চেতনিক

১ ৩ ৮ ১

সম্পাদক ॥ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চেতনিক

মুর্শিদবাদ জেলার প্রবীণতম কবিদের অন্যতম মণিকান্ত হালদার মহাশয় গত ১৩ই অক্টোবর সকালে তাঁর মুর্শিদাবাদ শহরস্থ বাসগৃহে পরলোক গমন করেছেন। আমরা এই শ্রদ্ধেয় কবির আত্মার শান্তি কামনা করি। স. চে.

◆ বিদগ্ধ সমাজ কর্তৃক সম্বর্ধিত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকারী ও আদর্শবাদী পত্রিকা 'চেতনিক'-এর ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা (শারদীয় ১৩৮০), মূল্য ২ টাকা ৫০ পয়সা এবং ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, মূল্য ২টাকা ২৫ পয়সা এখনো কিছু পাওয়া যায়।

◆ পরবর্তী (২য় বর্ষ ৩য়) সংখ্যায় অন্যান্য আকর্ষণীয় রচনাবলীর সঙ্গে থাকছে চিত্তরঞ্জন দাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'বাংলা মঞ্চে ব্রেশ্‌ট নাটকের চর্চা'।

শারদীয় চেতনিক

১৩৮১

দ্বিতীয় বর্ষ/দ্বিতীয় সংখ্যা

॥ সূচী ॥

সম্পাদকীয়

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি, বাটা ভ'রে পান দেবো, দোহাই তোমাদের, গালপুরে খেতে খেতে তোমরা আমাদের বাড়ি ছেড়ে, গাঁ ছেড়ে, দেশ ছেড়ে চলে যাও সমুদ্রপারে, কিংবা পৃথিবী ছাড়িয়ে মঙ্গলগ্রহের জঙ্গলে। আমাদের ধেড়ে খোকাখুকুদের আর ঘুম পাড়িয়ে রেখো না। ওদের জাগতে দাও। নইলে, সর্বনাশের উনুনের আগুন লোভী জিভ মেলে ওদের ধরলো ব'লে। শুধু কি ওরাই ম'রে রেহাই দেবে! গোটা দেশটাই যে অভাবে-স্বভাবে জলে পুড়ে মরতে বসেছে। আর ক'দিন পর পুজো। দশপ্রহরণধারিণীর নৈমিত্তিক পুজো মহাসমারোহে সম্পন্ন করবে ভদ্রলোকের ভিকিরি ছেলেরা। কোথাও কোথাও উপাদেয় পানীয়ের পিপে উপুড় হবে তাদের পিপাসার্ত পাকস্থলীতে। ভোটভিকিরি রাজাগজারা আসবেন তাদের 'হাতে রাখবার' নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্যে, সাজানো মায়ামঞ্চে উঠে তাদের বিগলিত ধন্যবাদ কুড়োবার জন্যে বহু দামী, কিন্তু অর্থহীন, 'ঋতবাক্য' উচ্চারণ করবেন, অনর্গল উদ্দেশ্যহীন অজীর্ণ বাণী উদ্গীরণ করবেন। অজস্র বাজি পুড়বে। সহস্র সঙ্ নাচবে। আর হাজার পাওয়ারের শত শত বিজ্‌লি রঙের আলোয় ঝলমল্ পুজাপ্রাঙ্গণের অন্ধকার আনাচে-কানাচে বর্শাবিদ্ধ জন্তুর মতো অসংখ্য অনাদৃত ক্ষুৎক্ষাম অমৃতস্য পুত্র কন্যারা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। কিন্তু আমরা তা দেখতে পাবো না। কারণ দেখবার মতো আমাদের চোখ নেই। আমার সবাই খারাপ লোক নই। সবাই কিছু চুরি-জোচ্চুরি করিনে, ঘুষ নেবার সুযোগ পাই নে। তবু আমরা তা দেখতে পাবো না। কারণ দেখতে হ'লে মন চাই। সে-মন আমাদের নেই। সুশান স্টেবিঙের ভাষায় 'We are too lazy to be critical.' কৌটোভর্তি চিন্তার চিনির ডেলাগুলো আমাদের মুখের মধ্যে চামচ-চামচ ফেলে দেওয়া হয়। আর আমরা পরম পরিতৃপ্তিসহকারে তা

গলাধঃকরণ ক'রে সোজা মস্তিষ্কের কুঠুরিতে চালান ক'রে দিই। মস্তিষ্ক হ'য়ে যায় শ' বর্ণিত 'বিলিয়ার্ড বল'-এর মতো 'সলিড্'। স্বাধীন চিন্তা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয় না, স্থান হয় না সেখানে তাই। তাই চারপাশে আগুন লাগলেও তার আঁচ লাগে না আমাদের আচরণে, আমাদের 'বংধা গংদা' মনে ও মননে। তাই আমরা অভ্যস্ত আবেগে ডিমক্রেসির ডিমে তা দিয়েই চলেছি, সে-ডিম আস্ত আছে, না পচে ঢোল হয়ে আছে তা যাচাই না ক'রেই। ডিমক্রেসি যদি যথার্থই হয় জনকল্যাণপ্রতিজ্ঞ রাষ্ট্র তা হলে তাকে মাথায় তুলে রাখা শুধু আমার আপনারই নয়, আমাদের পিতৃপিতামহেরও পবিত্র দায়িত্ব। আর ডিমক্রেসি মানে যদি হয় নিজের জাত ও জীবন খুইয়ে ক'জন অভিজাত বা রাত জাত নবাব বাদশার নবাবি কায়েম রাখার কসরৎ মাত্র— তাহ'লে তার ওপর আস্থা বজায় রাখতে পারে কোন্ স্বচ্ছদৃষ্টি, ঋজুমার্গ, বিবেকবান ব্যক্তি?

দেশের এই চরম দুর্দিনে নেতাদের মধ্যে, বিভিন্ন দলের মধ্যে, এমন কি লেখক শিল্পীদের মধ্যেও নির্লজ্জ পৈশুন্যপ্রিয়তা দেখে, আত্মমগ্ন বিচ্ছিন্ন দ্বৈপ জীবনযাপনের লিপ্সা দেখে, স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে নিঃসাড় নিস্পৃহতা দেখে দেশের সং সাধারণ মানুষ লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, বিপন্ন ও অসহায় বোধ করছে। অধিকাংশ সাহিত্যিক আজও, দারু জতুগৃহে বাস ক'রেও, ইলিয়া এরেনবুর্গ-কথিত 'স্বপ্নোৎপাদনের কারখানা' (dream factory)-র অংশ হয়ে, 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যসৃষ্টির নামে নিরালম্ব কিম্ভূতকিমাকার সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে চলেছেন। এইসব আত্মপ্রবঞ্চক বুদ্ধিবাজের দল, চারিত্রিক দৈন্য ও শঠতাবশতঃ, যে 'বিশুদ্ধ' কল্পনানিভর উপন্যাস-নাটক কবিতা প্রসব ক'রে যাচ্ছেন তা ভবিষ্যতের উত্তরোত্তর অধিকতর বাস্তবসচেতন সমাজ নিষ্ঠুর-ভাবে অশ্রদ্ধা করবে, প্রত্যাখ্যান করবে। পৃথিবী ও প্রকৃতির দাবিকে উপেক্ষা ক'রে, সমাজের চাহিদাকে অস্বীকার ক'রে কোনো সার্থক কালজয়ী সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হ'তে পারে না। কোনোদিন তা হয়ওনি। বাস্তবকে প্রতিবিম্বিত না ক'রে, যুগকে, যুগযন্ত্রণাকে বিস্মৃত হ'য়ে যুগোত্তর সাহিত্যসৃষ্টির স্পর্ধা এক-মাত্র মূর্খেই প্রদর্শন করতে পারে। কারণ, সংস্কৃতির মতো, সাহিত্যও বৃন্তহীন অলাবু নয়। সাহিত্য নিবিড়ভাবে যুগবক্ষে লালিত হয়েই যুগোত্তরণের সফল স্বপ্ন দেখতে পারে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস

ডঃ সরোজমোহন মিত্র, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট্.

প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ : বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কেবলমাত্র নিজেকে নিয়েই থাকা সম্ভব কি ? প্রশ্নটা মূলত সাহিত্যের নয়, সমাজ-অর্থনীতির। কিন্তু সমাজকে বাদ দিয়ে ত সাহিত্য হয় না। তাই সমাজজীবনে যা কিছু গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে সাহিত্যে তার কোন না কোনভাবে প্রতিফলন থাকবেই।

মানুষকে নিয়েই সমাজ। পরিবর্তনশীল মানবজীবনের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমাজেরও পরিবর্তন হয়। তার জন্য পৃথিবীটাকেও বদলে ফেলার একটা অসীম শ্রম পর্যায় অব্যাহত চলেছে। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের আবেগেরও পরিবর্তন হয়। ধনতন্ত্রের প্রথমদিক সাহিত্যের ঝোঁক ছিল ব্যক্তিপ্রবণতার দিকে। সামাজিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে জাহির করাই ছিল প্রধান উপজীব্য। শেক্সপীয়রের এন্টনি এবং ক্লিয়োপাট্রা কিংবা রোমিও জুলিয়েট-এ নিবাধ প্রেমের জয়গান। এখানে দ্বন্দ্ব সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির। শ্রেয় এবং প্রেয়-র দ্বন্দ্ব।

তারপর ধনতন্ত্রের শোষণের তীব্রতা বেড়েছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদ মাথা তুলে উঠেছে। বেপরোয়া এই শোষণের বিরুদ্ধে জীবিকার সংগ্রামে সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অসহায়ের শক্তি সংহতির মধ্যে। নদীর একপাড় যেমন ভাঙে অন্যপাড় তেমন গড়ে ওঠে। সমাজ জীবনেও চলেছে নিরন্তর এই ভাঙাগড়ার খেলা।

সাহিত্যে তার প্রতিফলন থাকতে বাধ্য। সাহিত্যিকেরা নিরন্তর শ্রম করে চলেন সামাজিক উপাদান সংগ্রহের জন্য। কিন্তু কেবল ইট কাঠ সুরকি সিমেন্ট যেমন কোন বাড়ি তৈরি করা যায় না তেমনি কেবল উপাদানেই সৃষ্টি সুন্দর হয়ে ওঠে না। তারজন্য পরিকল্পনার অভিনবত্ব চাই, বক্তব্যের দৃঢ়তা চাই, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বের পরিচয় চাই। বাড়ি তো সকলেই তৈরি করে কিন্তু সব বাড়ি তো একরকম হয় না। সৌন্দর্য কেবল ভিন্নতার মধ্যে নয়, প্রকাশ এবং প্রয়োজনের দৃঢ় সমন্বয় থাকা দরকার, তাছাড়া আছে রুচি, সামর্থ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গী।

যে কোন সৎ এবং মহৎ সাহিত্যিক সমাজ-দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করতে পারেন না। মানবিক মূল্যবোধে সমাজের অন্তর্নিহিত অন্তরায়গুলো সাহিত্যিক বড় করে তোলেন। তার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করে মানুষ তার সমাজকে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনে বদলে নিতে চায় ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষ যখন ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র আনয়নের জন্য তৎপর হয় তেমনি তার সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ব্যক্তি প্রবণতার পরিবর্তে সমষ্টিবোধই আধুনিক কালে প্রধান হয়ে উঠেছে। "সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণ সীমা ভেঙে নিয়ে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার যে নতুন গতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে" মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাংলা উপন্যাসে তাকে প্রথম রূপদান করলেন। 'সার্বজনীন' উপন্যাস তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কূট চক্রান্তে দেশ ভাগাভাগির মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা আসে। এই ভাগাভাগির পটভূমিকা তৈরী করার জন্য তারা যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল তা চরমাকার ধারণ করল ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগস্ট থেকে। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার ভয়াবহতার মধ্যে আমরা যা লাভ করলাম তার নাম 'স্বাধীনতা'। তার মূল্য দিতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে হোল। লিওনার্ড মসলে-র হিসেবে দেখা যায় মোট এক কোটি ৪০ লক্ষ বাস্তুত্যাগী হয়েছিল এবং ৩ লক্ষ লোককে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

সে এক নারকীয় দৃশ্য। হিংসোন্মত্ত মানুষগুলো যেন মত্ত হয়ে গিয়েছিল। আর অসহায় মানুষদের দিয়ে কিছু সুযোগসন্ধানী লোক ভাল ব্যবসা ফেঁদে রাতারাতি আরও বড়লোক হয়ে গেল। কিন্তু মার্কসবাদে বিশ্বাসী মাণিক জানতেন সমাজে এই প্রচণ্ড ভাঙনেও মানুষগুলো একেবারে চুরমার হয়ে যাবে না। অন্যদিকে মানুষ আবার গতিশীল হয়ে নতুনরূপ লাভ করবে।

হোলও তাই। শেয়ালদা ষ্টেশনে পথে ঘাটে উদ্বাস্তুর ভীড়ে একদিকে যেমন ভাঙনের রূপ চরমাকার লাভ করেছিল অন্যদিকে সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতির মোহ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বহু ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করে রাতারাতি বহু পড়ো জায়গায় নতুন নতুন মানুষের উপনিবেশ গড়ে উঠলো। উদ্বাস্তু জীবনের এই দিক তৎকালীন বাঙলা সাহিত্যের অধিকাংশ লোকেরই চোখে পড়ে নি। তারা যখন উদ্বাস্তু মেয়েদের নিয়ে নানা রসাল কাহিনী ফাঁদছিলেন তখন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাঙলা সাহিত্যে রূপায়িত করলেন এক উজ্জ্বলতর কাহিনী।

তিনিই প্রথম উপলব্ধি করলেন, "দশটা মানুষের জীবনের সুখদুঃখের অংশীদার হলে, দশজনের লড়ায়ে ভাগ নিলে জীবন বেশ জমে যায়।" রোগ-শোক দুঃখ বেদনার বন্যা মানুষকে কখনো ভাসিয়ে নিতে পারে না। সাময়িক ভাবে মুষড়ে পড়লেও মানুষকে সেই ধাক্কা সামলে নিতে হয়। আর পাঁচজনের দুঃখের সঙ্গে নিজের দুঃখটাকে মিলিয়ে দেখলেই তবে সেই দুঃখের বোঝাটা অনেক হালকা হয়ে সুখের উপলব্ধি জন্মে। 'সার্বজনীন' উপন্যাসে মাণিক অতি সুন্দরভাবে এই কথাই বলতে চেয়েছেন।

কেবল নিজের হিসাব ধরলে আজকের দিনে চলে না। দশজনের কথা ভাবতে হয়। বিভূতিভূষণের ছেলের এবং মহেশ্বরের জামাই সমীর কেবল নিজের হিসাব ধরেছিল বলে সর্বনাশের তলায় তলিয়ে যেতে বসেছিল। তিনশ টাকা মাইনের চাকরিতে তার তৃপ্তি ছিল না। রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্নে সে ব্যবসায় নেমেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে শ্বশুরের টাকা চুরি করতে হোল। চেনা জানা বহু লোককে প্রবঞ্চিত করতে হোল। কিন্তু সবই তার ধ্বংসের পথে খড়কুটোর মত ভেসে গিয়েছিল। অবশেষে সে গিয়ে আশ্রয় নিল শেয়ালদা ষ্টেশনে উদ্বাস্তুর মধ্যে। সে তাদের দেখেছে ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়েও কি অসীম ক্লেশ ও চেষ্টার দ্বারা তারা নতুন জীবন গড়ে তুলেছিলো। সেখান থেকে সে বাঁচবার পথ পেয়ে গেল! মদের নেশা তাকে আত্মবিনষ্টির পথে নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু পরে সে বুঝতে পারল বাঁচার নেশা আরও বেশী উত্তেজক। সে নেশাটা একাকী জমে না। তারজন্য দশজন প্রয়োজন।

কতগুলো মিথ্যা স্বপ্ন আর কল্পনা আঁকড়ে ছিল বলে মহেশ্বরের ছেলে সাধন ও সমীরের সঙ্গে ব্যবসায় নেমে বুঝতে পারেনি কি করে বাবার দশ দশ হাজার টাকা জলের মত উবে গেল। সবিতার বাল্যকাল থেকেই অন্যরকম নিষ্ঠা ছিল। সেজন্য মধ্যবিত্তসুলভ আবেগ আর স্বপ্নের চোরাবালিতে কখনো সে পা দেয়নি। প্রথম থেকেই সে হিসেব করে চলেছিল বলে তার জীবনে কোন প্রচণ্ড আশাভঙ্গের বেদনা এসে জীবনটাকে অর্থহীন করে দেয় নি। বরং অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার মত সাহসিকতা তার আছে। তাই দরকার পড়লে সে যেমন পুরুষ সেজে নিজের মা ভাইবোনদের নিয়ে অজানার পথে পাড়ি জমাতে পারে আবার তেমনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে দেশের দুঃখ-দুর্দশার গান গেয়ে ঘোড়া বিক্রী করে নিজেদের সংসার চালাতেও পেছপা

হয় না। কারণ সে বুঝতে পারে সমাজের গতিপথ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। নতুনভাবে নতুন উপায়ে এখন যেমন শোষণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে তেমনি তার প্রতিরোধও করতে হবে সংহত ভাবে। বাঁচবার কৌশলও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন করতে হয়।

এই কথাটা আশ্চর্যভাবে উপলব্ধি করল মহেশ্বর। পূর্ববঙ্গে তারা ছিল ব্যবসাদার জোতদার অনেক টাকা পয়সা প্রতিপত্তি চিরকাল ভোগ করে আসছে। সাতপুরুষ ধরে তাদের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। রাষ্ট্রিয় পরিবর্তনের সঙ্গে এপার বাংলায় এসেও সে তার ঐতিহ্য থেকে সরে দাঁড়াতে চায় নি মহাসমারোহে সে এ বঙ্গেও পুজো করে। কিন্তু যেখানে আয় নেই কেবল ব্যয় থাকে এবং তার ওপর সমীরের মত বাটপাড় থাকে সেখানে গহনা বন্ধক দিয়ে দারিদ্র্যের ঝড়কে রোখা যায় না। সাতপুরুষের পুজো তাকে বন্ধ করে দিতে হয়। এ বেদনা যে কী মর্মান্তিক ভুক্তভোগী ছাড়া উপলব্ধি করা তা সম্ভব নয়। কিন্তু এতক্ষণ মহেশ্বর কেবল নিজের কথাই ভেবেছে। মুহূর্তে সে বুঝল পাড়ায়ও যদি কোন পুজো না হয় তাহলে কেবল সে একা নয়, পাড়ার লোকগুলোও পুজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে। নিজেকে নিয়ে মশগুল থেকে সে কেবল মর্মান্তিক পীড়াই বোধ করছিল, সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের কবল মুক্ত সার্বজনীন দুর্গোৎসবের তাৎপর্য উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বিষণ্ণতা দূর হয়ে গেল। তাদের বংশানুক্রমে পুজো হয়ে পুজো গেল পাড়ার সকলের পুজো। এতে ব্যক্তিগত দায় কমে গেল অথচ আনন্দ বাড়লো অনেকগুন বেশী।

সাবিক এই অনুভূতির ধাক্কা এসে লাগলো সদা হাসিখুসী কর্মবিমুখ পরমেশ্বরের মধ্যেও চিরকাল সে ভাইয়ের পাঠানো টাকায় সংসারের কোন দায়িত্ব না নিয়ে গা বাঁচিয়ে চলে এসেছে। কিন্তু চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে হাবুডুবু খাওয়া সংসারের হাল দেখে বুড়ো বয়সেও তাকে চাকরী নিতে হোল। এতকাল সমাজের মধ্যে বাস করেও সে সামাজিকভাবে কোন সমস্যাকে দেখে নি তাই পদে পদে জমেছিল অসংখ্য ভুল ধারণা। তাই তো তার বাড়ির ছেলে সাধনের জুতোর সোল চুরি করার বিক্রী করার মধ্যে সে কোন দোষ দেখতে পায় না।

সুরমারও পরিবর্তন হোল। স্বামী সমীরের অধঃপতনে সে নিজেকে বিধবা বলে ভাবতে শুরু করেছিল। এতদিন সে কেবল নিজের হিসাব আর স্বামীর হিসাব নিয়ে ছিল বলে দুঃখের অন্ত ছিল না। কিন্তু সবিতার কথায় তার হুঁশ হোল। জগতে তার মত কত বৌ কত স্বামী আছে। জগতের হিসাবের সঙ্গে নিজের হিসাবটা মিলিয়ে নেওয়ার পরে সমীরকে নিয়ে নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখা দিল। এমনি করে মাণিক ব্যক্তিমানসিকতার ফাঁকির দিকটা চমৎকার করে এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে সকলে আনে দুঃখ গ্লানি। আর দশজনের সঙ্গে সংহতির মধ্যে আছে যথার্থ আনন্দ ও মুক্তির পথ। দশজনকে নিয়ে চেষ্টা না করলে সমাজকে কখনো বদলে দেওয়া যাবে না, নিজে শান্তি পাবে না।

যুগে যুগে ইতিহাসের বিকৃতি—কার স্বার্থে

মণি বাগচি

প্রাচীন কাল থেকে অতি-আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা পর্বে বহুবিধ বিকৃতি আমরা লক্ষ্য করে থাকি। উনিশশো কুড়ি সাল থেকে আমরা শুনে আসছি : জাতির জনক গান্ধী। কথাটি তাহা মিথ্যা এবং ঐতিহাসিক বিকৃতির একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বহু সভায় বলেছি, বহু প্রবন্ধে আলোচনা করেছি যে, জাতির জনক একজনই, তিনি রাজা রামমোহন রায়। গান্ধী Pseudo-father, এর বেশি কিছু নন। তবে এই বিকৃতিটা কার স্বার্থে? এই বিকৃতির উদ্ভব হয়েছিল বিদেশী শাসকের স্বার্থে ও এদেশের একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে যাদের চোখে বাঙালীর বৈপ্লবিক মনীষা চিরকালই শিরঃ-পীড়ার কারণ হয়ে এসেছে। গান্ধীর প্রথম আন্দোলন—অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কথাটা ধরা যাক্। এই আন্দোলন যখন সাফল্যের কাছাকাছি এসেছিল, গান্ধী মাঝপথে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন চৌরিচৌরার ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। এটাও ছিল ইতিহাসের বিকৃতির আর একটা দৃষ্টান্ত। এইভাবে আন্দোলনকে হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে গান্ধী প্রকৃত পক্ষে সেদিন যাদের নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছিলেন তারা হলো ভারতের ধনিকগোষ্ঠী, পুঁজিপতি ও শিল্পপতির দল। গান্ধীকে বলা হয়ে থাকে ভারতের জনগণের বন্ধু। আসলে তিনি ছিলেন এদেশের ধনিকগোষ্ঠীর বন্ধু। তাঁর কংগ্রেস তহবিলে এদেরই দান ছিল সর্বাধিক, আজও তাই। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক বলবে, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে না ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, না ছিল প্রখর চিন্তাগত বিপ্লব অথবা বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক অন্তপ্রেরণা। গান্ধীর রাজ-নৈতিক দর্শন, নিরপেক্ষ ইতিহাসের দৃষ্টিতে, অনেক কিছুর মিশ্রণে (থিওজফি, টলষ্টয়, বেদ ও সার্মন অন দি মাউন্ট) গঠিত ছিল। এ শুধু রহস্যময় নয়, দুর্বোধ্যও বটে। আজ যখন আমরা স্বচ্ছ দৃষ্টিতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃতি বিচার করতে চাই, তখন দেখতে পাই যে, এ ছিল জাতীয়তা, রাজনীতি, ধর্ম, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ এবং ধর্মান্ধ গোঁড়ামির এক আশ্চর্য জগা-খিচুড়ি। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে অন্তত বিশ কোটি সেইটি উপাদেয় মনে করেছিল। আসল কথা, কোন আন্তর্জাতিক চিন্তা চেতনা থেকে এই আন্দোলনের উদ্ভব হয়নি। তেমনি ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট তারিখটিকে আমরা

স্বাধীনতা দিবসের মর্যাদা দিয়েছি। এটাও ইতিহাসের আর একটা বিকৃতি। ভবিষ্যতের সত্যসন্ধ ঐতিহাসিক বলবেন, আসলে ঐদিন যেটা ঘটেছিল তা ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত একটি বিলের মাধ্যমে একটি বশম্বদ ও নিরাপদ রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর-এর অধিক কিছু নয়। ক্ষমতা হস্তান্তর আর স্বাধীনতা এক জিনিস নয়। অথচ গত সাতাশ বছর ধরে আমরা দেশের লোককে বলে এসেছি ঠিক উল্টো কথা। যদি আমরা সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ করতাম তা হলে দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার কাঠামোকে ভেঙে ফেলতাম কিন্তু তা করা হয় নি। যাদের হাতে ক্ষমতা এলো এবং সেই ক্ষমতা আজো যাঁদের করায়ত্ত তাঁরা সেই কাঠামোকে পুরোপুরি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত এবং শ্রেণীগত সম্পদ গড়ে তুলেছেন বৃহত্তর জাতীয় জীবনে এই যে ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার বিরাজমান, সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ হলে এটা কি সম্ভব হতো ?

১৯৭৭ থেকে যদি ১৮৫৭-তে চলে যাই, সেখানেও প্রত্যক্ষ করি ইতিহাসের একটা প্রকাণ্ড বিকৃতি ঐ বছরে সংঘটিত সিপাহী যুদ্ধকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে অভিহিত করা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়! এই প্রসঙ্গে একালের একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি : 'The rebellion which broke out in 1857 was neither a military mutiny nor a national war for independence It was not a mutiny because it was not confined to the troops, but was supported by the vast majority of the peasants and people of northern India ; and it was not a national war because as yet there was no nation in India, although the unifying policy of the British was rapidly creating one. It was a revolt precipitated by the revolutionary changes introduced by British capitalism into India. Historically considered, it was a revolt against nationalism and against modernity : it was an attempt to turn the clock of history back to feudal isolation and to feudal tyranny, to the handloom and the spinning-wheel, and to primitive methods of transport and communication.' (Lister Hutchinson :

The Empire of the Nabobs) অতএব সিপাহী বিদ্রোহের অনাকলা ইতিহাস-বিধাতারই অভিপ্রেত ছিল। অথচ এটাকেই আমরা জাতীয় অভ্যুত্থান বা স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে গৌরব বোধ করে থাকি। যদি জিজ্ঞাসা করি—কার স্বার্থে এই বিকৃতি বা সত্যের অপলাপ, উত্তর হবে—তাদেরই স্বার্থে যারা ভারতবর্ষকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের মধ্যে রেখে দিতে চেয়েছিল। হাল আমলের আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। চার্চিলের 'ওয়ার মেমরয়স' অনেকেই পাঠ করেছেন। এই বইটির (কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত) জন্যই তাঁকে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকায় এর সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল : 'Sir Winston Churchill is certainly a maker of history, but he can never be a writer of history, for he hardly understands the function of history' যাঁরা এই বইটি পড়েছেন তাঁরা দেখেছেন চার্চিল কোথাও ঐতিহাসিকের নিরস দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে পারেন নি।

আসল কথা, যাঁরা ইতিহাসের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে উপলব্ধি করতে না পারেন, তাঁদের হাতে ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি হওয়া আশ্চর্যের কথা নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্যজাতির গৌরব পরিকীর্তিত হয়ে থাকে, বলা হয়ে থাকে, তাঁরা সুসভ্য ও মহান ছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের পর আমরা জানতে পারলাম যে, আর্যদের ভারত আগমনের বহুপূর্ব থেকে সিন্ধুনদের তীরে যে দ্রাবিড় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা ছিল সকল দিক দিয়েই উন্নত। আর্যরা তাকেই ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। আর্যসভ্যতা দ্রাবিড় সভ্যতার তুলনায় যে খুব বেশি উৎকৃষ্ট ছিল না, তার অকাট্য প্রমাণ এখন আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সিন্ধুনদের সেই সভ্যতাকে আর্য পরবর্তী ভারতবাসীর জীবনে আর কখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে ইতিহাসের যে সব পাঠ্য বই আছে তার প্রত্যেকটির মধ্যে রাশীকৃত distortion of facts বা তথ্য বিকৃতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভারতীয় জাতি (Indian race) কথাটাই তো ভুল, তেমনি জাতীয় ভাষা কথাটা ভুল, আমাদের দেশে যে সর্বভারতীয় জাতীয় ভাষা নেই তার প্রমাণ যদি কেউ দেখতে চান তবে একটা পাঁচ বা দশ টাকার কারেন্সী নোটের ওপর তিনি যেন চোখ বুলিয়ে নেন। সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে এক জঙ্গল ভাষা ও অক্ষরের নিদর্শন। ভারতীয় খাদ্য বা ভারতীয় পোষাক-পরিচ্ছদের

মধ্যে যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে তার থেকে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, বৈচিত্র্য আর ঐক্য—এই দুই পারস্পরিক বিরোধী বৈশিষ্ট্য দ্বারাই চিহ্নিত হয়েছে ভারতীয় ইতিহাসের চিরন্তন ধারা।* ভারত-ইতিহাসের যথার্থ আলোচনা বা অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রকৃত বাধা কোথায় সেই কথা বলতে গিয়ে একজন আধুনিক ঐতিহাসিক লিখেছেন : 'India has virtually no historical records worth the name. In India there is only vague popular tradition with very little documentation above the level of myth and legend.' (D. D. Kosambi : The Culture and Civilisation of Ancient India) যে অর্থে রোম বা গ্রীসের বিস্তারিত ও সঠিক ইতিহাস আমরা পাই, ঠিক সেই অর্থে আমরা যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাই না তার প্রকৃত কারণটা তো এইখানেই।

আচার্য যদুনাথ সরকার বলতেন : 'No document, no history' অর্থাৎ দলিল ভিন্ন ইতিহাস লেখা যায় না। আবার সেই দলিল বা ডকুমেণ্ট সাচ্চা হওয়া চাই · এইভাবেই তো তিনি মুঘল ভারতের ইতিহাস, বিশেষ করে সম্রাট আওরংজীবের অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী রাজত্বের ইতিহাস, লিখতে পেরেছেন ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ছিলেন সত্যসন্ধানী ঐতিহাসিক। আকবর থেকে ইংরেজের ভারত ত্যাগের দিন পর্যন্ত যে ইতিহাস সেটা আসলে কী? মোহমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে যদি অবলোকন করা যায় তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, আকবরের যুগে গণদেবতা নেই, দেশ নেই, জাতি নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের অসফল স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীতে বাস্তবতার রূপ গ্রহণ করবে বলে কেউ কেউ আশা করেছিলেন, যেহেতু তথাকথিত স্বাধীন ভারতের, প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু হয়ত অজ্ঞাতসারে আকবরের পথেই চলেছিলেন। যাকে আমরা 'জাতি' বলে ভ্রম করেছি। এ আকবর-নেহেরুর কাম্য সেই মহাজাতি নয়। বর্তমান ভারতীয় জাতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এখনো সংকীর্ণবুদ্ধি সম্প্রদায়-সহস্রের সাময়িক ঐক্য এবং মৌখিক ঐক্য, এইজন্যই জহরলাল মাঝে মাঝে ন্যাশনালিজমের মুখোসের আড়ালে regionalism, casteism, communalism এর নগ্নমূর্তি দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। সেই স্মরণীয় ১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট দিনটির কথা মনে পড়ে। স্বাধীনতার দিনেই ভারতমাতাকে শরশয্যা নিতে হয়েছিল;

তাঁর বক্ষ পঞ্জরে দুইদিকে আঁধবেঁধা ধারালো ছুরি, পেটের মধ্যে স্নায়াবী বাতাপী-ইম্বল, অঙ্গে অহিংসা চিহ্নিত নামাবলী। আকবরের রাজত্বে ভারতীয় মহাজাতি পায়ের ওপর ভর করে না দাঁড়াতেই হিন্দু মুসলমান মারাঠী গলা টিপে মেরেছে। এই পাপে হিন্দু জাতি আলমগীরশাহী রৌরবে পড়েছে। মুসলমান মুঘল সাম্রাজ্য হারিয়েছে, হিন্দু-মুসলমান দেড়শো বছরের বেশি বিলাতি লাঙল টেনে রক্তবমি করেছে। আকবরের অসাফল্যের পরিণাম আওরংজীব, আওরংজীবের অসাফল্যের পরিণাম মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান।

ইতিহাসের বিকৃতি জাতির পক্ষে ক্ষতিকর, একথা কোন যুক্তি দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। আজ তাই ভারতবর্ষের নতুন করে লিখবার দিন এসেছে। মানুষের ভুরুর নীচে দুটো চোখ ছাড়া ওপরে অজ্ঞাতস্থানে আর একটা চোখ সৃষ্টিকর্তা লুকিয়ে রেখেছেন—এটাই প্রজ্ঞাচক্ষু, যার দ্বারা সত্যের স্বরূপ দর্শন হয়, ইতিহাসের বিশ্বরূপ দর্শন হয়—ঐ প্রজ্ঞাচক্ষু জাতির স্বাধীনতার দিনে উন্মীলিত হয়, দাসত্বে অন্ধ হয়ে যায়। এই স্বাধীনতা নয়, চিন্তার স্বাধীনতা এবং সকলরকম সহজ সংস্কার থেকে বুদ্ধি ও বিচারের মুক্তি। এই রকম মুক্তপুরুষই ইতিহাস চর্চার প্রকৃত অধিকারী। (ওদেশে র‍্যাঙ্কে, লর্ড এ্যাকসন, টয়েনবি আর এদেশে, রাণাডে, যদুনাথ, ভাণ্ডারকরকে আমরা এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করতে পারি।) প্রকৃত ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক দেশকালনিরপেক্ষ সহজ সংস্কারমুক্ত—মতবাদীর সংঘর্ষ এবং বাহবা-স্ফোটনের বহু উর্ধ্বে। ইতিহাসের ধর্মাধিকরণে নিন্দুক ও স্তাবকের ব্যঙ্গ, বক্র ও অতিশয়োক্তি বাগাড়ম্বর সূক্ষ্ম বিচারধারাকে প্রভাবিত করতে পারে না। এইজন্যই মনে হয় হিন্দুর মহাভারত আধুনিক সংজ্ঞানুসারে ইতিহাস না হলেও, কল্পিত কিংবা বাস্তব 'বেদব্যাস' একমাত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বেদব্যাসের রচনায় কোথাও বিকৃতির লেশমাত্র দেখা যায় না, পক্ষপাতিত্বও নয়। ইতিহাসের বিশ্বরূপ তিনিই দর্শন করেছেন। যারা হরিলুটের বাতাসায় সন্তুষ্ট হওয়ার মতো মানুষ সাধারণতঃ সেই শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের হাতেই ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে থাকে।

বলেছি, ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে। কথাটা একটু বিশদ করে বলি। ক্রোচে বলেছেন, ইতিহাসের কাজ সত্যকে প্রকাশ করা—'History should unfold the truth'—এবং এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই আজ ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন করে লিখবার দিন এসেছে। সত্যের উদ্ঘাটন

বড় সহজ কাজ নয়—নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত দৃষ্টি ভিন্ন ঐতিহাসিক সত্যের উদঘাটন আদৌ সম্ভব নয়। অতীত গৌরবের প্রতি অন্ধ অনুরাগ অনেক ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকে আবিল করে দেয়। প্রকৃত ইতিহাস অনুশীলনের মধ্যে রোমান্টিক কল্পনার স্থান নেই। যেখানে রোমান্টিক কল্পনা, সেখানেই ইতিহাসের বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এর একটা দৃষ্টান্ত বাংলার বারভুঁইয়া। কল্পনা ও আবেগের আতিশয্যে আমাদের নাট্যকাররা যশোরের প্রতাপাদিত্যকে মেবারের রাণাপ্রতাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আচার্য যদুনাথ তাঁর সম্পাদিত 'হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখেছেন: 'A false provincial patriotism has led modern Bengali writers to glorify the Bara Bhuiya of Bengal as the champions of national independence against foreign invaders. They were nothing of the sort. These mushroom captains of plundering bands have been likened to the hereditary chieftains of the homes they had bought with the blood of their ancestors through centuries of struggle. The height of absurdity is reached when our dramatists call Pratapaditya of Jessor as the counterpart of Maharana Pratap Singh of Mewar It is thefore neccessary to debunk the Bengali hero by turning the dry light of history on him.'

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বিদেশীদের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু ত্রুটি, সত্যের অপলাপ ও তথ্য-বিকৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন স্বনামধন্য ভারততত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ইতিহাস-বিজ্ঞানী ভাউ দাজী। আমাদের দেশে কোন হেরোডোটাস বা থুসিডাইডস, লিভি অথবা ট্যাসিট্যাস জন্মায় নি। তাই ইংরেজ শাসনের আমল থেকে এদেশের স্কুল-কলেজের পাঠ্যতালিকায় ইতিহাস জাতীয় যেসব বই স্থান পেয়ে এসেছে। সেগুলির লেখক প্রধানও বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর লোক অথবা মিশনারি পাদরি। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রথম এইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তখন থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন করে লেখার কথা উঠতে থাকে। গিবন বলেছেন, একটি জাতির উত্থান, বিকাশ ও পতনের সামগ্রিক পটভূমিকাতেই তার ইতিহাস রচিত হতে পারে। তিনি নিজে এই পদ্ধতির অনুসরণ করে তাঁর কালজয়ী ইতিহাস (Decline and fall of the Roman Empire) রচনা করেছিলেন। অনেকে বলেন, ইংরেজ-পূর্ব ভারত-

ইতিহাসের কিছু উপাদান বার্ণিয়ের, ট্যাভার্নিয়ের, মানুচী প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকরা রেখে গিয়েছেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ এইসব বিবরণকে 'Bazar gossip'-এর অতিরিক্ত মূল্য দেন নি। তিনি বলেছেন, এইসব বিবরণকে ইতিহাস রচনার নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। কারণ এইসব পর্যটকদের কেউই ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন নি।

ভারত ইতিহাসের প্রবাহ ধারা (continuity) চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। যদুনাথ বলেছেন: "The civilisation and culture of India has outlived the shock of dynastic revolutions, foreign invasions, religious conflicts and widespread natural disaster" ভারতীয় সভ্যতার এই যে প্রাণশক্তি, পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এই নিরবধি প্রবাহধারা ইতিহাসের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন জাতি বিরল নয় যাদের ইতিহাস বলতে কিছু নেই, অথচ তারা প্রাণশক্তিতে ভরপুর। সুতরাং প্রাণশক্তির দোহাই দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রবাহধারার মহিমা কীর্তন ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে নিরর্থক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্মজীবন অপরিবর্তিত ও জড় অবস্থায় ছিল, বহির্বিশ্ব থেকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে জীবন কাটিয়েছি, বাইরের অন্যজাতির চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান করেছি—নিতান্ত গণ্ডীর মধ্যে থেকে আমরা দীর্ঘ শতাব্দীকাল কাটিয়ে দিয়েছি। সুতরাং যে contiunity বা প্রাণপ্রবাহের কথা বলা হয়, ইতিহাসের দৃষ্টিতে তার মূল্য সামান্যই। মানব সভ্যতার বড় কথা হলো synthesis বা সমন্বয়। এর ভেতর দিয়েই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিকাশলাভ করে পারস্পরিক ঐক্যবোধ। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে আর যাই থাকুক, এই সমন্বয়বোধ, এই ঐক্যবোধটা ছিল না। রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবকাল থেকে আমরা এ জিনিস লাভ করলাম উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এবং তখন থেকেই আমাদের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে দেখা দিল সামগ্রিক অনুশীলনের আগ্রহ। তখন থেকেই এলেন একদল নতুন ইতিহাস বিজ্ঞানী, যাঁরা বিশ্ব সভ্যতার পটভূমিকাটি সামনে রেখে ভারত-ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এইভাবে এঁরা শুধু ইতিহাসের সত্য উদ্‌ঘাটন করলেন না, এর মর্ম অনুধাবন করলেন ও তথ্যের সমন্বয় সাধন করলেন। ভারত ইতিহাস তাঁদের হাতেই বিকৃতি-মুক্ত

হলো ও তার সত্যকার রূপরেখাটি আমাদের দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হলো। এঁরা দেখালেন, মানুষ ও দেবতা অপ্রিয় সত্য শুনতে আগ্রহশীল নয়; অথচ প্রকৃত ইতিহাসে হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।'

আমাদের 'সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্য' রাষ্ট্রকে (welfare state) রূপায়িত করবার জন্ম সম্প্রতি জাতিগঠনধর্মী সাহিত্যের প্রয়োজন হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, যথেষ্ট সংখ্যায় মার্কামারা সাহিত্যিক উৎপাদন করবার জন্ম দিল্লী কি অন্যত্র একটি সর্ব বিদ্যাপ্রসবিনী কারখানাও স্থাপিত হয়েছে, সত্যমিথ্যা খোদাতালা জানেন। অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হওয়ার পর রাষ্ট্রের প্রয়োজনে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের জন্ম মুসলমান যুগের দুই প্রস্থ ইতিহাস লোকশিক্ষার জন্ম নতুন পদ্ধতিতে রচনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং 'সত্যমেব জয়তে' এই ছাপ-মারা কিছু ইতিহাস-গ্রন্থও ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ থেকে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সর্বমঙ্গলার কৃপায় ভারতীয় গণতন্ত্রে অপ্রিয় সত্যের অপলাপ করে মিথন প্রশস্তি রচনা করলেও রেহাই পাওয়া যাবে না। গোদের ওপর বিষ-ফোড়ার মতো আমাদের ইতিহাসে নানাবিধ ism বা মতবাদ ক্রমশ প্রকট হচ্ছে, যে ism দিল্লীর মসনদ দখল করলে, ধূর্ত ঐতিহাসিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে ডাক ছাড়বে, 'জয় মামুর জয়!' বর্তমান বুদ্ধিজীবী ও শাকাহারি (নতুবা 'অহিংস' হয় না) সরকার চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, কাউকেও চটাবার প্রবৃত্তিও নেই, হিম্মতও নেই। জওহরলালের মতো রোমান্টিক ঐতিহাসিককে যখন আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের মুখের ওপর বলতে শুনি, 'I am a better historian than you,' তখনও আঁচ পাওয়া গিয়েছিলে যে, স্বাধীনতার অর্থে সত্যকার ইতিহাস চর্চার বারোটা বেজে গিয়েছে। কাঞ্চনমূল্যে ক্রীত একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিককে দিয়ে নেহেরু স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস লিখিয়েছেন, তার পাতায় পাতায় আছে তার বিকৃতি। এই বিকৃতি যে কাদের স্বার্থে, তা বলে দিতে হবে না। এমন অবস্থায় 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্' নাটকের মতো সর্বদর্শন এবং সর্ববিধ ইজমের চমৎকার সমন্বয় করে রাষ্ট্রভাষায় একখানি ঐতিহাসিক নাটক যিনি লিখতে পারবেন তিনিই জাতীয় ঐতিহাসিকের গৌরব লাভ করবেন, যেহেতু পূর্বতন ঐতিহাসিকগণ জাতির মনের ওপর দুঃস্বপ্নের মতো চেপে রয়েছেন। বর্তমানে স্কুল-কলেজে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ইতিহাস-পুস্তকে যা থাকবে তা-ই আদি-অকৃত্রিম ইতিহাস! ইংরেজ-আমলের সেই গোড়ার যুগ, শিক্ষার ক্ষেত্রে, কি আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে?

জানি, ইতিহাসের পুনরুক্তি হয়, কিন্তু তা যে এমন সাংঘাতিকভাবে হয়, সেটা আমাদের জানা ছিল না। তাইতো এখনকার ইতিহাসে ছেলেদের পড়তে হয়: জাতির জনক গান্ধী। স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নেহেরু!!

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও 'ফাল্গুনী'

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, পাটনা ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথের প্রধান রূপক নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম 'ফাল্গুনী' (১৯১৫)। 'শারদোৎসবে' (১৯০৮) যেমন শৈশব ও যৌবনের মহিমা কীর্তিত হয়েছে 'ফাল্গুনী'তে তেমনি যৌবন শেষের মহিমার কীর্তন দেখা যায়। ফাল্গুনীর অন্যতম চরিত্র 'কবি' বলছেন—

"হ্যাঁ মহারাজ সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবন নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের আভা দেখতে পেয়েছে, তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।"

'পূরবী'র তপোভঙ্গ কবিতা আর ফাল্গুনীর বাণী একই। ফাল্গুনীর বাণী হচ্ছে—

"ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।" কবিও বলেছেন—

"আমরাই তো পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।"

দীর্ঘকাল পরে লেখা 'তপোভঙ্গে'রও (১৯২৪) ঐ একই বাণী—

"তপোভঙ্গদূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি তব তপোবনে।"

ফাল্গুনী নাটকে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের যে ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে বাণীমূর্তি পরিগ্রহ করেছে সে প্রসঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের মূল নীতির অবতারণা করা আবশ্যক। ভগবান্ বুদ্ধদেবের ধ্যানময় ছবিটি যেমন রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল মুগ্ধ ক'রে এসেছে বুদ্ধের বাণীর নানা অংশের প্রতিও তেমনি কবির নিরঙ্কুশ প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে বুদ্ধদেবের ধর্মশিক্ষায় যা মূলগত

(fundamental) নীতি তার সঙ্গে রবীন্দ্রদর্শনের তথা ফাল্গুনীর ছুর্নিবার্য প্রভেদ রয়েছে। ভগবান্ বুদ্ধের চরম নীতি হচ্ছে 'প্রব্রজ্যা' বা বৈরাগ্য। এই নীতি রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শননীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। রবীন্দ্রদর্শনের মূল কথা "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" কবি 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে'-ই মুক্তির স্বাদ গ্রহণে ইচ্ছুক। ফাল্গুনী নাটকেও এই বাণী-ই প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয় প্রব্রজ্যা নীতির উত্তর দেবার জন্যই যেন ফাল্গুনীর সৃষ্টি। সেই কথাই এখন স্পষ্টাক্ষরে আলোচনা করা হচ্ছে।

বৌদ্ধ সাহিত্যের মখাদেব জাতকে প্রব্রজ্যার মহিমা যে-ভাবে কীর্তিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের তা মনঃপূত না হওয়াতেই যেন 'ফাল্গুনী' নাটকের সৃষ্টি। জাতকের গল্পে আছে—পুরাকালে মখাদেব নামে এক রাজা ছিলেন তিনি কল্পককে (কেশমণ্ডনকারী) বলে রেখেছিলেন : 'সিরস্মিং ফলিতানি পস্সয়োস অথা মে আরোচেস্সাসিতি', অর্থাৎ মাথায় পলিত কেশ দেখলে তখনই আমাকে জানাবে। কল্পক'ও একদিন রাজাকে তা জানালেন : 'কেসাণং অন্তরে এবং এব ফলিতাং দিস্সাদেবো,' অর্থাৎ আপনার কেশের মধ্যে একটি পক্ক কেশ দেখা গেছে। তখন রাজা কল্পককে বললেন : তং ফলিতং উদ্ধরিত্বা পানিং হি থরোহীতী', অর্থাৎ এই পলিত কেশটিকে তুলে আমার হাতে দাও। অতঃপর রাজা পক্ককেশ থেকে মৃত্যুর আগমনের বার্তা পেলেন মচ্চু রাজাণং আগন্তা সমীপে ঋতং', অর্থাৎ মৃত্যু রাজার সমীপস্থ হয়েছে। রাজা মখাদেব তৎক্ষণাৎ পক্ককেশ হাতে নিয়ে 'তং দিবসং এব রজ্জং পহায় ইসিপব্বজাণং পব্বজ্জিত্বা ' অর্থাৎ সেই দিনই রাজ্য ত্যাগ করে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

'ফাল্গুনী নাটকের সূচনা অংশের সুরুতে মহারাজ তাঁর মাথার ছুগাছি পক্ককেশের উল্লেখ ক'রে বৈরাগ্য-সাধনের কথা বললেন। মহারাজের বক্তব্য এই যে, পাকা চুলের মাধ্যমে যমরাজ মৃত্যুর নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, সুতরাং পাকা চুল ছুটি তুলে ফেলে দিলেও কোনও লাভ নেই, কারণ "যমের পত্রই যেন সরালুম কিন্তু যমের পত্রলেখককে তো সরানো যায় না।" রবীন্দ্রনাথের নাটকে মহিষী-ই রাজার পক্ককেশ তুলতে চাইলেন, পক্ষান্তরে জাতকে রাজা নিজেই কল্পককে দিয়ে পক্ককেশ তুলিয়ে হাতে নিলেন। যাই হোক, জাতকের কাহিনীতে যেমন, ফাল্গুনীতে'ও তেমনি রাজা পক্ক কেশ থেকে মৃত্যুর আগমনের 'নোটিস' পেলেন। কিন্তু রবীন্দ্রদর্শন বৌদ্ধদর্শনের একেবারে বিপরীত, তাই

ফাল্গুনী নাটকে জাতকের উপসংহারের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবটি যেন জবাবের আকারেই ফুটে উঠেছে। 'ফাল্গুনী'র রাজাও প্রথমে সংসার ত্যাগের বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু নাটকের অন্যতম চরিত্র কবিশেখর এসে রাজার মত সমূলে বদলে দিলেন। কবিশেখর বললেন: "...ঐ সাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রঙ লাগবে..." মহারাজ এ যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক না। আর এক যৌবন-লক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।" এই হচ্ছে ফাল্গুনীর বাণী 'তপোভঙ্গে'র ভাষায় এই বাণী হচ্ছে—

"বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে, আমি রচি তারি সিংহাসন
তারি সম্ভাষণ।"

বস্তুতঃ, ফাল্গুনীতে জীবন মৃত্যুর অনন্ত চক্র অবিশ্রাম গতিতে চলেছে। এই দিক দিয়ে 'ফাল্গুনী'র বাণীর সঙ্গে 'বলাকা'র (১৯১৬) বাণীর'ও পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'বলাকা'য় সৃষ্টির জঙ্গমতাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি অবিশ্রান্ত গতিতে চলেছে, সে চলার বিরাম নেই, সমাপ্তি নেই। ফাল্গুনী'র বাণী'ও সেই অন্তহীন চলার বাণী—"সংসারে যে কেবলই সরা কেবলই চলা, তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সেই তো বৈরাগী, সেই তো পথিক, সেই তো কবি বাউলের চেলা।" 'বলাকা'তে কবি লিখেছেন—

তব নৃত্য মন্দাকিনী
নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।"

'ফাল্গুনী'তেও এই বাণীরই সার্থকতা দেখা যায়। এখানেও মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই জীবনের গতি অপ্রতিহত আছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় "ফাল্গুনীর ভিতরের কথাটা অতি সরল। সে হচ্ছে এই যে জীবনটা অমর বলেই তাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বারে বারে নবীন করে নিতে হয়।"

প্রসঙ্গক্রমে এ'কথাও বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রদর্শনের প্রায় সমস্ত দিকগুলিই ফাল্গুনী নাটকে সার্থক হয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন, দুঃখকে এড়িয়ে যে মুক্তি বহু ধর্মগুরুর পরম কাম্য, রবীন্দ্রদর্শনে তার স্থান নেই—"তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি।" তিনি চান "দুখ হবে মোর মাথার ভূষণ সাথে যদি দাও ভকতি।" ফাল্গুনীর মন্ত্রও তাই—

"মহারাজ এ দুঃখকে তো আমরাই বহন করতে পারি।.........ঐ যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেছে, ঐ কান্নার মাঝখান দিয়ে এখন ছুটতে হবে। .....ঐ যে কান্না, ও যে প্রাণের কাছে প্রাণের আহ্বান। কিছু করতে পারব কি না সে পরের কথা কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি না দুলে ওঠে তবে অকর্তব্য হল বলে ভাবনা নয়, তবে ভাবনা মরেছি বলে।"

'শারদোৎসবে' যেমন 'ফাল্গুনী'তেও তেমনি মানবজীবনের আনন্দময় অস্তিত্বেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। ফাল্গুনী'র সূচনাংশে কবি রাজাকে বলেছেন— "আমার রচনার মধ্যে প্রাণ বলে উঠেছে—সুখে দুঃখে কাজে বিশ্রামে জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে । এই আনন্দময় 'আমি আছি'র জয়।" রবীন্দ্র দর্শনের একটি মূল কথা এই বাণীর মধ্যে সুস্পষ্ট হয়েছে।

ফাল্গুনী রবীন্দ্রনাথের এমন একটি নাটক যার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র দর্শনের মর্মকথা, বা তাকে যদি তত্ত্ব বলি তাহলে সেই তত্ত্ব, নাট্যবস্তু অপেক্ষা কিছু বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ এখানে নাটকীয়তা গৌণ হয়ে গিয়ে তত্ত্বকথার প্রাধান্যটাই যেন বেশি চোখে পড়ে। কিন্তু সঙ্গীত ও গীতমাধুর্যে এর নাট্যক্রটির অনেকখানি ক্ষতিপূরণ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ ফাল্গুনীর গানগুলি অপূর্ব। এগুলির মধ্য দিয়ে সমস্ত বন্য প্রকৃতির আত্মাকে যেন মূর্ত ক'রে তোলা হয়েছে। টমসন সাহেব ফাল্গুনী নাটকের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ, কিন্তু তিনিও লিখেছেন—

"The music is the play in wild-wood music, such as the spirit of bamboo, the spirit of the south wind, the spirit of the flowers might sing if they took human voice"

এ কথা বিশেষভাবে সত্য। 'ফাল্গুনী' নাটকে ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়া সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে এমন চঞ্চল, এমন মুখর করে তুলেছে যে গাছপালা, পাখি, সব যেন এখানে জীবন্ত ভূমিকা পেয়েছে।

আর্যভাষায় প্রাগার্য প্রভাব

ডঃ সুধীর কুমার করণ

প্রাচীন ইরাণী এবং বৈদিকভাষার উৎস একই। ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উভয় ভাষ'ভাষী জনগোষ্ঠীর গভীর সম্পর্ক ছিল। আবেস্তার প্রাচীনতম শ্লোক-গুলিকে, ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র ধরে অনায়াসে সংস্কৃত ভাষায় এবং বৈদিক ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়। উভয় ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের মধ্যে অনুপস্থিত। যার অর্থ এই দাঁড়ায়, যে—প্রাচীন ইরাণী-ভাষী এবং বৈদিকভাষী জনগোষ্ঠীর আর্যজাতি অনেক পূর্বেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-বর্গের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে নতুন এক ভাষাগোষ্ঠীরূপে দেখা দিয়েছিল। —ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দুই প্রাচীন গোষ্ঠীর ভাষাগতসাদৃশ্য অতি স্পষ্ট।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। সংস্কৃতে 'হিরণ্য' শব্দের প্রাচীন ইরাণীয় রূপ ছিল জরণ্য*—যার অর্থ স্বর্ণ। সংস্কৃত ভাষার সেনা অসুর যজ্ঞ হোতর সোম প্রভৃতি শব্দের আবেস্তীয় রূপ ছিল যথাক্রমে—হয়েনা, অহুর, ইয়সন্, জওতর এবং হওম। বৈদিক দেবতা মিত্র এবং বিবস্বন্ত্ (পুত্র) যম—আবেস্তার ভাষায় মিহ্র(অ) এবং বিবহ্ওন্ত্ (পুত্র) ইয়ইম্।

কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটে যায়। ফলে—আবেস্তার দএব (সংস্কৃত—দেব) শব্দের অর্থ হয়েছে—অপদেব। ইন্দ্র এবং নাসত্য, আবেস্তার অপদেবতা হিসেবে গৃহীত। অসুর শব্দের অর্থও বিপরীত ধর্মী। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, উভয়গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের ফলেই এই ধরণের ব্যাপার ঘটেছে।

ইন্দো-ইরাণীয় বর্গের আর্যভাষা যখন ভারতীয় আর্যভাষায় রূপান্তরিত হচ্ছিল, তখন তার মধ্যে বিভিন্ন অন্-আর্যভাষার অনুপ্রবেশ-ও ঘটে যাচ্ছিল। পরবর্তীকালে পাণিনি এবং অন্য বৈয়াকরণগণ যখন সংস্কৃতভাষার নিয়ম সূত্রগুলি বিধিবদ্ধ ক'রে ভাষার ক্রমরূপান্তর বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন তখনও লৌকিক ভাষায় সেই পরিবর্তন অব্যাহত থেকে গেল। বলাবাহুল্য ভাষার

---

*তুলনীয় বাংলা শব্দ—জরি (জরির কাজ)

এই গ্রহণ বর্জনের ক্ষমতার মধ্যেই ভাষার প্রাণশক্তি নিহিত থাকে।

ভারতবর্ষের, বিভিন্নসময়ে বিভিন্ন আর্যভাষী গোষ্ঠী এসে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করেছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে সবসময় সদ্ভাব ছিল, তা-ও নয়। বিভিন্নগোষ্ঠীর সংঘাতের কিছু কিছু চিত্র বেদের মধ্যেই আছে। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তো বার বার আর্যজনের সংঘাত ঘটেই ছিল। পরিণামে অনেক অন্‌-আর্যভাষী জনগোষ্ঠী দাসত্ব স্বীকার করে অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। এদের ভাষার অনেক শব্দই শেষ পর্যন্ত আর্যভাষার মধ্যে স্থান লাভ করে। এবং অনেক অন্‌-আর্য ভাষা শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। যারা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় সচেষ্ট হয়, তারা গভীর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক থেকে দূরে সরে যায়।

বৈদিক আর্যগোষ্ঠীর ভাষায়, ভারতীয় প্রাগার্য গোষ্ঠীর ভাষার কিছু কিছু ধ্বনি ও শব্দ গৃহীত হয়েছিল। বেদের মধ্যে তার পরিমাণ খুব বেশী নয়, কিন্তু তার প্রমাণ আছে। বৈদিক মূর্ধণ্য ধ্বনিগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় অথবা ইরাণীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অলভ্য বলে, সহজেই অনুমান করা যায় যে উক্ত ধ্বনিগুলি ভারতীয় দ্রাবিড় বর্গের ভাষা থেকে গৃহীত। ধ্বনিগতভাবে খাঁটি বৈদিক আর্যশব্দ NIZDA-র ক্ষেত্রেও এই ধ্বনি পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে 'নীড়' শব্দের উদ্ভব।

ইন্দো-ইরাণীয় অনেক শব্দই সংস্কৃত ভাষায় ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে অবস্থান করলেও তারই পাশাপাশি অনেক সমার্থক অন্‌-আর্যভাষার শব্দও গৃহীত হয়। অশ্বের পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় ঘোটক। শুধু পাশাপাশি থাকা নয়, পরবর্তী-কালে ঘোটকই প্রাধান্য লাভ করে। যার ফলে ঘোটক শেষ পর্যন্ত ঘোড়া হলেও অশ্বের কোন রূপান্তর ঘটেনি। বৈদিক 'শ্বন' শব্দের পরিবর্তে প্রাগার্য কুর্‌কুর্‌ বা কুকুর শব্দও এইভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে—কুর্‌কুর্‌ বা কুকুর শব্দ মূলতঃ ধ্বনিসূত্র অনুসারে গঠিত।

একই সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি শব্দও পাশাপাশি প্রচলিত—যার একটি আর্য অন্যটি প্রাগার্য। ব্যাঘ্র-শার্দূল, মার্জার-বিড়াল ঋক্ষ-ভল্লুক প্রভৃতি শব্দগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এদের প্রথমটি আর্যগোষ্ঠীয়—দ্বিতীয়টি প্রাগার্য। হস্তীর প্রতিশব্দ গজ, মাতঙ্গ, কুঞ্জর, ইভ, নাগ প্রভৃতি শব্দ মূলতঃ প্রাগার্য ভাষা থেকেই গৃহীত। মহিষের প্রতিশব্দ হেরম্ব, সৈরিভ, কাসর, লুলাইক্ক প্রভৃতি এইভাবে প্রাপ্ত।

প্রাগার্য ভাষার মধ্যে যে গুলির বিলুপ্তি ঘটেছিল, সেগুলির পরিচয় অজ্ঞাত বলে অনেক প্রাগার্য শব্দের উৎস আবিষ্কার করা যায়নি। কিন্তু সেগুলি যে ইন্দো-ইরাণীয় বর্গের নয়, তা সহজে বলা যায়।

ভারতীয় প্রাগার্য দ্রাবিড় এবং অষ্ট্রিকভাষী গোষ্ঠীর শব্দ এবং ধ্বনি অধিকতর ভাবে ভারতীয় আর্যভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের উত্তর পুর্বাঞ্চলের তিব্বতী-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত থাকা সত্বেও ঐ ভাষা-গোষ্ঠীর শব্দ আর্যভাষায় গৃহীত হয় নি। বৈদিকযুগ থেকেই আর্যভাষায় দ্রাবিড় ও প্রাগার্য ভাষার প্রভাব সুরু হয়ে যায়। সংস্কৃত ভাষায় অষ্ট্রিক ভাষাবর্গের মুণ্ডারী ও সাঁওতালী ভাষার প্রভাব ও যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছিল। কিন্তু এর বিপরীত ঘটনাও ঘটেছিল। মুণ্ডারী ও সাঁওতালীবর্গের অন্যান্য অষ্ট্রো এশিয়াটিক ভাষার তুলনামূলক আলোচনা না হলে এ কথা বলা সহজ হবে না,—সংস্কৃত ভাষায় তার প্রভাব কোন্ পথে এসেছিল।

বিশাল অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাবর্গের মন্‌খ্‌মের ভাষার সঙ্গে মুণ্ডারী-সাঁওতালীর সম্পর্ক বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের মতে—সংস্কৃত ভাষায় প্রাপ্ত অনেক প্রাগার্য শব্দের উৎস বহির্ভারতীয়। তাঁদের মতে মাতঙ্গ শব্দটি বহির্ভারতীয় অষ্ট্রো-এশিয়াটিক। শব্দটির অর্থ – হস্তযুক্ত প্রাণী। মালয়ী ভাষায় মইনুতং শব্দের অর্থও তাই। লবঙ্গ শব্দটি যবদ্বীপীয় ভাষার লওং শব্দের প্রতিরূপ বলেই অনেকের ধারণা।

সংস্কৃত অলাবু, উদুম্বরা, কদলী, কর্পাস, অঙ্গাল, লাঙ্গল, সর্ষপ, মরিচ প্রভৃতি শব্দগুলির সঙ্গে মালয়ী, খ্‌মের, শবর, হো, এবং সাঁওতালী রূপের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

অনেকে অনুমান করেন, ঋগ্বেদে প্রাপ্ত ইন্দ্রানি 'শম্বর' শব্দটি শম্বর হরিণের টোটেম। আর্যভাষায় গৃহীত অসংখ্য অষ্ট্রিক শব্দের কিছু কিছু নিদর্শন তুলে ধরা যেতে পারে। যথা :—কুক্কুট, পতঙ্গ, ডিম্ব, বাতুলি (বাদুড়) পঙ্গু, খঞ্জ, খোঁড়া, কুব্জ, লিঙ্গ, পুণ্ডরীক, লম্পট, কুষ্ঠ, দোল, কদলী, নারিকেল, তাম্বুল, বাতিঙ্গন, অলাবু নিম্বুক, কর্পাস, শাল্মলী, দাড়িম্ব, কোকিল, হল, অর্গল, শৃঙ্খল, লাঙ্গল লগুড় বাণ তীর কনক, মুকুর শৃঙ্গার, দুন্দুভি পটহ, রাকা, কুঞ্জ ইত্যাদি।*

কিন্তু সংস্কৃত ভাষার উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল

দ্রাবিড় বর্গের ভাষাগুলি।[৩] বৈদিক যুগ থেকেই দ্রাবিড় ভাষা ও দ্রাবিড়সভ্যতা আর্যভাষার ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।[৪] অনেকে অনুমান করেন,—পুনর্জন্মবাদ বেদ-বহির্ভূত দ্রাবিড় ধ্যানধারণারই ফল। অনেকের ধারণা পৌরাণিক দেবতা শিবও দ্রাবিড় দেবতা হতে পারেন। তামিল শিবন্ এবং শেম্বু শব্দ দুটি এই ধারণার পরিপোষক। শিবন্ শব্দের অর্থ লাল এবং শেম্বু শব্দের অর্থ তামাটে। পৌরাণিক হনুমান বা হনুমন্ত তামিল অন্‌মান্তি শব্দজাত বলে মনে হয়। অন্‌মান্তি শব্দটির অর্থ হচ্ছে পুরুষ কপি, বৈদিক ভাষায় বৃষকপি। লিঙ্গপূজা সর্পপূজা প্রভৃতি দ্রাবিড়দের দান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে ঋগ্বেদে প্রাপ্ত বেশ কিছু শব্দকেই দ্রাবিড়-উৎসজাত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। অণু, অরণি, কপি, কলা, কাণ্ড কুণ্ড, ফল, বিল, নীল, নীহার, পুষ্কর, পুষ্প, রাত্রি সায়ম্ প্রভৃতি শব্দ এই পর্যায়ভুক্ত।

ব্রাহ্মণযুগে প্রাপ্ত আড়ম্বর, খড্গ, তণ্ডুল, তিল, মর্কট, মল্লী, ব্রীহি ও প্রভৃতি শব্দ ও দ্রাবিড় উৎসজাত। বেদপরবর্তী কাল থেকে পৌরাণিক কাল পর্যন্ত, সংখ্যাহীন দ্রাবিড় শব্দ আর্যভাষায় পরিগৃহীত হয়েছিল।

৩ পরবর্তীকালে আঞ্চলিক উপভাষাতে প্রচুর সাঁওতালী-মুণ্ডারী শব্দ গৃহীত হয়েছে, আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার বাংলাভাষাবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই তা বোঝা যায়।

৪ এই বর্গের চারটি প্রধান ভাষার নাম তেলুগু, তামিল, মালায়লম্ এবং কন্নড়ী। এদের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য বর্তমান। তামিলে দু'হাজার বছরের প্রাচীন সাহিত্য পাওয়া যায়। এই বর্গের অন্য কথ্য ভাষাগুলি—টুলু, কুর্গ, টোড়া এবং কোটা, পরজ, গদবা, গোণ্ডী, কোণ্ডা, কুড়ুখ, মালতো প্রভৃতি।

আকর গ্রন্থ :

১। The Sansrit Language (T. Burrow)
২। O. D. B L (Suniti Kumar Chatterjee)
৩। ভাষার ইতিবৃত্ত (সুকুমার সেন)
৪। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ (পরেশচন্দ্র মজুমদার)

কবিতা প্রসঙ্গে কিছু

হরপ্রসাদ মিত্র

কবিতা সম্বন্ধে পাঠক-সমাজের আগ্রহ কী রকম, এ বিষয়ে জেম্‌স্ রীভস্ প্রণীত ১৯৬৫ সালে প্রথম প্রকাশিত ও ১৯৬৭ সালে পুনর্মুদ্রিত একটি বইয়ে দেখা যায় যে, একুশ থেকে সত্তর বছরের মধ্যে যাঁদের বয়স, এরকম কুড়িজন পাঠককে জিগ্যেস করা হয়েছিল—'আপনি কবিতা পড়েন কি?' এবং এই সরল প্রশ্নের জবাবে শিক্ষক, কারখানাকর্মী, চিকিৎসক, পেশাদার গায়ক-বাদক, চাষবাসের সহায়ক তিনজন, কেরাণী কয়েকজন, কয়েকজন দোকানকর্মচারী,—এঁদের মধ্যে একজন বলেছিলেন, তাঁরা কখনোই কবিতা পড়েন না! বাকি ছ'জনের মধ্যে একজন বলেছিলেন, তিনি সবসময়েই কবিতা পড়ে থাকেন,—অন্যান্য বিনোদনের চেয়ে কবিতাই তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বিনোদন। একজন বলেন যে, সমসাময়িক পত্রিকা ও সঙ্কলন প্রভৃতি থেকেই তিনি মাঝে মাঝে কবিতা পড়েন; চারজন বলেন যে, বছরে হয়তো একখানা কবিতার বই তাঁরা ছুঁয়ে থাকেন। অধিকাংশই কবিতার প্রতি বিরূপ ছিলেন না। তবে দু'তিন জন বলেছিলেন কবিতা মানেই ভুবিমাল এবং তাঁদের সকলকেই কবিতার খুবই বিরোধী বলে মনে হয়েছিল। অবশিষ্ট যাঁরা, কবিতার বিরুদ্ধে তাঁদের বিশেষ কোনো মন্তব্য ব্যক্ত হয়নি, তবে কবিতার ব্যাপারে তাঁদের কোনো আগ্রহও ছিল না।

এই অভিজ্ঞতা থেকে লেখক সরাসরি বলেছিলেন যে, তাঁর ধারণা এই দাঁড়িয়েছিল যে, প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের মধ্যে শতকরা সত্তর জনই কবিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। বাকি শতকরা কুড়িজনের জীবনে কবিতা না হলেও চলে। অবশিষ্ট দশজনের মধ্যে মাত্র একজনই কবিতার রসিক; কবিতার কিছু যে দাম আছে, সেকথা ঐ একশ'র মধ্যে একজনই বিশ্বাস করেন।

আমাদের সমসাময়িক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অবস্থা ঠিক এতোটা শোচনীয় মনে করতে কষ্ট হয়, কিন্তু একুশ থেকে সত্তর,—পাঠক সমাজের এই বয়ঃসীমা মেনে, নমুনা-জরীপের কাজে নামলে অবস্থা আরও শোচনীয় মনে হবে ব'লে

আশংকা হয়। এদেশে স্বাক্ষরের হার—অর্থাৎ যাঁরা শুধু লিখতে পড়তে পারেন, তাঁরা একশ-তে পঁয়ত্রিশের বেশি হবেন কি? যিনি স্বাক্ষর, তিনিই শিক্ষিত,—একথা কিছুতেই বলা চলে না। আমাদের বিরলসংখ্যক আগ্রহী সাহিত্য-পাঠকদের মধ্যে কবিতার গুণগ্রাহী হয়তো দুশ'র মধ্যে একজন,—হয়তো আরও কম!

তবু স্টলে স্টলে কবিতা-পত্রিকা কলকাতাতে তো বটেই, মফঃস্বলেও বেশ কিছু দেখা দিচ্ছে। দেখা দিয়েই লুপ্ত হচ্ছে এরকম পত্রিকাও অনেক। এই প্রকাশোচ্ছ্বাস ও মৃত্যুহার যে কৈশোরের নৈসর্গিক লক্ষণ, তাতে সন্দেহ কোথায়?

এবং এতৎসত্ত্বেও আমরা যে কবিতাপ্রিয় জাতি, একথা অমান্য করবার যুক্তি নেই।

যা সমসাময়িক, তা নিঃসন্দেহে, নির্বিচারে চিরস্থায়ী নয়। যা বর্তমান, সেটাই সর্বাধিক মনে করা আমাদের মানবিক দুর্বলতা মাত্র। ফসল বেশি ফলা খুব একটা প্রাকৃতিক উচ্ছ্বাস বটে, কিন্তু বেশি ফলনে ফলের গুণগত হ্রাস ঘটে থাকে কি না, সেটাও বিচার্য। গাছ বাঁচাতে হলে আগাছা দূর করা দরকার। সেও স্বীকার্য। অন্তত গুণের দিকে নজর রেখে, লেখককে আত্মপ্রকাশের তাগিদ মানতে হয়। পাঠক উদাসীন বা বিমুখ হয়ে গেলে রচনা পড়বেন কে?

কবিরা নিজেরা এ চিন্তা উপেক্ষা করছেন বলে কেউ কেউ অনুযোগ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, তাঁরা 'আধুনিক কবিতা' বুঝতে পারেন না। কবিদের মধ্যে যাঁরা এসব অনুযোগে কান দিতে নারাজ, তাঁরা হয় নিরুত্তর থাকেন, না হয় বলেন—পাঠক প্রস্তুত নন বড়ো বড়ো পত্রিকায় (বহুপ্রচার-ময়) যেসব কবির লেখা ছাপা হয় তাঁরা কখনো কখনো নিজেদের ব্যক্তিগত সংযোগের ফলে মাঝারি বা তুচ্ছ রচনাও পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে বড় বড় টাইপে ছাপা হবার সৌভাগ্য অর্জন করে যশস্বী হয়ে ওঠেন। শিক্ষিত দুশ' পাঠকের মধ্যে মাত্র একজন যে কালে যথার্থ কবিতা-রসিক, সেকালে, সেদেশে এরকম প্রচার ভাগ্য না ঘটাই অস্বাভাবিক। অতএব অপ্রকাশের যন্ত্রণায় প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কবিরা নিজেদের ছোটো ছোটো গোষ্ঠী গড়ে তুলে ক্ষণস্থায়ী এবং বিরল ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা চালিয়ে থাকেন। কিন্তু পাঠককে যথার্থ

ভাল কবিতার গ্রাহিকা-শক্তিতে উদ্বোধিত করবার আয়োজন কেউ করেন না। যাঁরা এ কাজ করতে পারেন, তাঁরা বিবেকী সম্পাদক বা অন্য কোনো সমর্থ পক্ষের কাছে অণুমাত্র উৎসাহ পান না বলেই চুপ হয়ে যান।

বাংলা কবিতার আসর এখন যদিচ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নানা দলে উপদলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তবু তার গুণগৌরব যে একেবারে কিছুই নেই, এরকম ধারণা ঠিক নয়। 'একক', 'ধ্রুপদী', 'লা-পোয়েজি', 'জীবনানন্দ', 'গঙ্গোত্রী', 'অন্যদিন', 'শতভিষা', 'সময়ানুগ' প্রভৃতি পত্রিকা প্রধানত কবিতা পত্রিকাই। আরো কয়েকটি পত্রিকা আছে যেগুলির নাম ঠিক এই মুহূর্তে মনে আসছে না বলে এই সারিতে উল্লেখ করা গেল না। সত্তরের দশকের গল্প লেখকদের মতো পৃথক কবিদলও আছেন। তাঁদেরও আলাদা পত্রিকা আছে—একাধিক। দশক-ওয়ারি বিভাগ চিন্তা চলছে। ভিন্ন ভিন্ন দশকের অনেক কবি আছেন যাঁরা সকলেই 'আধুনিক কবি' নামে চিহ্নিত।

এই দশক বিভাগে কবিগোষ্ঠীর চিন্তা মোটেই সংগত নয়। এবং 'আধুনিক কবিতা' নামটিও বিভ্রান্তিকর। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, বিনোদ বেরা, কবিতা সিংহ, অরুণকুমার সরকার, শিবাজী গুপ্ত—এঁরা সকলেই তো সাম্প্রতিক কবি, এঁদের প্রত্যেককেই কি একই প্রকৃতির আধুনিক কবিতার লেখক বলতে পারি? 'আধুনিকতা' কি সময়ের চিহ্ন শুধু? 'আধুনিকতা' যে মেজাজ বা মনোভঙ্গির বিশেষ প্রকৃতি, সেও স্বীকার্য বটে, কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিত্বের পার্থক্য ধরতে হলে কোন্ কোন্ লক্ষণে প্রভেদ চিহ্নিত হবে? 'আধুনিক' কথাটা এ-অর্থে সত্যিকার ধর্তব্য কোনো প্রভেদবাচক শব্দ নয়। রবীন্দ্রনাথ কি আজও 'আধুনিক' নন?

বোদলেয়র, রিলকে প্রভৃতি বিদেশী কবিদের কথা তুলে নবীন কবিরা আজকাল ঐসব কবির অনুকরণ চেষ্টা করে থাকেন মাঝে মাঝে,—যেমন, তিরিশের দশকেই বাংলা-কবিতার আসরে টি এস এলিয়টের কথা উঠেছিল এবং পরে অনেকদিন তা চলেছে। এলিয়ট আমাদের বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের মধ্যে কী পরিমাণে ধ্বনিত, সে বিষয়ে অনুসন্ধান হয়েছে কিছু কিছু, কিন্তু বাংলা-কবিতায় এলিয়ট-তরঙ্গ যখন আজকের মতো ক্ষীণ হয়ে যায়নি তখনো যেমন, এখনো তেমনি বাংলার নবীন কবিদের পথ-সন্ধান চলছেই প্রবীণরাও সকলে নিঃশেষিত হননি। অমিয় চক্রবর্তী হঠাৎ 'আহা পিঁপড়ে

ছোটো পিঁপড়ে'-র মতো কিংবা 'সার্কাস'-এর মতো শিশুরঞ্জক কবিতা আর লিখবেন না বলা হঠকারী প্রগল্ভ তরুণের পক্ষেই সম্ভব। বুদ্ধদেব বসু তো তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আগ্রতম আধুনিক কবি থাকবার চেষ্টা করেছেন।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্প্রতি তাঁর হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। কথায়-কথায় বুদ্ধদেবের 'মহাভারতের কথা'র কথা উঠতে তিনি বললেন, 'এই বইয়ে তাঁর যথার্থ পরিণতির চিহ্ন আছে।' সেই মহাভারতের প্রসঙ্গই বুদ্ধদেবের কবি মনকে তাঁর পরিণত বয়সে নানাভাবে নাড়া দিয়েছিল যেমন ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতা পড়ে এবং পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে ঋষ্যশৃঙ্গ-কাহিনী পড়ে তিনি মুগ্ধ হন। ফলে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটক দেখা দেয়। কেউ কি বলবেন যেহেতু এই রচনার মূলে এলিয়ট বা বোদলেয়র ছিলেন না, অতএব এক্ষেত্রে বুদ্ধদেব অনাধুনিক ?

> রোদনরূপসী, তুমি কেন কাঁদো ? অশ্রু কেন পদ্ম হয়ে ফোটে ?
> কেন তার হিরণ্ময় অভিমান দিগন্তেও হয় না বিলীন ?

বুদ্ধদেবের 'রোদনরূপসী' কবিতার (১৯৬৪) এই দু ছত্র কবিতার শব্দ, অর্থ, ছন্দ, উপমা ও রূপকচিন্তা কি তথাকথিত 'আধুনিক'দের মতে সেকেলে ব্যাপার ?

না, 'আধুনিক' কথাটাই বিভ্রান্তিকর। সম্প্রতি পি. ই এন্ (কলকাতা শাখা)-এর এক কবি-সভায় আমি বলেছি, বাংলা কবিতার ধারার মধ্যে পর্ব-পর্বান্তর চিহ্নিত করতে হলে বরং 'তরঙ্গ' শব্দটা ব্যবহার করা ভাল। যেমন বলতে পারি, রবীন্দ্র তরঙ্গের বিস্তারের মধ্যেই সত্যেন্দ্র-তরঙ্গ, নজরুল তরঙ্গ, জীবনানন্দ-তরঙ্গ ঘটে গেছে। অথবা, কবিতায় দুর্বোধ্যতা-তরঙ্গের পরে এসেছে যা-খুশি বাচালতার তরঙ্গ !

মেনকা নদীর ঘাট পেরিয়ে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মেনকা নদীর ওপারে সবে সূর্য উঠেছে। শরৎকাল। মাঠে সবুজ শস্যের পাতায় সারারাতের শিশির ঝলমল করে উঠেছে। সেই সময় লোকটা এল। খেয়াঘাটে নৌকোয় চেপে এপারে এসে একটা চায়ের দোকানে বসল। তার পরণে হাল্কা নীল শার্ট আর খয়েরি পাতলুন, পায়ে ছেঁড়া চপ্পল কাঁধে একটা ব্যাগ। লোকটার বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। দেখে বোঝা যায়, রাতে ঘুমোয় নি। চোখ দুটো টকটকে লাল। এক চিলতে গোঁফ আছে ঠোঁটের ওপর, তাতে একটা ক্রুরতার আভাষ আছে। দাড়ি গত দু'তিনটে দিন সম্ভবত কামায় নি। সে ভারি গলায় চায়ের হুকুম দিল। তারপর একটা সিগ্রেট জ্বালল।

মেনকানদীর ঘাটে এই ছোট্ট বাজারটা সবে গড়ে উঠেছে। রাস্তায় পিচ পড়ার পর লোকেরা অনেক সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে। দুবেলা একটা বাসও যাচ্ছে আসছে দূরের শহর থেকে। গ্রামের নাম হরিণমারা—বাজারের পিছনে কয়েক একর জমির ওধারে। মাঝারি গ্রাম কিছু ভদ্রলোক আছে। একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কিছু ছেলে ফুটবল ক্রিকেটও খেলে। তাদের খেলার মাঠ আছে। একটা পাঠাগারও সবে গড়ে উঠছে। তবে পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা বড় জোর জনা বারো।

লোকটা চুপচাপ চা খাওয়ার পরই উঠে পড়ল। তারপর চলে গেল। তখন চাওলা খগেন বলল—কেউ চিনতে পারলে? মধুবাবুর সেই জামাই।

চায়ের দোকানে ভিড় সবে জমছে। কেউ গাঁয়ের লোক, কেউ বাইরের ব্যাপারী বা মামলাবাজ। বাসের আশায় বসে আছে। খগেনের কথায় দুএকজন গা করল। বাকিরা অন্য আলোচনায় মেতে রইল।

খগেন অস্ফুট স্বরে স্বগত বলল—শালা খুনে আবার এদিকে কেন? ক্ষমা ভিক্ষে করতে নাকি?

রহিম ব্যাপারী এতক্ষণে কান করল। —আরে তাই তো! মধুখুড়োর জামাই বলেই মনে হল। এতক্ষণ খ্যাল করি নি। আবার কেন এল ব্যাটা?

খগেন দাঁত বের করে অর্থাৎ হেসে বলল—নির্ঘাৎ আবার কার বুকে ছুরি বসাবে—তুমি দেখে নিও।

আদালত সেখ মাঠে যাবার পথে শিশির শুকোবার অপেক্ষায় এবং অভ্যাসে চা খেতে বসেছে। সে বলল—মধুবাবুর মেয়েকে খুন করেছিল কেন হে খগেন দা?

খগেন বিরক্ত হয়ে বলল—তাও শোননি? তুমি বড়, হ্যাকা হে আদালত।

হলুদ দাঁতে হেসে আদালত বলল—মাইরি না খোদার কসম।

—তবে সাক্ষী দিয়েছিলে যে!

—মধুবাবু বলেছিল, তাই। আমি দাদা সাত পাঁচ কিছু জানতাম না।

রহিম ব্যাপারী তামাসা করে বলল—সেজন্যেই তো ওর সাজা হল না। বিলকুল খালাস দিলে জজসায়েব। বাবা, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে!

আদালত বলল—কিন্তুক তাহলে খুনটা করল কে?

খগেন রেগে বলল—অত হই হই কাণ্ডের পরও এখনও বলবে খুনটা করল কে? তুমি বড্ড হ্যাকামি করো হে আদালত। এখনও তো বছর পেরোয় নি। রাগ কোরো না। এজন্যেই বলে চাষা!

চাষীকে চাষা বললে রেগে যাওয়ার ব্যাপার ঘটে। 'চাষা' কথাটা গাল। 'চাষী'ই ভদ্রতা ও সৌজন্যমূলক শব্দ। দিল্লি থেকে কলকাতা—সবখানে শিক্ষিত মানুষ চাষীভাই বলে থাকেন। ভাই বলার কারণ অবশ্য দুর্জ্ঞেয়। আদালত কিন্তু চাষা শুনেও রাগবার মানুষ নয়। সে তার বিশাল হলুদ দাঁত আরও বের করে দিয়ে শুকনো অট্টহাসি হেসে বলল—তা যা বলেছ দাদা!

এইসব কথাবার্তা যখন ঘাটে চলেছে, তখন লোকটা অর্থাৎ মধুবাবুর জামাই হরিণমারায় ঢুকছে। দু'পাশে কয়েকপ্রকার শস্য এবং মধ্যে কাঁচা রাস্তা। কিছু কাদা আছে কোথাও। দুধারে ফণিমনসা আর নিশিন্দা ঝোপ। সেখানে ফিকে সবুজ বাঁশপাতার মতো পাখি বসে আছে। প্রজাপতিরা ডানা থেকে শিশির শুকিয়ে নিচ্ছে। সারারাতের শিশিরে মাকড়সাদের জাল ভিজে চবচবে হয়ে উঠেছিল, তাতে অনেক পোকা আটকে রয়েছে এবং মাকড়সারা জলজলে চোখে অপেক্ষা করছে, ক্ষুধার্ত। রাস্তায় আর কোন লোক নেই। নির্জন দেখাচ্ছে গ্রামটা। এখনও রাতের কুয়াশার নিঃঝুম ঘোর কাটেনি। উঁচু তালগাছের মাথায় রোদ পড়ে প্রার্থিত একটি দিনকে প্রকাশ

করছে পৃথিবীতে। লোকটা গ্রামে ঢুকল। কোনদিকে তাকাল না। তাকালে দেখতে পেত, পুকুরঘাট অথবা গোয়ালঘর থেকে গ্রামীণ বধূ ও কন্যারা তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে। কে ফিসফিস করে বলেও উঠেছে—এই লোকটাই তো? শেফালিকে খুন করেছিল!

তখন মধুবাবু পণ্ডিতমশাই তাঁর আটচালায় বসে প্রাইভেট পড়াচ্ছেন। একদঙ্গল ছেলেমেয়ে চেঁচামেচি করে পড়ছে। ছায়া জমে আছে রাস্তা ও আটচালার সামনে ফাঁকা জমিটায়। কয়েকটা কাক একটা মরা নেংটি ইঁদুর নিয়ে ঝগড়া করছে। কাছাকাছি মুসলমান পাড়ার এক প্রকাণ্ড মোরগ কীভাবে চলে এসেছে এবং মাঝেমাঝে ডেকে উঠছে। একটা নেড়ি কুত্তা রাস্তার ধুলোয় বসে লেজের কাছে কামড়াচ্ছিল। হঠাৎ ঘেউঘেউ করে মোরগটাকে তাড়া করে নিজেদের পাড়ায় পাঠিয়ে দিল। কিন্তু লোকটাকে দেখে সে লেজ নাড়তে থাকল। লোকটা দাঁড়িয়ে গেছে। আটচালার দিকে তাকিয়ে আছে।

মধুবাবুর চোখে পুরু লেন্সের চশমা। কিন্তু একটু দূরে কিছু দেখতে পান না। তিনি হাঁক রাজবংশীর রোগা ছেলেটাকে যোগ শেখাচ্ছেন। পাঁচ—পাঁচ আর সাত হ্যাঁ, আঙুলের গিরে গোন্। পাঁচ—ছয়—সাত—আট—নয়—দশ……

এইসময় তাঁর ছোট মেয়ে অঞ্জলি দৌড়ে এসে বলল—বাবা, বাবা! শোন।

মধুবাবু মুখ তুলে বললেন—এঁ্যা?

অঞ্জলি চাপা গলায় বলল—জামাইবাবু এসেছেন, জামাইবাবু। ওই ছাখো, ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন!

মধুবাবু আনমনে বললেন—তা আমি কী করব? নাচব নাকি? এসেছে এসেছে।

—আঃ! কী মাথামুণ্ডু বলছ! যাও, ডেকে নিয়ে এসো।

—তুই ডাক্ গে না। আমি পারব না। হ্যাঁ, ছয় - সাত—আট—নয়…

অঞ্জলির বয়েস সতের-আঠারো। শ্যামবর্ণ, হাল্কা গড়ন, ডিমালো মুখ। একমাথা বিশাল চুল। তার চুল খুলে পিঠে নামল। কোমর অব্দি দুলতে লাগল। সে হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে গিয়ে বলল—জামাইবাবু! এসেছেন! আসুন—আসুন!

লোকটা ভুরু কুঁচকে একটু হাসল। —অঞ্জলি, কেমন আছ?

—ভালো! বাড়ি আসুন না! এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

—হুঁ। যাবো। চলো।

লোকটা অঞ্জলির পিছনে এগোল। অঞ্জলি দৌড়ে বাড়ি ঢুকল। চেঁচিয়ে বলল—মা, মা! দ্যাখ কে এসেছে! জামাইবাবু এসেছেন, মা!

মধুবাবুর স্ত্রী হাঁসের দরমার সামনে ঝুঁকে ডিম খুঁজছিলেন। ঝকঝকে উঠোনে সরে ফিকে হলুদ রোদ পড়েছে। শিউলিতলা ফুলে সাদা হয়ে আছে। জবা গাছে টকটকে লাল ফুল ফুটেছে। কুয়োর ধারে একরাশ বাসন হাঁড়িকুড়ি মাজতে বসেছে শৈল ঝি। কাক আর চড়ুই তাকে জ্বালাচ্ছে। তার হাতের ঘষামাজার শব্দটা থামল। তার চোখে পলক পড়ছিল না। আর মধুবাবুর স্ত্রী পিছন ঘুরে জামাইকে দেখেই ঘোমটা একটু টানলেন। তাঁর কাঁচাপাকা চুলের একটা গোছা গালের ওপর দিয়ে বুকে নামল একবা'র দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিছু বললেন না।

অঞ্জলি লোকটাকে ব্যস্তভা'ব বলল আসুন। এ ঘরে আসুন।

বাড়ির পুবে বাঁশবন। ওপাশেই অঞ্জলির ঘর। ওঘরেই ছ'মাস আগে এক রাত্রে বাসর সাজানো হয়েছিল। দিদি শেফালি আর এই লোকটাকে এক বিছানায় শোয়ানো হয়েছিল। এটাই পৃথিবীতে মানুষ মেনে নিয়েছে। এবং সেই রাতের সকালে সবাই আবিষ্কার করেছিল, শেফালির গলাটা কাটা। রক্তে বাসর ভেসে গেছে। আর এই লোকটা ঘরে নেই। পুবের দরজাটা হাট করে খোলা।

অঞ্জলি ও ঘরে একা শুতে পারত না। কিন্তু আস্তে আস্তে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। আর ভয় পায় না। তাছাড়া আর শোবেই বা কোথায়—আইবুড়ো সোমত্ত মেয়ে! সে শহরের কলেজে পড়ে। আগের বছর শহরে আত্মীয় বাড়ি থেকে পড়াশুনা করত। রাস্তায় বাস আসার পর এখন বাড়ি থেকে রোজ যাতায়াত করে।

লোকটা নিঃশব্দে সেই ঘরে ঢুকল। সেই খাট! খাটটার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর দেয়ালগুলো দেখল। শেফালি বেশি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায়নি। দেয়ালে তার হাতের শিল্পকলা বাঁধানো রয়েছে অনেকগুলো। 'পতি পরম গুরু' ইত্যাদি বাক্যসম্বলিত পুষ্পিত ও বর্ণাঢ্য সেই শিল্প। একটা হলুদ হরিণ। একটা পদ্মফুল। তাজমহল। দেবী দুর্গার মুখ। এইসব।

—বসুন। অঞ্জলি প্রায় ফিসফিস করে বলল।

লোকটা কোণের একটা হাতলভাঙা চেয়ারে বসল। আবার ঘরের ভিতরটা দেখতে থাকল।

অঞ্জলি আস্তে আস্তে বলল—বাবা আপনাকে নিজেই চিঠি লিখতেন। কিন্তু বাবার মনে—এমন কি মায়েরও, দোনামনা ভাবটা যায়নি। আশা করি, তা টের পেলেন। হ্যাঁ. এখনও ওঁরা বিশ্বাস করতে পারছেন না। দিদির নিজের হাতে লেখা চিঠি—তবু কেন জানিনা, ওদের এত অবিশ্বাস। অথচ···

লোকটা তাকাল তার দিকে।

—অথচ, আমি তো আগাগোড়া জানতাম! দিদির একটা সাংঘাতিক বিপদ হবে, আমি ঠিক জানতাম। জানেন দিদির চিঠিটা ওই কুলুজিতে চন্দনকাঠের বাকসোতে আমিই কিছুদিন আগে আবিষ্কার করলুম। তারপর সব জল হয়ে গেল। বুঝলাম—আপনাকে মিছিমিছি আমরা কষ্ট দিয়েছি।

অঞ্জলি একটু কাঁদে। তারপর সামলে নিয়ে আবার বলে—চিঠিটা আপনাকে দেখাচ্ছি। কিন্তু তার আগে কতগুলো ব্যাপার জানতে ইচ্ছে করে। সে রাতে কীভাবে দিদিকে খুন করল ও? আপনি কি বেরিয়েছিলেন কোনসময়? কেন বেরিয়েছিলেন?

লোকটা একটু হাসে। এতক্ষণে মুখ খোলে। নদীর ধারে গিয়েছিলাম। ভীষণ গরম লাগছিল, তাই।

—মিথ্যা। বিশ্বাস করি না। দিদি নিশ্চয় আপনাকে অপমান করেছিল।

—উঁ?

—বলুন।

—হুঁ। শেফালি আমাকে·········নাঃ, আমিই জানতে পেরেছিলাম, কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। বোকা মেয়ে! রঞ্জনের সঙ্গে যে ওর রেজিষ্ট্রি বিয়ে হয়ে আছে—শেষ মুহূর্তেও বাড়িতে জানালে পারত। কী বোকা! দু-দুবার তো বিয়ে করা যায় না। অথচ কিছুতেই বলেনি কাকেও!

—দিদি বরাবর অমনি বোকা ছিল। ওর একটা সুন্দর দেহ ছাড়া আর কিছু তো ছিল না।

একটু চুপ থাকার পর অঞ্জলি আবার বলে—আসলে গ্রামের মেয়ে। বাইরে ততটা মেশেনি কারও সঙ্গে। রেজিষ্ট্রি বিয়েটা ওর কাছে বিয়েই ছিল না। রঞ্জুদা এ বাড়ি আসত। কিন্তু কবে যে এতদূর গড়িয়েছে, কেউ

টের পায়নি। সেবার দিদি হঠাৎ শহরে আমাদের আত্মীয়বাড়ি—মানে মায়ের দূরসম্পর্কের বোনের স্বামী—আমি যে বাড়ি থেকে কলেজে পড়তাম - দিদি বেড়াতে গেল। আমি সবে স্কুল ফাইনাল দিয়েছি। ওর সঙ্গে গেলাম। তারপর কোন ফাঁকে দিদি উধাও। পরে ফিরল। কিন্তু কেমন অন্য মেয়ে। অত বোঝবার ক্ষমতা তখন ছিল না। টের পাইনি যে ওদের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে।

লোকটা আস্তে বলে—এখনও সব অবিশ্বাস্য লাগে।

—আমারও। বিয়ের দিনও যদি আমাকে অন্তত জানাত যে তার দুবার বিয়ে হতে যাচ্ছে!

—বিয়ের পর এঘরে আমাকে জানাল। ভীষণ কাঁদছিল। পা ধরে ক্ষমা চাইছিল। আর……

—আর?

—আর বলেছিল আমাকে চলে যেতে—যেন না ফিরি। আমি তাই চলে গিয়েছিলাম। নদীর ধারে গিয়ে হঠাৎ টের পেলুম—খালি পায়ে শুধু গেঞ্জি গায়ে বেরিয়ে এসেছি। ভাবতে অনেক সময় লাগল। নাঃ, জামা জুতোটা নিয়ে আসা উচিত গেলাম দরজা খোলাই ছিল কিন্তু ঘর অন্ধকার। বাড়ির সবাই তখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেশলাই জ্বাললাম! দেখলাম রক্ত।

—কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না কেন রঞ্জন দা ওকে খুন করল?

—সে এখন কোথায়, অঞ্জলি?

—বাইরে কোথায় নাকি চাকরি করে। ওদের বাড়ির কেউ বলে না—বলতে চায় না।

—তোমার বাবা রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারটা খোঁজ নেন নি?

—নিয়েছেন। সব সত্যি। কিন্তু ওঁর বা মায়ের দোনামনাটা কাটছে না এখনও। হয়তো ভাবছেন, ওই ব্যাপারটা টের পেয়েই তুমি দিদিকে……

সে খিক্‌খিক্ করে হাসল। —হাঁ, তা তো অসম্ভব ছিল না।

—কিন্তু রঞ্জনদা দিদিকে খুন করল কেন?

—আমি কেমন করে জানব? তোমার চিঠি পেয়ে ভাবলাম—তুমি তা বলতেই ডেকেছ।

—আমি ভেবেছিলাম, আপনিই বলতে পারবেন।

—আমি জানি না।

—দিদি এত বোকা মেয়ে ছিল! "...অঞ্জলি আবার কাঁদে। চুপিচুপি।

শরতের সূর্য উঠোনে মুঠোমুঠো উজ্জ্বল রোদ ছড়াচ্ছে। শৈল ঝি ঝকঝকে তৈজসপত্র রান্নাঘরের বারান্দায় জল চোয়াতে উপুড় করে রেখেছে। মধুবাবু পড়ানো শেষ করে ঘরে ঢুকে বাটিভরা মুড়ি নিয়ে চুপচাপ জলযোগ করছেন। অঞ্জলির মা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কিছু বলছেন হয়তো লোকটা সম্পর্কে। উঠোনের ধারে পাঁচিলে একটা দাঁড়কাক বসে আছে—বিষণ্ণ। চড়ুইগুলো উঠোনে নেমেছে। দূরে কোথায় চিল ডেকে উঠল। প্রকৃতির ছন্দে কোথাও বাধা নেই। কোন তাল কাটছে না। নীল আকাশে হাল্কা সাদা মেঘও পথ ভোলে না। মেনকা নদীর ধারে বাসের ভেঁপু বাজল।

এখানে এক পরিত্যক্ত বাসরে দুজন তন্ময় হয়ে কথা বলছে—একদিন যে বেঁচে ছিল, তার কথা।

—কিন্তু কেন রঞ্জনদা খুন করবে? সে তো সোজা এসে বলতে পারত—শেফালি আমার স্ত্রী! অঞ্জলি তীব্র কণ্ঠস্বরে বলতে থাকে। ...অথচ সে এল না। সেদিন নাকি সে গ্রামেই ছিল না।

লোকটা হাসে। —কায়স্থের ছেলে। বামুনের মেয়ে। এই অজ পাড়াগাঁয়ে তার অমন সাহস কোথায়?

—কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে খুন করতে তার সাহস হল!

—সেটাই অবাক লাগছে!

—আপনি জানেন? দিদি অন্তঃসত্ত্বা ছিল?

—হ্যাঁ, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আমি দেখেছিলাম।

—আমার কেমন হেঁয়ালি লাগে!

—আচ্ছা অঞ্জলি, সেরাতে তুমি কোথায় শুয়েছিলে?

—বারান্দায় তক্তাপোষে। নিচে শৈল ছিল। তক্তাপোষে আমার পাশে ছিল পিসতুতো ভাইবোন স্বপন আর কাজল। বাবা ছিলেন বাইরে আটচালায়। গ্রীষ্মের রাত তখন। পিসিমা মা আর সবাই ঘরে ছিলেন। পিসেমশাইরা উঠোনে সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়েছিলেন। ......অঞ্জলি সেই রাতটা যেন চোখের সামনে আনতে থাকে।...আমার ঠিক ঘুম নয়—তন্দ্রামতো এসেছিল। তারপর...

—তারপর ?

—তারপর মনে হল এঘরে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি চলেছে। দিদির কেমন চাপা আওয়াজও পেলাম। মনে মনে হাসলাম। ঘুমটা কেটে গেল।

—তারপর ?

—আর ঘুম এল না। কিন্তু……হঠাৎ চমকে উঠল অঞ্জলি।

—কী হল ?

—কিন্তু……

—কী ?

—দিদি বোবায় ধরা গলায় শেষবার একটা কথা বলে উঠেছিল !

—কী কথা অঞ্জলি ?

—'বাবা, বাবা !'

—বাবা ! আশ্চর্য !

—হ্যাঁ। মনে পড়ছে। স্পষ্ট মনে পড়ছে। আর……

—আর ?

—আর যখন বাবা দৌড়ে এলেন সকালে—ঘরের দরজায় আমরা ধাক্কা দিচ্ছিলাম—কোন সাড়া পাচ্ছিলাম না—তখন……

—বলো অঞ্জলি।

—তখন বাবার ধুতিতে কয়েক জায়গায় রক্ত ছিল !

লোকটা হাসে। তারপর বলে—হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়েছিল।

অঞ্জলি হু হু করে কাঁদতে থাকে।

মেনকানদীর ঘাটে সন্ধ্যা—সূর্য চলেছে পশ্চিমের দিগন্তে। নীলনীল কুয়াশা জমছে নদীর জলে, সবুজ শস্যে ও গাছপালায়। মাকড়সারা জাল বুনতে শুরু করেছে বিকেল থেকে। প্রজাপতিগুলো আড়াল খুঁজছে। পাখিরা ব্যস্ত, চঞ্চল—সবার বিশ্রামের সময়। ঘাটের ভিড় আবার জমেছে। খগেন চাওলা দেখল, লোকটা ফিরে এল। এসে বসল তার বেঞ্চে। বলল—একটা চা।

শ্বশুরবাড়ি ছিল নাকি এতক্ষণ ? আবার কাকেও খুন করে এল না তো ? সন্দিগ্ধ চোখে তাকায় খগেন। তারপর বলে—মশায়ের আসা হচ্ছে কি হরিণমারা থেকে ?

লোকটা মাথা নাড়ে।

—মশাই মধুবাবুর জামাই বটে তো ?

সে মাথা দোলায়।

খগেন তার ভাবসাব দেখে আর ঘাঁটাতে সাহস পায় না। চা খেয়ে সে ওঠে। খেয়ানৌকোয় চাপে। তারপর ওপারে চলে যায়। তখন খগেন বলে—চিনতে পারলে তো সব ? সেই খুনে জামাই। ভিড় চমকে গিয়ে তাকায়। দেখে লোকটা ধীরে সুস্থে ওপারের কাঁচা রাস্তায় চলেছে। সন্ধ্যার ধূসরতা তাকে ক্রমশঃ গ্রাস করে। এই দেখে মনে হয়, তার এ যাওয়াই শেষ যাওয়া। আর কোনদিন আসবে না হরিণমারায়।

মেনকানদীর ঘাটে রাতের আলো জ্বলে ওঠে। প্রকৃতির বহতা ধারার মতো মেনকা অন্ধকারে ছলছল শব্দ তুলে দূরের সাগরে যায়। নির্বিকার সে।

প্রবন্ধ

লোকশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

ডঃ সুধীর কুমার নন্দী

ভারতবর্ষে উনিশ শতকী নবজাগরণের মূলমন্ত্র হ'ল পশ্চিমী মানবতাবাদ। হিন্দু তথা ভারতীয় ঐতিহ্যের অচলায়তন যে সংস্কার সৃষ্টি করেছিল প্রায় দু'হাজার বছর ধ'রে তার মূলে কুঠারঘাত করল নব্য ভারতের রেনেসাঁস। এই নব অভ্যুত্থানের প্রাথমিক লক্ষণ হ'ল স্বাধীন চিন্তা, স্বচ্ছ মতবাদিতা। মানুষের যুক্তি যাকে গ্রহণ করবে তাকেই সত্য মূল্য দিতে হ'বে। এ হল হিউ-ম্যানিজমের গোড়ার কথা। ভারতীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে যখন হিউম্যানি-জমের এই মন্ত্রটি বারবার খণ্ডিত হচ্ছিল মানুষের ঐতিহ্য পরায়ণতার জন্য, যখন মুক্তিবুদ্ধি বারবার লজ্জিত হচ্ছিল সংস্কার পূজার জন্য তখন ঘটল রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। যে স্বাধীনচিন্তার বীজমন্ত্র রাজা রামমোহন এবং ডিরোজিও নব্য বাঙলার প্রাণে প্রাণে রেখে গেলেন তার যথাযোগ্য উদ্বর্তন ঘটল না উনিশ শতকের বাংলা দেশে। বারবার নানান্ মনীষীর জীবনে হয়

সংস্কার না হয় ধর্ম, না হয় চলিত নীতিকথা বড় হয়ে দেখা দিল। যাঁরা পশ্চিমী জ্ঞান সভ্যতার ধ্বজা ওড়ালেন তাঁরা পূর্ব দেশে শুধু কুসংস্কার প্রত্যক্ষ করলেন আর যাঁরা প্রাচ্য দেশের প্রজ্ঞা এবং মনীষার পোষকতা করলেন তাঁরা পশ্চিমী জীবনাবাদে শুধু স্বৈরাচার অবলোকন করলেন। কোথাও যুক্তি প্রাধান্য পেলো না। যুক্তির নামে গোঁড়ামির নিশান আচ্ছন্ন ক'রে দিল উনিশ শতকী বাংলার চিন্তালোক। রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন উনিশ শতকের প্রত্যন্ত সীমায়। এ রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী হিউম্যানিষ্ট। তাঁর চিন্তায় কোথায় সংস্কার-পূজার আভাস নেই। অতি-নব্যতার ব্যর্থ আস্ফালনে তাঁর মানসিকতা ভারাক্রান্ত হয় নি। সংস্কার যেখানে বোঝা হ'য়ে উঠেছে সেখানে সংস্কারকে তিনি ত্যাগ করেছেন। সে সংস্কার ধর্মেরই হোক্ কী জাতীয়তাবাদেরই হোক। ধর্ম যেখানে মানুষের মনুষ্যত্বকে অসম্মান করেছে তিনি সেখানে ধর্মদ্রোহী হয়েছেন। জাতীয়তাবাদ যেখানে মানুষের অন্তরস্বামী ভগবানকে ঘৃণার বিষে জর্জরিত করেছে সেখানে তিনি জাতীয়তাবাদী নন। মধ্যযুগীয় সংস্কার নব মানবিকতার আদর্শ উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে নি মধ্যযুগে পুরোহিততন্ত্রে মানুষের অবিচল ভক্তি ও নিষ্ঠা মানুষের বিচারবুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। আধুনিক যুগের চেতনা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল। তাই'ত দার্শনিক বেকন যুক্তিবাদী মানুষকে নানান্ ধরণের বদ্ধমূল ধারণা এবং সংস্কারের বিরুদ্ধে সাবধান করে দিলেন। তবু নব্য দর্শনের জনক দেকার্ত এই সংস্কার-বিমুক্ত হতে পারেন নি তাঁকে বারবার পুরোহিততন্ত্রের কাছে আত্মনিবেদন করতে দেখেছি। আপনার যুক্তি-বুদ্ধিকে তিনি বারবার চার্চের কাছে নিবেদন করেছেন, চার্চের অনুমোদন চেয়েছেন আপন স্বাধীন চিন্তনের। আমাদের দেশের মনীষীদের দেখেছি রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র এবং সমাজপতিদের কাছে আত্মবিক্রয় করতে। পশ্চিমী হিউম্যানিজম আমাদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিল ভারতবর্ষের শাশ্বত চিন্তায় 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' এ সত্য চণ্ডীদাসের উক্তি নয়, এ ভারতবর্ষের শাশ্বত মর্মবাণী। এই মর্মবাণী রবীন্দ্রনাথ আপন মননে এবং কথনে সত্য ক'রে তুললেন। কোন প্রলোভন কোন নিন্দা তাঁকে তাঁর বিশ্বাসে বিচলিত করতে পারল না। উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যেমন আপন বিশ্বাসের প্রেরণায় তিনি বিদ্রোহ করলেন ঠিক তেমনি আবার স্বজাতীয়ের নিগ্রহে এবং অপমানে তিনি বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে প্রতিবাদ জানালেন বিদেশীয় স্বৈরাচারের। রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ যুক্তি তাঁকে

সত্যের পথে অবিচলিত রেখেছে। স্বচ্ছ মননের অধীশ্বর রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনি এ যুগের শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিষ্ট।

হিউম্যানিষ্ট রবীন্দ্রনাথ এ যুগের অন্যতম শিক্ষা-অধিনায়ক। বিদেশী শাসক এদেশে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শিক্ষার কল প্রতিষ্ঠা ক'রে মুখস্ত-বিদ্যাবিশারদ ভুরি ভুরি কেরানী সৃষ্টি করছিল। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, স্বামী দয়ানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র, মার্সম্যান প্রমুখ মনীষীদের দৃষ্টি এদেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রত্যক্ষ করেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে তাই দেখি পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞান বাংলাভাষার মাধ্যমে দেশের মানুষের আয়ত্তে আনবার চেষ্টা চলেছে। পশ্চিম দেশীয় অনেক পণ্ডিত এই কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এতদ্দেশীয় অনেকেই ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রবিদ্যাকে সহজলভ্য করার জন্য বাংলা ভাষায় শাস্ত্র পুরাণাদির অনুবাদ করেছিলেন। এই ভাবে যখন দেশের মানুষকে দেশীবিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে স্বচ্ছ ক'রে তোলার চেষ্টা চলেছে তখন এলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদ সমগ্রতার জীবনবাদ। মানুষ বুদ্ধিকেন্দ্রিক নয় মানুষের জীবন তার বুদ্ধির সীমানায় নিঃশেষিত নয়। তার অনুভূতি আছে, সৌন্দর্য পিপাসা আছে, তার আত্মদর্শের উন্মাদনা আছে। (যে শিক্ষা মানুষের মানবীয় সত্তার সমগ্রতাটুকুকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র সংকীর্ণ ক্ষুদ্র পাথায় ভর করে সে শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করলেন।) সে অস্বীকার শুধু কথনেই সীমাবদ্ধ রইল না। বালক রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে সে শিক্ষাপদ্ধতিকে অস্বীকার করলেন। যে শিক্ষায় অনুভূতি নিঃসাড় হয়ে এলো বালক রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধাচরণ করলেন। দার্শনিক বললেন মানবের সত্তা খণ্ডিত সত্তা নয়। তার চেতনায় সমগ্র জীবন প্রতিবিম্বিত। (তাই ক'বি তাকেই যথার্থ শিক্ষা বললেন যা মানুষের মননধারায় শৃঙ্খলা আনে, যা তার অনুভূতিকে পুষ্ট এবং সমৃদ্ধ করে, যা তার আনন্দ বেদনাকে স্বচ্ছ এবং সংযত করে। তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ যখন সঙ্গীতের আনন্দধারায় আত্মহারা হয় না, প্রকৃতির সান্নিধ্যে পুলকিত হয় না, তখন তার জীবনে শিক্ষা-সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। যে শিক্ষা মানবের মনোজগতের মাত্র একটি তন্ত্রীকে স্পর্শ করল, মুখস্তের খেয়া পারাপারে যাত্রীকে পার ক'রে দিল তাকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ব'লে স্বীকার করেন নি। জ্ঞানের সঙ্গে যদি রসের চর্চার সমাবেশ না হয় তবে মানুষের জ্ঞান বোঝা হ'য়ে জ্ঞানার্থীর স্কন্ধে ভর করবে।) তাই তিনি বিশ্বভারতীতে জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে কলাবিদ্যাচর্চার

সুযোগকে যুক্ত করলেন।) কবির সুচিন্তিত অভিমত তাঁর আপন ভাষাতেই ব্যক্ত করি: " হৃদয় বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকিবেই আর থাকাই শ্রেয়। ...... এই হৃদয় বৃত্তির প্রকাশ কলাবিদ্যার সাহায্যে ঘটে। সভ্য অসভ্য সকল দেশেই এই সকল কলাবিদ্যার পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থায় এই কলাবিদ্যার কোনো স্থান নাই। কলাবিদ্যা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সে যুগের শিক্ষিত সমাজের কাছে কলাবিদ্যাকে অপাংক্তেয় ক'রে রেখেছিল। কলাবিদ্যা পৌরুষ বিকাশের, ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটনের পরিপন্থী ব'লে অনেকেই মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ জার্মান জাতির সঙ্গীতপ্রিয়তা ও জাপানীদের পুষ্পবিলাসিতার উল্লেখ ক'রে বললেন: আনন্দপ্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দপ্রকাশের পথগুলিকে মারিয়া দিলে জাতির জীবনীশক্তিকেই ক্ষীণ করিয়া দেওয়া হয়। যে জাতি আনন্দ করিতে ভোলে সে জাতি কাজ করিতেও ভোলে। আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোকে ভয় করে, সৌন্দর্যভোগকে তাহারা চাপল্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর বলিয়া জানে।' তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্কল্পের কথা অভীক কণ্ঠে ঘোষণা করলেন: "বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলাশিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সঙ্কল্প হউক।'

(ইটকাঠে গড়া নীরস খাঁচায় মনুষ্যের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।) তাইতো প্রান্তরে আনন্দনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভিত প্রতিষ্ঠা করলেন। শিশু বৃক্ষ যেমন আলোক-বাতাসের স্পর্শ চায় ঠিক তেমনি ভাবেই মানবশিশুও সেই স্পর্শ কায়মনোবাক্যে কামনা করে। উদার আকাশ, অবাধ বাতাস, প্রশান্ত আলোকের আশীর্বাদে শিশুমন সমৃদ্ধ হয়, পূর্ণ হয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মানবচেতনার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে প্রকৃতির আনন্দময় পরিবেশে। প্রচলিত 'শিক্ষাপদ্ধতি' এই মহৎ সত্যটিকে স্বীকার করেনি বলেই তার এমন নিদারুণ বিফলতা। (রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হল প্রকৃতির মোহময় পরিবেশে।) উপনিষদের ভাবপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির দুলাল। তিনি চাইলেন তাঁর জাতির উত্তরসাধকদের সার্থক করে তুলতে তাঁদের ঐকান্তিক জীবনসাধনায়। সে সাফল্যের মূলে রয়েছে ঐ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবোধ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাই মানুষকে ছাড়িয়েও তার

পরিবেশকে বিচার করেছে। শিমুল-সজিনার ঋণ কবি-জীবনে অপরাজ্ঞ। মধুরের সান্নিধ্য কবিকে ধন্য করেছে, কবি তার স্পর্শে পুলকিত হন, গর্বিত হন তার আত্মীয়তায়। এই বোধ কবির শিক্ষাদর্শনেও অনুস্যূত। তিনি তাই তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বৃক্ষতলে শ্যামল শষ্পাসনে বসবার বিধি প্রবর্তন করলেন। প্রাচীর নেই, বাধা নেই, নিষেধের অনর্থ নেই। তবে নিয়মের শৃঙ্খলকে কবি অস্বীকার করেন নি। শিক্ষার্থীদের জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের শিশু প্রাণের দুর্বার প্রাণশক্তিকে প্রবাহিত করতে হবে সুশৃঙ্খলভাবে। তাই শিক্ষার্থীদের দেহে মনে তিনি সংযমের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। শিক্ষার্থীরা আশ্রমে আবাসিক হ'য়ে থেকেছে। নিজের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম নিজেরাই সম্পন্ন করেছে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন আত্মনির্ভর। নিজের কাজ তিনি নিজের হাতে করতে ভালোবাসতেন। দাসদাসীর সেবা নেওয়া তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রজীবনীকার এ কথা আমাদের বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বার্দ্ধক্যজনিত অশক্ততায় বন্দী হবার আগে পর্যন্ত কখনও দাস দাসীর সেবা গ্রহণ করেননি। এই দুর্নিবার স্ব-তন্ত্রপ্রিয়তা কবির জীবনদর্শনের ভিত্তিভূমি তাঁর শিক্ষাদর্শনেও তাই তিনি শিক্ষার্থীর স্বনির্ভরতাকে বড় ক'রে দেখেছেন। শিক্ষার্থী আত্মনির্ভর হ'বে। কর্তাভজা জাতির নুব্জ মেরু-দণ্ডকে ঋজুতায় সমুন্নত করার জন্য কবির প্রয়াস সর্বজনবিদিত। তাই কবি চাইলেন তাঁর দেশের ছেলেমেয়েদের জীবনে স্বানর্ভরতা আসুক। সে স্বাতন্ত্র্য ফুটুক তাদের চিন্তায়, ব্যবহারে কর্মে। সে স্বয়ংচিন্ততা তাদের উত্তরকালের জীবনসাধনায় প্রমূর্ত হোক্।

অধ্যয়ন এবং অধ্যবসায় অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। কবির জীবনে এই অধ্যবসায়ের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ। শ্রম, অনলস কর্মসাধনা জ্ঞানার্থীর পরম আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ আপনার জীবনে জ্ঞানসাধনায় এই নিগূঢ় সত্যটিকে মূর্ত ক'রে তুলেছিলেন। শিক্ষার্থী রবীন্দ্রনাথ জীবনের সকল স্তরেই অশ্রান্ত কর্মী। এ কথা রবীন্দ্র-জীবনীকার আমাদের বলেছেন যে প্রৌঢ় পীড়িত রবীন্দ্রনাথকে মধ্যাহ্ন ভোজনান্তিক বিশ্রাম গ্রহণ করানো যায় নি। 'জাতির জনক' গান্ধীজিকে শান্তিনিকেতনে আগমন করতে হয়েছিল তাঁর 'গুরুদেবকে' বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করার জন্য। এই অনলস কর্মী রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর দেশের ছেলেমেয়েরা যেন শ্রমবিমুখ না হয়। তাদের মনে জ্ঞানের স্পৃহা জাগ্রত হোক্, সেই জাগ্রত ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য তারা দেশবিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে

জ্ঞান আহরণ করুক। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছেলেমেয়েদের পড়িয়েছেন। সুযোগ্য পণ্ডিত এবং শিক্ষকদের ভার দিয়েছেন এই সুকুমারমতি কিশোর-কিশোরীদের চিত্তবৃত্তির সম্যক্ বিকাশ সাধনের। বুদ্ধি যেমন শাণিত হয়েছে, তেমনি তাদের অনুভূতির ব্যাপ্তিও প্রসারিত হয়ে উঠেছে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। শিক্ষাবিদ্, লোকগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। আজ দেশের দিকে দিকে নৃত্য-গীতের উৎসব। এ যুগের শিক্ষিত সমাজ তথা শিক্ষাবিদেরা শিক্ষায় কারুকলার আবশ্যিকতাকে সাগ্রহে স্বীকার করেছেন। বিংশশতকের প্রথম পাদেও এই বোধ লক্ষিত হয়নি শিক্ষিত সমাজে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নৃত্য-গীতাদি কারুকলার যে মর্যাদাসম্পন্ন স্থান রয়েছে তা আধুনিক কালে আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম। লোকগুরু রবীন্দ্রনাথ সেদিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অন্ধ দেশ, মূঢ় সমাজ সেদিন কবির কথায় কর্ণপাত করেনি। কবির বিরূপ সমালোচনা করেছে পণ্ডিতমূর্খের দল। আজ আমরা কবিপ্রচারিত শিক্ষাদর্শনের যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারছি। এ যুগে চারুকলার সাধনায় কবি ছিলেন পথিকৃৎ। দেশের বৃহত্তর শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নব ভাবনার প্রবর্তক।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি যখন মাধ্যমিক স্তরে ও ইংরাজী ভাষাকে আশ্রয় ক'রে রইল তখন তা ফলবান হ'ল না এ দেশের মানুষের জীবনে। যে কয়জন ভাগ্যবান স্মৃতির খেয়ায় জ্ঞানের গন্ধমাদনকে বহন করতে সক্ষম হ'ল তারাই সার্থক সফল হ'ল। আর অসংখ্য অগণিত মানুষ এই অসাধ্য সাধন করতে পারল না ব'লে অপাংক্তেয় হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাটুকু উদ্ঘাটিত করে দিলেন। তিনি চাইলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার। দরিদ্র দেশের দরিদ্র মানুষ। তাদের হাতে সুলভে যাতে সহজবোধ্য পথে দেশবিদেশের জ্ঞান আসে কবি সেই পথের নির্দেশ দিলেন। রাষ্ট্রব্যবস্থা তখন চায় নি যে দেশের মানুষ যথার্থই শিক্ষিত হ'য়ে উঠুক। তাই সুফল ফলল না। কর্তৃপক্ষ পুরানো রীতি পদ্ধতিকেই আঁকড়ে ধ'রে রইল দেশের মানুষকে অভুক্ত, অতৃপ্ত রেখে। একক যাত্রায় আস্থাবান নিত্য-যাত্রী কবি বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেন। লোক-শিক্ষার জন্য তিনি নব নব তত্ত্বের উদ্ভাবন করলেন। দেশের প্রাচীন জ্ঞান সুলভসংস্করণ গ্রন্থে প্রচারিত হ'ল মাতৃভাষার মাধ্যমে। বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত হ'ল এদেশের ইংরাজী অনভিজ্ঞ মানুষের কাছে। দেশের মানুষের

উপবাসী পিপাসু চিত্তে জ্ঞানের সঞ্জীবনী ধারায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হ'ল। কবি বললেন মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের কথা। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বললেন। তবে তাঁর মতে শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। কবি-কথিত নীতি স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়েছে। ভবিষ্যৎ অতীতকে স্বীকার করেছে, তাকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমগ্রতাবাদী, এ কথা আগেই বলেছি। একদিকে তিনি যেমন ব্যক্তি মানুষের সমগ্র সত্তার শিক্ষা-শৃঙ্খলায় সংযম প্রত্যাশা করতে চেয়েছেন অন্যদিকে তিনি সার্বিক শিক্ষার (universal education) সমর্থক ছিলেন। সমস্ত মানুষের শিক্ষায় জন্মগত অধিকার। কবির ঔপনিষদিক জীবনদর্শন তাঁকে সমদর্শী ক'রে তুলেছে। যে পরা সত্তা চেতনে অচেতনে পরিব্যাপ্ত মানুষে তো তাঁরই প্রতিষ্ঠা। তাই তো কবি সর্ব আমিতে আত্ম-আমির ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করলেন। তাইতো কবি এতো বিশ্ব-ঘনিষ্ঠ। সকলের আত্মীয়তায় কবি সার্থক, কবি ধন্য। তিনি চাইলেন সকলের জন্য শিক্ষার আলো। যারা জীবনে লাঞ্ছিত, মৃত্যুতেও অবহেলিত তাদের শিক্ষার জন্য কবির মর্মবেদনা। তিনি চাইলেন অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসংখ্য গ্রামের অগণিত নরনারীকে সুশিক্ষার আলোকে চক্ষুষ্মান ক'রে তুলতে। দেশের সামগ্রিক রূপটুকুই কবির চোখে সত্য। খণ্ডিত রূপ, বিচ্ছিন্ন সত্তা কবি-ভাবনায় অসিদ্ধ। আদিম্ভজনের মতই রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সমগ্রতাবাদী। এই সমগ্রতার ধারণাই কবিকে জাতীয়তাবাদের পল্বল থেকে আন্তর্জাতিকতার মহাসাগরে লীলায়িত হয়ে ওঠার অবকাশ দিয়েছে। রবীন্দ্র-মানস বিচারে এই সমগ্রতার ধারণাটুকু কবিকে বোঝার পক্ষে আবশ্যিক। রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শন এই সমগ্রতার ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। উদাহরণ দিই। বিদ্যালয়ের কাজ এবং বিদ্যালয়ের অবকাশ নিয়ে বিদ্যালয়ের কর্ম রূপের সমগ্রতা। শুধু কাজ, দমবন্ধকরা অশ্রান্ত কর্মচক্রের আবর্তন কবির কাছে অগ্রাহ্য। কাজের বিরতি চাই, অবকাশ চাই। কাজের যেমন দরকার, কর্মবিরতিরও প্রয়োজন তার চেয়ে কম নয়। এই বিরতি না থাকলে কাজের রূপটুকু উপলব্ধি করা যায় না। কবি বললেন: "অবিশ্রাম কর্মের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কর্মটাকেই অতিশয় একান্ত করে দেখা হয়। কর্ম তখন মাকড়সার জালের মতো আমাদের চারদিক থেকে এমনি আচ্ছন্ন করে ধরে যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা বুঝবার সামর্থ্যই আমাদের থাকে না। এইজন্য অভ্যস্ত কর্মকে পুনরায় নূতন করে দেখবার সুযোগ লাভ

করব বলেই এক একবার কর্ম থেকে আমরা সরে যাই। কেবল মাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়।" (ছুটির পর, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে) রবীন্দ্রনাথ এখানে বলছেন, যে কাজ এবং ছুটি—এ দুটোকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে দেখলে তবেই কাজের পূর্ণরূপটুকুর উপলব্ধি হয়। গতি যেমন বিচ্ছিন্নভাবে সত্য নয়, গতির সত্যতা স্থিতিকে ও নিয়ে ঠিক তেমনি কাজের সঙ্গে বিরতি যুক্ত থেকে কাজকে পূর্ণ করে। কাজ অকাজের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়। সমগ্রতাবাদী রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসমবায়ের কথা বললেন: "পৃথিবীর এখন বায় হইয়াছে, জাতিগত বিদ্যা-স্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে, সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে, সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে। অতএব আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদানপ্রদান ও তুলনা হইবে, সেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবেই।" বিশ্ব-বিদ্যার এই পূর্ণাঙ্গ রূপের জন্য কবির সাধনা। তিনি এই বিশ্ব বিদ্যাধারাকে দেশের শিক্ষার্থীর মানসতটে বহমান করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। এই দুরূহ কর্ম সম্পাদন করতে হলে ভারতীয় জ্ঞানের পূর্ণ রূপটুকু ভারতীয়দের সামনে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। ভারতীয় জ্ঞানের ধারা বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রধানত এই চারটী শাখা-আশ্রয়ী। এর পরে আছে ইসলামের প্রভাব। মুসলমানদের সাহিত্য-শিল্প সংস্কৃত ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ সে ঋণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করলেন, জীবনব্যাপী সাধনায় ইসলামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আত্মগত করবার জন্য তাঁর দেশবাসীকে বললেন নব্য-ইয়োরোপীয় ভাবধারা কবির শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্বীকৃতি পেলো। পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা মূঢ়তা। কবি তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ইংরাজীসাহিত্য পঠনপাঠনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। তিনি স্বয়ং ব্রাউনিং-এর কাব্য-সাহিত্যের ক্লাস নিতেন। ইংরাজদের অনাচারকে অশ্রদ্ধা করলেও তাদের সাধনাকে ও সিদ্ধিকে তিনি বরাবরই শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ চিন্তায় ও কর্মে সমগ্রতাবাদী ছিলেন। তিনি শৌখীন আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন না। তাই তাঁর শিক্ষাদর্শন এতোখানি গভীর এবং ব্যাপক হতে পেরেছে। তাঁর শিক্ষার আদর্শ ছিল প্রাচীন ভারতীয়ের তপোবনের আদর্শ। কবি বললেন যে আমাদের

তপোবনে একদিন অনন্তের বার্তা এসে পৌঁচেছিল। সেদিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম ব'লে জেনেছিল। সেদিন ভারতবাসী সমপ্রভার মন্ত্রে আস্থা স্থাপন করেছিল বলেই ভারতীয় প্রজ্ঞা সেদিন যে মন্ত্রটির জন্ম দিল তা হচ্ছে :

"যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।"

যিনি সর্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না। কবিগুরু এই মহামন্ত্রটিকে সাগ্রহে বরণ করেছিলেন। তাই তিনি মহামানবের সাগরসঙ্গমে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলেন। তাইতো তাঁর শিক্ষাদর্শন বিশ্বজনীনতার প্রসাদচিহ্নিত।

প্রবন্ধ

বাংলা নাটকের সুষ্ঠু ধারা

ডঃ শিশির কুমার সিংহ

বাংলাসাহিত্যের অন্যান্য আধুনিক শাখার মত নাট্যশাখারও উদ্ভব উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। আমরা এখন নাটক বলতে যে শ্রেণীর সাহিত্যকে বুঝি ইংরেজদের আগমনের আগে আমাদের দেশে সে ধরণের রচনা ছিল না। বিলাতি মঞ্চে বিদেশী নাটক দেখেই আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে নাটক লেখার প্রেরণা জাগে। তাই বাংলা নাটকের প্রধান আদর্শ ছিল বিদেশী নাটক।[১] অবশ্য আমাদের দেশের প্রাচীন যাত্রাগানের এবং কালিদাস ইত্যাদি সংস্কৃত নাট্যকারদের নাটকের প্রভাব যে বাংলা নাটককে প্রভাবিত করেনি তা' নয়। তবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটকগুলির গঠন রীতি ও কলাকৌশল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ঐ গুলি মূলতঃ শেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শ অনুসরণে রচিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে দু'টি নাটক প্রথম মৌলিক নাটক বলে চিহ্নিত হয়েছে সেই 'কীর্তিবিলাস' (জি সি. গুপ্ত : ১৮৫২) এবং 'ভদ্রার্জুন' (তারাচরণ শীকদার : ১৮৫২) নাটক দু'টি শেক্স-

পীয়রীয় নাট্য আদর্শে রচিত। 'কীর্তিবিলাস' নাটকের মুখবন্ধে নাট্যকার বিয়োগান্তক নাটক রচনার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে যে কথা বলেছেন সে কথাগুলি উদ্ধার করলে আমার মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধ হবে।

"অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণে শেক্সপীয়ার-নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—

আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তথাপি আমার মন অবিরত শোকপ্রয়াসী।......"

তবে এই নাটকেও সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুযায়ী পদ্যে প্রস্তাবনা আছে। 'ভদ্রার্জুন' নাটকটিতেও ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় প্রকার নাট্যাদর্শই বিদ্যমান।

এরপর নাট্যসাহিত্যক্ষেত্রে রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-২৬) মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) এবং দীনবন্ধু মিত্রের (১২৩৬ ৮০) আবির্ভাবের ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্য যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করলো। মধুসূদনের হাতে নাটকের গঠনকৌশলেরও উন্নতি হল। সার্থক ট্রাজেডি 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১ ?) যেমন রচনা করলেন তেমনি দু'টি প্রহসনও তিনি রচনা করলেন ('একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ': ১৮৬০)। এ দু'টি প্রহসনই পরবর্তী নাট্যকারদের প্রহসন রচনার আদর্শ হলো। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, মধুসূদনের নাটকে কালিদাসের নাটকের (বিশেষ করে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর) প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই পর্বের নাট্যকারদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে 'কুলীনকুল সর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকটি রচনা করে তিনি অর্থ এবং খ্যাতি দুইই লাভ করেন। তিনি সামাজিক, পৌরাণিক এবং প্রহসন (নক্সা) রচনা করেও নাটকের বিভিন্ন দিক খুলে দেন। মধুসূদনের অনুসরণে দীনবন্ধুও প্রহসন জাতীয় নাটক রচনা করেন। তাছাড়া সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নামক বিখ্যাত নাটকটিও রচনা করেন। দীনবন্ধুর নাটকগুলির মধ্যে সমাজের নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের চরিত্র খুব সুন্দর ফুটে উঠেছে। রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধুর নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সাধারণ নাট্যশালার প্রধান নাট্যকার ছিলেন দীনবন্ধু। মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর

নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নাটকগুলির হাস্য-কৌতুকের মধ্যেও মানব-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। যার ফলে তাঁদের প্রহসন জাতীয় নাটকগুলিও সাধারণ প্রহসন নাটকের থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদালাভ করেছে।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম পর্বের উপরিউক্ত তিনজন বিশিষ্ট নাট্যকারের প্রচেষ্টায় বাংলা নাট্যসাহিত্য মাত্র ক'বছরের মধ্যেই বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে নাট্যশাখাও দিন দিন সমৃদ্ধতর হয়ে উঠতে থাকে। পঞ্চাঙ্ক, একাঙ্ক ইত্যাদি বিভিন্ন রীতির নাটকও এই পর্বেই রচিত হয়। তাছাড়া এই পর্বের নাটকগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল বস্তুধর্মিতা, কল্পনা প্রবণতা নয়, কিন্তু এই সময়ের উপন্যাসসাহিত্যে ছিল ঠিক এর বিপরীতধর্মী।[২]

নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয়পর্বের বিশিষ্ট নাট্যকারগণ হলেন মনোমোহন বসু (১৮৩১—১৯১২), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮—১৯২৫) গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪ ১৯১২), অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯২৯) এবং রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯—১৮৯৪)। জাতীয় রঙ্গশালা (১৮৭২) ও অন্যান্য রঙ্গমঞ্চের সফলতা ও প্রভূত জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়োপযোগী নাটকের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। বিশিষ্ট নাট্যকারগণ এক একটি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁরা রঙ্গমঞ্চের নির্দেশে দর্শকরুচির প্রতি দৃষ্টি রেখে নাটক রচনা করতে বাধ্য হয়। ফলে নাটকের মধ্যে ধীরে ধীরে বাস্তবগুণ লোপ পেয়ে গিয়ে কল্পনা-বিলাসিতা, রোমান্টিকতা, অলৌকিক চমৎকারিত্ব ইত্যাদি প্রবেশ করতে থাকে। অর্থাৎ ধীরে ধীরে নাটকের রূপের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে নাটক রচনা করতে হওয়ায় এই পর্বের নাটকগুলির মধ্যে প্রকৃত নাট্যগুণ তথা সাহিত্যগুণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই দেখি গিরিশচন্দ্র-অনূদিত 'ম্যাকবেথ' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হলেও দর্শকসমাগম হয় নি তখন ব্যবসায়িক স্বার্থে দর্শকদের রুচির প্রতি দৃষ্টি রেখে পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ করা হয় এবং আশানুযায়ী দর্শক সমাগমও হয় তাই এই যুগে নাট্যকারের স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক প্রেরণায় নাটক রচিত না হওয়ায় নাটক ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও নাট্যসাহিত্যের আশানুরূপ উন্নতি হয়নি।

এই পর্বের নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে যে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে সে দু'টি হল : ১) আদর্শবাদ—জাতীয়তাবোধের আদর্শ, প্রেমের আধ্যাত্মিক আদর্শ। ২) ভক্তিবাদ।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমরা এ যুগের নাটকগুলিকে মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি :

১) ইতিহাসমূলক—যে নাটকগুলির প্রধান লক্ষ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের আদর্শে দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা। অর্থাৎ এই সময়ের নাটকে জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

২) পৌরাণিক-আধ্যাত্মিকমূলক—যে নাটকগুলির প্রধান রস ভক্তিরস।

এই পর্বের নাটকগুলিতে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জীবন অপেক্ষা আদর্শ জীবনই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে এবং ভক্তিরসের প্রাবল্যের ফলে অলৌকিকত্ব এত বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে যে নাটকের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর এর ফলে দেশীয় "যাত্রাগানের" মত এই পর্বের নাটকে গানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক নাটকগুলির মধ্যেও ('প্রফুল্ল' ইত্যাদি) আদর্শবাদ অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করার ফলে বাস্তব রস ফুটে না ওঠায় চরিত্রগুলি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি।

মনোমোহন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—গিরিশচন্দ্র—রাজকৃষ্ণের আন্তরিক চেষ্টার ফলে যেমন গভীর ও গম্ভীর নাটকের উন্নতি সাধিত হয়েছে ঠিক সেরূপভাবে অমৃতলালের আন্তরিক চেষ্টার ফলে প্রহসন ও বিদ্রূপাত্মক নাটকের (নক্শা ?) উন্নতি সাধিত হয়েছে। নাট্যসাহিত্যের এই যুগে অমৃতলালের নাটকগুলির মধ্যেই মানব জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি খুব সুন্দররূপে চিত্রায়িত হয়েছে। এই যুগে কেবল তাঁর নাটকের মধ্যেই বাস্তব রস পরিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ নাট্যসাহিত্য আদর্শবাদ ভক্তিবাদ-আধ্যাত্মিকতার ভাবোচ্ছ্বাস থেকে আবার বাস্তবতার পথে ফিরতে শুরু করেছে ;—আধুনিক নাটকের যা বিশিষ্ট গুণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের (১৮৬৩—১৯১৩) নাটকে পূর্বধারার অনুসরণই লক্ষ্য করি। (জাতীয় আন্দোলনের ফলে) স্বদেশপ্রীতির উচ্ছ্বাসে ও দেশপ্রীতিমূলক সঙ্গীতের উন্মাদনায় হাস্যরসের স্রোতে শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর নাটকগুলিও মূলতঃ মেলোড্রামাটিক-ঐতিহাসিক নাটক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের (বিশেষ করে রাজপুত ইতিহাসের) ঐতিহাসিক বীরদের কাহিনী অবলম্বনে যে নাটকগুলি তিনি রচনা করেছেন সেগুলি রীতিমত

জনপ্রিয় হলেও নাটক হিসেবে খুব উচ্চশ্রেণীর হয়ে ওঠেনি। সামাজিক নাটকেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।[৩] ক্ষীরোদপ্রসাদও (১৮৬৩—১৯২৭) গতানুগতিক পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি নাটক (বিশেষ করে, 'আলিবাবা' : ১৩০৪ সাল,—কাহিনীর চমৎকারিত্বের জন্য এবং অমরেন্দ্র দত্তের অভিনয়ের জন্য) বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও তাঁর হাতে নাট্যসাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না। তিনিও গিরিশচন্দ্র-রাজকৃষ্ণের পথেই চলেছেন, বিশেষ নতুনত্ব দেখাতে পারেননি।

এই পর্বে নাট্যসাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে ঠিকই এবং প্রচুর এবং বিভিন্ন প্রকারের নাটকও রচিত হয়েছে এও ঠিক,—তবু একথা বলা বোধহয় খুব দোষের হবেনা যে এসব সত্ত্বেও নাট্যসাহিত্যের মান খুব একটা উন্নত হয়নি। যে সব প্রতিভাধর নাটকরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা যদি দর্শকরুচির প্রতি অধিকমাত্রায় গুরুত্ব না দিয়ে প্রকৃত উন্নতমানের নাটক রচনা করতে সচেষ্ট হতেন তাহলে বাংলা নাট্য-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতই সমৃদ্ধ হয়ে উঠত এবং সঙ্গে সঙ্গে 'দর্শকরুচি'রও পরিবর্তন ঘটতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় নাট্যকাররা জনপ্রিয় হতে গিয়ে এবং রঙ্গমঞ্চের লাভালাভের প্রতি অধিকমাত্রায় দৃষ্টি দিতে গিয়ে 'জনপ্রিয় নাটক' (popular drama) রচনা করতে পারলেও প্রথম শ্রেণীর নাটক রচনা করতে সক্ষম হননি।

নাটকের দ্বিতীয় পর্বের শেষ এবং তৃতীয় পর্বের শুরুর মাঝে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে যে নাটকগুলি আমাদের চমক্ দেয় সেগুলি হল রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরণের বিশিষ্ট নাটক। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ একাকীই একটি যুগ। পূর্ববর্তী নাট্যকারদের নাট্যধারার সঙ্গে তাঁর নাটকের যোগ যেমন দুর্লক্ষ্য (যদিও আগের যুগের অনেক নাট্যকারের ওপর, বিশেষ করে অমৃতলাল বসুর ওপর, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব চোখে পড়ে।) পরবর্তী নাট্যকাররাও তেমনি তাঁর ধারা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারেননি। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাট্যরচনা কৌশলের যে রীতিগুলি প্রচলিত আছে তার মধ্যে শেক্সপীয়রীয় রীতিই (তখন বাঙালী নাট্যকারদের কাছে) সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল। বাংলা নাটকের উদ্ভব কাল থেকে শুরু করে রবীন্দ্রপূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটক শেক্সপীয়রীয় নাট্যাদর্শে রচিত। এমন কি রবীন্দ্রনাথের প্রথম দু'একটি নাটকেও (বিশেষ করে 'বিসর্জন' নাটকটি উল্লেখযোগ্য) উক্ত নাট্যরীতিই লক্ষ্য

করা যায়। তবে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই রীতি লঙ্ঘন করে নতুন রীতির নাটক রচনা করে বাংলা নাটকের আধুনিক পর্বের সূচনা করলেন। বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব পদ্ধতির নাটক রচিত হল, ফুটে উঠলো মানবজীবনের প্রকৃত ছবি। প্রচারিত হল মানবজীবনের মহত্বের জয়গান। এতদিনে বাংলা নাটক মুক্তির পথ পেলো। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তখন নাট্যকৌশলের পরিবর্তন ঘটেছে। মেটারলিঙ্ক নতুন ধরণের নাটক—"প্রতীক নাটক" (symbolic play) রচনা করে জগৎ বিখ্যাত হয়েছেন ('ব্লু বার্ড—নোবেল পুরস্কার ১৯১১)।[৪] রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে একের পর এক তাঁর বিখ্যাত সাঙ্কেতিক বা ব্যঞ্জনাপ্রধান নাটকগুলি রচনা করেছেন (অবশ্য এর অনেক আগেই ১২৯১ বঙ্গাব্দেই তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক অংশত প্রতীক নাটক রচনা করেছেন।) 'রাজা' (১৩১৭), 'অচলায়তন' (১৯১১), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৪) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাটকেই দেখতে পাই প্রকৃতি ও মানবজীবন একই সূত্রে বাঁধা। সাধারণ মানুষের সহজ সরল জীবনের 'ক্রিয়াকর্ম খেলা আনন্দ' হয়েছে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু। তিনি 'ফাল্গুনী' নাটকের রঙ্গমঞ্চবিহীন অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকদের স্বাভাবিক যোগ ঘটিয়ে নতুনত্বের সৃষ্টি করেছেন। তাই জনৈক সমালোচক বলেছেন:

"একমাত্র রবীন্দ্রনাথই জেনেছিলেন বাংলা নাটকের সম্পূর্ণ স্বকীয় নাট্য-বিন্যাস, তার লোকজীবনের সঙ্গে ঘন সম্পর্কে যোজিত এক নাট্যরূপ। সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে এই ভঙ্গীই স্পর্শ করে আছে প্রতীচ্যের আধুনিক পর্ব, এখনো পর্যন্ত তাঁকেই হয়তো বলা যায় আমাদের দেশের আধুনিকতম নাট্যকার।"[৫]

রবীন্দ্রযুগের শেষ পর্বে এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে সব নাট্যকার নাটক রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন মন্মথ নাথ রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, নিশিকান্ত বসু রায়, প্রমথনাথ বিশি, মনোজ বসু, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়স্কান্ত বক্সী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, 'বনফুল', বিধায়ক ভট্টাচার্য, ডঃ বিজন ভট্টাচার্য। এই সমস্ত নাট্যকারদের হাতে বাংলা ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাট্যধারার বেশ উন্নতি ঘটেছিল, পৌরাণিক নাটক এবং একাঙ্ক রচনায় মন্মথ রায়ের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। তবে দুঃখের বিষয় রীতিনীতির অর্থাৎ নাট্যকৌশলের কোন অভিনবত্ব তিনি দেখাতে পারেননি। মনোজ বসু ও তারাশঙ্করের সামাজিক নাটকগুলি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

'বনফুলের' জীবনীমূলক নাটক দু'টি রীতিমত নাটক হয়ে উঠেছে। 'শ্রীমধুসূদন' এবং 'বিদ্যাসাগর' এই শ্রেণীর নাটকের অগ্রদূত। হাস্যকৌতুকরসের মধ্যে দিয়ে নাট্যরসবিতরণের কৃতিত্ব প্রমথনাথ বিশির। আর এই কারণেই তাঁর নাটকগুলি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। এই সময়ের সামাজিক নাটক রচয়িতাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। সাধারণ বাঙালী পরিবারের জীবনযাপনের সমস্যাগুলোকে সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত করেছেন তাঁর নাটকে। তাঁর 'মাটির ঘর' নাটকটি এই শ্রেণীর একটি সহজ সরল নাটক। এই নাটকের মধ্যে সাধারণ বাঙালী পরিবারের সুখদুঃখকে অতি নিপুণভাবে গভীর দরদের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন।

যুদ্ধোত্তর নাটক : দেশী ও বিদেশী :—এরপর শুরু হয়েছে নব নাট্য আন্দোলন। যুদ্ধোত্তর নাটকের রূপ গেছে পাল্টে। আধুনিক জটিল মানবজীবনের ছবি নানা আঙ্গিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা চলছে। কি দেশী কি বিদেশী আধুনিক নাট্যকাররা নাট্যমুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাই দিন দিন নাট্যকৌশলের নতুন নতুন রীতি উদ্ভাবিত হচ্ছে। মঞ্চসজ্জা নিয়ে নানাধরণের পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। বা আদৌ মঞ্চের কোন প্রয়োজন আছে কিনা সে নিয়েও গবেষণা চলছে। রাস্তায় রাস্তায় হঠাৎ হঠাৎ নাটক অভিনীত হচ্ছে। জনসাধারণও এই নাটকে অংশ গ্রহণ করতে পারছেন। এই রকম নানা পরীক্ষানিরীক্ষার শেষে বর্তমানে আমরা পৌঁচেছি 'অ্যাবসার্ড ড্রামায়' বা উদ্ভট নাটকে। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে—বিশেষ করে ফ্রান্সে—উদ্ভট নাটক নিয়ে রীতিমত মাতামাতি চলছে—তবুও সার্থক নাট্যমুক্তি ঘটেনি। আধুনিক বাংলা নাটক পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাবে রীতিমত প্রভাবিত। বর্তমানের বেশির ভাগ বাংলা নাটক হয় বিদেশী নাটকের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ,—নয়তো বিদেশী কলাকৌশলে রচিত। তাই প্রথমে কয়েকজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য নাট্যকারের সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন।

চিরাচরিত নাট্যকৌশল ত্যাগ করে যে সব পাশ্চাত্য নাট্যকার নাটক রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন ইউজিন ও'নীল (Eugene O'Neill—'Mourning Becomes Electria), টি. এস এলিয়ট (T. S. Eliot : 'The Cocktail Party') আর্থার মিলার (Arthur Miller : 'Death of a Salesman'), বার্টোল্ট ব্রেখট্ (Bertolt Brecht : 'Mother courage'), স্যামুয়েল বেকেট্

(Samuel Beckett : 'Waiting for Godot'), আয়োনেস্কো (Ionesco : 'The Chairs'), এডোয়ার্ড অ্যাল্‌বী (Edward Albee : 'Who's Afraid of Virginia Woolf')। এ ছাড়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যকারদ্বয় হলেন ইবসেন ও শ'। তাঁদের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর।

ও'নীলের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন : "Modern American drama, by common critical consent, begins with Eugene O'Neill"—[৬] একথা একান্ত সত্য। ও'নীলই চিরাচরিত রীতি ত্যাগ করে নতুন নাট্যরীতির প্রবর্তন করেন। এর জন্য তিনি বার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তিনি সমসাময়িক সমাজজীবনের ছবি নাটকের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর নাটকের মধ্যে যেসব নতুন নতুন তত্ত্ব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বাস্তববাদ' ("Realism") এবং অভিব্যক্তিবাদী ("Expressionism")। নাট্যকৌশলের নতুন রীতি (form) প্রবর্তনের দিক দিয়ে বিচার করলে ও'নীলের সঙ্গে এলিয়টের তুলনা করা যায়। তবে দু'জনের প্রয়োগকৌশল বা উপস্থাপনার ভঙ্গিতে বেশ পার্থক্য আছে। ও'নীল সমসাময়িক ঘটনা ও মতবাদকে উপেক্ষা করেননি কিন্তু এলিয়ট পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐতিহ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন "The surface of 'The Cocktail Party' is modern, bus it has roots in the traditional literary heritage of western civilization"।[৭]

সমসাময়িক আমেরিকান নাট্যকারদের মধ্যে খ্যাতির তুঙ্গে উঠেছেন আর্থার মিলার। মিলারের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার আমেরিকানত্ব। "Death of Salesman' নাটকের মধ্যে জনৈক আমেরিকান 'সেলসম্যান'-এর জীবনের সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। এ সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলেছেন—"The most salient quality of Arthur Miller's tragedy of the common man Death Of A Salesman is its Americanism.[৮] মিলার নাটকটির মধ্য দিয়ে নাটকের একটি নতুন আঙ্গিক (form) সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন : "I wished to create a form which, in itselt as a form, would literally be the process of

Willy Loman's way of mind."[৯] একটি বিশেষ শ্রেণীর মনের কথা—তাদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-ব্যর্থতার কথা তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন—

"What was wanted now was not a mounting line of tension. nor gradually narrowing cone of intensifying suspense, but a bloc, a single chord presented as such at the outset, within which all the strains and melodies would already be contained."[১০] আবার আর এক জায়গায় তিনি তাঁর নাট্য-পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলেছেন :

"It was to forego the usual preparations for scenes and and to permit—and even seek—whatever in each character contradicted his position in the advocate-defense scheme of its jurisprudence."

ব্রেখ্‌ট্ সমস্ত চিরাচরিত নাট্যকৌশলকে - নাট্যকল্পনাকে ত্যাগ করে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে অভিনেতা ও দর্শক কেউই যেন ভাবাবেগে নাটকীয় ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে না পড়েন। সবসময়ে তাঁদেরকে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু বিচার করতে হবে।[১২] —অথচ চিরাচরিত ধারণা হল নাটক দেখতে দেখতে যদি নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ি,—তাহলেই নাটক রচনা সার্থক হয়।

ব্রেখ্‌টের নাটকের কলাকৌশল অপেক্ষা বিষয়বস্তুর অভিনবত্বই সমসাময়িক নাট্যকারদেরকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল এবং বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।[১৩]— তাঁর নাটকে ব্যাখ্যাত মার্ক্সীয় দর্শন এক বিশেষ মূল্যলাভ করেছে—যা বাঙালী নাট্যকারদেরকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

·বেকেট্ তাঁর নাটকে সমসাময়িক মানবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার, যুগযন্ত্রণার ছবি খুব নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর আবেদন মানুষের হৃদয়ের কাছে, ভাবোচ্ছ্বাসের কাছে। তিনি আশাবাদী—মানবজীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা হতাশা থেকে নতুন সুস্থ জীবনে উত্তরণে বিশ্বাসী।

বেকেট্ ও আয়োনেস্কো দু'জনের ওপরেই ব্রেখ্‌টের প্রভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। তবে আয়োনেস্কো বেশ কিছুটা সনাতনপন্থী। তিনি নাট্য-কাহিনীর তথা প্লটের উৎকর্ষের ওপরেই অধিক গুরুত্ব দান করেছেন।

অ্যালবী আবার বেকেট ও আয়োনেস্কোর মত ক্যাটাগরিভুক্ত হলেও নাট্য

কৌশলের দিক দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নপথাবলম্বী। তাঁর নাটক 'ডায়ালগ' বা সংলাপপ্রধান এবং ডায়ালগগুলিও বিশেষ ধরণের। তাঁর "Who is Afraid of Virginia Woolf" এই ধরণের একটি বিখ্যাত নাটক। এই নাটকটিতে বর্তমান অত্যাধুনিক জগতের এক বিশেষ শ্রেণীর নর-নারীর (যারা স্বামী-স্ত্রী) 'মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনের মানসিক (দৈহিক ?) অন্তর্দ্বন্দ্ব অপূর্ব নাটকীয়তার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বর্তমানের নাট্যকারদের মধ্যে নাটক রচনায়, প্রয়োজনায়, পরিচালনায় ও অন্যান্যভাবে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র, রতনকুমার ঘোষ প্রমুখ। কলকাতায় এবং মফস্বলে উপরোক্ত নাট্যকারদের নাটক নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা চলছে। এই সব নাট্যকারদের নাট্যরচনার প্রেরণার মূলে আছে "প্রগতিশীল ভাবাদর্শ, প্রচলিত মূল্যবোধের নিগড় ভেঙে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভীপ্সা।"[১৪] এই আদর্শকে সামনে রেখে শুরু হয় নাট্য আন্দোলনের যুগ। নবনাট্য আন্দোলন ও গণনাট্য আন্দোলন নামে দু'টো নাট্য আন্দোলন গোষ্ঠী গড়ে ওঠে এই দুই নাট্য-গোষ্ঠীর ভাবাদর্শকে অনুসরণ করেই অধিকাংশ নাট্যকার নাটক রচনা করতে থাকেন। সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্যের বেদনাময় ছবি, শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্ব ও মানসিক হতাশা, রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্তে আবদ্ধ যুবক সম্প্রদায়, প্রচলিত আদর্শগুলির অসারতা, সমাজের দরিদ্রতম মানুষদের কর্দমাক্ত জীবনচিত্র, সমসাময়িক ঘটনা—ভিয়েতনামসমস্যা, বাংলাদেশসমস্যা, ইত্যাদি বিষয়গুলি অবলম্বন করে বিভিন্ন নাটক রচিত হচ্ছে। সাম্প্রতিকতম নাটকগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় উৎপল দত্তের 'ব্যারিকেড' শম্ভু মিত্রের 'গণ্ডার', এবং 'চৈরোভ্যাকটিল', 'এবং ইন্দ্রজিৎ', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত', মনোজ মিত্রের 'চাকভাঙা মধু', এবং রতনকুমার ঘোষের 'মহাকাব্য', ইত্যাদি নাটকগুলির। উৎপল দত্তের 'ব্যারিকেড' নাটকটিতে বর্তমান কালের রাজনীতির কদর্য ও বীভৎসরূপটি বিদেশী পটভূমিকায় (নাৎসী শাসন) খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের বর্তমান দশকের কদর্য রাজনীতি যুবকসম্প্রদায়কে তথা সাধারণ জনজীবনকে কিভাবে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করে তুলেছে এই নাটকটিতে তারই সার্থক রূপদান করেছেন নাট্যকার। শম্ভু মিত্রের 'গণ্ডার' 'চৈরোভ্যাকটিল' প্রতীকের আধারে সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটিতে একটি সাধারণ যুবকের

(ইন্দ্রজিতের) জীবনের ছবি সহজ সরলভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সাধারণ একটি যুবকের জীবন-কথা অসাধারণ নাট্যরূপ লাভ করায় নাটকটি চরম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' নাটকটি প্রতীক নাটক। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র সঙ্গে যেন বেশ কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। মায়ায় বন্দী জীবন-যৌবন-শক্তি কিভাবে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তা প্রতীকের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শোষিতের সঙ্গে শোষণের প্রতীকী সংগ্রাম। বহুরূপী রাজাসাহেব চরিত্রটি শোষকের মায়াবী রূপ। নাটকটিকে সফল করতে হলে মঞ্চসজ্জা তথা দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রয়োজন। মনোজ মিত্রের 'চাকভাঙা মধু'র প্লটে তেমন নতুনত্ব না থাকলেও কাহিনীটি দর্শকদেরকে বেশ আকৃষ্ট করে। নাটকের প্রধান চরিত্র 'মাতলা' সাপের ওঝা—সুন্দরবন অঞ্চলে তাদের বাস। আরণ্যক আদিমতা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট হলেও তাদেরও হৃদয় আছে। কিন্তু তারা মহাজন সুদ-খোরদের দ্বারা (অঘোর ঘোষ) অত্যাচারিত শোষিত এই সমাজের প্রতিনিধি অঘোর ঘোষকে সাপে কেটেছে মাতলা এবং তার কাকা চায় অত্যাচারী অঘোরের মৃত্যু হোক। কিন্তু যুবতী কন্যার (বাদামী) অনুরোধে মাতলা অঘোরকে বাঁচিয়েছে। পরে অবশ্য বাদামীর হাতেই অঘোরের মৃত্যু হয়েছে। শোষক আর শোষিতের দ্বন্দ্বই হচ্ছে এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। নাটকটিতে সুন্দরবন অঞ্চলের ভাষাও (পাত্র-পাত্রীদের মুখে) ব্যবহার করা হয়েছে। লোভী এবং স্বার্থপর সমাজ নেতারা কিভাবে পরস্পর কলহ করে চরম সর্বনাশ ডেকে আনছেন তা সুন্দরভাবে এ নাটকটিতে দেখানো হয়েছে। যাদুকরের কথামত বরাভয়দাত্রী জগতের কল্যাণরূপী মা'কে বরণ করতে এসেছেন সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু মা যখন আবির্ভূত হলেন তখন মা'কে বরণ করে নেওয়ার জন্য স্বার্থপর সমাজ নেতারা মোটেই উৎসুক নন, তাঁরা কেবল মায়ের কাছ থেকে ধন-সম্পদ হস্তগত করতে চান এবং সেই কলহেই তাঁরা লিপ্ত হয়েছেন। তাই তাঁদের প্রতীক্ষা বিফল হয়ে গেছে, তাঁরা কিছুই পান'নি। মা'কে বরণ করে সুখ-শান্তি লাভ করেছে সমাজের দীন দুঃখীরা। নাটকটির মঞ্চসাফল্য অতুলনীয়। যাদুকর চরিত্রটি লেখকের অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকটির নাটকীয়তা দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

এ ছাড়াও আরও অনেক নাট্যকার রয়েছেন যাঁদের নাটক রীতিমত মঞ্চ-সাফল্য অর্জন করেছে। প্রতিদিন কত কত বাংলা নাটক প্রকাশিত

হচ্ছে। কলকাতায় এবং মফস্বলে একাঙ্ক নাটকের অভিনয় রীতিমত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিভিন্ন জায়গায় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার (যেমন : বাংলার বাইরে—পাটনা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, দিল্লী, ত্রিপুরা। উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে বোঝা যাচ্ছে বাঙালী সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই ধারাটি বর্তমানে কত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে মাঝে মধ্যে কিছু সার্থক নাটক রচিত হ'তে দেখা গেলেও দেশের প্রয়োজন ও চাহিদার অনুপাতে তা পর্যাপ্ত নয়। কাজেই, যদিও একজন নির্ভরযোগ্য রুচিশীল (connisseur—কনিস্যার) নাট্য-পর্যালোচক হিসেবে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারতো, তবু একজন সমাজ ও পরিবেশসচেতন নাট্যরসিক ব্যক্তি হিসেবে আমি অনুভব করছি আমার বক্তব্য শেষ হয়েও হ'ল না। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে : নাটক কি শুধুই বিনোদনের উপকরণ? যেনতেনপ্রকারে দুঃখদীর্ণ কালহরণের জন্যেই এর প্রয়োজন? একটু চিন্তা করলেই আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হব রসোত্তীর্ণ নাটক হ'তে হ'লে তার শুধু কালোত্তীর্ণ হলেই চলবে না। তাকে যুগোপযোগীও হতে হবে। যুগের আশাআকাঙ্ক্ষা, দুঃখবেদনা, সামাজিক ও মানসিক দ্বন্দ্ব, এমন কি বিশেষ বিশেষ ঘটনাকেও উপেক্ষা করতে পারেননি নাট্যকারকুলশ্রেষ্ঠ শেক্সপীয়ার পর্যন্ত। এ যুগেও জনতার শিক্ষার অন্যতম বলিষ্ঠ ও সার্থক মাধ্যম নাটক। তাই নাট্যকার তাঁর নাটকে শুধু যুগের ছবি এঁকেই ছুটি নিতে পারেন না। যুগের সমস্যাকে তুলে ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত ইঙ্গিত রাখবেন সেই সমস্ত সমাধানের অমোঘ পথ সম্পর্কে। যে কোনো শিল্পই কম বেশি প্রচার ধর্মী। সার্থক শিল্পীমাত্রেরই শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা তাঁর কোনো না কোনো সুনির্দিষ্ট বোধজাত বক্তব্য বা বাণী যা তিনি প্রকাশ তথা প্রচার না করে তৃপ্তি পান না, শান্তি পান না। প্রচারধর্মী শিল্পও যে কতো সার্থক হতে পারে তার মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে উল্লেখ করছি আমেরিকান উপন্যাস Uncle Tom's Cabin-এর যার লেখিকা মিসিজ্ হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বীচার স্টো কে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন অভিনন্দিত করেন 'একটা মহান (দাসপ্রথা বিরোধী) যুদ্ধের জন্মদাত্রী'রূপে। আমাদের দেশেও আছে জলন্ত দৃষ্টান্ত—'নীলদর্পণ'।

এ যুগের বাংলা নাটকগুলির আরও যুগোপযোগী হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের হৃদয়ের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে তাদের।

কুয়েকজন মধ্যবিত্ত যুবক বা কিশোরের চিত্তবিকৃতিজাত অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃহত্তর দর্শক-চিত্তপটে তেমন গভীর রেখাপাত করতে পারে না। মানুষ নাটক দেখতে আসে শুধু চিত্তবিনোদনের জন্যই নয়, কোনো মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে, বিত্তদ্ধ জাগরণে অনুপ্রাণিত হবার প্রস্তুতি নিয়েও আসে সে রংগালয়ে। বিচক্ষণ নাট্যকার সেকথা ভালোই জানেন এবং তার সুযোগও নেন। জনমতকে উপযুক্তভাবে জাগ্রত ও সংহত করতে তৎপর হন তিনি। তবে উদ্দেশ্যমূলক নাটক রচনার ক্ষেত্রে একটা বিপদও আছে। অদক্ষ নাট্যকার প্রচারপ্রধান নাটকরচনাকালে প্রচারকৌশলকে আবৃত রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মোটেই সচেতন না থাকায় নাটক রসোত্তীর্ণ হয় না নাট্যকারের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না। এই ধরণের বেশ কিছু অসার্থক নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হচ্ছে আজকাল। তবে এটাও ঠিক, মধ্যে মধ্যে এঁদেরই হাত দিয়ে কিছু কিছু ভাল জিনিসও বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। তবু, সতর্কতার সঙ্গে আরও কিছুকাল অপেক্ষা ও অবেক্ষণ না করে তাঁদের নাম নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়তো সংগত হবে না।

---

১) বা সা ই. (২য় খণ্ড)—সুকুমার সেন

২) বা নাট্য সা ই. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৩) তবে দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' এবং 'সাজাহান' যে রীতিমত সার্থক ও জন-প্রিয় নাটক সেকথা অনস্বীকার্য। এই নাটক দু'টিতে চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিরুদ্ধ ভাবসংঘাত খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

৪) একথা বলা বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটক মেটারলিংকের অনুসরণে রচিত হয়নি। কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রতিশোধে'র (১২৯১) মধ্যেই প্রতীক ব্যবহার করেছেন।

৫) কালের যাত্রা : শঙ্খ ঘোষ

৬) Myth and Modern American Drama

Thomas E Porter – P. 26

৭) ঐ পৃ: ৫০

৮) ঐ পৃ: ১২৭

৯) Indroduction : Arthur Miller's collected plays.

১০) ঐ

১১) ঐ

১২) "The aim of Stanislavsky to make audiences forget they were in a theatre. That of Brecht was to remind them every possible means, ... "

Mid Century Drama Laurence Kitchin. P. 72

১৩) "Brecht's subject matter, more even than his technical influence, has an international appeal because it touches at so many points on the conflicts of divided world." Ibid. P. 73

১৪) 'চতুষ্কোণ' : মাঘ, ১৩৮০, সাহিত্যসমাচার : নারায়ণ চৌধুরী

নকশা

একটি অবাস্তব বস্তু

ডাবলু মুখোপাধ্যায়

বাসে ফিরছিলাম।

আমার সহযাত্রীদের একজন অর্ধশিক্ষিত, কিন্তু সুরসিক, এক গ্রাম্য মুরুব্বি। অন্যজন কোনো বুনিয়াদী কলেজের এক অধ্যাপক। মুরুব্বি তাঁকে 'অর্ধপক্ব' বলে সম্বোধন করছিলেন। কেন, তা পরে তিনি সভাষ্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

মুরুব্বি বললেন : বুলো তো হে অর্ধপক্ব, কুন্ দ্যাশকে পরাধীন বুলবো ?

অধ্যাপক বললেন : মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন (ব'লে নিজের ফোলিয়ো ব্যাগ থেকে 'চেতনিক'-এর একটি সংখ্যা বের ক'রে তার এক জায়গা প'ড়ে) : 'যে দেশের রাজা অন্যদেশের সিংহাসনে আরূঢ় এবং অন্য দেশবাসী. সেই দেশ পরতন্ত্র।'

মুরুব্বি বললেন : তা হলে কও দেখি আমাদের দ্যাশের রাজা কে ?

অধ্যাপক বললেন : আমাদের দেশে তো রাজা নেই। গণতন্ত্রে রাজা থাকতে নেই.........।

তাঁর কথাটা লুফে নিয়ে মুরুব্বি বললেন : 'ও, তাই বুঝি তাদের আমাদের বাণী ? তা বেশ, তা বেশ ! তা বাণী কুন্ হ্যাদের মেয়্যামানুষ বুলো তো অর্ধপক।

অধ্যাপক : কেন, এই দেশেরই। ভারতবর্ষ নামক বিশাল দেশের কোনো এক স্থলে তাঁর বসবাস—

—'স্থলপদ্মের মোতুন।' মুরুব্বি বলেন।—'তা দেখতে এ্যাই হ্যাদেরই মানুষের মোতুন তো ?'

অধ্যাপক বললেন : হ্যাঁ, নাকমুখ সব একটা করেই, চোখকানও দুটো করেই। কাজেই এই দেশের লোকের মতোই।

'ঠিক বুলছো তো হে অর্ধপক ?' বললেন মুরুব্বি। একটু থতমত খেয়ে অধ্যাপক বললেন : না, আমাদের দেশের লোকদের নাকটা উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিত চাপা, চোখদুটো ঈষৎ ঘোলাটে। কিন্তু বাণীর নাকটা টিকলো, চোখদুটো উজ্জ্বল। যেন বহুদূর পর্যন্ত কী দেখে নিতে চাইছে।

মুরুব্বি বাধা দিয়ে বললেন : হ্যাঁ, সব দেখেশুনে 'নিতে' চাইছে। খুব হুঁশিয়ার বেটি আমাদের, কিছু দিতে চাইছে না হে। তা কী খায় গো তিনি ?

— কবি দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'মুরগীর পেটে মুরগী লাগিয়ে' খোয়েন।

— কিসে চড়েন ?

—মানে ?

—মানে, মাঠে কি ঘাটে তা জানতে চাহাছিনা। বুলছি এ্যাই ক্যাম্নুন-ক্যাম্নুন গাড়ি ঘুড়ায় চড়েন, এ্যাই আর কি।

—তা এক শাড়ের তো আর ব্যাপার নয়। চড়েন ট্যাকসিতেই। না, ঠিক হ'ল না নিজের চাওয়া গাড়িতে। তবে পেট্রোল দুষ্প্রাপ্য হলে সেবার লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি একদিন অশ্বযানে সংসদভবন প্রয়াণ করেছিলেন।

—কী পরেন গো তিনি হ্যাহে ?

—রেশমি, টেরিলিন এইসব।

—এ্যাই হ্যাদের লোকের সাথে ত্যানার সম্পর্কটা ক্যাম্নুন ?

—খুব মধুর সম্পর্ক। যথা তিনি বলেন এই দেশের লোককে তিনি টাকায় এককিলো চাল খাওয়াবেন, টাকা লিটার কেরোসিন জোগাবেন। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমাবেন। কমাবেনই। কারণ যে আমি শিক্ষাগত্তে কাগজের দর বাড়িয়ে চলতে পারছেন মহাজনদের উস্কে দিয়ে তাতে বইখাতার দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ শিক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও অনেক

নীচে নেমে যাবে। মোদ্দা কথা হলো, সারা পৃথিবীতে ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এমন নেতা বা নেত্রী আর দু'টি নেই। আমরা তাঁর জন্য গর্বিত।
—তাই বুদ্ধির ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামিয়েই বুঝি গাল দু'টার এ্যাই হাড়ির হাল।
তাকিয়ে দেখি অধ্যাপকের গালে দু'জায়গায় ব্লেডের সূক্ষ্ম ক্ষতচিহ্ন।
—তাইলে আমি বুলি হে, তুমরা যারা পড়া লিখা ক'র্যা পণ্ডিত মোশ্ভি হও ত্যানাদের মোগ্‌জকের ভিরেনটা ঠিক পুরা হয় না। তাইলেই তুমরা দেখ্যাও দ্যাখো না শুন্যাও শুনো না। তুমাদের মোগ্‌জকের প্যাটের ভিতর খালি ভুট ভাট্‌ মুট্‌ফাট্‌। তাইলে তুমাকে বুলি হে অর্ধপক্ক : খালি প্যাটে ভুটের ফুটানিতে তুমাদের নেশা জমে ভালো, কিন্তুক আমাদের মোতুন চাষা-ভুষাদের প্যাটে খালি মুচোড় মারে, খালি মুচোড় মারে হে।
এতোক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাছাকাছি ক'জন আমরা শুনছিলাম এই 'ষাট' আর 'ষষ্ঠীর ধন'-এর কলজে ভেদী কথোপকথন গন্তব্যস্থল এসে পড়ায় অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বাস থেকে নামলাম। বাড়িমুখো হাটতে হাটতে ভাবছিলাম : স্বচ্ছ বুদ্ধি নামক বস্তুটা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তার বাইরেই ওটা থেকে এবং খোলে ভালো। এলিয়ট সাহেব বলেছেন : 'Much learning deadens or perverts poetic sensibility' আমার মনে হয় শুধু কাব্যানুভূতিই নয়, কাণ্ডজ্ঞানকেও বিনষ্ট বা বিকৃত করে দেয় সমাজ-চেতনাহীন অতিবিদ্যা।

গল্প

চো র

পল্লব সেনগুপ্ত

হেডমিস্ট্রেস্ স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন দুজনের দিকেই। ওরা কোনো জবাব দিলনা এবারও. দাঁড়িয়েই রইল মুখ নিচু করে। পর্দার ওপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে কয়েকটি মুখ, বড়দিদিমণির চোখে চোখ পড়লেই সরে যাচ্ছে আবার। অঙ্কের টিচার অঞ্জলিদির মুখ অন্যদিনের থেকেও বেশি গম্ভীর, আর ক্লাস ইলেভেন বি'র সেই চারটি মেয়ে—যাদের ব্যাগে খাতাগুলো টিফিনের ঘণ্টা পড়ার আগে অবধি ছিল, তারা বিরক্ত মুখে তাকিয়ে থাকল ঝর্ণা আর দীপালি নামে তাদেরই সহপাঠিনী ঐ দুই আসামীর দিকে। বৃদ্ধ হেডক্লার্ক অনিলবাবু একবার পর্দা ঠেলে বাইরে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারা-মেয়েগুলোকে ধমকে এলেন সম্ভবত এই থমথমে অসহ্য চুপচাপ ভাবটাকে কাটাবার জন্যেই

"তা হলে বলুন অঞ্জলিদি কি করবেন এদের নিয়ে?" হেডমিস্ট্রেসের প্রশ্ন, "কি সাজেষ্ট করছেন আপনি আজ ক্লাস-টিচার?"

"কি বলব।" অঞ্জলিদির গলায় নৈর্ব্যক্তিক স্বর, "যা করার আপনিই ডিসাইড্ করুন। এটা ত ক্লাস ডিসিপ্লিনের কোনো ব্যাপার না, গোটা স্কুলের সুনাম-দুর্নামের বিষয়—"

সুনাম দুর্নাম। হাঁ, তা আছে বৈকি সুনাম এ স্কুলের। দুচারটে স্কলারশিপ, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা ফার্ষ্ট ডিভিশন, আর মাঝে মধ্যে এক আধটা স্ট্যান্ড এই স্কুলের পক্ষে প্রায় নিয়মিত ব্যাপারই বলা চলে। ডিসিপ্লিনের খ্যাতিও আছে, ফলে গোটা শহরজুড়েই কি সকাল-বিকেল এ স্কুলের নাম লেখা বাস-গুলোকে ঘুরতে দেখা যায়। সুতরাং এই স্কুলের ইলেভেন-বি'র ছাত্রী ঝর্ণা দত্ত আর দীপালি বাহা টিফিনের সময় ক্লাসে ঢুকে খাতা চুরি করে পালাবার সময়ে ধরা পড়বে এবং এতবড় গুরুতর ব্যাপারটা নীহারকণা দত্তের মতো রাশভারী হেডমিস্ট্রেস ক্ষমা করে দেবেন—এ ত ভাবাই যায় না।

"তাহলে তোমরা স্বীকার করছ যে তোমরা ওদের খাতা চুরি করেছ?" কঠিন মুখে প্রশ্ন করেন নীহারদি। ওরা মুখ নিচু করেই দাঁড়িয়ে থাকে

চুপচাপ। উসখুস করে অন্যমেয়েগুলি: তাপসী, মৃত্তা, মল্লিকা আর বিদিশা। ওদের কেমন নিজেদেরকেই অপরাধী বলে মনে হয়।

"জবাব দাও। চুপ করে থাকলে রেহাই পাবে ভেবেছ? জবাব দাও, চুরি করেছ কি-না?"

দীপালি মুখ তোলে এতক্ষণে। শীর্ণ দু'গাল বেয়ে জল নেমে আসছে নিঃশব্দে উপ্‌চে উপ্‌চে। স্বর্ণার মুখখানা দেখা যাচ্ছেনা, কিন্তু সেও যে কাঁদছে, সেটা তার অপুষ্ট পিঠ কাঁধের মৃদু কাঁপুনি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

"হ্যাঁ।" প্রায় অস্ফুট গলায় উত্তর দিল দীপালি এতক্ষণ পরে "আর তুমি?" আরেক আসামীও ঘাড় নেড়ে স্বীকার করে অপরাধ। বড়দিদিমণির মুখ লাল হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে, অঞ্জলিদির চোয়াল আরও শক্ত। অনিল বাবু দম বন্ধ করে ওপরে তাকিয়ে থাকেন। এই মুহূর্তে কিঁইচ-কিঁইচ শব্দ করে ঘুরতে থাকা পাখাটার চেয়ে মনোযোগ দেবার যোগ্য জিনিষ যেন আর কিছু নেই বলে মনে হতে থাকে। তাপসী, মল্লিকারা যেন ছুটে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচত দম ফেলে।

"কেন?" প্রাণপণে চেষ্টা করছেন নীহারদি গাম্ভীর্য বজায় রাখতে। "ওদের খাত' চুরি করেছিলে কেন?"

কেন। জলে বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দীপালির দুই চোখের সামনে স্পষ্ট দুশ্যমান হল ওদের ব্‌স্তির দুই দুর্গা পিতুরী লেনের একতলার প্রায়-অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে আরশোলা-সঙ্কুল ঘর দুখানা। স্বর্ণার মনে পড়ল ওর মায়ের কণ্ঠার ওপরে বসানো শীর্ণ মুখখানা যা মাত্র আটত্রিশ বছরেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সব বলিরেখায় কীর্ণ। দীপালিদের রেডিও নেই, উল্টোদিকের মনীষাদের বাড়িতে গিয়ে ও রেডিওর নাটক শোনে। এক্ষুণি এই বনমালা সরকার উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দোতলায় বড়দিদিমণির ঘরে ফ্যানের তলায় দাঁড়িয়ে ঘামতে ঘামতেও ওর মনে হল মনীষাদের রেডিওটাই তীব্র স্বরে বেজে চলেছে। স্বর্ণা ওর খিটখিটে, রুগ্ন, ক্লান্ত মায়ের অস্তিত্বটাই খুঁজতে চেষ্টা করল যেন পিছনের পর্দার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। এতক্ষণের মধ্যে ওর এই প্রথম মুখ তোলা।

রাস্টিকেশন-অর্ডার লেখবার জন্যেই সম্ভবত নীহারদি প্যাড টেনে নিয়ে ফাউন্টেন পেনের ক্যাপটা খুললেন। স্কুলের এত বছরের অর্জিত সুনাম তছ্‌নছ্‌ হয়ে যাবে এরকম বদমাইস মেয়েরা ক্ষমা কিংবা প্রশ্রয় পেলে।

এইসব মেয়ে! একদিন এরাও মা হবে। কি শেখাবে ছেলে মেয়েদের!

হঁ ! তোদের ছেলে-মেয়েরা চোরই হবে। ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় নীহারকণার মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে। ফেটে পড়েন এইবার ধৈর্যহারা হয়ে :

"উত্তর দাও ! বদমাইশ মেয়ে ! কেন চুরি করেছ খাতা ?" কলমধরা হাতটা সম্ভবত প্রচণ্ড রাগের চাপেই একটু একটু কাঁপতে থাকে। কলমের নিবটার দিকে তাকিয়ে দীপালির মনে হল ওটা যেন একটা বর্শার ফলা, আর ও নিজে যেন একটা বুনো খরগোস, কিংবা হরিণ কিংবা ঐ রকম একটা কিছু। নীহারদিকে ওর মনে হতে লাগল প্রাগৈতিহাসিক এক ব্যাধ নারী বলে। মনীষাদের রেডিওতে কি ঝড়ের শব্দ হচ্ছে ? টেবিলের টেলিফোনটা কি তীব্র-স্বরে ঝনঝন করে উঠল ? পর্দার ওপাশের মেয়েদের মৃদু গুঞ্জন এরকম হুঙ্কারের মতো শোনাচ্ছে কেন ? ঝর্ণা কি দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে ওকে একা শিকারীর বল্লমের মুখে ফেলে ?

"বল জবাব দাও, বল বড়দিদিমণিকে।" অনিলবাবুর কণ্ঠস্বরে কি একটু সহানুভূতি মেশানো আছে ? অল্প একটু মমতা ? যার ছোঁয়ায় মেয়েটা এত ক্ষণ চুপচাপ থেকেও, এবারে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল ?

"নীহারদি" পর্দা ঠেলে ইংলিশের টিচার স্বপর্ণাদি ঘরে ঢুকেছেন। "বল ?" বড়দিদিমণি তাকান ওর দিকে : "কিছু বলবে ?"

* * * *

স্বপর্ণাদি যা বললেন তা হল এই : গত দু'সপ্তাহ ধরে দীপালী আর ঝর্ণা হোমটাস্ক আনছেনা ওর ক্লাসে। গোড়ারদিকে দুয়েকদিন কিছু না বলেও মাঝে একদিন উনি প্রচণ্ড রাগারাগি করেন, বাড়িতে চিঠি দেবার ভয় দেখান। গতকাল আবার ওর ক্লাস ছিল—কালও সেই একই ব্যাপার। দুজনকেই ক্লাস থেকে বার করে দিয়েছিলেন উনি টাস্ক না করে আনার জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন সামনের দিন খাতা না আনলে ক্লাসে ঢুকতে দেবেন না সামনের দিন অর্থাৎ আসছে কাল। ইতিমধ্যে এই ঘটনা।

অঞ্জলিদির চোয়াল এর মধ্যে নরম হয়ে গেছে। বড়দিদিমণি চশমা খুলে রেখে চোখ বুঁজে শুনছেন। তাপসী মল্লিকারা অস্থির হয়ে অনিলবাবুকেই ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করে ওরা চলে যেতে পারে কি না দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অনিলবাবু নিজেই ঘরের বাইরে যান। পিছন পিছন ওরা চারজন। দাঁড়িয়ে থাকে শুধু দুই আসামী। একটু আগের ডুকরে ওঠা কান্নাটা এখন বন্ধ।

সুপর্ণাদি হয়ত আরও কিছু কথা বলবেন ভাবছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নীহারকণা মুখ তুললেন :

"খাতা ছিলনা তোমাদের ?" নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে দুজনেই পুতুলের মতো।" বাড়িতে বলনি কেন খাতা লাগবে ?" কথাটা বলেই হেডমিস্ট্রেস বুঝতে পারলেন ঠিক হলনা প্রশ্নটা। এতক্ষণ রাগের মাথায় খেয়াল হয়নি, ওদের দিকে ভাল করে তাকাতেই নজরে পড়ে যে, এইমাত্র যে চারজন মেয়ে ঘরের বাইরে গেল তাদের সঙ্গে এদের দুজনের স্বাস্থ্য, চেহারা, পোষাক সব কিছুরই তফাৎ আছে। গাঢ় সবুজ পাড় সাদা শাড়ি রত্নমালা ইস্কুলের বড় মেয়েদের ইউনিফর্ম, এদের দুজনের বাঁ-কাধে ইস্কুলের নামলেখা ব্রোচ দুটো আছে বটে, কিন্তু শাড়ির পাড়গুলোকে এখন কষ্ট করেই সবুজ বলে বুঝতে হয়। তাপসী, বিদিশাদের মতো পাটভাঙ্গা ত নয়ই, বরং বোঝাই যায় অন্তত পাঁচ-ছদিন ধরেই পরা হচ্ছে। শীর্ণ, শুষ্ক, কয় কালো মেয়েদুটোর ভয়ার্ত করুণ মুখ দুটোর ঠিক পাশেই লাল-সোনালি সিল্কের ছাপা শাড়ি পড়া সুপর্ণাদির ফর্সা মুখখনাকে অসম্ভব বেমানন্ লাগছে।

"সুপর্ণা তুমি বোসছ না কেন ? বোস।" হেডমিস্ট্রেস আপ্রাণ চেষ্টা করেন সহজ হবার জন্যে। কি ভেবে ওদের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তোমরাও বোস।"

হকচকিয়ে পরস্পরের দিকে চায় দীপালি আর স্বর্ণা। এ কি সেই নীহারদি যিনি সেদিনও স্রেফ্ ধমকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন এ অঞ্চলের বিখ্যাত মাস্তান কাবুল গাঙ্গুলীকে, আর সোজা আঙুল উঁচিয়ে গেটের ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার 'যুগ যুগ জিও' ধ্বনির তোলা সাঙ্গোপাঙ্গদের। কাবুল কেন, নীহারকণার ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়াতে পারেন এমন কোনো মানুষের কথা এ ইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত কেউই মনে করতে পারেন না। উঁচু ক্লাসের ফাজিল মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, উনি নাকি স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেও মাঝে মাঝে "সাইলেন্স, ছাট আই ওয়ান্ট" বলে ধমকে ওঠেন! এটা খুব সম্ভব ফাজিলগুলোর বানানো, তবে খোদ সেক্রেটারীও যে ওঁকে সমঝে চলেন, তার পরিচয় বহবারই পাওয়া গেছে।

সেই নীহারকণা। ওরা ঠিক নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভীতু চোখে সুপর্ণাদি অঞ্জলিদির দিকে তাকায়, অঞ্জলিদির ইঙ্গিতে ওরা খুব আস্তে আস্তে বসে। যেন চেয়ারের আওয়াজ হওয়াটা খুব বড়গোছের একটা

অপরাধ হয়ে যাবে।

"তোমার রোল নাম্বার কত?" বর্ণার উদ্দেশে কথাটা ছুঁড়ে শুধোন বড়দিদিমণি।

"বাইশ।"

"আর তোমার?"

"সাত।"

খস্ খস্ করে কি সব লেখেন উনি। বেল বাজাতে জগৎপ্রসাদ এসে ঢোকে। স্লিপটা হাতে দিয়ে বলেন "রবিবাবু।"

ক্যাশিয়ার রবিবাবু খাতাপত্র দেখে যা বলে গেলেন তার মূল বক্তব্য হল: বর্ণার মার্চ থেকে মাইনে বাকী, আর দীপালীর জানুয়ারী থেকেই। ওর সেকশন চার্জও দেওয়া নেই। খাতায়ও নাম নেই মাসছয়েক ধরে। সেটা ক্লাসটিচার অঞ্জলিদিরও মনে পড়ল এখন।

বোধহয় এই প্রথমবার বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন জীবনে নীহারকণা দত্ত এম এস. সি, বি. টি, ডিপ. ইন এড. (এডিন.)। কি করবেন এখন উনি নিজেই স্থির করতে পারছেন না। বিবেকের সঙ্গে আপোষ? না-কি ডিসিপ্লিন-ইনডিসিপ্লিনের প্রশ্ন ভুলে মানবিক দিক দিয়ে বিষয়টার ফয়সালা?

নিজেই ভাবলেন, চিন্তাটা খুব কেতাবী হয়ে যাচ্ছে অঞ্জলিদি অনেকদিনের টিচার, নীহারকণার রিটায়ারমেন্টের পর উনি হেডমিস্ট্রেস হলেও পারেন—ওঁকে বলা যায় কথাটা। কিন্তু এই মেয়ে দুটোর সামনেই? নাঃ, সেটা হয় না।

"তোমরা দুজনে বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।" কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল ওদের। এতক্ষণ যা হচ্ছিল, হচ্ছিল—আবার ঘরের বাইরে যাওয়া মানেই সাতশো মেয়ের চোদ্দশো চোখের সামনে.. ......। টিফিনের ঘণ্টা এখনো ফুরোয় নি..... মুখে মুখে ইস্কুলময় নিশ্চয় চাউর হয়ে গেছে। জোড়া জোড়া চোখে সবাই ওদের দেখবে......। দুর্গা পিতুরী লেনের কত মেয়ে পড়ে এখানে। দীপালি ভাবল। বর্ণার ঠিক পাড়ার মেয়ে এখানে কেউ না পড়লেও, ওর মামার বাড়ির পাড়ার বেশ কিছু মেয়ে এই ইস্কুলের ছাত্রী। অনেকেই চেনে ভাল করে।

কিন্তু বেরোতেই হবে। বড়দিদিমণির কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেটা কাজে

পরিণত হওয়াই এই ইস্কুলের নিয়ম। পর্দার ওপারে ওরা ফিরে যাবে ধীরে-ধীরে।

•

অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস মীরাদি এবং আর সব সিনিয়র টিচাররা চমকে উঠলেন স্বর্ণাদির মুখে বড়দিদিমণির সিদ্ধান্ত শুনে। নীহারদি কি পাগল হয়ে গেলেন? সরকারী গ্র্যান্টের ওপর নির্ভর করে যে ইস্কুলকে সারা বছর চলতে হয়, সেই ইস্কুলে এমন কাণ্ড ঘটবে? আর ঘটাবেন স্বয়ং নীহারকণা দত্ত, যিনি আটচল্লিশ ঘণ্টা বাংলা-বন্ধ হয়েছিল যেবার, সেবারে দারোয়ান পাঞ্জিরা আর বেয়ারা জগৎপ্রসাদকে নিয়ে একা এত বড় ইস্কুল বাড়িতে দুটো দিন কাটাতে চেয়েছিলেন, পারেননি নেহাৎ সমস্ত টিচারের সমবেত বাধা কিংবা অনুরোধ কিংবা উত্তরেরই ফলে। সেই বড়দি কি-না বলেছেন, সস্তা-দরে খাতা-কাগজ-বই কেরোসিনের দাবীতে ছেলেরা সামনের হপ্তায় যে স্ট্রাইক ডেকেছে তিনি তাতে বাধা দেবেন না, বরং স্ট্রাইকের পরদিনও ইস্কুল খোলা না রেখে সমস্ত মেয়েদের নিয়ে রাইটার্সে যাবেন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে!

সেদিন টিফিনের ঘণ্টা ফুরোলে দেখা গেল আরও একটা অভাবনীয় দৃশ্য। দোতলার সিঁড়ির মুখে ঝর্ণা আর দীপালী নামে ইলেভেন-বি'র খাতা-চোর সেই মেয়েদুটোকে বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে এবং নিঃশব্দে কেঁদে চলেছেন একজন। তাঁর নাম নীহারকণা দত্ত। পেছনে দাঁড়িয়ে আরও চারটি মেয়ে: তাপসী, রত্না, মল্লিকা, বিদিশা। তাদের চারজোড়া চোখও ত টাপু-টাপুর বানভাসি হলে মনে হল যেন সিঁড়ি-দিয়ে-উঠতে-থাকা মেয়েগুলোর সবায়েরই।

বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গে

ডঃ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিংশ শতকের তিনের দশকে বাংলা সাহিত্যে যে সব কথাশিল্পীর আবির্ভাব বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। কালক্রমে তিনি কল্লোলীয় কিন্তু মানসধর্মে তিনি ভিন্ন গোত্রের। বায়রণ বলেছিলেন, I awoke one morning and found myself famous.' পথের পাঁচালী প্রকাশের পর বিভূতিভূষণও অনুরূপ উক্তি করতে পারতেন।

পথের পাঁচালী বাঙালী উপন্যাসপাঠকদের অপার সন্তোষ দিয়েছে। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতা নিয়েও পুরনো ভিক্টোরিয় মূল্যবোধের জগতে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বেই প্রচলিত ন্যায়-অন্যায়, শিব সুন্দরের ধারণার ভিতে সংশয়ের ফাটল ধরা পড়ছিল। বিশ-ত্রিশের দশকের ত্রিশঙ্কু মধ্যবিত্তের দ্বিধা—একদিকে শহরে শিক্ষার আদর্শ, দেশাত্মবোধ, সত্যাগ্রহ, সন্ত্রাসবাদ, সমাজতন্ত্র, অন্যদিকে চিরন্তনী বন্দোবস্তের উপস্বত্বের পিছুটান শরৎসাহিত্যে লক্ষণীয়। সেজন্যই বোধহয় কল্লোল-গোষ্ঠী মোহিতলালকে অগ্রজ যুগপ্রতিভূ কবি রূপে এবং শরৎচন্দ্রকে কথাশিল্পী রূপে মর্যাদা দিয়েছিল।

অথচ শিল্পচেতনায় কল্লোল-লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কি সুগভীর পার্থক্য। আবার একথাও সত্য, শরৎ চন্দ্রের উত্তরাধিকার থেকেই কল্লোলীয়-দের যাত্রা সুরু। অচিন্ত্য প্রেমেন শৈলজানন্দ মানিকের মত বিভূতিভূষণের কথা সাহিত্যেও ভাবশরীরে শরৎচন্দ্র উপস্থিত। তারাশংকরও এর ব্যতিক্রম নন।

কিন্তু কোন শিল্পীই হুবহু আর-একজনের মত হন না। হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধি এবং পর্যবেক্ষণের ভঙ্গি একই দেশ-কালচিহ্নিত দুই শিল্পীর রচনায় ভিন্ন স্বাদের হতে বাধ্য। বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে কোন তীব্র উত্তেজক উদ্দীপক ভাবধারা, কোন কালাপাহাড়ী বিদ্রোহ আনেন নি। অত্যন্ত শান্ত মৃদু কোমল স্বাদের এমন এক প্রসন্নতা নিয়ে এলেন যা বাংলা সাহিত্যে অভাবিতপূর্ব অথচ আমরা রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই পেয়েছিলুম :

'আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম ; দেখলুম, এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।

যতকাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটিমাত্র ধূলিরেখায় সংক্ষিপ্ত করে এঁকেছে, সেই একটি রেখা চলেছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আর-এক সোনার সিংহদ্বারে।'

(আশ্বিন ১৩২৬ : পায়ে চলা পথ) পাঠান্তেই মনে পড়ে পথের পাঁচালীর উপসংহার।

দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে মাস বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়...তোমাদের মর্মর জীবনস্বপ্ন-শেওলা-ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুরায় না... চলে · চলে · চলে এগিয়ে চলে ·

অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ ..

এমন কি 'অনির্বাণ' বিশেষণটিও রবীন্দ্রানুসরণ। একটি কাব্যশর্মী ক্ষুদ্রগদ্যরচনায় যে-মহাশিল্পের ইঙ্গিত ছিল, পথের পাঁচালী অপরাজিত (সাধারণ অর্থে বিভূতিভূষণের রচনাসমগ্র) উপন্যাসে তারই পূর্ণায়ত প্রকাশ ঘটেছে। সেদিক থেকে সমকালীন কথাশিল্পীদের মধ্যে একমাত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বিশেষ অর্থে নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রপথিক। শরৎচন্দ্র নিজে বলেছেন, নষ্টনীড়-চোখের বালি তাঁর প্রেরণার উৎস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের গদ্যোপন্যাসে শরৎচন্দ্রীয় ছক পরিস্ফুট, শৈলজানন্দ গল্প-গুচ্ছের প্রদর্শিত পথেই পল্লী ও শহরতলীর সমাজকে দেখেছেন। কিন্তু কাব্যে মানসিকতায় কবি রবীন্দ্রনাথের আত্মীকরণ ঘটেনি। একমাত্র কথাশিল্পী বিভূতিভূষণই রবীন্দ্রনাথের নিসর্গভাবুকতা, নিসর্গকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিকতার সার্থক উত্তরসাধক। কবিদের মধ্যে অনেকেই রবীন্দ্রনিসর্গভাবুকতার পথিক হয়েছেন, কিন্তু গল্প-উপন্যাসে একা তিনিই রাবীন্দ্রিক অর্থে নিসর্গ রসিক। এ ক্ষেত্রে কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথও তাঁর সঙ্গে তুলনীয় নন।

কিন্তু তাতে কি কথাশিল্পরূপে বিভূতিভূষণের উপন্যাসের মূল্য বেড়েছে ? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। সেই প্রথম প্রকাশের সময় থেকে আজও যার জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন, সেই পথের পাঁচালীর অমরতায় সন্দেহ করবে কে ? আপন সত্তার জোরেই কালপরিবর্তনের মধ্যদিয়ে পাঠকের রুচিবদলের পরও তার মর্যাদায় সমান রয়েছে। এর কারণ যদি শুধু লেখকের নিসর্গচেতনায়

খুঁজে পাওয়া যেত, তাহলে সোনার তরী চিত্রা-বনবাণী পূরবীরও অনুরূপ জনচিত্তহারিতা স্বীকৃতি পেত।

যে আগ্রহ নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক ছোটদের রূপকথা বলেন, তার সবটাই বাৎসল্যনিষিক্ত নয়, সকলেরই মনে মনে হারানো শৈশবের জন্য বেদনা আছে, অজ্ঞাতসারে সেই জীবনসংগ্রামহীন শৈশবে ফিরে যাবার অবকাশ করে দেয় রূপকথা। পথের পাঁচালী যদি মহাকাব্য হয়, তবে তা অনুরূপ Nostalgia-র মহাকাব্য। এদেশে শিল্পবিপ্লব এখনো সমাধা হয়নি, তাই আমরা কেউ পাশ্চাত্য অর্থে খাঁটি নাগরিক নই। আধুনিক 'City-Novel' তাই আমাদের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নয়। গ্রাম ছেড়ে-শহরে-আসা মানুষদের কাছে গ্রাম সবপেয়েছির দেশ, সেখানে আছে স্বাচ্ছন্দ্য, প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য, মানুষগুলি অত্যন্ত সরল, এ এক স্বপ্নের গ্রাম, বাস্তব নয়। রোমান্টিক মায়া-কাজলের চোখে বলা সহজ—'বড় ভাল লাগে আমার পাড়াগাঁয়ে বাস।' বিভূতিভূষণের অপূর্ব স্রষ্টার কাছ থেকে সেই স্বপ্নাঞ্জন চোখে নিয়েই আবির্ভূত। তাই হরিহরের কষ্টের সংসার, মার নির্লিপ্ত গার্হস্থ্যব্রত, ইন্দির ঠাকরুণের শোচনীয় মৃত্যু, দারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্গা, হরিহর, লীলা, সর্বজয়া ও অপর্ণার মৃত্যু—সবই পর্যবেক্ষকের মত অপু দেখে গেছে, কখনো পুলকে উল্লসিত বা বেদনায় অভিভূত হয়নি। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে মৃত্যু আছে, মৃত্যুশোক নেই। তাঁর মতই নায়ক অপু 'আস্বাদনপন্থী,' বিশ্লেষণপন্থী নয়।

নিশ্চিন্দিপুরের অপু কাশীতে একটু বদলেছে। তারপর মনসাপোতা, কলকাতা, চাঁপদানী আবার নিশ্চিন্দিপুর। অপু যে শেষ পর্যন্ত প্রাপ্তমনস্ক হতে পারলনা এতে উপন্যাসের চরিত্ররূপেই তার মহিমা খর্ব হল। কাজলকে নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরের প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্য—(১) বাইরের পৃথিবীর সংঘাতে সে আহত, তার মুখোমুখী হতে একান্ত অনাগ্রহ, ২) ছেলে কাজলকে অপু নিজের শৈশবস্বর্গেই প্রতিষ্ঠা দিতে চায়, বাইরের পৃথিবীতে ছেড়ে দিতে নারাজ। অর্থাৎ এক প্রয়াসে দুই অর্থে অপুর শৈশবে প্রত্যাবর্তন। নিজে সে ফিরে এসে জীবনের সয়ে পৌঁছল, কাজলকে সেই শৈশবতীর্থে পৌঁছে দিয়ে নতুন করে নিজেকেই সে প্রতিষ্ঠিত করল।

শ্রীকান্ত তিনপর্বের (চতুর্থ পর্ব এক্ষেত্রে তুলনাযোগ্য নয়) কাহিনীতে পর্যটক শ্রীকান্ত, অন্নদাদিদি, নিরুদিদি, ইন্দ্রনাথ, নতুনদা, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কমললতার সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। যেহেতু শ্রীকান্ত-কাহিনী স্মৃতিচারণামূলক,

তাই পূর্বাপর অভিজ্ঞতার বিশদ বর্ণনা নেই। কিন্তু কিশোর ও যুবক শ্রীকান্ত যে অভিজ্ঞতার ধরতাপে অনেক বদলেছে, তার ইঙ্গিত আছে। শ্রীকান্তকেও জীবনসংগ্রামে পলাতক বলা যায়। কিন্তু তার গভীর সংবেদনা এবং বিশ্লেষণ-প্রবণ ভাবুকতা তাকে উপন্যাসের চরিত্ররূপে বিশিষ্টতা দান করেছে। অভয়া অন্নদা এক ধাতুতে গড়া, অভয়া ভিন্ন ধাতুর। এই বিচিত্র জীবন-ধারণায় শ্রীকান্তের ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বলতর হয়েছে, তার জীবনোপলব্ধি অভিজ্ঞতায় ও মননে প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করেছে। বিভূতিভূষণের অপু কাজল জিতু কুশল পাহাড়ী কারও সম্পর্কেই তা বলা যায় না। তারা সকলেই নিসর্গরসিক, পরা প্রকৃতির রহস্যময় টানে দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি ভুলে যায়, সর্বদা অন্তঃকর্ণে শোনে 'কি যেন মহান গীতি বাজিতেছে সমস্বরে'।

আদর্শ হিন্দু হোটেল উপন্যাসের প্লট ও পরিবেশ দুঃখদারিদ্র্য জীর্ণ সমাজ এবং বিচিত্র মানবচরিত্রাংকন দাবি করে। কিন্তু এও যেন এক বাস্তবতার রোমান্স। হাজারীঠাকুর যেন রোমান্সের সেই পরমহংস, সংসারের গ্লানিময় সরোবরে বিচরণ করলেও তার অনায়াসে কোথাও কর্দমস্পর্শ ঘটে না, স্বপ্নের কৈলাসে হাজারী ঠাকুরের মন মুক্তি পায়। 'বনে-পাহাড়ে' থেকে 'দেবযান' প্রকৃতির হাত ধরে পরা প্রকৃত লোকে উত্তরণ। দুর্গার হাত ধরে অপু যখন শৈশবে বেরিয়ে পড়েছিল প্রকৃতিকে জানতে, তখনই এই নিসর্গযাত্রার সূচনা।

সেজন্যেই বিভূতিভূষণের প্রথম রচনাই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। কথাটা শুনতে ভালো, আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসাসূচক। কিন্তু সত্যি কি এটা Compliment? প্রথম রচনায় থাকে লেখকের অভীপ্সা, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক পর্যবেক্ষণ। কিন্তু সে অভীপ্সার সঙ্গে অভিজ্ঞতার পাক হয় ধীরে ধীরে, পর্যবেক্ষণও পরিণতি লাভ করে। তাঁর জীবন-অন্বেষা জীবনজিজ্ঞাসাকে ভেঙে ভেঙে গড়ে, নতুন পরিধি দান করে, পুরনো ধারণার রূপ-রঙ বদলায়। তবেই তো একটি সাহিত্যকীতির প্রশংসার পরেও আবার রচনার আন্তর তাগিদ আসে। এ জীবন লইয়া আমি কি করিব?—এ প্রশ্নের উত্তরসন্ধান জীবনে ও শিল্পে নতুন সম্ভাবনার জন্ম দেয়। এই মহতী অতৃপ্তি বিভূতিভূষণে ছিলনা। ছিল না বলেই বিভূতিভূষণের শিল্পীমানসের বিকাশ বিবর্তন নেই। হার্ডি ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ দুজনেরই নিসর্গভাবুকতা একদেশদর্শী, তবু হার্ডির পর্যবেক্ষণ বাস্তবতা সম্মত, তাই তিনি উপন্যাস না লিখলেও বলা যেত, ঐ নিসর্গদৃষ্টি উপন্যাসরচনায়

অনুকূল। কেননা উপন্যাস প্রথমতঃ এবং শেষতঃ বাস্তবতার শিল্প। কিন্তু ওয়ার্ডস্বার্থের যে অধ্যাত্মস্বর্গে উত্তরণ সেখানে কবিকল্পনাও নির্বাক, উপন্যাসের তো প্রবেশাধিকারই নেই। বিভূতিভূষণের মানসিক গঠনের যদি কোন পরিণতি লক্ষণীয় হয়, তা হল ওয়ার্ডস্বার্থীয় মিস্টিসিজমে আত্মলীনতা—অর্থাৎ উপন্যাস শিল্পের অসংবরণ। চাপদানি-পর্বের উপস্থাপনায় বিভূতিভূষণের আশ্চর্য উদাসীনতা, অপুর মানসিক জড়তা এবং পটেশ্বরীকে দিয়ে আবার নিজের ছকে পট-পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, নিশ্চিন্দপুর অপুকে বাল্যজীবনে কবি করিয়াছিল—প্রৌঢ় বয়সে তাহাকে দার্শনিকের ও যোগীর ধ্যানদৃষ্টি উপহার দিয়া তাহার দিগ্‌বিজয় যাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করিয়া দিল। এই উচ্চতম দার্শনিক সুরেই এই মহাকাব্যের ন্যায় বিরাট উপন্যাসের (পথের পাঁচালী-অপরাজিত যুক্তভাবে) পরিসমাপ্তি।' বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য সুন্দর বিশ্লেষিত হয়েছে, এবং তাঁর যে জীবন-বিশ্বাস থেকে চরিত্রগুলির উদ্ভব তার স্বরূপ ব্যাখ্যাও যথার্থ। কিন্তু বিভূতিভূষণ মহাকাব্যের ব্যাপ্তি, গভীরতা ও বহুশাখায়িত বিস্তার কোথায়? মহাকাব্যের ভঙ্গি অবজেকটিভ, বিভূতিভূষণের পক্ষে যা অসম্ভব, তাঁর সাবজেকটিভিটি বা আত্মপ্রক্ষেপণ অতিমাত্রিক বলেই লেখকের অভিজ্ঞতার ভায়েরিগুলি আর নায়কদের মানসিকতা হুবহু এক। সব উপন্যাসই কমবেশী autobiographical, কিন্তু বিভূতিভূষণে শিল্পের আড়ালটুকুও বড় অল্প। সত্যি-কথা বলতে কি, বেদান্তের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' তত্ত্বের ঘোর পুরুষানুক্রমে আমাদের চোখে এমন জবোচাভাবে লেগেছে যে, এই সুখ দুঃখ আশা নৈরাশ্যের বাস্তব সংসার থেকে রেহাই পেলেই আমরা খুশী। তাই বস্তুদৃষ্টির চেয়ে আমাদের কাছে ধ্যানদৃষ্টি বড়। আসলে বস্তুদৃষ্টি ত্যাগ করে, অর্থাৎ উপন্যাসের জগৎ ছেড়ে দিয়েই ধ্যানলোকে প্রস্থান করতে হয়। বিভূতিভূষণ তাই করেছেন। 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে, তবুও শান্তি তবু অনন্ত তবু আনন্দ জাগে'—এই বোধ নিয়েই সব সমস্যাকে দেখেছেন। তাই কোন সমস্যার অস্তিত্বই দৃঢ়মূল নয়।

অথচ বিভূতিভূষণ জীবন-পলাতক শিল্পী নন। ছোটগল্পগুলির অধিকাংশ চরিত্রই অনভিজাত। অভাব অনটনের কথা সবগুলিতে আছে। কিন্নরদলের পল্লী-পরিবেশ শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজেরই অংশ একটি প্রাণোজ্জ্বল কলকাতার মেয়ে বধূ হয়ে এল গ্রামে। সব পরচর্চা পরনিন্দা সে হেলায় জয় করলে।

উপসংহারের করুণরস মর্মস্পর্শী, কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্যে করুণ রস দুর্লভ। 'পুঁইমাচা' তার প্রমাণ। সহায়হরি ও অন্নপূর্ণা আসলে হরিহর ও সর্বজয়ারই অন্য সংস্করণ। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের ভেতরের ছবিটি অনবদ্য। সামান্য খেজুর রস পুইমাচা, পিঠে ইত্যাদিকে নিয়ে সুখ দুঃখের ছোট ছোট বুদ্‌বুদ। যে ক্ষেন্তী বাবার অত অনুগত, বাবা-মেয়ের নৈকট্য বুনো কচু সংগ্রহকে ছাড়িয়ে যেখানে একটা কল্পস্বর্গ রচনা করেছিল, সেখানে বাবার মুখে ক্ষেন্তির মৃত্যুর নিরাবেগ নির্লিপ্ত বর্ণনা এবং মাছধরার সাথী বিষ্ণু সরকারের সঙ্গে মাছের চার নিয়ে আলোচনা ('পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধের হবে না') অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু বিভূতিভূষণের জীবন-বিন্যাসের ছকে চরিত্রের এই ধরণই প্রত্যাশিত।

শিল্পীর জীবনবিন্যাস বলতে কি বুঝি? ই এম ফর্স্টার উপন্যাস প্রসঙ্গ আলোচনায় 'প্যাটার্ন' বলতে উপন্যাসের শিল্পরীতিকেই নির্দেশ করেছেন।

ফর্স্টরের কথায়: 'It (pattern) draws most of its nourishment from plot.' তিনি এই 'প্যাটার্ন' অভিধায় স্পষ্টতঃ উপন্যাসের formal pattern বা আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যকেই লক্ষ্য করেছেন। সেজন্যই প্লটের সঙ্গে তার অভিন্নতা, এবং বিশেষ নান্দনিক বোধ সঞ্চার করাই একমাত্র লক্ষ্য। প্যাটার্ন সাধারণতঃ দুশ্রেণীর—'Hour-glass' এবং 'Grand chaine'। প্রথমটিতে আছে শিল্পের দাবি অনুযায়ী জীবনের 'Castrating' হেনরি জেমস এই পদ্ধতির ঔপন্যাসিক। তিনি মানবচরিত্রের সম্পূর্ণ আলেখ্য অঙ্কন করেন না কয়েকটি চিন্তাশীল, অনুভূতি-মর্মরিত মুহূর্তের অভিজ্ঞতার সারসংকলন মাত্র উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

কিন্তু 'প্যাটার্ন' কথাটি সম্প্রতি নতুন তাৎপর্যে গৃহীত হয়। আরনল্ড কেটল 'প্যাটার্ন অর্থে বুঝিয়েছেন 'জীবন বিন্যাস'। জীবনের খণ্ডীকরণ বা Castrating নয়, ঔপন্যাসিকের কাজ সমগ্র জীবনকে দেখা এবং তার বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে চরিত্রশালায় রূপান্তরিত করা। এই হ'ল কেট্‌লের মত। বর্তমান আলোচকও এই মত সঙ্গত মনে করেন। জীবন সম্বন্ধে লেখকের যে ধারণা তার থেকেই উপন্যাসের বিশেষ Journal pattern-এর উদ্ভব। 'Pattern is the way life evolves.' সেই প্যাটার্নকেই আমি 'জীবন-বিন্যাস' বলতে চাই। তার দ্বারাই উপন্যাসের বক্তব্য, চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাগ্রন্থন, এমনকি 'nature and profundity of the pattern of a book'

নিয়ন্ত্রিত হয়।

যদি কেট্‌লের 'প্যাটার্ন' অর্থে 'জীবন-বিন্যাস' মেনে নিই, তাহলেই বিশেষ বিশেষ ঔপন্যাসিকের চরিত্রাঙ্কনে একই ছকের পুনরাবৃত্তির কারণ বুঝতে পারব। যেমন হেনরি জেমসের চরিত্রকে পাবনা ডিকেন্সের উপন্যাসে, তেমনি জেমস জয়েসের চরিত্রও কোথাও নেই, হয়ত বা মার্সেল প্রুস্তে তাদের অস্ত বেশে দেখা যেতে পারে। লেখকের এক জীবন-বিন্যাস থেকে এক শ্রেণীরই চরিত্র 'টষ্টা স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে একদা অভিযোগ উঠেছিল, তাঁর সব নরনারী মূলত একই আদলে গড়া, পুরুষ যেন সাংখ্যের পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নারী যেন প্রকৃতি, সব শক্তির আধার। কিন্তু এ অভিযোগ কোন্ ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়? বস্তুত বিশেষ লেখকের জীবনবিন্যাসের আলোকেই তাঁর উপন্যাসের শিল্পমূল্য বিচার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলি বঙ্কিমী জীবনবিন্যাসের নিরিখেই বুঝতে হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনবিন্যাস অনুযায়ী তাঁর সৃষ্ট নরনারীর আদলও স্বতন্ত্র।

বিভূতিভূষণের জীবনবিন্যাস শাশ্বত জীবনছন্দে বিশ্বাসী। চোখের সামনে পরিবর্তমান বিশ্বের অব্যবহিত বেদনা তাঁর চিত্তের গভীরে দাগ কাটে না। 'ভূমানন্দময় হবে, এই আবরণ ক্ষয় হবে'—এই হল তাঁর জীবনদর্শন। তাই তাঁর চরিত্রগুলি হয়েছে ভাবুক স্বপ্নচারী অধ্যাত্মপথিক।

সুতরাং চরিত্র কল্পনার দৈন্য বা উপস্থাপনার অসঙ্গতি থেকে উপন্যাসে যে-সব দোষ ঘটায়, বিভূতিভূষণে তার চিহ্ন নেই। তাঁর যেখানে সীমাবদ্ধতা, সেখানে তাঁর শিল্পচেতনার অভাব নয়, জীবনবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যই দায়ী। বরং সারাজীবন ভরে, সব রকম পরিবেশে তিনি অন্তর দিয়ে বলতে পেরেছিলেন 'পশ্য দেবস্য কাব্যং'। যত সেই কাব্যের রূপ রস বর্ণ গন্ধ দেখেছেন, মাধুর্য আস্বাদন করেছেন, তত মুগ্ধ হয়েছেন। নিরন্তর মুগ্ধতার অভিভব বিরল সারস্বত শক্তির পরিচয়বহ।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সফল ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব আশা করা যায় না।

পঞ্চাশ বছর পরে

ডঃ অমলেন্দু মিত্র

[একটি স্বল্পালোকিত কক্ষ। এক স্থবির বৃদ্ধ মাদুরে উবু হয়ে বসে। বৃদ্ধের নাতি একটি তৈলপাত্র হাতে নিয়ে বাইরে থেকে ভেতরে এল]

দাদু ॥ কি-রে তেল পেলি ?

নাতি ॥ হ্যাঁ দাদু।

দা ॥ এখন দর কত রে ?

না ॥ পঞ্চাশ টাকা।

দা ॥ (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) উঃ ভাবা যায় না পঞ্চাশ টাকা কে-জি। আমাদের আমলে বারো টাকা কে-জি তেল খেয়েছি—বড় জোর পনেরো টাকা।

না ॥ তাহলে স্বর্গসুখে ছিলেন বলুন গভর্নমেন্ট বলছে আপনাদের চেয়ে আমাদের পারচেজিং ক্যাপাসিটি বেড়েছে।

দা ॥ তা আর বলতে। ডিম আশি পয়সা বড় জোর একটাকা জোড়া করে খেয়েছি। আর তোরা এক একটা ডিম আট টাকায় কিনছিস। তখন হাঁস মুরগীরই বা দাম কি ছিল। ৫/৭ টাকায় মুরগী পাওয়া যেত। এখন ৬০/৭০ টাকা একটা মুরগীর দাম। আমার ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি, তার পাঁচ পয়সা সের চিনি, পাঁচ পয়সা সরষের তেল, টাকায় ১০০টা ডিম খেয়েছেন। খাঁটি গাওয়া ঘি টাকায় দু সের ছিল। এখন ঘি কত করে চলছে রে ?

না ॥ আড়াইশো-তিনশো টাকা কেজি। সে তো পাওয়াই যায় না। মন্ত্রী টন্ত্রীদের জন্য সব চলে যায়।

দা ॥ হায়, কি যে হল রে। তোরা চোখে দেখতে পাচ্ছিস না শাকসব্জী, তরিতরকারী—আমরা কত যে খেয়েছি। তোরা চাল খেতে পাসনে বাজার থেকে কিসের গুঁড়ো কিনে এনে খাচ্ছিস। আমরা দেড় টাকা দু'টাকা, বড় জোর চার টাকা কে-জি অঢেল চাল খেয়েছি। রামরাজ্য ছিল রে, রামরাজ্য !

না ঃ চাল পাওয়া যায় দাদু, তবে ৪০/৫০ টাকা কে-জি। তাও যদি ঘুষ দেওয়া যায়।

দা ঃ চাল কি হয় রে? পাওয়া যায় না কেন?

না ঃ সব নাকি মদ তৈরী হয়। বাকী বিদেশে চালান যায়, ফরেন এক্সচেঞ্জের দরকার। দশগ্রাম সোনা দু'হাজার টাকায় মেলে না। দেশে মেয়ে মানুষ আর পেট্রলের বড় অভাব, তাই কেনা হয়।

দা ঃ পেট্রল নিয়ে কি হয়? তোরা তো গোরুর গাড়ী চড়িস। দেশ থেকে পাম্প মেশিনগুলো তো আমাদের কালেই উঠে গেছে। মোটর গাড়ীও পুষ্পক রথের মর্যাদা পেয়েছে। ওঃ মোটরের হর্ণ যে কতকাল শুনিনি!

না ঃ মোটর আছে দাদু, তবে তাদের কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। বাড়ী বাড়ী ঘুরে মেয়েদের তুলে নিয়ে যায় মন্ত্রী টন্ত্রীদের জন্য।

দা ঃ (শিউরে উঠে) বলিস কি? আগে আমাদের কালে কোনো মন্ত্রী টন্ত্রী মেয়েছেলে নিয়ে সামান্য কিছু করলেই 'বিনোদিনী কেলেঙ্কারী' বলে কাগজে কাগজে হৈ চৈ পড়ে যেত। তারপর? তারপর? মন্ত্রীরা আর কি করে রে? তারা কি তোদের ভোট পায় না?

না ঃ ভোট পায় দাদু। সবে পার্টির জোরে। ভোটের দিন পাইক পেয়াদা এসে দাঁড়ায়। পিঠমোড়া করে বাঁধে—ভোটের কাগজ নিয়ে ওদের চোখের সামনে দাগ দিয়ে বাক্সে ফেলতে হয়।

দা ঃ ইস্, বিরোধী পার্টি নেই?

না ঃ আছে। তারাও ডাকাত। যে গদিতে আসে সেই-ই ডাকাতি করে।

দা ঃ আমাদের কালে কত বড় বড় 'বিরোধী' পার্টি ছিল। তারাও কি ডাকাতি করছে নাকি?

না ঃ তারা কেউ নেই। হয় মগজ ধোলাই হয়ে গেছে, নয় কালেসে পুড়ে পার হয়ে গেছে জমির।

দা ঃ (মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে) আর কাগজওয়ালারা?

না ঃ তারা সরকারের প্রচারযন্ত্র। কারও বিরুদ্ধে লিখবার বা সমালোচনার অধিকার নেই। লিখলে সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে মারা হয়। আগে মগজ ধোলাই-এর সার্টিফিকেট জোগাড় না করলে সম্পাদক হতে পারে না।

দা ঃ আমাদের কালে বিখ্যাত একটা বাংলা কাগজ ছিল। তারাই ছিল মহাবোদ্ধা। বাংলার জেঠামশাই ছিল তারা। সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি,

খেলাধুলা, সঙ্গীত, সিনেমা, হেন বিষয় ছিল না, যা না তারা বুঝত। বড় বড় সাহিত্যিকদের চাকরী দিয়ে পোষা বেড়ালের মত বসিয়ে রাখত অফিসে।

না ॥ সেসব আর নেই দাদু। ঐ সব প্রাতঃস্মরণীয় সাহিত্যিকরাই তো নয়া-বাস্তব কাহিনী লিখে লিখে দেশের লোকদের মানুষ করে গিয়েছেন। তাঁরা আমাদের সমস্ত জাতীয় মহাপুরুষ। তাঁদের ছবি জাতীয় মহাফেজ-খানায় টাঙ্গানো আছে। ব্রেনগুলিকে মিউজিয়াম-জারে জিইয়ে রাখা হয়েছে। দরকার মত তাদের ব্রেনের ভাইব্রেশন বিশেষ যন্ত্র দিয়ে 'পিক্ আপ্' করে আজকালকার সাহিত্যযশপ্রার্থী মগজে পুরে দেওয়া হয়।

দা ॥ ভারী আশ্চর্য ব্যবস্থা তো! আচ্ছা কোন্ ভাষায় বই লেখা হয় রে আজকাল? রাষ্ট্রভাষা মানে হিন্দীতে?

না ॥ না দাদু! সব কটা ভাষা মিলিয়ে একটা মিশ্র ভাষা করা হয়েছে। সেটাই রাষ্ট্রভাষা।

দা ॥ সে আবার কি?

না ॥ ধরুন "তুমি কোথায় যাচ্ছ?" রাষ্ট্রভাষায় বলতে হবে, "তুমি where যাওচ্ছসি হায়।" বাংলা ইংরাজী, ওড়িয়া, হিন্দী, মিলিয়ে বললাম।

দা ॥ ওঃ অপূর্ব! বল বল্ আর নূতন কি কি সব হয়েছে।

না ॥ প্রত্যেক জায়গাযগায় যন্ত্র বসানো আছে। খেলার মাঠে স্কুলেকলেজে, লাইব্রেরীতে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে। সব আওয়াজ, সব ছবি কন্ট্রোল-রুমে রেকর্ড হচ্ছে টেলিভিশনে। কোনো গোলমাল দেখলেই স্বেচ্ছা-সেবকের দল ছুটে গিয়ে সাবড়ে দিয়ে আসে। এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, বলা যায় না, হয়ত এমন যন্ত্র আছে, সব কথাই সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে।

দা ॥ ওহো, আমাদের সময়ে জর্জ অরওয়েল এইরকম ধরণের যন্ত্রের কথা একটা উপন্যাসে লিখেছিলেন বটে। যাক্, তাহলে বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়েছে এদেশে আর জিনষপত্র সেই '৭৪ সালের মত সস্তা করতে পারছে না! তোদের গুঁড়ো গুলে খেতে হচ্ছে।

না । ইচ্ছে করেই করে না দাদু! ফসল বা সব্জী ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাঠ থেকে সোজা গভর্ণমেন্টের ঘরে চলে যায়। বাজারে আসে শুধু টিন ভতি গুঁড়ো!১

দা ঃ তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ! আর স্কুল কলেজগুলো ?

না ঃ আছে ! সেখানে পড়ানো হয় যৌনতত্ত্ব—প্র্যাক্টিক্যালও হয়। দেশ বিদেশের যৌনতত্ত্ব রঙীন টেলিভিশনে দেখানো হয়। ছেলেমেয়েরা দারুণ উত্তেজনা ভোগ করে। মেয়েরা এমনিতেই যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সখি মহল তুলে নিয়ে যায়। পাকাপোক্ত করে ছেড়ে দেয়। তারা খুব সমাজে মিশে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। অজন্তার ছবির আদর্শে টপ্‌লেস আর মিলিমিটার মাপের অধোবাস পরে পথে বেরুনো কল্যাণব্রতি। আপনাদের আমলের মত চরিত্র নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

দা ঃ কিন্তু ছেলেপুলে হয় না ?

না ঃ ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর গবেষণায় ও ল্যাঠা ঘুচে গেছে দাদু ! এমনই কল বের করেছে—নূতন কোনো প্রসবের বালাই নেই। হাসপাতাল থেকে মেটারনিটি বিভাগ উঠে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে হোস পাইপ আর যন্ত্র নিয়ে লোক দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়। মেয়েদের গায়ে এমন একটা "রে" দেয় যাতে গর্ভ হবার ভয় থাকে না।

দা ঃ তাহলে দেশের লোকসংখ্যা বেশ কমেছে বল ?

না ঃ হু হু করে কমছে। তাছাড়া ফি-বছর কয়েকলক্ষ লোক এমনিই মেরে ফেলা হয়। আপনাদের সময় আইন-আদালত এসব ছিল তো ? আজকাল নেই।

দা ঃ সেকালে বিচারের নামে অবিচার কিছু হলেও জেলকে সবাই ভয় করত। চোর ডাকাতরাও সামলে চলত।

না ঃ ওসবের বালাই আজকাল নেই। পুলিশে ধরেই কার্নেসে পুরে দেয়। সে পোড়া ছাই দিয়ে সার হয় জমির।

দা ঃ (আঁতকে উঠে) কি জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলে ? ভারুব ! পরলোকের ভয় নেই ? ঠাকুরদেবতা, পূজার্চনা ওসব আছে, না কেঁটিয়ে বিদেয় করেছে ?

না ঃ ওসব নেই। অর্চনা হয় নারী মূর্তির। বছরে দু'বার দেশের শ্রেষ্ঠা রূপসীদের নগ্ন মূর্তি গড়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসানো হয়। সেখানে আট রূপবির ধরে নরনারীর হুল্লোড়ের মেলা বসে।

দা ঃ বটে। আচ্ছা দেশে বেকার নেই ? তারা চাকরি চায় না ?

না ॥ চাকরির অভাব নেই এখন। স্বেচ্ছাসেবকের চাকরি চাইলেই পাওয়া যায়। বেকার বলে আর কিছু নেই। ওদের মধ্যেই যারা অলস তারা রগরগে সেক্সের বই, পত্র, পত্রিকা লেখে ছাপাঁয়।

দা ॥ হ্যাঁ ভাল কথা, সাহিত্যের হাল কি ?

না ॥ সাহিত্য এখন প্রকৃত বাস্তব। কল্পনার লেশ থাকলে চলবে না। যে যত ভাল রতিশাস্ত্রের বই লিখতে পারে তাকেই এ্যাকাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়।

দা ॥ এ্যাকাডেমি মানে সাহিত্য এ্যাকাডেমি ? ওঃ আমাদের সময় সাহিত্য এ্যাকাডেমির কত নাম !

না ॥ সাহিত্য এ্যাকাডেমি কিনা জানিনে দাদু—এ্যাকাডেমি মেটাসেক্সুয়াল ফ্যাকালটি।

দা ॥ মেটা-সেক্সুয়াল কি-রে ? শুনেই যে মাথা ঘুরে যাচ্ছে ! আচ্ছা, ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডিয়ো, কমিশনার, আই-জি, ইনস্পেক্টার এসব আছে তো ? কি করে তারা ?

না ॥ তারা খালি সেটলমেন্ট করে—কার ঘরে মেয়ে বড় হল, কে বাড়ির উঠানে একফালি জায়গায় তরিতরকারি লাগিয়েছে। রেডিওগ্রাম টেলিভিশনের ব্যাপার তো ! নিজে থেকেই এসে হেলিকপ্টারে মানুষ পোড়ানো ছাই মেশিন দিয়ে ছিটিয়ে গাছটাতে "রে" ছড়িয়ে দেবে তারপর বাড়ীর মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যাবে। আপনার নাতনীকে কবে নিয়ে গেছে।

দা ॥ (মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে) হায়, হায়, হায় ! হাঁরে বলি আমার বয়সী বুড়োরা কেউ বেঁচে আছে ? আমার সেই বন্ধু ছিল, রহমৎ, সুনীতি, রামলোচন ?

না ॥ না দাদু—তাদের কবে পোড়ানো হয়ে গেছে।

দা ॥ (আঁতকে উঠে) সে-কি ? অপরাধ ?

না ॥ অপরাধ রাজদ্রোহ ! কটি লোক জড় করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অবশ্য না দিলেও ওরা মারত। বুড়োদের ওরা রাখতে চায় না। পঞ্চাশ পেরুলেই মেরে ফেলার নিয়ম।

দা ॥ (সভয়ে) তাহলে আমাকেও মেরে ফেলবে ? ...কি-রে উত্তর দিচ্ছিস না যে...আমাকেও মারবে নাকি ?

(মিউনিসিপ্যালিটির দুজন কর্মীর প্রবেশ। একজনের হাতে বন্দুক, খাবারের দল ইত্যাদি) কে? কে তোমরা?

১ম কর্মী। এই বুড়োটার আওয়াজ ট্রেস করে আসতে এতক্ষণ লাগল (স্যুইচ টপ্...টপ্...টপ্, একটা বেগুনী আলো যন্ত্রটার পিছনে জ্বলতে থাকে। যন্ত্রের মুখ থেকে বৃদ্ধের গায়ে অদৃশ্য আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ গোঙাতে গোঙাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ("ফার্নেস এ্যাণ্ড ম্যানিওর ডিপার্টমেন্ট" লেখা একটা গাড়ীতে টেনে তুলল বুড়োকে কয়েকজন লোক) (নাতির দিকে ফিরে) আপনি এতকাল বুড়োকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কেন?

নাতি। এক্সপেরিমেন্ট করবার জন্য।

২য় কর্মী। কিসের এক্সপেরিমেন্ট? কে অধিকার দিয়েছে আপনাকে, বুড়ো বাঁচিয়ে দেশের খাদ্যের অপচয় ঘটাতে।

নাতি। বুড়ো আজ ত্রিশবছর ডিপ্ ফ্রিজে অজ্ঞান হয়েছিল কিছু খেতে দিইনি। কদিন হল বাঁচিয়ে তুলেছি।

১ম কর্মী। এ রাজদ্রোহিতার ক্ষমা নেই। এক্ষুণি ফার্নেস এ্যাণ্ড ম্যানিওর ডিপার্টমেন্টের চিফ একজিকিউটিভের কাছে আসুন।

[নাতিকে ঘিরে ধরে টানতে টানতে সবার প্রস্থান]

প্রবন্ধ

লোকসংগীতের সামাজিক তাৎপর্য

পুলকেন্দু সিংহ

গ্রামের সাধারণ অল্পশিক্ষিত মানুষেরা পুরুষানুক্রমে বিভিন্নরকম পাল-পার্বণ, ব্রত প্রভৃতি উপলক্ষ্যে যে গানগুলি রচনা করেন ও নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গিতে ও সুরে লোক শিল্পীবৃন্দ যে গানগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পরিবেশন করেন সাধারণভাবে সেগুলিকে লোক-সংগীত বলা চলতে পারে। বলা বাহুল্য সব সংগীতই অবশ্য সংজ্ঞা অনুযায়ী লোকসংগীতের পর্যায়ে পড়েনা, বিশেষ করে যেগুলি কেবলমাত্র অধ্যাত্ম চেতনায় নিবিষ্ট। ধর্মীয় পালপার্বণে

ধর্মীয় উপলক্ষ্যে, যেমন গাজনে, ধর্মরাজের পূজোয়, যে গানগুলি রচিত ও পরিবেশিত হয় প্রতি বৎসরে, সেই গানগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো একটি ধর্মীয় আবরণ থাকে (যেমন বোলান গানে, জারি গানে)। কিন্তু ধর্মীয় আবরণটি ভেদ করে এক অমলিন মানবিক আবেদনের রসমাধুর্যে লোকমানসে যে দাগ কাটে, হৃদয়কে স্পর্শ করে তা লোকসংগীতের নিজস্ব প্রাণশক্তিরই অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণরূপে পরিগণিত হয়। বলা বাহুল্য এই মানবিক চেতনা বা বোধই লোক-সঙ্গীতের প্রাণ স্বরূপ।

কোন গান অধ্যাত্ম চেতনার গভীর মধ্যে থেকে জীবনের পারমার্থিক চৈতন্যের যতই নির্দেশ দিক না কেন—যদি তার মধ্যে থেকে মানুষের প্রেম, ভালবাসা, অনুরাগ, অভিমান, দুঃখ ও আনন্দের ইঙ্গিত না থাকে তবে তা লোক-সংগীতের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। বলা বাহুল্য লোক-সংগীতের প্রেম-ভালবাসা, দুঃখ ও আনন্দ শুধু মাত্র ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিগত বোধই নয়, ব্যক্তি থেকে সমষ্টি, সমষ্টি থেকে সমাজ চৈতন্যের ঐশ্বর্য লোক-সংগীতকে প্রাণবন্ত এক সতেজ ও সবল মাধুর্য দান করে। মানবিক বোধই লোক-সংগীতের উজ্জ্বল দীপ্তি।

চৈত্রের গাজন উপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে লোক-কবিগন ছোট ছোট পালাগান রচনা করেন, লোক শিল্পীগণ বিশেষ সুর ও ভঙ্গিতে নৃত্য ও বাদ্য সহকারে সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলি পরিবেশন করেন। রামায়ণ, মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণ থেকে মুল কাহিনী গৃহীত হলেও সেগুলি লোককবিগণের দ্বারা রচিত ও লোকশিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয়ে মুল কাহিনীর অনেক মৌলিকত্ব হারায়। হারিয়ে কিছুটা লৌকিক চরিত্র ওই সকল পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে আরোপিত হয়, চরিত্রের বর্ণনায়, পোষাকে, আচারে। বোলানের 'সীতা' আর রামায়ণের সীতা থাকেন না। তিনি যেন স্বামীপরিত্যক্তা দুঃখিনী গ্রাম্য বধু হয়ে দেখা দেন। তার পরনে থাকে গ্রামেরই আর পাঁচটি গরিব ঘরের বধুর মত লাল পেড়ে মোটা শাড়ি, হাতে নোয়া, সিঁথিতে এয়োতির চিহ্ন লাল টকটকে সিঁদুর। তার দুঃখ ও বেদনায় যেন গ্রাম্য রমণীর দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ পায়। তাই 'রামায়ণের' মত বোলান গান আর ধর্ম সঙ্গীত থাকে না লোক-সংগীত হিসেবে প্রতিভাত হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মহরম উপলক্ষ্যে যে জারিগান পরিবেশিত হয় সেই গানে কারবালা প্রান্তরের ধর্মীয় কাহিনী বিবৃত

হলেও—লোককবিদের রচনা ও লোক-শিল্পীদের পরিবেষণের স্পর্শে তা লোক-সংগীতের রূপান্তরিত হয়। ধর্মীয় গণ্ডী অতিক্রম করে এক মানবিক বোধে লৌকিক সমাজচেতনার স্পর্শে এই গানগুলি সঞ্জীবিত হয়।

সুতরাং যে কোন লোক-সংগীতেই অনিবার্য ভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজচেতনা এসে পড়ে। লোক-সংগীতের এই সমাজচেতনার মধ্যেই সামাজিক তাৎপর্য নিহিত আছে।

কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় কাহিনীভিত্তিক গানগুলি লোক-সংগীতে রূপান্তরিত হয়নি। যেমন কীর্তন ও রামায়ণ গান। এর প্রধান কারণ কীর্তন ও রামায়ণ গান রচনা করেছেন এক মননশীল মন। রীতিমত অধ্যবসায় ও অনুশীলনের মাধ্যমে মূল রচনার ভাব ও ভাষা গায়কেরা অক্ষুন্ন রাখতে ব্রতী হন। এই গানগুলির সুরে ও পরিবেষণায় একটি নির্দিষ্ট পরিশীলিত উচ্চাঙ্গের সুর ও আঙ্গিক রক্ষা করা হয়। চরিত্রগুলি ও অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করা হয়। এই গানগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক ধ্যান-ধারণার প্রবেশ করার সুযোগ থাকে না—যেহেতু পরিবেষনার কঠোর নিয়ম ও রীতি মানা হয়। কঠোর নিয়ম রীতিগুলি সাধারণ মানুষের করায়ত্ব থাকেনা। 'বোলান' বা 'জারিগান-এ সহজ স্বচ্ছন্দভাবে লোক-জীবনের স্পর্শ পেয়ে লৌকিক রূপ পাবার যে সুযোগ থাকে রামায়ণ গানের 'সীতা'য় বা 'কীর্তন' গানের শ্রীরাধিকায় সেই সুযোগ থাকেনা বলেই—ধর্মীয় কাহিনীভিত্তিক রচনা হয়েও 'বোলান'-এর 'সীতা' 'লৌকিক সীতা' আর রামায়ণের গানের 'সীতা' ধর্মীয় কাহিনীর 'সীতা হিসেবে চিহ্নিত হল। বোলান-এর সীতার রূপকল্পনায় গ্রাম্য কবিগণ তাদের দেখা ও জানা গ্রাম্য-বধূর ধ্যান ধারণা আচার-অনুষ্ঠান আরোপিত করেন। তাই বোলান-এর সীতা 'লৌকিক সীতা' সাধারণ মানবীর অতি সাধারণ দুঃখ-দৈন্য আশা-নিরাশার আনন্দ বেদনায় বোলানের 'সীতার' হৃদয় উদ্বেলিত। সেই সহজ মানবিক বোধ এখানে হাজির।. মানবিক বোধ আবার সমাজ চেতনায় বিস্তার লাভ করে।

লোক সংগীত লোক-সমাজের অনেক লোক-কবি কোন এক সময় কোন উপলক্ষ্যে রচনা করেন। সেই রচিত গান কোন সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গীত হয় লোকশিল্পীদের দ্বারা যৌথভাবে। তখন আর সে গান কোন একক কবির রচনা হিসেবে পরিগণিত হয় না। পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একক থেকে বহুতে রূপান্তরিত হয়। সে গান তখন গোষ্ঠীজীবনের গান।

সমষ্টির গান। সমষ্টির গানে সমষ্টির ব্যথা-বেদনা আশা-আকাংক্ষা প্রকাশ পায়। সমষ্টিকে নিয়েই সমাজ। সমাজচেতনাই লোকসংগীতের সামাজিক তাৎপর্য বহন করে।

এই গান ব্যক্তিবোধ থেকে সমষ্টির বোধ-এ রূপান্তরিত হয়ে লোক শিক্ষাও লোকরঞ্জনের বিশিষ্ট মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়। লোক-সংগীত লোক-সমাজের উপযোগী করে কবিরা রচনা করেন। লোক-শিল্পীরা সেই গান লৌকিক ভঙ্গিতে ও সুরে লোক-সমাজে পরিবেশন করেন লোক শিক্ষা ও লোক-রঞ্জনের জন্য।

সহজবোধ্য এই গানে যে আনন্দস্বাদ ও শিক্ষা থাকে তা সাধারণ মানুষও সহজ ধর্মবোধ, ন্যায়অন্যায়বোধের সহজাত ক্ষমতা গুণে উপলব্ধি করেন। আনন্দ আস্বাদ করেন। শিক্ষা গ্রহণ করেন। সমাজশিক্ষায় তাই লোক-সংগীতের বিরাট অবদান থাকে।

কয়েকটি পাঁচালী, ঝাবু ও গম্ভীরা গানের মত লোক প্রিয় লোক সংগীতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ থেকে এই গানগুলিতে সমাজচেতনা যে কতোভাবে থাকে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

সমসাময়িক লোক-জীবনের অনেক চিত্র ও চরিত্র এইসব সংগীতে লুকিয়ে থাকে কখনো বা সহজপ্রাপ্য 'রূপক' ও 'প্রতীকে'র মোড়কে কখনো বা ব্যঙ্গ শ্লেষ ও কৌতুকের জারকরসে জারিত হয়ে। রসগ্রাহী গ্রাম্য শ্রোতা তার সহজ অনুসন্ধিৎসা থেকেই এই সকল পরিচিত রূপকের মর্মভেদ করে ঘটনার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করেন। সমাজ-ইতিহাসের অসংখ্য উপকরণ ছড়ান ছিটান থাকে এই সকল লোক সংগীতের সমাজচিত্রে।

মুর্শিদাবাদের 'প্রহেলী পাঁচালী' থেকে সমাজজীবনের গূঢ় রহস্য পাওয়া যেতে পারে।

"আগে ছিলাম ফাঁকাতে, ঢুকে গেলাম চাকাতে
সেখানে ছারপোকাতে, আমাকে রাখেনি সুখে
দিবা মানুষ আছে তথা, কয়ে দিলাম কত কথা
এখন সে গেল কোথা, পাইনা তাকে ডেকে ডেকে॥
এক মাগী হাতা ধরে হাতিরে ভিতরে ভরে
দাঁতি লাগিয়ে তারে জল ছিটে দেয় চোখে মুখে
কাতরে কয় কাতিক চন্দ্র আমাকে লেগেছে ধন্দ

ছড়ি বাজে আনন্দ কয় নদীর বাঁকে।"

গাজন উপলক্ষ্যে পরিবেশিত একটি সাম্প্রতিক পাঁচালী গানে মুর্শিদাবাদ জেলার খাদ্য ও কৃষি ব্যবস্থার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় :—

"ধানে ত কিছু হল না গম লাগালাম জোর দিয়ে
চষে, কুড়ে খুঁট খুঁচড়ি দিলাম কিছু ছিটিয়ে
গমে ফলন হল ভাল খুঁট খুঁচড়ি কিছু হল
জল পেলে ভাই হত ভাল বলিছে পরস্পরে।
রুটি ছাতু খেয়ে মলাম, ভাত মুড়ি ত মেলে না,
নুন দিয়ে ভাই রুটি ছাতু খাওয়া কভু চলে না।
খেতে হচ্ছে পেটের দায়ে থাকা যায় কি এসব খেয়ে
কোনদিন যায় অম্বল হয়ে, মরি ওষুধ বাগড়ে
ক্যালিম্পং, আই আর এইট লাগালাম খরচ করে।
পুকুরের জল মরে গেল গিয়েছে রে দে পুড়ে
বেচতে হল ঘটিবাটি বেচতে হল গয়নাগাটি
সোনার সংসার হল মাটি গেল যে ছারখারে।
কাত্তিক চন্দ্র বলছে হেসে, এসে অসার সংসারে
কোন কর্ম করলাম নাক দিন চলে যায় পসারে।"

পাঁচালী গান একটি সুপরিচিত লোক সংগীত। এই সংগীতে সমাজচৈতন্যে নিবিক্ত সমাজচিত্র কত স্পষ্ট ও সুচিত্রিত তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

মালদহের গাজন একটি বিশিষ্ট লোক-উৎসব। উৎসব উপলক্ষ্যে গম্ভীরা গান রচিত ও গীত হয় প্রতি বৎসর। গম্ভীরা গানের বিভিন্ন পর্যায়ে তুচ্ছাতি-তুচ্ছ গ্রাম্য ঘটনাবলী, সমস্যা, দুঃখ, দৈন্য, আশা-নিরাশা থেকে শুরু করে, সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও স্থান লাভ করে শিবকে উপলক্ষ্য করে এইসব গান গীত হয়। গম্ভীরার শিব আর দেবাদিদেব কৈলাসবাসী শিব নন। ইনি কখনো বা কৃষির কর্তা, কখনো বা রাষ্ট্রনায়ক। যদিও তার পরনে নিয়মমাফিক বাঘছাল, গায়ে ছাইভস্ম, মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল থাকে।

গম্ভীরা গানের বিচিত্র বিষয়বৈচিত্র্য ব্যক্তি, গ্রাম, দেশ, সমাজ থেকে বিশ্বজনীন এক মানবিক চেতনায় উন্নীত হয়। সাধারণ মানুষের চিন্তাও যে কত গভীর, ব্যাপক ও বিশ্বজনীন হতে পারে গ্রাম্য কবিদের রচিত গম্ভীরা

গানের অসংখ্য উদাহরণ থেকে তার নজির তুলে ধরা সম্ভব। যাঁরা এই গান-গুলি রচনা করেন, যাঁরা পরিবেশন করেন, যাঁরা এগুলির রস গ্রহণ করেন তাঁরা সকলেই গ্রামের সাধারণ মানুষ। এঁরা কেউই সমাজবহির্ভূত কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নন। সুতরাং এঁদের রচিত ও পরিবেশিত গানে সামাজিক সমস্যা ত স্থান পাবেই। সমস্যাসম্পর্কে সচেতন হলে তবেই সমাধানের সূত্র পাওয়া যায়। এই গানগুলির মধ্যে শুধু সমস্যাই থাকে না, সমাধানেরও ইঙ্গিত থাকে। অন্ততঃ এই গানের আনন্দ রস, ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মধ্য দিয়ে সমাজকে সতর্ক ও সচেতন করে দেওয়া হয়। অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে অবিচার আর অনিয়মের বিরুদ্ধে গম্ভীরা শিল্পীরা অত্যন্ত আদর্শনিষ্ঠ ও সংগ্রামী। কোন রক্তচক্ষুর ভয়, কোন মোহ, কোন লোভ এঁদের সামাজিক কর্তব্য থেকে আজো বিচ্যুত করতে পারেনি। সমাজশিক্ষায় ও সমাজের অগ্রগতিতে এই শিল্পীর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার যোগ্য। এইভাবেই এঁরা এঁদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন। সঙ্ গানের শিল্পীদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা চলে। সঙ্ গানেও নানাবিধ ব্যঙ্গ কৌতুক ও রূপক চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের অন্যায় কার্যাবলীকে কঠোর সমালোচনা করা হয়ে থাকে। সঙ্ গানের শিল্পীরাও রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে আনন্দ রসের ভিয়েন দিয়ে তিক্ত কথায় রস পরিবেশন করেন।

গ্রামের সাধারণ অল্প শিক্ষিত গরীব কৃষকদের প্রতি উপেক্ষা ও অবিচার হলে তারা প্রতিবাদ করতে সাহস পায়না। তারা দুর্বল, তারা নিপীড়িত, তারা অশিক্ষিত ও দরিদ্র। এরা সাধারণভাবে প্রতিবাদ করতে ভয় পায়। ভাষায় কুলায় না, নানাবিধ বাধানিষেধ আর রক্তচক্ষুর ভয়ে এরা ভীত ও সন্ত্রস্ত। দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামে এরা জর্জরিত। কিন্তু তবুও এরা মানুষ, এদেরও বোধ আছে, জ্ঞান আছে, প্রতিভা আছে। এই সকল লোকসংগীত মাধ্যমে তাই তারা তাদের গুপ্ত ক্ষোভ ও বেদনা উজাড় করে দেয়। এই গানের ভাষা তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা, হৃদয়ের ভাষা এখানে এরা নির্ভয়, মুক্তকণ্ঠ মুক্তহৃদয়। এই গানগুলির মধ্য দিয়েই গ্রাম সমাজের অব্যক্ত বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও অনুরাগ ধরা পড়ে। এই গানগুলি সমাজ দর্পণ তথা সমাজ-ইতিহাসের অমূল্য দলিলবিশেষ। যেমন গম্ভীরা গানের শিববন্দনা :

"চাষী দলের দুঃখে সারা দিলে হে বরষী—তাই

পোনে বীজে সারে রক্তা চাষী জাতি হে
জঙ্গল কাইটা করছ আবাদ
ঘুচাইতে হায় খন্ডের অভাব
তাতে জুটাতে ভরকারী ডিপার্টমেন্ট-রয়েছে কিশারী
ফলাইছ ফসল কত কাগজ কলমে
তবু প্যাটের আগুন নিভেনা কেনে ?
দেশ বাঁচাইছ আমেরিকার দানে
চষে উঠান আঙিনা—হে নানা
গিলবে দেশটা কোটি কোটির দেনা।
আর যোগাসনে বসে কেনে ওহে মহাযোগী
দিনে দিনে হলে তুমি ক্যানসার রোগের রোগী হে —
মিল মালিক আর মজুতদারে কালোবাজারী সাথে করে
চোর জুয়াচোর আর জালিয়াৎ ঘুষখোররা লুটছে দিনরাত
দ্যাশের দুশ্‌মন সব একসাথে মিলি দিয়া স্বার্থের হাড়িকাঠে
মানবতার বলি
চাহ তুমি চোখ খুলি নইলে হাম্‌রা বাঁচব না হে নানা"

নানা' এখানে শিব তথা রাষ্ট্রের কর্ণধার। তাকে উপলক্ষ্য করে গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে গম্ভীরার কবি বলেছেন গ্রামের কৃষকের কথা সরকারী বিভাগের কার্যাবলীর কথা, দুর্নীতির কথা, কালোবাজারীর কথা, আমেরিকা থেকে ধারকর্জের কথা, রাজনীতির স্বার্থের কথা, সর্বোপরি গ্রামের সাধারণ মানুষের কথা ও দেশের কথা স্থান পেয়েছে।

একটি পাচালী গান :—

"ভাইরে বুঝি যেতে হল দেশ ছেড়ে
বাবু মশার কামড়ে।
বাবু মশার কামড়ে
'মশাতে' ফাঁকি দিয়ে পেট-ভরায়
কে যে মানুষ কে যে মশা
আর কাজের দফা দেয় সেরে
চেনা দায় এ সংসারে।
এরা শোষণ করে রক্ত

গুণগুণ করে গান শোনায়
আর সাজে পরম ভক্ত
উড়ে এসে আশে পাশে
কামড়ে দেয় চুপিসারে।"

*　　　*　　　*

এঁদের কাজের বালাই নাই
পরের দেহের হুল ফুটিয়ে পেটটি ভরে নেয়
এদের কাজ কেবল হয় কাজ না করা
ফাঁকি দিয়ে কাজ সারা।"

আমাদের সমাজে 'পরশ্রমভোগী' একশ্রেণীর শোষক মানুষই যে 'মশা'র নামে আলোচ্য পাঁচালীতে আলোচিত হয়েছেন সেকথা বলাই বাহুল্য। পাঁচালী গানে জীবন যন্ত্রণার ছবি:—

স্ত্রী—গলার হারটা বেচে দিলে, টাকাগুলো পেটে খেলে
কাপড়ের দাম নাই ফলে চাইলে মেলে না
পু—ধনি হে, বলি তোমার সবিতো এই পেটের তরে
পেটে খেতে লক্ষ্মী ছাড়ে তাও কি জান না।
স্ত্রী—ঋণ দিয়ে হে দেশের সরকার, নিয়ে নাও হে যত
খয়রাতি আর ঘর তোলার ঋণ দিয়ে খোঁজ রাখ না
পু—গ্রুপ লোন পেলাম না মোটে সংসার চালাই খেটে খুটে
টাকা কড়ি নাইকো মোটে হোল খোরাক টানা।
স্ত্রী—আমি ভেবেছিলাম মনে, সুখ হবে স্বদেশী শাসনে
দুঃখ বাড়ে দিনে দিনে শান্তি পেলাম না।"

আর এক পাঁচালী:—

স্ত্রী—আমি স্বদেশী নারী বাংলাদেশে মিলবে নাকো এমন সুন্দরী
কেন চোখের মাথা খেয়ে পাড়াগাঁয়ে করলাম বিয়ে
সুখ পেলাম না খেয়ে শুয়ে উপায় কি করি।
পু—কি হয়েছে চাঁদবদনী বল মনের কথা শুনি
ধনি তুমি বাপের খনি নয়নে হেরি
স্ত্রী—এই কি পাড়াগাঁয়ের রীতি লজ্জাতে মরি।
পু—এবার দেশে ধান হল না, সারাবছর চাল ডাল কেনা

দোষ মনে করি গহনা দিতে না পারি।

স্ত্রী—কাজ নাই আমার তোমার গহনার

অমন গয়না পাব মেলাই

চলে যাব কলকাতায় সুখ আছে ভারি।

স্ত্রীলোকের বায়না তালিম করতে পারছে না বেচারা নেহাতই আর্থিক কারণে—যদিও আন্তরিকতার অভাব নাই। সাধের সঙ্গে সঙ্গতির গরমিল, কিন্তু আত্মস্বার্থী স্ত্রী লোকটির কাছে সব, তাই সে সুখ ভোগের জন্য মজা লুটতে সহরে যাবে—যাবে কলকাতায়। গ্রাম-সমাজের অবক্ষয়ের যথার্থ চিত্র আর কি হতে পারে?

বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে 'গম্ভীরা'র কবি আক্ষেপ করে বলেছেন :

"পাইনা ভাষা বলতে খাসা অভিধান চষে।

বাঙালী আর বাংলার দশা বুঝাব কিসে।

হায় বাঙালী সব খোয়ালি করমের দোষে॥

... ...

বঙ্কিমচন্দ্র আর রবি বিশ্বকবি রাজা রামমোহন আশু মুখার্জী

... ...

ভাব বাঙালী অতীতের কথা লজ্জায় নত হয় যে মাথা

তোদের বাইরে চটক, ভেতরে ফাঁকা চালানী প্যাসে

শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর গেল কোথা ভেসে॥"

ভারতের দুঃখদুর্দশা সম্পর্কে 'গম্ভীরার কবি বলেছেন :—

"যেথা মাটির তলে সোনা মিলে সাগরতলে হীরা

সোনার ভারত নামটা যাহার আছে জগৎ জোড়া হে

সেথায় লোকে মরছে ভুখা খাবার জোগায় আমেরিকা

অন্নপূর্ণা যাদের ঘরে তাদের ঝোলা কেন ঘাড়ে,

সাজিয়ে বোকা আমেরিকা তোমার বুদ্ধির গোড়ায় ঢালছে ছাই!

দেশটা জুড়ে হেট উপড়ে চলছে দলাদলি

সভ্য মানুষ আজ দানবতার বলি হে

আনতে শান্তি বাঁচাতে দেশ জাগো একবার ভোলা মহেশ।

যেমন হয়ে সতীহারা দক্ষের যজ্ঞ করলে সারা

কর দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন দাস উপেন আজ ভেবে কয়॥"

গ্রাম্য কবিরা গ্রামের কথা, দেশের কথা ছাড়াও দুনিয়ার কথা নিয়েও মাথা ঘামায় :—

"টন্‌ট" (এখানে নিক্সন ও চৌ-এন-লাইকে) শিল্পীরা গানের একটি রসগ্রাহী অংশ :—

"খেয়ে ঠেকা, সেজে বোকা, জোড়া ভায়রা ভাই
রাগে রোষে ভাবছে বসে নিক্সন চৌ এন-লাই।
ওদের কূটনীতির বলি হ'ল ধান চাল্ এখন কি উপায়
মাইয়ার লাথে আঁধার দেখে
এখন ঝাড়া ঠাটায়॥
ভিয়েতনাম যুদ্ধে এদের দো মুখো গতি
ভারতদমনে এলো জমায়ে দোসতি
পাকিস্থানে এরা জেলে লালবাতি
জোরা বাঁদর নাচায়
ভুট্টো, ইয়াহিয়া বেহায়া এদের মাগের ভাই॥
.. ..
ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি
পূর্ব্ বাঙলায় আনলে মুক্তি
রুখবে কেবা এদের শক্তি দেখিয়ে জুজুর ভয়।"

আমাদের লোকসংগীত আজ ব্যক্তিচৈতন্য থেকে বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ। ভাওয়াইয়া, ভাদু, বিবাহ সঙ্গীত, বিভিন্ন ছড়া, টুসু আদিবাসীদের গানেও আছে সংসারের সুখ দুঃখ, দেশ, কাল, প্রকৃতির অসংখ্য অন্তরঙ্গ চিত্র।

লোকসমাজের যথার্থ ইতিহাসরচনার জন্য এই সব অজ্ঞাত রত্নগুলি আহরণ করে সাজাতে হবে। তবেই দেশের ইতিহাসে গ্রাম-সমাজের লোক-মানসের অজ্ঞাত দিক উন্মোচিত হবে। লোক-সংগীতের এটাই হয়তো সবচেয়ে প্রধান সামাজিক তাৎপর্য।

গল্প

নগর সংকীর্তন

রতন চট্টোপাধ্যায়

ডাসটোবীন বললেই ফোঁস ক'রে রেগে ওঠে ফেলটু। ভোবড়ানো সান্‌কিটা বগলদাবায় চেপে ধ'রে লাঠিটা উঁচিয়ে মারতে যায় কেলটুকে। বলে, এ্যাঁ ডাসটোবীন,—শালো, নবাবপুত্তুর—আসিস কেনে তবে? কেলটু আচমকা ভয় পেয়ে ভড়কে যায়। ব্যাপারটা তরল করার চেষ্টায় গালের বত্রিশটা ছ্যাংলাপড়া দাঁত বার ক'রে হেঁ হেঁ ক'রে হাসে। বলে, মাইরি, এই নাক কান মললাম, আর বদি (যদি) কখনও ডাসটোবীন বলেছি তো আমাকে মেরে লোপাট করে দিবি। তা শুনে তৎক্ষণাৎ ফেলটুর রাগ জল হ'য়ে যায়। কেলটু যে রীতিমত তাকে ভয় করে সেটা একটা গর্বের ব্যাপার। তবু সে এখন বুক চেতিয়ে, লাঠি নাচিয়ে বলে, থান্‌লে (তা'হলে) বল্‌ এটা এসটোরেট (রেষ্টুরেণ্ট)। কেলটু ঘাড় কাৎ ক'রে সায় দেয়, এসটোরেট। তারপরই দুজনে ভাব হয়ে যায়। আসলে ফেলটুর কথায় সায় দিলেই কেলটু তখন গলায় গলায় বন্ধু।

পেট ভোগরা দশ বার বছরের দুটো হিলহিলে ছেলে ঘাড়ে গলায় হাত জড়িয়ে সেই কাকফর্সা দিতেই এসে সরকারী ফ্ল্যাট বাড়ীর চৌহদ্দির ডাষ্টবীন-গুলোর আনাচে কানাচে চরকির মত ঘুর ঘুর করে। দুজনের বগলে দুটো তোবড়ানো সানকি। আর হাতে একটি করে লাঠি। ফেলটু বলে, আসুক সেই লেড়ীকুত্তার দল। এমন ঝাড়বো না। কেলটু বলে তোর যতো মস্তানী ওই লেড়ীকুত্তা'গুলোর ওপর। ধর, যদি তেড়ে আসে বাবুর বাড়ীর ওই রোমওয়ালা কুকুরগুলো? থ্যাকোন (তখন)—থ্যাকোন কী করবি? ফেলটু সহসা ঠোঁট উল্টে চোখের তারা কোটরে চালান করে দিয়ে মুখে একটা কপট নির্লিপ্ত অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তোলে, তা দেখে খিক্‌ খিক্‌ ক'রে হেসে কেলটু মাটিতে লুটোপুটি খায়। বলে, বা, দেখালি মাইরি,—কিন্তুক ধর যদি এসেই পড়ে শেকল কেটে। অমনি ফেলটুর মুখখানা ভয়ে বিবর্ণ ছাই হয়ে যায়। ভয়ে চোখের তারা দুটো কাঁপতে থাকে। বুকের ভিতরটা কীরকম

দুর দুর করে। তবুও সাহস সঞ্চয় করে কেল্টু। কেল্টুকে চুপচাপ থাকতে দেখে কেল্টু বলে, থামলে কী হবে গুরু? কেল্টুর আচমকা গুরু সম্বোধন কেল্টুর বুকের ভিতর শলাইয়ে ফুলকির মত জ্বলে ওঠে। কেল্টু বলে, শালো মওকা পেলে পটকা ঝেড়ে দেবো একদিন কানা করে। কেল্টু ভগমগ হাসে, বলে, তোকে কি গুরু মেনেছি সাধ ক'রে। তা শুনে কেল্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হ য়ে যায় কেল্টু। হাতের লাঠিটা ঘুরিয়ে সপাসপ্ ছুঁড়ো ঘাসের উপর মারে।

ওদের বিক্রম দেখে অদূরে উবু হয়ে বসা নেড়ীকুত্তার দল আকাশের দিকে চেয়ে মড়া কান্না জোড়ে। পাতিকাকগুলো খা খা ক'রে ডেকে গেরস্তদের বেলা এগারোটার ঘুম ভাঙায়, এ বাড়ী ও বাড়ীর কার্ণিশে ডানা ঝাপ্‌টে বসে। বোধকরি প্রতিবাদ জানায়। এদিকে হাতের লাঠি শক্ত মুঠোয় ধ'রে কেল্টু চিৎকার পাড়ে, বজ্জাত, মানষের খাবারের ওপর ভাগ বসাতে আসবি তো বদন বিগড়ে দেবো। কেল্টু হাতের লাঠিটা সানকির উপর মেরে তা থৈ নৃত্য করে। মাইরি গুরু, তোর বীরত্ব আছে কাই বলিস। দেখে শুনে অবাক মানছি। ব্যাস্, কেল্টু যেন অসুরের মত শক্তি পেয়ে যায় কোথা থেকে চকিতে ডাষ্টবিনের উচ্ছিষ্ট খাবারের কথা ভুলে পাতি কাক আর নেড়ীকুত্তাদের পেছনে তাড়া করে ছোটে। আর সেই মওকায় কেল্টু অন্তর্হিত হ য়ে যায়, এতক্ষণ ধ রে চুপিসাড়ে লক্ষ ক রে যাওয়া ডাষ্টবীনের পেটের মধ্যে।

আট আট বোলটা ফ্ল্যাটের মাঝখানের বড় ডাষ্টবীনটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ফালুক ফুলুক তাকায়। পুলকিত হয় মনে মনে। কেল্টু এতক্ষণে কাক আর কুকুরের পেছন পেছন অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ফিক্ করে এক চিলতে হাসলো কেল্টু। শালো মস্তান, তাপর গব গব ক'রে ঠিক রাক্ষসের মত ছাইপাঁশের গাদা ঘেঁটে উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো গিলতে লাগলো। শাল আর কলা পাতা চাট্‌তে চাট্‌তে জিভে টাগরায় চটাস্ ক'রে শব্দ করলো। ইস্ খাটি ঘিয়ের গন্ধ আস্‌ছে। একেবারে খাটি ঘি। আরও কীসব মসলার গন্ধ। তার নামই জানেনা কেল্টু। কেল্টু তো ছার, তার বাপ ঠাকুর্দাও জানেনা। গতকালই এই ডাষ্টবীনটার সামনে এসে দাঁড়াতেই শুনতে পেয়েছিল রাতে বেশ ধুমধাম খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হ'য়েছে কোন ফ্ল্যাটে। সেই আশায় বুক বেধে সারাটা দিন ধ রে এমন কি রাত বারোটা অবধি এ পাড়ার

কুকুরগুলোর সঙ্গে ঠোক ঠোক ক'রে বেড়িয়েছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, বাড়ীর চাকরবাকরগুলো পর্যন্ত ডাস্টবীনের ধারেকাছে আসেনি। কারণ, ধুমধাম ব্যাপার হলেও বিয়ে পৈতে কিংবা অন্নপ্রাশনের বা শ্রাদ্ধের কোন ব্যাপার ছিল না। এমনি বন্ধু বান্ধব নিয়ে খাওয়া দাওয়া। প্রাইভেট গাড়ী এসেছিল অনেক। হাসি ঠাট্টার শব্দ কানে আসছিল বার বার। ছেলে আর মেয়েদের একসঙ্গে নানারকম গান। কিন্তু উচ্ছিষ্ট নিয়ে কেউ ডাস্টবীনের ধারেকাছে আসেনি। তাই কাঁচা খিস্তি ঝাড়তে ঝাড়তে শেষে ডেরায় ফিরে গিয়েছিল ফেলটু। ফাঁকা সানকিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল রাগে। কিন্তু আজ কাক ফর্সা দিতেই সেই সানকি হাতেই এসে সরকারী বাড়ির গেটের মুখে দাঁড়াতেই চমকে উঠেছিল ফেলটুকে দেখে। ইস্ বাবুর বাড়ির এতসব রঙ বেরঙের খাবারের উচ্ছিষ্টের উপর ভাগীদার। সে আবার, যে সে কেউ নয়, ফেলটু। বুকের ভিতরটা ধুকপুক ক'রে উঠেছিল। এখন সেই ফেলটুকে কাক আর কুকুরের পেছনে ভিড়িয়ে দিতে পেরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে একখানা চিবোন মাংসের হাড় মুখে পুরে চুষতে চুষতে উবু হয়ে ফেলটুকে দেখতে গিয়ে, বাবুর বাড়ির গ্রীলে ঘেরা বারান্দার বড় লোমওয়ালা কুকুরটাকে দেখতে পেল। কুকুরটা বোধকরি অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছিল তাকে। ফেলটু মাথা জাগাতেই গর গর শব্দ তুলে কুকুরটা ভেংচি কাটলো। বোধকরি বিদ্রূপ করলো। সহসা ফেলটুর মনে হলো তবে কি তার গালের মাংসের অসমাপ্ত চিবোন হাড়খানা ওই কুকুরটার? আর দে'র না ক'রে বাকি মাংসের হাড়, মাছের কাঁটা ইত্যাদি দিয়ে সানকি ভর্তি ক'রে ফেললো ফেলটু। তারপর পায়ে পায়ে ভোঁ কাট্টা হয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলো ফেলটুর ডাক। কুকুরগুলোকে যে এক মহূর্তে চৌহদ্দির বাইরে বার ক'রে দিয়েছে সেই বীরত্বটুকু প্রমাণ করার জন্যে ফেলটুর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এসে দাঁড়ালো ফেলটু। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই ফেলটুর। ইতি উতি চোখ ফেরাতেই দেখতে পেলো, বাবুদের বাড়ীর গ্রীল দেওয়া একতলার একটা ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়ানো বৌ ঝি মেয়েরা এমন কি বাড়ির সুখী কুকুরটা উদ্ভক তাকে দেখে টিপে টিপে হাসছে। এমন সময় দেখতে পেল, কোন ফ্ল্যাট থেকে একটা ঝি লাল চকচকে পলিথিনের বালতি করে, এক বালতি নোংরা এনে ফেললো ডাস্ট বীনটায়। আর অমনি হামলে গিয়ে পড়লো ফেলটু। শুধু ছাই, আর নোংরা ছেঁড়া ন্যাকড়া ছাড়া খাবার কিছুই পড়েনি। ফেলটুর সব চেটেপুটে শেষ করা

কলা আর শালপাতার দিকে চেয়ে টস্ টস্ করে কয়েক ফোঁটা জল নেমে এলো চোখ থেকে। মনে পড়লো, ছোট বোন পাঁচির আব্দার। "দাদা, আজ আমার জন্মে এসটোরেটের ভাল ভাল খাবার যা পাবি, নে আসবি। আহা! গত সাতদিন ধ'রে হাসপাতালের চাতালে যমে মানুষে টানাটানি হয়েছে পাঁচিকে নিয়ে। সাত রাত চোখের পাতা এক ক'রতে পারে নি ফেল্টু। জ্বরে ভুগে পাঁচির চলচলে মুখখানা শুকনো আমসির মত হ'য়ে গেছে। সেই মুখের চোয়াল নাড়িয়ে চিঁ চিঁ ক'রে দাদার কাছে আব্দার জানিয়েছিল পাঁচি। তাই সাতদিন পর হাসপাতাল থেকে ফিরেই আজ কাকফর্সা না দিতেই এসে হাসির হয়েছে ফেল্টু।...... আর যেন ভাবতে পারছে না সে। সহসা কেল্টুর মুখখানা ভেসে উঠলো চোখের উপর।

হারামজাদ শুয়ার কা বাচ্চা। শালো, তুমি কাক আর কুকুরের বেহদ্দ। আপন মনে কথাটা বলতে বলতে দাঁতে দাঁত চাপলো ফেল্টু, তারপর ছুটলো কেল্টুর খোঁজে—শালাকে পেলে কপ্‌পোরেশানে জল দে আস্ত গিলে ফেলবো... ভাবতে ভাবতে গলায় ঠিক কুকুরের মত গর্‌গর্ শব্দ তুলে ডেরার দিকে ছুটে গেল।

গল্প

গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস

দিব্যেশচন্দ্র লাহিড়ী

শীতের অতিথি পাখির মত এবারেও হাওড়া ময়দানে জাঁকজমকের সঙ্গে সার্কাসের বিরাট তাঁবু পড়েছে। আর তাঁবু খাটানো মাত্রই চারপাশে যেন উৎসবেরও আমেজ লেগে গেছে বিরাট তাঁবুর চারপাশে ছোট ছোট তাঁবু। এক পাশে পশুশালা। হাতী ঘোড়া উট বাঘ সিংহ বানর মাঝে মাঝে গর্জন। উঁচু বেড়ার ওপাশে কৌতুহলী ছেলে বুড়ো মানুষের দল। নানাধরণের মন্তব্য।

কখনও কখনও এক আধটা চিল ছোঁড়াছুড়ি। সার্কাসের সদর প্রবেশ পথের এদিক ওদিকেও রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে চা-পান বিড়ি-তেলেভাজার প্রচুর দোকান। কিন্তু ময়দানের আসে-পাশের এবং ফুটপাথের ধারী খুপরী-ঝুপরী ঘরের জরাজীর্ণ বাসিন্দাদের হয়েছে বেশ মুস্কিল। বেআব্রু ভিখিরী লোকগুলোর আব্রু বলতে আর কিছু নেই যেন।

তবু তারই মাঝে শুরু হয় ওদের দৈনন্দিন জীবন। ন্যাংটা কালো হাড়-সর্বস্ব ছেলে-মেয়ের দল খাবার সন্ধানে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে। পথ-চারীদের ফেলে দেওয়া খাবারের ঠোঙা কাড়াকাড়ি করে চেটেচুটে দাঁত বের করে ধাবমান বাসগুলোর দিকে তাকিয়ে হি-হি হাসে। আর মাঝে মাঝেই সার্কাসের বেড়ায় উঁকি মারে। এক চোখ কানা বুড়ী হাবলের মা প্রতিদিনের মত ভাঙা চায়ের বাক্সের ওপর আদ্যিকালের ছাতাপড়া বিস্কুট, লাল-নীল লজেন্স আর কয়েকটা পান নিয়ে বসে। কিন্তু তার চেহারা দেখে কোন খদ্দেরই আসে না। পাশেই তিনটি ইঁট দিয়ে সাজানো উনুনে নিখোঁজ চটকল মজুর হারাণের বিধবা বউ বুধুয়া ভিজে কাঠ-কুটে আগুন ধরানোর চেষ্টা করে আর গাল দেয়—মর মর। মুখপোড়াদের মরণ হয় না।

—মরণ কি অত সস্তা রে। —হাবলের মা বলে।

ওপাশ থেকে ছামুর খোলা বউ চিৎকার করে ওঠে —এক্ষুণি শানকিতে গেঁড়োগুলো ধোবার জন্যে রাখলাম, কে নিল?

খুপরীর ভেতর থেকে ছামু গর্জে ওঠে,—মাগী তুই নিজের জন্যে গেঁড়ো-গুলো সরিয়েছিস। শালা—কচুর গেঁড়ো সিদ্ধ করে খাব তাও—শালা তোর—

ওদিকে রাস্তার আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়া ডাবের ভেতরে শাঁসের সন্ধান পেয়ে তার মালিকানার জন্যে ছোঁড়াদের মধ্যে মারামারি বাধে আর খিস্তির তুবড়ি ছোটে।

ফুটপাথের এক পাশে বসে ঠোঁটে বিড়ি নিয়ে তাস ফাঁটতে ফাঁটতে ভিখু বধু বাবুর দল হল্লা করে বলে —লাগা শালা চিক্কুম চিক্কুম—ধর্মেন্দর শত্রুঘন— চিক্কুম চিক্কুম।

জঞ্জালের মধ্যেই ছোঁড়াগুলো মারামারি করে।

ভিখুর বাপ পায়ের ঘায়ে পটি বাঁধতে বাঁধতে মাঝে মাঝেই অভ্যাসবশে পথচারীদের বলে ওঠে—গরীব খোঁড়াকে ভিক্ষে দেন বাবু।

ছামু তার বউয়ের চুলের মুঠি ধরে ঘুঁষা কষে দিয়ে চিৎকার করে,—বল শালী,

কোথায় রেখেছিস গেঁড়ো। তিন দিন পেটে কিছু নাই, তার ওপরে—
রংচটা রাতজাগা সুধামণি রূপসীর ছেঁড়া কানি পরিহিত বিরক্তিভরে একবার তাকায়, তারপরে চোখবুঁজেই আড়মুড়ি ভাঙে আর বলে,—যত ছোটলোকের কাণ্ড।
দূর থেকে সুধামণির ছেঁড়া-ব্লাউজে আড়চোখে এক চুমুক নজর বুলিয়েই মুটে ফুচুলাল গুণগুণ করে গান ধরে,—সুন্দরী—হায় হায় সুন্দরী—
সুধামণি ভুরু কুঁচকে বলে—মর মিনসে।
এদিকে ঢাউস পেট নিয়ে ফুটপাথের ওপর পা ছড়িয়ে বসে বিন্তী সমানে কোঁকায়—আর পারি না। একটু ফ্যান দে—ফ্যান দে।
তাই শুনে হাবলের মা গজগজ করে—সোয়ামীর সাথে সম্পক নাই এদিকে বছর বছর—
বিন্তী নাকে কাঁদে,—বড় যন্ত্রণা গো—বড় যন্ত্রণা
সার্কাসের মাইকে বাজে—ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা।
গান শুনে সকলেই ক্ষণিকের জন্য থমকে যায়।
শুধু বিন্তী কোঁকায়—কচুর শাক কটা সেদ্ধ করে দে। একটু খেতে দে
গান থামলে সার্কাসের মাইকে শোনা যায়—গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস, গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস। আজই শুভ উদ্বোধন। আপনারা দলে দলে আসুন। টিকিটের হার দশ টাকা পাঁচ টাকা দু'টাকা আজ থেকে শুরু। উদ্বোধন করবেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী—আর প্রধান অতিথি থাকবেন মাননীয় মেয়র শ্রী—গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস—
বিন্তীর কোল ঘেঁষে দু'টো হাড় জিরজিরে পেটসর্বস্ব বাচ্চা কান্না জুড়ে দেয়। বিন্তী একটার পিঠে থাপ্পর লাগিয়ে মুখ ঝামটা দেয়—আমাকে খা তোরা, খেয়ে ফেল আমাকে।

বাচ্চা দুটো চোখ বুঁজে প্রকাণ্ড হা করে কাঁদে।

হাবলের মা বিরক্ত হয়ে একটা বিড়ি ধরায়। আর ভাবে কি হয়ে গেল সব। চাল ডাল তেল নুন না জুটলে খাবে কি সবাই? বাঁচবেই বা কি করে? যমের অরুচি সেই ভোটের বাবুগুলোই বা গেল কোথায়? ও নচ্ছারদের ঘরে কি হাঁড়ি চড়াতে হয় না?
—আখে ঝুট বোলে কৌয়া কাটে, কালে কৌয়েসে ডরিও………
সার্কাসের মাইকে গমগম করে গান বাজতে থাকে।

রাস্তা দিয়ে অজস্র মানুষ হেঁটে যায়। বাস ট্যাক্সি কার নদীর স্রোত বয়ে চলে। চারপাশের দোকানে রাস্তায় ফুটপাথে বাজারে শুরু হয় কেনা-বেচা। রোদ বাড়ার সাথে সাথে সার্কাসের তাঁবুর সামনে বেড়ায় চারদিকে ভীড় জমতে শুরু করে। চতুর্দিকের এই অজস্র মানুষের মুখ দেখে মোটেই মনে হয় না যে কারও কোন দুঃখ দুর্দশা অভাব আছে। কিংবা কোথাও কোন গলদ রয়েছে। সবই যেন ঠিক-ঠাক ঘটে যাচ্ছে।

তবুও হঠাৎ ভিখু বদু রামুর তাস খেলা বন্ধ হয়। ওরা উঠে পালায়। বিস্তীর কান্না যেন ক্ষণিকের জন্য থমকে যায়। ফুটপাথ খুপরী খুপসীর বাসিন্দারা সচকিত সন্ত্রস্ত হয়। চাপা হল্লা শোনা যায়—হাল্লা গাড়ি—হাল্লা গাড়ি—পুলিশ।

মুহূর্তমধ্যে সবাই যেন ভয়ে শিঁটিয়ে ওঠে। কালো ভ্যান থেকে ফুটপাথে পুলিশ নেমে গর্জন করে,—হটো, ফুটপাথ সাফা করো, মিনিষ্টর আয়েগা—মিনিষ্টার আয়েগা।

সুধামণি আপন মনে মুখ ঝামটায়, আ মরণ, তোর মুনিষ্টারের কি আমি রাখনি? যা না হাড়কাটায়।

—এই লড়কী বকো মাৎ।

—আ ম লো, মিন্‌সের চোপা দেখ। বলি ও সেপাইজী চাচি পান খায়েগা? সেপাইজীর শকুন চোখ সুধামণির ছেঁড়া ব্লাউজ থেকে আর সরতে নড়তে চায় না। সে একদৃষ্টে তাকিয়েই থাকে।

এদিক ওদিক থেকে দু-চারজন ঘুগনিওয়ালা, ফুচকাওয়ালা, চা পান বিড়ি-ওয়ালাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। —যাওয়ার আগে এখানে ওখানে দু চার ঘা বসিয়েও দেয়। —

কিছুক্ষণের জন্য চারপাশের চাঞ্চল্য যেন একটু থিতিয়ে আসে। একটু পরেই তা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

'বস্তী কোঁকায়—মরে গেলাম, মরে গেলাম।

ছারু বিড়বিড় করে,—কত দিন ভাত খাই নি। একটু ফ্যান।

হাবলের মা পুলিশের বুটে উল্টানো চায়ের বাক্সের তলায় ভাঙা বিস্কুটগুলো খুঁজতে থাকে আর ভাবে ওবেলা থেকে তাকেও উপোস করতে হবে।

ওদিকে ফুদ্দু'লাল নতুন আশায় গান ধরে,—ভাল রোটি খাও, প্রভুকে গীত গাও। সার্কাসের মাইকে শোনা যায়—গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস। গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস।

আজই শুভ উদ্বোধন। টিকিটের হার দশ টাকা পাঁচ টাকা দু'টাকা। মাননীয় মন্ত্রী—বিশেষ আকর্ষণ—অসাধারণ খেলা। হিংস্র সিংহের শিশুপ্রীতি। ভয়ংকর ভয়াবহ নরখাদক হিংস্র সিংহের অতুলনীয় শিশুপ্রীতি। বিশ্বের ইতিহাসে এ খেলা এই প্রথম।

সার্কাসের প্রবেশ দরজায় ক্রমে ভীড় বাড়তে থাকে। বেড়ার চারপাশেও কৌতূহলী ছেলে-মেয়ে-মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু ফুটপাথের জীবন একই ভাবে বয়ে চলে। কখনও চিৎকার, কখনও বা স্তব্ধতা। তবুও এরই মাঝে সার্কাসের উদ্বোধন যেন প্রত্যেকের কাছেই একটু নতুনত্বের একটু বৈচিত্র্যের ছোঁয়া এনে দিয়েছে। সকলেই যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে—কখন শুরু হবে খেলা!

এক সময়ে তাঁবুর ভেতরে কনসার্ট বেজে ওঠে। তাঁবুর দীর্ঘ থামগুলোর মাথায় রঙীন বেলুন উড়তে থাকে। আর গেটের বাইরে ভীড় সামলাতে পুলিশেরা হিমশিম খায়।

—গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস। গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস। আমাদের খেলা একটু পরেই শুরু হবে। টিকিটের হার—। মারাত্মক ট্রাপিজের খেলা—ডেথ জাম্প হাতী জেব্রা সাথী—উটের নৃত্য—আর বিশেষ আকর্ষণ, বিশ্বে এই প্রথম—ভয়ঙ্কর বন্য সিংহের অসাধারণ শিশুপ্রীতি—মানব-শিশুর সঙ্গে নরখাদক সিংহের মিতালী গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস—

বাজনায় মাইকে ভীড়ে গোটা চত্বরটাই গম্‌গম্ করতে থাকে। মিনিস্টারের গাড়ী আসা মাত্রই ভীড় যেন আরও উপচে পড়ে। যান-বাহনের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ সার্জেন্টরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে। বেড়ার চারপাশে মানুষ ক্রমেই বাড়তে থাকে। কনসার্ট আরও জোরে শুরু হয়।

মিনিস্টার ও মেয়রের ছোট্ট বক্তৃতার পর হাততালিতে যেন ফেটে পড়ে তাঁবু। কনসার্টে ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা। মাইকে দৃপ্ত ঘোষণা—আমাদের প্রথম খেলা—বানরের প্যারেড, শিম্পাঞ্জীকে গার্ড অফ অনার—

বাইরে ভীড় ও চিৎকার ক্রমেই বাড়তে থাকে। সে ভীড় সামলাতে পুলিশ এক সময়ে মৃদু লাঠি চালায়। জনতা ও পথচারী ভয়ে বিহ্বল হয়ে এদিক ওদিক ছুটে পালায়। ড্রাইভারেরা মাঝ রাস্তায় গাড়ী ফেলে গা ঢাকা দেয়। চারপাশের দোকানের দরজা ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যায়। আর লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পরস্পরকে ধাক্কা মেরে কে আগে পালাতে পারে সেই চেষ্টা করে।

কিছুক্ষণ পরেই সবকিছু আবার আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসে কিন্তু—

কিন্তু সার্কাসের সদর দরজার ভীড়টা যেন হঠাৎই ঘূর্ণী ঘূর্ণী [illegible]
স মনে ফুটপাথের ওপরে জমায়েত হয়।

প্রচুর লোকে ভীড় করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে।

গোলাকৃতি সে ভীড়টাও ক্রমেই বাড়তে থাকে। কেবলই বাড়তে থাকে। আর দূরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা ভাবে ম্যাজিক কিংবা দাঁতের ম জন কিংবা অন্ধ-শিল্পীর অপূর্ব ছবি বোধহয় ওখানে আছে। গুটিগুটি তারাও ভীড়ের দিকে এগিয়ে আসে। আর ভীড় ঠেলে উঁকি মেরে দেখে—

থিক থিকে রক্তের মাঝে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে শিল্পী। চোখ দু'টি আকাশের দিকে স্থির হয়ে রয়েছে মরা মাছের চোখের মত। ঠোঁটের ওপরে কয়েকটা কালো মাছি সেঁটে আছে। আর কয়েকটা ভন্‌ভন্‌ করে উড়ছে। রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখটায় এখন আর কোন যন্ত্রণার ছাপ নেই যন। কিন্তু দুই উরুর মাঝে রক্ত মাখানো ওটা কি? একটু আধটু নড়ছে বোধহয়। পা দুটো তো এখনও ভেতরেই রয়েছে॥

ভীড়ের মাঝ থেকে কে যেন বলে ওঠে—শিগ্‌গির হাসপাতালে নিয়ে চলুন। কাছেই হাসপাতাল।

—দূর মশাই, মরা মানুষকে হাসপাতালে নেবেই না।

—ছেলেটা বাঁচবে তো?

—মা মরে কাঠ আর ছেলে জ্যান্ত, ডাক্তারে খিস্তী দেবে।

—একটা ডাক্তার ডাকুন না। অনেক ক'টা ডাক্তার আছে আশে-পাশে। ঐ তো—

—মদনা, কি দেবে কে? চালের কে, জি, ছ'টাকা, তেল আঠারো টাকা।

—সবাই কিছু কিছু পয়সা দিন না।

—মদনা, পয়সা দিই আর ওদিকে ছেলেটা যদি বাপ বলে কেঁদে ওঠে?

—এম্বুলেন্স, এম্বুলেন্স ডাকুন না।

—সোজা মর্গে পাঠিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

—দূর মশাই, পুলিশের হাঙ্গামা সামলাবে কে?

—অনেক দিন খেতে পায় নি বোধহয়।

—কিন্তু কত রক্ত মাইরী।

—শালা—চীফ মিনিস্টারকে কান ধরে নিয়ে এসে দেখা।

—দে দে আর বাতেলা মারিস না, সিনেমার লাইনে দাঁড়াতে হবে খেয়াল আছে ?

—আচ্ছা বলুন তো ভারতে প্রতিদিন ফুটপাথে কত শিশু মারা যায় ?

—আমি এ বিষয়ে রিসার্চ করছি। এরা যদি মরবেই তবে জন্মায় কেন ?

—ফুকুর ফুকুর করে বলেই জন্মায়। শা-লা বেজন্মা।

—খবরের কাগজে এ দৃশ্য ফ্ল্যাশ করা উচিত।

—আগে হেলথ মিনিস্টারকে ধরে আনুন।

—সেদিন মশাই চেঁদোর সামনে দেখি একটা ভিখিরী—মানে মেয়ে বেশ ডাগর ডোগর

তাঁবুর ভেতরে হাততালি পড়ে। মাইকে কনসার্ট দ্রুততর হয়।

আর এদিকে শিশুটির দেহ ঘিরে ভীড় আরও বাড়তে থাকে। নানারকম মন্তব্য—পরামর্শ—উত্তেজনা আলোচনা সমানেই চলে।

এক ফিনফিনে সিল্কের পাঞ্জাবী বেল-বটমকে বলল,—রাবিশ, এ দেশে মিলিটারি ক্যুপ হবে দেখবেন

বেল-বটম বুশ শার্টকে,—এদের সেক্সি হিরোইন কে বলুন তো ?

বুশ শার্ট পাজামা-গুরু পাঞ্জাবীকে, ইনফ্লেশন আর হোর্ডিং বন্ধ না করতে পারলে ·

গুরু-পাঞ্জাবী, এবরশন লিগ্যালাইজড্ মানলুম কিন্তু ভিউ স্লিপে বার্থকে কন্ট্রোল করতে না পারলে সায়েন্সের

ধুতি শার্ট,—কথাটা গরীব হটাও, না গরীবি হটাও ? বড় বাজারের চারজন ভাড়াটে ব্যবসাদারের কোমরে দাড় দিয়ে আর গোটা কলকাতায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ কালো টাকা ধরে মুর্খেরা—আচ্ছা আমি চলি—বিকেলে গুরুজীর নামগান আছে।

—ছেলেটা বোধহয় বেঁচে আছে।

—ধুকপুক্ করছে। কিন্তু কাঁদে না কেন ?

—দুর—পুরো ডেলিভারি না হলে,—পা দুটো এখনও তো ভেতরেই আটকে আছে।

—'গুপ্তজ্ঞান' ফিল্ম-এ এসব পিকচার ভিভিড।

সার্কাসের মাইকে জবরদস্ত কনসার্ট আরও দ্রুততর হয়। তারই ফাঁকে শোনা যায়—গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস। এবারে আজকের সেরা খেলা—ভয়ঙ্কর সিংহের শিশুপ্রীতি। নরখাদক সিংহের সঙ্গে তিন বছরের শিশুর—

হঠাৎ ভীড় সরিয়ে কোথা থেকে হাবলের মা এসে দাঁড়ায়। আর একঝলক দেখে নিয়েই হু-হু করে কেঁদে ওঠে—বিস্তীরে। তারপরেই ভীড়কে লক্ষ্য করে—হারামজাদা আবাগীর বেটা,, খানকীর বাচ্চারা তোরা মানুষ! তোদের মরণ হয় না? অ বুধুয়া, অ সুধামণি শিগগিরি গরম জল আর ন্যাকড়া আন। ব্লেড আন। মিন্‌সের দল হাঁ করে দেখছিস কি?

ভীড় পাতলা হয়। ছায়্‌ আর ফুর্‌লাল একটা নোংরা শাড়ীর দু'প্রান্ত ধরে জায়গাটাকে ঘিরে দাঁড়ায়।

সিংহের গর্জন ছাপিয়ে মাইকে অতি দ্রুত কনসার্ট বাজতে থাকে।

আর একটু পরেই যেন লোকজন ভীড় গাড়ী মাইকের বাজনা, সব কিছুর শব্দ, কোলাহলকে ছাপিয়ে একটা শিশু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে,—ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া।

মৃত্যু

অনিমেষ রায়

সফরের শুরুতে সবেমাত্র গাড়ি ছাড়ার সময় উচ্চৈস্বরে যোগানের মতই ভেসে এল একটা আর্তনাদ!

বিশেষ যার অবস্থা ছোট, জাত ছোট, জগৎ ছোট, ছেলেটা আরও ছোট। থাকত পাড়ার কোণের বাড়িটার এক কোণে। এসেছিল নিঃশব্দে, থাকত নিঃশব্দে। শুনলাম বোবা ল্যাংড়া ছেলেটা মরেছে।

মায়ের কাঁদার সময় নেই! ছোটলোক ওরা, ওদের কান্নাও ছোট। শোকের সময় কৈ? শোকযাত্রার চাঁদা কুড়োতেই ও তো চলেছে।

যাওয়া আসা সবটাই সত্যি। শব্দময় জীবনের আশায় মায়ের যে পাঁচ সাতটা বছর কাটিয়ে গেল বিশে, ওটাই ছিল ওর মৃত্যু। এখন ও মুক্ত।

মৃত্যু দুঃখ আনে কিন্তু এ ছেলেটা যেন দুঃখটা সঙ্গে নিয়ে গেল। অনেকেই বলল—মুক্তি পেল, খালাস পেল।

খালাস কে পেল? সত্যিই কি পেল? না দিল?—জানিনা।

গল্প

অ জা ন্তে

প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশের উত্তর পশ্চিমকোণে মেঘ জমতে শুরু হয়েছে। সামনের পুকুর পাড় পেরিয়ে মেঠো রাস্তা। গরুর গাড়ির চাকায় চাকায় ধুলো উড়ছে। খরখরে গাছপালা বাতাস নেই একটুও। ঐ পথ দিয়ে মানুষ চলছে, গাড়ি চলছে। কেউ মেলায় যাচ্ছে আবার কেউবা ফিরছে। কেউ যাচ্ছে কেনা কাটা করতে আবার কেউ বা ফিরছে কেনা কাটা সেরে। কেউ সারারাত ধরে যাত্রা দেখবে, সিনেমা দেখবে। আলকাপ ঝুমুরের দল এসেছে। সাধন ঠাকুরের দাওয়ায় অদূরে পুকুরের পাড় দিয়ে মানুষের মিছিল চলেছে। এ গাঁয়ের ভিন গাঁয়ের মানুষের দল। বেলুন উড়ছে নানারঙের। গ্যাস পোরা। সূর্যি ঠাকুরের দিকে মুখ করে উড়ে যাচ্ছে তারা। কেউ গান করছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলেছে। ভারী সুন্দর। এক উৎসবের জোয়ার নেমেছে যেন গ্রামের বুকে। পুরাণো দিনের লোকেরা বলে, আগের দিনের মত মেলার সেই জোর নেই সেই আনন্দ নেই। আগে নাকি আরও লোক আরও আনন্দ আর হাসিখুশির ভাব ছিল মেলায়। এখন বাস চলে দিনরাত। বাইরের মানুষ বাসে চেপে আসে আবার মেলা দেখে কেনাকাটা সেরে চলে যায়। সেই জমাটি আসর কেমন যেন খাপছাড়া। কেমন যেন প্রাণের চেহারাটা কেমন করে যেন পালটে গেছে।

অথচ সাধন ঠাকুরের ছেলে লক্ষীকান্ত এসব কিছুই বিশ্বাস করেনা। সে নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে বসে এই সব যাত্রী দেখছে আর বাপের উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। আগের দিনের সবকিছুই ভাল, সবকিছুই আনন্দের—বাপের যেমন কথা। —হলই বা বাপ, তারও কী শখ্ আহ্লাদ থাকতে নেই? পিতৃত্ব ফলাচ্ছে?' থাকল তোর জমি জায়গা বসত বাড়ি, আমার কী? গতর আছে খেটে খাব।

গতকাল সে মেলায় গিয়েছিল। এক তাজ্জব ব্যাপার। কত মানুষ আর আজব সব কাজকর্ম তাদের। সার্কাস পার্টি, ম্যাজিক, নাগরদোলা,

রকমারি রকমের দোকান, সিনেমা, পুতুলনাচ, যাত্রা, ঝুমুর—মাথা ঘুরে যায়। লক্ষ্মী অবাক হয়ে এক পানের দোকানে দাঁড়িয়ে সার্কাস পার্টির বড় বড় মেয়েদের ফ্রক পরে ঘুরতে ফিরতে দেখেছে। সে আরও দেখেছে বাঘ, সিংহ, ভল্লুক কত মজাদার সব জিনিস। বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছিল তাঁবুর ভিতর সে মেলাতে রাত কাটাবে ভেবেছিল। অবাক চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় সে মনে করল অনেক লোকের মধ্যে সে ইচ্ছে করেই হারিয়ে যাবে। লক্ষ্মী জানত না, ইচ্ছে করলে হারিয়ে যাওয়া যায় না। তবুও সে একসময় গগন মণ্ডলের চোখের আড়ালে সোজা হাঁটতে হাঁটতে বড় বিলটা ঘুরে ওপারে গিয়েছিল। দেখল এক তাঁবুর পাশে ঝুমুরদলের ছেলেমেয়েরা হাসা-হাসি করছে নিজেদের মধ্যে। ওদের হাসির মধ্যে কেমন একধরণের নেশা। ঘুম ঘুম ভাব। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। এই তাঁবুর পাশেই বড় বড় লম্বা বেলুনকে বাতাস ভরে দিয়ে নানারকমের আকৃতিতে বিক্রি করছে দোকানী। ঝালবড়া পাঁপড় ভাজার তেলপোড়া গন্ধ বাতাসে। গরুর গাড়ির ভিড় ঠেলে ম্যাজিক দেখানোর তাঁবু, বাইরে কঙ্কালের চেহারা আঁকা পর্দা। পাশে মাটি কোপানো খোলা জায়গায় কুস্তি হচ্ছে। পনেরো পয়সার টিকিট। সে টিকিট কেটে পালোয়ানদের দেখেছিল। আর সেখানেই সে একসময় ভিড়ের চাপে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল একটি অল্পবয়সী ভিনগ্রামের মেয়ের গায়ে। মেয়েটি তাকে কিছুই বলেনি কিন্তু অদ্ভুত আবেশে মেয়েটি সারাক্ষণ তার দেহ স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুস্তি দেখেছিল। তারপর ওর হাতটা ধরেছিল। লক্ষ্মীর সারাদেহ কেঁপে উঠেছিল। সামনে কুস্তি চলেছে অথচ তার মনে ঝড়। মেঘ নেই, বাতাসে নেই অথচ কী এক অবাক যন্ত্রণায় তার হাঁটু থেকে পা অবধি কাঁপতে থাকল তারপর সহসা হাততালি লক্ষ্মী হাত ছেড়ে হাততালি দিয়েছিল।

লক্ষ্মী দেখেছিল, কোপানো মাটির ওপরে একজন আর একজনের বুকের ওপরে বসে বিজয়ের হাসি হাসছে। চিৎকার করে কে যেন বলে উঠল: বা'জিয়াৎ ভাইয়া, ছোড় দিজয়ে।'

ভিড় পাতলা হয়ে এলে লক্ষ্মী কুস্তির আখড়া ছেড়ে বাইরে এসে সেই মেয়েটিকে আর দেখতে পায়নি। কিছুক্ষণ আগের সেই প্রাণকাঁপানো নেশা কীভাবে যেন ভেঙে গিয়েছিল। সে আর অপেক্ষা করেনি আবার হাঁটতে হাঁটতে সে এগিয়ে যেতে থাকে। দূরে বাস আর ট্রাক দাঁড়িয়ে। শহরের

মানুষ এসেছে, পোষাক আশাকে সে মানুষ করতে পেরেছিল।

ঠিক এমনি সময়েই ফটিক হাড়ি লক্ষীকে দেখতে পেয়েছিল। একেবারে খপ্ করে তার হাতদুটো চেপে ধরে বলেছিল: ঠাকুরের বেটা, তুমি কেমন ছেলে গা? ওদিকে গগনভাই তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ আর এখানে দাঁড়িয়ে তুমি কিনা মজা দেখছ? দাঁড়াও তোমার বাপকে গিয়ে সব বলব।

বাপ্‌কে সে আর ভয় করেনা তবুও মেলার এত লোকের সামনে ফটিকের অপমান সে নীরবে সহ্য করেছিল। একান্ত নিরুপায় হয়ে সে ফটিকের পিছু পিছু ফিরে এসেছিল। একটু আগে সে নিজের হাতের গন্ধটা শুঁকে দেখেছিল, এক অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ হয়তো ফুলের গন্ধই হবে, সেই অচেনা মেয়েটার গন্ধ, যে মেয়েটা একান্ত আপনজনের মতো ভিড়ের মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে হাত ধরেছিল সেই কুস্তীর আখড়ায়।

গতকাল রাতে সে হাতের কাছে নাক রেখে ঘুমিয়েছিল। এক অদ্ভুত শিহরণে সে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। বাপে বুঝতে পারেনি। একান্ত দুশ্চিন্তা নিয়েই সাধন ঠাকুর ছেলের গায়ে হাত দিয়ে দেখেছিল জ্বর কিনা। বাপের আদিখ্যেতা লক্ষীর পছন্দ হয় না। বাপে ছেলের গায়ে কাঁথাটা টেনে দিলেও সে সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। বাপ বুঝেছিল, ছেলের অভিমান হয়তো।

লক্ষী জানেনা ফটিক সব কথা বাপের কানে তুলেছে কিনা। কিন্তু আজ আর লক্ষীর মেলায় যাওয়া হল না। সাধন ঠাকুর মেলায় আজ হালের এক জোড়া বলদ কিনতে যাবে। লক্ষী মেলায় যাবার কথা বলতেই সাধন ঠাকুর একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন: অবিবেচক হসনে লক্ষী, বয়স হয়েছে, নিজের সংসার এবার বুঝে নে। আমি আর ক'দিন? মাঠের ধান পড়ে আছে, আর তুই কি না মেলায় গিয়ে ফুর্তি করবি? বুড়ো বাপের ওপর তোর একটুও মায়া হয় না?

লক্ষী সবে যোয়ান হয়েছে। বাপের এই খেদ সে ভাল মনে নিতে পারল না। একটু রাগ করেই বলল: তোর জমি জায়গা তোরই থাক বাপ, আমার লোভ নেই। আমি মেলায় যাব।

সাধন ঠাকুর ছেলের কথায় জন্তুর মতো ধমকে বলল: কেন মেলায় কি আছে? ফুর্তি? পেটে দানা পড়লে অমন ফুর্তি সারাজীবনই থাকবে। হালের বলদ না কিনলে সংসার চলবে কি করে শুনি? গেল সন কী রকম খরা গেল দেখলি না? আমি তো রাজা মানুষ নই যে··

লক্ষী খাবা দিল : তোর সংসার তুই বুঝেনে বাপ্। আমার সঙ্গে তোর কোনদিনই বনিবনা হবে না। থাকল তোর সংসার...

বাপে আর সহ্য করতে পারল না। হুঁকোটা দাওয়ায় হেলান দিয়ে রেখে সোজা ছেলের গালে ঠাস করে এক চড় মারল সে। আর যায় কোথায়? বাপকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে লক্ষী সোজা পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়াল। তারপর সে এখন কী করবে ভাবতে লাগল। সে পালিয়ে যাবে—আর কোনদিনই সে ফিরে আসবে না, তারপর বুঝবে! লক্ষীকে মারা? বাপ্ হয়েছে বলে নিশ্চয়ই মাথা কিনে নেয়নি একেবারে। শেষ পর্যন্ত রাগে দুঃখে অভিমানে লক্ষীর চোখে জল এল। সে পুকুরের পাড়ে চুপ করে বসে বসে নিজের মনে ফুঁসতে লাগল।

ছেলেকে হঠাৎ রাগের বশে চড় মারাতে সাধন ঠাকুর মনে মনে কিছুটা অনুতপ্ত হয়েছিল। ছেলে অবুঝ বড়। অবুঝকে সে বোঝাবেই বা কি করে? ছেলের এতটা বয়স হল তবু জেদ গেল না। আর ছেলেরই বা দোষ কোথায়?

মা মরা ছেলে। কত ছোট থেকে আদর দিয়ে দিয়ে সেই তো ছেলেকে জেদী আর অভিমানী করে তুলেছে। ছেলের বয়স হয়েছে অথচ বাপের মন বুঝতে চায় না কিছুতেই। পোড়া চোখ দুটো এখন জ্বালা করে শুধু কিন্তু জল নেই। ভীষণ খরা। ধু ধু করে চারিদিক। নিজের অদৃষ্টকে দায়ী করে সান্ত্বনা খুঁজতে চেষ্টা করে শুধু। দিনের হালচাল পালটে গেছে। কীসব কথা লোকের মুখে। যারা বাবু ছিলেন তারাও দুঃখী হয়ে গেলেন। সেই গ্রাম আর নেই, সেই ভালবাসা নেই প্রেম আর নেই। কেমন সব খাপছাড়া। ফটিক হাড়ি এখন গ্রামের নেতা। তার কথাতে এখন গ্রামের শ'য়ে শ'য়ে মানুষ চলছে। অথচ কী দিন ছিল একসময়ে। লক্ষীরা না জানুক সে তো জানে। তাই আজও বাবুদের বাড়ির কাউকে দেখলে সে প্রণাম করে, সমীহ করে কথা বলে। গাঁয়ের কারোর মনে আর শ্রদ্ধা নেই সবাইকে অবজ্ঞা। সাধন ঠাকুরের এসব ভাল লাগে না। এসব দেখে শুনে সে বোবা হয়ে গেছে।

সাধন ঠাকুর আর দেরি করল না। সে একসময়ে ছেলের সন্ধানে পুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়ালো। সে দেখল লক্ষী বসে আছে, থমথম করছে সারা মুখ। মায়া হল, ছেলেটার মুখ দেখলে তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়। অদ্ভুত মিল ওর মুখের সঙ্গে। সেই চোখ সেই নাক সেই রঙ। প্রাণটা

কেঁপে ওঠে। ওর মনে পড়ে যায় স্ত্রীর সেই মৃত্যু শয্যার পাশে ছেলেটার হাতটা ধরে সে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল স্ত্রী কিছুই বলতে পারে নি। শুধু ছল ছল করা চোখ থেকে গড়িয়ে পড়েছিল চোখের জল। বালিশ ভিজে গিয়েছিল, তারপর এক ঝড়ের রাতে সব শেষ। তার সংসারের শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতেই হয়তো লক্ষী এসেছিল, নইলে সংসারে তার আর আসক্তি কোথায়। দিন গেল মাস গেল বছর গেল, এভাবে সময় চলে গেল এক টানা। স্ত্রীর দেনা চুকিয়ে সেও মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে, এখন শুধু ডাক আসার অপেক্ষা। এসব কথা ভাবতে ভাবতেও সে বুঝতে পারে তার মায়া এখনও যায় নি! এক অদৃশ্য মায়ার বন্ধনে সে এখনও জড়িয়ে আছে। লক্ষী এখনও মানুষ হল না।

সে একসময় ছেলের দেহ স্পর্শ করল পরে ধীর গলায় সে বলল : তুই আমার ওপর রাগ করিসনে বাপ্ বুড়ো হয়েছি বুড়ো হয়েছি বুঝতেই পারছিস, সব সময় মাথার ঠিক থাকে না।

সাধন ঠাকুরের গলায় রীতিমত মিনতির সুর, তবুও লক্ষী বাপের হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে দিয়ে বলল : আদিখ্যেতা রাখতো।

অসহায় মুখটা তুলে ধরে সাধন ঠাকুর পরে বলল : বাপের সঙ্গে ওভাবে কথা বলে না লক্ষী। আমার যা কিছু সবই তো তোর জন্য। আমার আর কে আছে বলতে পারিস? সামনের মাসেই তো তোর জন্য মেয়ে দেখছি। তোর বিয়েও দেব, আমার সব ঠিক করা আছে।

লক্ষী একথার কোন উত্তর দিল না। সাধন ঠাকুর পূর্ব কথার জের টেনে বলল : আজ আর তোকে মাঠে যেতে হবে না। বাড়ীর পিছনের বাঁশ ঝাড় থেকে চারটে খুঁটি করার মত বাঁশ কেটে রাখিস, দড়ি তো ঘরেই আছে, কাল বরং বাপ বেটায় মিলে ঘরটা মেরামত করে নেব। বলা যায় না যে রকম ঝড় উঠছে আজকাল।

পিছন থেকে গগন মণ্ডল এসে ডাকল : কী ঠাকুর! তুমি এখনও তৈরী হও নি?

সাধন ঠাকুর সত্যিই লজ্জায় পড়ল আজ গগন মণ্ডলের সঙ্গে সে বলদ কিনতে মেলায় যাবে এই কথা ছিল। সুতরাং সে আর দেরি করল না। ঘরে গিয়ে গামছার খুঁটে টাকাগুলি বেঁধে নিল সে। তারপর ছাতা আর লাঠি নিয়ে সোজা এসে নামল সেই মেঠো পথে ধুলো উড়ছে, মানুষের মিছিল চলছে যেন। দূর থেকে সে একবার চেয়ে দেখল, লক্ষী তখনও

পুকুরের পাড়ে বসে রয়েছে।

গগনের সঙ্গেই তার সুখ দুঃখের কথা হয়। সে তাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে পথ হাঁটতে হাঁটতে বলল : আমার কপাল ভাল নয় ভাই। একেক সময় আমার মনে হয় কি জান? মনে হয় এই জমি জায়গা হাল গরু বেচে দিয়ে কোথাও চলে যাই। কী হবে সংসার গুছিয়ে? আমার একটা ছেলে, সেও মানুষ হল না।

গগন মণ্ডল পূর্বেই এমন কিছু একটা অনুমান করেছিল। ছেলের সঙ্গে আজকাল অনেকেরই বনিবনা হয় না। গগনের অবশ্য সে ভাবনা নেই। সংসারের ঝামেলার ভয়ে সে আজীবন সংসারই করল না। তবু বন্ধুবান্ধবের সংসারে নিত্যকার অশান্তির সে খবর রাখে। তাই কিছুটা সহানুভূতির সুরেই বলল : চাষীর ছেলেদের চোখে এখন শহরের নেশা লেগেছে ভাই। জমি চাষ কি আর ভাল লাগবে ওদের? এসব দিনকালের দোষ! তোমার আমার নয়।

গগনের কথাগুলি সাধন ঠাকুরের বেশ লাগে। তবু তার মনে হয় কোথায় যেন মস্ত একটা ভুল থেকে যাচ্ছে। এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত একদিন সকলকেই করতে হবে।

লক্ষ্মী দূর থেকে দেখছিল ওদের দুজনের মিলিয়ে যাওয়া। এই পুকুরে পাড় থেকে বহুদূর দেখা যায়। তারপর একটা বড় বাঁকের আড়ালে ওরা চলে গেলে সে আবার ভাবতে লাগল : আজ না হক এর মধ্যে সে একদিন এখান থেকে পালিয়ে যাবে। বাপ হয়ে ছেলের মন বুঝতে পারে না কেউই। যে সংসারে মন লাগে না সে সংসারে সে নাই বা থাকল। সে শহরে যাবে। শহরে কত হাল ফেশান, কত মজা। গতর আছে যখন তখন সেখানেই সে খেটে খাবে।

দুপুরের ছায়া নামতে থাকে। শালিক পাখীদের কিচিমিচি শব্দ। ঐ পাশে দুটো কাঠবিড়ালী এক নাগাড়ে সাধনের কাঁঠাল গাছে ওঠানামা করছে। কোঠা ঘরে গত রাতে ইঁদুরদের দৌরাত্ম্য গিয়েছে। পুকুরের জলে মাছ লাফানোর শব্দ। সবকিছু মিলিয়ে লক্ষ্মী দারুণ নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকে।

আমড়া গাছের ডালে বসে দাঁড়কাক ডাকছিল। কাকের ডাক তার একটুও ভাল লাগে না। মা যেদিন মারা গিয়েছিল সে তখন বছর দশেকের ছেলে। ওর মনে আছে গোঁসাই বাড়ীর মাধব বাবাজী এই কাকের বিশ্রী

ডাক শুনে এই বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে লক্ষীর বাপকে ডেকে বলেছিল : শুনই তো শুনলে ঠাকুর, এখন আর কি ? এখন কাজীর বাপের মাথার কাছে বসে হরিনাম কর।

তারপর সে কী ঝড় উঠল রাতে ; মা আর বাঁচল না। সব কেমন হয়ে গেল।

দাঁড়কাকের ডাকটা ভীষণ বিশ্রী লাগছে কানে। একটা ঢিল তুলে লক্ষী তাক করে ছুঁড়ল। কাকটা উড়ে গেল বটে কিন্তু বাড়ির পিছন দিকে আবার ডাকতে লাগল। লক্ষীর প্রাণটা ছ্যাৎ করে উঠল।

এক এক করে অনেক কথাই মনে পড়েছিল তার। গত সপ্তাহেই তো সে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল জমি নিয়ে। বাপ বলছিল : গ্রাম ছাড়বি নে লক্ষী ! জমির মতন আর জিনিস নেই রে। তোর যা রেখে গেলাম তোর অভাব হবে না। একটু নজর রাখবি তাহলেই চলবে।

সে বলে ছিল : চাষবাস আমার দ্বারা পোষাবে না, আমি শহরে ব্যবসা করব।

বাপে হেসেছিল শুনে : চাষীর ছেলের আবার ব্যবসা ? ব্যবসার আমরা কি বুঝি ? সব লোক ঠকিয়ে খেয়ে নেবে। অবুঝ হসনে। আমি যখন তোর বাপ তখন নিশ্চয়ই তোর অমঙ্গল চাইতে পারি নে। তুই পরের কথায় আর নাচবি না।

দাঁড়কাকটা তখনও ডাকছে বিশ্রীভাবে। কেমন কাঁপা কাঁপা গলার আওয়াজটা। ভিতরটা কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। লক্ষী আবার উঠে দাঁড়াল। কাকটাকে ঢিল মেরে উড়িয়ে দিতে হবে।

আকাশের উত্তর পশ্চিম কোণে সেই জমাট মেঘটা ক্রমেই ছেয়ে ফেলছে। লক্ষীর মনে কেমন আশঙ্কার ছায়া নেমে এল যেন। ঘরের অবস্থা তার অজানা নয়। যদি গত সপ্তাহের মতো আবার ঝড় ওঠে। বাপ যাবার আগে বাঁশের খুঁটি করার কথা বলে গেছে। কী জানি ঝড় উঠলে ঘরের অবস্থা কী হবে বলা যায় না।

সে আর দেরি করল না একটুও। বাঁশঝাড় থেকে সে মনোমত বাঁশ কেটে আনল। তারপর ধীরে ধীরে মাপ করে কেটে নিল। থম থমে আশ্চর্য প্রকৃতির নিস্তব্ধতায় লক্ষী একটানা শব্দ করে কাটতে লাগল খুঁটি। ঝড়ের আগেই সে যেন সব কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে।

গত হপ্তাহেও ঝড় উঠেছিল। ভীষণ ঝড়। সমস্ত ঘরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। লক্ষ্মী দুহাতে সজোরে ঘরের চালটা ধরে ছিল একা। ঘরটা ভেঙে পড়ে যদি। বাপ মাঠ থেকে একরকম ছুটতে ছুটতে চলে এসেছিল।

আজ আবার যদি ঝড় ওঠে! লক্ষ্মী ভয় পেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল কেমন অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। দাঁড়কাকটা একটু আগে ভয়ঙ্কর বিশ্রী স্বরে ডাকছিল। ওর ভাল লাগছে না।

ঠিক এমনি সময় বিদ্যুতের চোখ ধাঁধানো আলোর সঙ্গে সঙ্গেই বাজ পড়ার বিরাট শব্দ। লক্ষ্মী কান ঢেকে দাওয়ায় উঠে বসল। তারপরই ধুলোর ঝড়। সবকিছু ঢেকে ফেলল যেন নিমেষের মধ্যে। লক্ষ্মী জানে একটু পরেই সেই তাণ্ডব শুরু হবে।

দূর থেকে তার চিনতে কষ্ট হয়নি। একরকম দৌড়োতে দৌড়োতেই সাধন ঠাকুর মেলা থেকে ফিরে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত আকাশের অবস্থা দেখে তার আর সাহস হয়নি। বাপকে অসময়ে ফিরে আসতে দেখে একটু আগের নিঃসঙ্গতার মাঝখানে সে অনুভব করল, এতবড় আপনার লোক তার আর কেউ নেই।

সাধন ঠাকুর প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলল: তুই একা বাড়িতে আছিস ভেবে আমার কেমন যেন ভয় লাগল লক্ষ্মী। আমি তাই সগনকে রেখে চলে এলাম রে। জানিস তো তুই রাগ করলে আমার আর কিছু ভাল লাগে না। বিশ্বাস কর, আসছে কাল আমি তোকে নিয়েই মেলায় যাব। তোর পছন্দমত বলদ কিনব, কি বল?

বাপের সকরুণ ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মী কাঁদতে চাইল, কিন্তু পারল না। বাইরে তখন ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

●● 'চেতনিক'-এর সহৃদয় লেখকবর্গের প্রতি সানুনয় অনুরোধ:

- পত্রিকাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পত্র দিয়ে নিশ্চিন্ত করবেন।
- আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ করবেন। উদাহরণ স্বরূপ: বাড়ি, গাড়ি (দেশী শব্দ), মিউনিক, স্টক (বিদেশী শব্দ), মর্ম, কার্য (রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব পরিহার), পুজো, কাজ, সুজি (তদ্ভব শব্দ), ইত্যাদি।
- অপ্রবীণ লেখকরা উত্তর পেতে চাইলে পত্রের সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠালে ভাল হয়।

আসা যাওয়ার পথের ধারে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আসা যাওয়ার পথের ধারে ঠোঁট উল্টিয়ে বসে থাকে
কাপুরুষের মর্জি ,
দিনের হাওয়া ঘণ্টা বাজিয়ে যায় নতুনতর সর্বনাশের,
রাতের হাওয়ায় নিস্তব্ধ গ্রামের জঠরের ক্ষুধা হা হা করে ।
কাপুরুষ তবু বেহালা বাজিয়ে যায়,
প্রভু যে-রকমটি চায় সে-রকম ছড়া তৈরী ক'রে…
দাসব্যবসায়ে পোক্ত প্রভু গালে হাত দিয়ে ভাবে ।

আগুন ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে,
কয়েকটি ক্রীতদাস তবু হিজিবিজি লেখে ,
প্রভু না বললে ওরা দিন বদলে
বিশ্বাস করবে না ।

সারারাত সারাদিন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সারারাত সে ঘুমের ভেতর জেগে ওঠে
দেখেছে পুলিশ তার তেরো বছরের
দাদাকে মারতে মারতে
কালো গাড়িতে চড়িয়ে, তারপর আবার
মারতে মারতে…

ভোর হ'তে না হ'তে
দারুণ ভয়ে সে মায়ের গলা জড়িয়ে
'দাদা কোথায় ?' ব'লে কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

দাদা ঘরেই আছে। কিন্তু মা জানেন,
ঘরগুলি ভাঙছেই, কেউ বাদ যাবে না,
তাই সারা দুপুর
কোলের ছেলে ভয়কে তাড়িয়ে
বাঘবন্দী খেললেও
তিনি ঘুমুলেন না, এবং সারারাতও
তিনি ঘুমাননি।

সে কখন

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

একলা একলা গাছ কিংবা পাখির মতন কেউ কাউকে মানে না
জলাশয়ে মেঘ ছায়া ফেলে চলে যায়
কেউ বলে ধূলিঝড় কেউ বলে সাদা হাসি কাঁর,
আমরা সর্বনাশা আগুনের কাছাকাছি বসে
যে আগুন দেবতা
যে-আগুন প্রথম মানুষ জেনেছিল অগ্নীশ্বর বলে
সে ত নদীর মতনই স্নিগ্ধ নক্ষত্রের আলো,
বেহিসেবী ঢুলে পড়লে
সে আমাকে পোড়াতেও পারে...
প্রত্যেকে এখন একলা, কেউ কারো কথাটি শোনে না
স্বাধীন নৈরাজ্যে আমরা ভাবছি, শুধু ভাবছিই
কখন করতাল দিয়ে বেজে উঠবে মৃদঙ্গ মন্দিরা
আগুনের চারপাশে
বেজে উঠবে আনন্দলহরী।

ঝুমঝুমি

বাসুদেব দেব

•

খোলা কবিতার বইয়ের ওপর পড়ে
তুষার তিমির প্রকৃতির অবহেলা
পর্দা সরিয়ে হঠাৎ কে যেন ডাকে
'যাই' বলে উঠে দেখো ঝরে যায় বেলা

গ্রামের লোকেরা ফিরে যাবে এই পথে
আমি তো ওদের কেউ নই কেউ নই
ভাঙা ঝুমঝুমি দেব কোন বালিকাকে
সন্ধ্যার বাঁকে চাপে রহস্যময়ী

শব্দের ষড়যন্ত্রের থেকে দূরে
সে যখন করে একলা নিলাজ স্নান
মহুয়া গাছের ওপরে পূর্বে চাঁদ
যেন তৃষ্ণার নয়ন অনির্বাণ

খোলা কবিতার বইয়ের ওপর নামে
ভালাখ্যাপা মেঘ মরণশীলতা ঢাকে
উলের কাঁটায় স্মৃতি ফুটে ওঠে ফুলে
রাঙা ঝুমঝুমি দেবে কোন বালিকাকে

রওনাক নঈমের দুটি কবিতা

মূল উর্দু থেকে অনুবাদ :
কবিরুল ইসলাম

পণ্ডশ্রম

ফুলের রাণী রৌদ্র থেকে
ডিসেম্বরের লাজুক সকালবেলায়
রাঙা ঠোঁটের প্রথম হাসিটুকু
আমি দেখতে চাই।

অর্থাৎ গিঁঠে বাতাস বেঁধে
এবই সাঁস ঘুরে বাঁবাব প্রবৃত্তি।

পুকুর

এই পুকুর আমাকে খুব ভালো করে চেনে :
জিভ যখন শুকিয়ে আসে
আমি তার কাছে যাই
আকণ্ঠ স্নান করি
তার পূর্ণ স্পর্শে পাই পরম তৃপ্তি
এটা অবশ্য ঠিক যে আমি একটাও ঢিল ছুঁড়িনি
আমার এই পুকুরে
কিন্তু কখনও সখনও, মিথ্যে বলে লাভ নেই,
অন্য পুকুরে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করেছে।

সোনার বাংলা চাই

ফজল-এ-খোদা

লাংগলের ফলা হোক অস্ত্রের সুতীক্ষ্ণ বেয়োনেট
মাটির শরীর খুঁড়ে ফালা ফালা করে নিই
তপ্ত রক্তবীজ বুনি বাংলার অনাবাদি সকল অংগনে
শিশুর হাসির মত হাসুক ফসল গ্রামে গঞ্জে ও শহরে।

বিধ্বস্ত বাংলা ফের আগের বাংলা হোক
উঠোনে ধানের পালা পুকুরে মাছের ঝাঁক
বাগানে কুমড়ো ফুল গোয়ালে দুধেল গাই
নবান্নের উৎসব হোক প্রতিদিন ঋতুতে ঋতুতে।

বধূর কলস ঘাটে যাক না জলকে যেতে সকাল বিকেল
লাল পেড়ে শাড়ি হোক হাটের সওদা প্রতি চাকির ভিতর।

[এক পত্রে বর্ষীয়ান কবির নির্দেশ :

"আপনার 'ভিখরের মোরগ' দিয়ে ছাপুন্। কবিতাটি ভাল হয়েছে।"

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ভিখরের মোরগ

(একটি একক সংলাপ)

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গর্‌জা— !

গর্‌জা— !

গর্‌জা— !

ভিখরের মো–রগ্‌টো গুঁ—সায় গর্‌জা !

আমার ঠুঁটছুটো কুথায় গেইছে হে

আমার টাক্‌রাটো কুথায় গেইছে

এট্‌টু মদঠদ্‌ লিয়া আসো না মাইরি

ঠুঁট্‌ছুটো ভিজায় লি

টাক্‌রাটো ছাড়ায় লি

জিব্‌ভা পেককা

কন্‌ঠো দিয়া চালায় দি

এক-চুমুকথে সব্‌টু—কু—নি

ববাব্‌বর পাক্‌থ— লিতে মাইরি।

বুলবো কি তুনিয়ায়

কিচ্‌ছু নাই'হে বসথস আর

ছিলো যা স—ব চুষ্‌ষা লিলেক

কয় শ—কু—নে

জমিনে বুক ঠ্যাকায়ে।

শালোরা সংসা—বটোকে

ছিলায় লিলেক হাথের উফরে হে

অয়ের উফর সব্‌টু –কু ঘি আর ব্যান্নোন্‌

আর পর্‌বারে জনে জনে

আতা—ত্তা মিঠাই গিল্‌লা

শালোরা বুঁদ হৈয়া রইছে হে মাইরি !

দুনিয়ার সবটু—কু রস
শুষণ্যা নিলেক যানো আ—গোসৃতো ঝিসি হে
আর ঐধারে আমার প্যাটে হাভোর-পাভোর লাগাইছে
অ্যাট্‌টা আসৃতো মক
আর অ্যাট্‌টা মক রৈছে আমার কন্‌ঠে
অ্যাট্‌টা টাক্‌য়ায় অ্যাট্‌টা জিব্‌ভায়
আর অ্যাট্‌টা মক আমার ঠুঁটে।

শুধু ক'কো-টা মদের লেগ্যা হে মাইরি
এই পাঁচ মকতে মাথা কুটে
শালোদের নিফা—ক দর্‌জায়।
গর্‌জা—!
গর্‌জা—!
গরজা—!
ভিথরের যো—রগ্‌টো ওঁসা—র গরজা—।।

কবিতা : সত্তর দশক
সাগর চক্রবর্তী

পাথর যেন সময় বাতাস জল
বুকের বক্ষে জড়িয়ে কালসাপ
নাভির পদ্মে লাজের মাথা খেয়ে
বাড় বাড়ন্ত পাপ।

আমি গাধা, ঘুলিয়ে খাই জল
জল না নিজের রক্ত, মনস্তাপ
ফণফণিয়ে নাচায় সর্বনাশের
ছুঁয়েছে শেষ ধাপ।

জল হাওয়া কি সইবে এতো চাপ?

পৃথিবীতে বুঝি ক্ষত্র-ধর্ম শেষ

বলরাম রায়চৌধুরী

নপুংসকের ঢাক কাঁধে নাচে বেহায়া বৃহন্নলা,
গাণ্ডীবে তোলে টংকার অর্জুন,
বীরের হৃদয়ে বাসাবাঁধা আজ নটিনীর ছলাকলা,
মেরুদণ্ডের গভীরে ধরেছে ঘুণ।

গাণ্ডীব ধরো বীর অর্জুন কুরুক্ষেত্র রণে,
অপগত হোক্ কাপুরুষতার ভয়,
দ্বাদশ বর্ষ উদযাপিত কি প্রতিশ্রুতির বনে,
এখন যুদ্ধ সম্মুখে দুর্জয়।

অর্জুন হাতে গাণ্ডীব নাও, সাজো তূণে অক্ষয়,
ক্ষুধায় কাতর কম্র বৈশ্বানর
খাণ্ডববনে চিতার আগুনে লিখো নবীনের জয়
পৃথিবীতে আজ ভীরুতা বাঁধছে ঘর।

গাণ্ডীব ধরো সম্মুখরণে হে বীর সব্যসাচি,
ছুড়ে ফেলে দাও বৃহন্নলার বেশ,
পচা নর্দমা শুঁকে শুঁকে ওড়ে জীবনের কানামাছি,
পৃথিবীতে বুঝি ক্ষত্র-ধর্ম শেষ।

কাদের কি অপরাধ?

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাদের কি অপরাধ?

?

খাদ্যে ভেজাল দিলে;
ওষুধে ভেজাল দিলে;
তেলে সাপের চর্বি দিলে;
কালো টাকা ঘাটাঘাটি করলে;

যাদুকরী কাটগড়ায় 'সদা সত্য কথা বলিব'
বাক্যটি উচ্চারণে, দেশে বিদেশী আদালতে
বেকসুর বেলে খালাস হয়ে যায় ॥
তারপর চৌরাস্তায় রাজার মত বপুটি দুলিয়ে
কখন ক্যাডিলাকে পা নাচিয়ে গিলে করা পানজাবির বোতাম দোলায় ॥

কাদের কি অপরাধ ?
?
অথচ বহরমপুর জেলে কিংবা সেনট্রাল জেলে
আমাদের অপুষ্ট যৌবন
উজ্জ্বল তারকা খোসে যায়
দোনলা আঁধাতে ঝরে স্বদেশ আমার
মাটি তুই এ রক্তে পবিত্র হবি কি ?
না'কি তুই এইভাবে স্বদেশ বাঁচাবি ?

কা'দের কি অপরাধ ?
?
দলীলে লিখবেন কে ?
দুয়োরাণী নাকি সুয়োরাণী
নাকি কে ? কে ? কোন সে সকাল ?...

সূর্যে বিস্ফোরণ ঘটাও

ব্রজগোপাল রায়

যার যা-কিছু-সব পুরে নাও আশ্চর্য-কার্তুজে।
ঘোড়াটা সতর্ক হাতে ধরো তর্জনীতে, মাছিটাকে
লেলিয়ে দিয়ে সূর্যের ভেতর বিস্ফোরণ ঘটাও।
বলয়ের নিপিট অস্থিগুলো ছিটায়-ছাটি হ'য়ে গিয়ে।
পৃথিবীর চৌহদ্দি বদলে গেলে কুৎসিৎ রাতও শেষ হবে।
সময়—ভী—ষণ দ্রুত পাল্টাচ্ছে। সৈনিক,—রেডী ?
ও—য়া—ন...... !
টু—উ—উ—উ...... ॥

খি_ !!!......আঃ, সব দুস্তর-অন্ধকার জলে গেলো...
দূষিত রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে...গলগল্ ক'রে—
সূর্যে বিস্ফোরণ ঘট—ছে......!!!
আকাশময় আগুন !...আলো...উত্তাল...উত্তাল...
বাঃ, কী টকটকে লাল বিশুদ্ধ সকাল !!
ঈশ্বর ! ওরা জানে না, ওরা কি অপরাধ করেছে...

নিগ্রো কবিতা/আফ্রিকা

স্বগত প্রেম

ক্রিস্টোফার ওকিবো

অনুবাদক : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

আমাদের দু'জনের মধ্যে চাঁদ উঠেছে
উঠেছে যুগল পাইনের মাঝখানে
ওরা স্বাগত জানাচ্ছে পরস্পরকে

চাঁদের উত্তরণে প্রেম জেগে উঠছে হৃদয়ে
নিঃসঙ্গ ধমনীতে তার আশ্চর্য প্রবাহ

এবং এই মুহূর্তে আমরা ছায়া
জড়িয়ে আছি পরস্পর
চুম্বন করছি হাওয়াকে শুধু !

নদীর জন্যে

বিনোদ বেরা

গাঁয়ের প্রান্তে ছোট্ট টালির বাড়ি
কবেই বুজেছে নদীর গহীন খাড়ি
ওইখানে এক কয়েত বেলের গাছ
ধু...ধু চরে খেলে রোদ্রে স্মৃতির মাছ।

পুকুর ঘাটে বৌ ঝি বাসন মাজে
ছোট্ট পাড়াটি ব্যস্ত এখন কাজে
আমি বুঝি একা ঘুমানো দিনের ঘোরে—
দূরে বহুদূরে নদীটি গিয়েছে সরে।

ওরা ফিরে গেল
সুনীতি চট্টোপাধ্যায়

উলুবনে মুক্তো ছড়াতে এসে
ওরা ফিরে গেল।
চিনল না জানল না
চারিদিকে নৈঃশব্দ, ছিমছাম, চুপচাপ
কেমন ক্রোধ ও যন্ত্রণায়
একে একে ভেঙে গড়ে উঠেছে।
গড়ার মুখে, আমার মুখ দেখে
ওরা ফিরে গেল।

O MY SWEET WARRIOR FOE
হে বীর আমার শত্রু
এক ইতালীয় কবি ফ্রাংসেস্কো পেত্রার্ক।
[খৃ: অব্দ ১৩০৪—১৪৭৪]
অনুবাদ : মঞ্জুভাষ মিত্র

তোমার সুন্দর চোখে শান্তি পাব বলে এককণা
চেয়েছি হাজার বার বীরাংগনা হে নারী আমার শত্রু
বলেছি হৃদয় নাও, তবু কিন্তু অহংকারী তোমার ভাবনা
ভুলেও মাটির দিকে সমতলে নামায় নি ভুরু
কিন্তু যদি আরো কারো এই বুক বেঁধে রাখত সুখের শিকলে
সে রমণী থাকতো কিছু ব্যর্থ আশা মিছে স্বপ্ন নিয়ে
তুমি যাকে ঘৃণা করো আমি তাকে বর্জন করে গেছি বলে

তোমার ভিতরেও : আমি বলো কি করব ওই বস্তু দিয়ে ?
তাড়না করলেও তাকে খুঁজে নিতে সে কিন্তু কখনো পারেনা
তোমার ভিতরে নীড় : চঞ্চল পথরেখা ভ্রমণ-বিধুর
একাকী থাকার দুঃখ সহেনাকো তবু অন্য কোথাও যাবেনা
পথের ফোয়ারা থেকে সরে যেতে হয় বহুদূর ।
আমাদের দুজনের আত্মায় রয়ে যাবে এইসব পাপ
তোমার কিছুটা বেশি যেহেতু এ হৃদযন্ত্রে তুমিই আলাপ !

কাঁচ

মনীষীমোহন রায়

বেঁচিবনেই কুঁচের সঙ্গে দেখা
সংগ্রহ শেষে ফিরছিলে ট্রামে একা
দাঁড়িয়েছিলাম দারুণ অন্যমনে
স্বপ্নেরা শুধু বাঁধছিলো বাসা মনে
তুমি ভেঙে দিলে অন্যমনের বাঁধ
দূর মেঘলোকে উঠেছিলো ফুটে
গোরাস্থালির চাঁদ

কেঁদেই যাও

পীযূষ ভট্টাচার্য

জন্মালো যে-মুহূর্তে শিশুটি
জানলো না কোথায় এসে পড়লো ও !
তখন থেকেই কাঁদছে
বড়ো হয়েও কাঁদবে / বুড়ো হয়েও কাঁদবে ।
কেঁদেই যাও, কেঁদেই যাও / তোমাকে কাঁদতেই হবে
তোমার মা 'ভোল' পাবে
ভাবনা কি, তুমিও পাবে ঢোল একটা
ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবার / জনে জনে সাধবার জন্যে ।

মূর্খ হয়ে থাকো
মাঝে মাঝে করো ভিক্ষে / সুযোগ পেলে চুরি
আর যদি ভাগ্যবলে তেমন সুযোগ মিলে যায়
বেল্ বটম্ প্যান্ট বানাও / গোঁফটোমা জুলপি শানাও
চোখে আঁটো গগ্ল্স্ / বেশ বেশ
জুতো জোড়া আয়না করে নাও
দেখো, সিগারেটটা জ্বলছে তো ? গোটা কয় রিং বানাও
এবার সামনে যে-রকটা দেখছো / সোজা চলে যাও ওখানে
ওখানে তোমার মতো আরো অনেককে পাবে
যারা মেয়ে দেখলেই গেয়ে উঠছে হিন্দি গান
করছে ফষ্টি নষ্টি কারো সংগে বা
তুমিও ভিড়ে যাও ওদের দলে
দ্বিধা কেন, আনাড়ি বন্ধু ?
ওরা যাকে গুরু বলবে / তোমারও গুরু হোক সে
ওদের সংগে মাঝে মাঝে যাবে সোডার বোতল হাতে
এবং গুরুর আজ্ঞায় করবে চার্জ্
চাকরি পাবে। বউয়ের কানে মাকড়ি পাবে
নইলে পিঠে লাকড়ি খাবে।

অতএব কেঁদেই যাও, কেঁদেই যাও॥

মায়ের দু'চোখ

অমিতাভ দাস

ট্রেনের বাঁশী বেজে উঠলে চঞ্চলতা যাই
সময় আমার সবুজ নিশান উড়বে বলে দাঁড়িয়ে আছে
আমার এখন মনে পড়ে যায় তুলসীতলার শঙ্খধ্বনি
খুঁজে বেড়ানো মায়ের দু'চোখ
হারিয়ে যাওয়া মেলার ভীড়ে বালকবেলার অন্বেষণে

তেরোশো একাশি চেতনিক/একশো উনিশ

চোখের জলে নৌকোখানি হাত বাড়িয়ে ডাকিয়ে যায়
সূর্যালোকে চেয়েছিলাম দেখতে শুধু সুনীল আকাশ
নইলে কেন কেঁদে বেড়ায় পথ হারানো উচ্চাভিলাষ
বুকের ভিতরে মা ডাকছে   মায়ের আঁচল স্নেহের ভাষায়

সামনে পিছে ছড়িয়ে থাকা কাঁটার মতো চরণধ্বনি
ভয় দেখানো প্রেতের ছায়া
কোন্ ভরসায় শেকল টেনে প্রাপ্তিযোগে দাঁড়িয়ে যাবো ?
আমিত আর নিষ্ঠাসহ অন্বেষণে সোনার সিঁড়ি খুঁজে পাইনি
সম্মোহনের পেছন নিয়ে   নিশির ডাকে ভেসে যাইনি
নিঃস্ব ছবির নিয়ত দুঃখ জড়িয়ে তবু দাঁড়িয়ে থাকি
মুঠোয় কাঁপে কতকালের বিশ্বাসী বুক নৈশ হাওয়া
দুঃস্বপ্নের জীবনটাকে   পথের ধুলোয় কে বা কারা
লুটিয়ে ছিলো যাওয়ার বেলায়   সরে দাঁড়ায় ভিজে বেড়াল
ভোর হয়না

পরিণামের শেষ ঘোড়াটি খুঁজছে সোজা বধ্যভূমি
এইত সময় দাঁড়িয়ে হাসে
সব ভাসানো ভয়াকোটাল শাসন খেয়ে সরে যাচ্ছে
বধ্যভূমির পাঁচিল টিপে হেঁটে আসে শোকধ্বনি   শেকল বাজে
ঘৃণাতো নয় সহাস্যে এই বিদায় বলে অকুতোভয়
চরণ বাড়াই   ফেরার তাড়া
এখন আমার মা ডাকছে   মায়ের দু'চোখ খুঁজে বেড়াই .....

এখন
শান্তি রায়

বুকের ভিতর বহুদূর ধারালো নখ মসৃণ ছুরি বসে গেলে
কিছু টাটকা হাওয়া ঢুকে পড়ে ফুসফুসের ভিতর :
কেননা একদিন হৃদয়ের কাছে চিৎকার করে বলেছিলাম : ভালোবাসার
ফুল দাও পাখি দাও চিরহরিৎ অস্থির গৌরব

বুকের ভিতর মানবিক কান পেতে শোনো : এই নিদারুণ দীর্ঘশ্বাস
ভয়াবহ দুঃখের পাঁচালি
কোথা যেন চুরি হয়ে যায় জীবনের শব / শিস ও পাখি বাগান…বাগান…

এখন মেরুদণ্ড টান করে রাখা মারাত্মক গভীর জরুরী

'কেউ কি আছো কেউ কি আছো এখন আমাদের স্বপ্নের ভিতর স্মৃতির ভিতর
আমরা তো আর বেশিদিন বাঁচবো না হে
সময়ের এইসব চোরাবালি অসহায় আমাদের সুনিপুণ গ্রাস করে প্রজ্ঞার কৌতুক
ইঙ্গিত সুত্রাণ নেই / পাতারাও একসময় হলুদ হয়ে ঝরে যায় বড়ো দ্রুত…'
কার বিভ্রান্ত চিৎকারে সভ্যতার ভিত কাঁপে, পায়ের তলার মাটি
হঠাৎই খসে খসে যায়…
তখন কি বিপন্ন আর্ত চেতনায় অকৃত্রিম ঘুণ ধরে যায়…

বুকের ভিতর বহদূর ধারালো নখ চকচকে ছুরি বসে গেলে
কিছুটা টাটকা হাওয়া ঢুকে পড়ে ফুসফুসের ভিতর
বস্তুতঃ এখন মেরুদণ্ড টান করে রাখা মারাত্মক গভীরে জরুরী… ॥

ওরা এখন গভীর ঘুমে

মদনগোপাল রায়

আহা রে,
ওদের এখন জাগাতে যাওয়া বৃথা !
তার চেয়ে
যারা জেগে আছে
তাদের নিয়ে
চলো আমরা পথে পথে বেরিয়ে পড়ি
নতুন দিনের স্বপ্ন বুকে আগলে।
পথে যেতে যেতে
অনেক সাথি পাওয়া যাবে।
হাজার পায়ের দৃপ্ত দুন্দুভি-ঘায়ে
ওরা জাগতে বাধ্য হবে তখন।

আহা রে !
ওরা এখন গভীর ঘুমে ॥

দুটি কালো চোখ

সাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়

এক আকাশে অসংখ্য তারার মতোই চোখ ;
লাল, নীল, ফিরোজা।
সাহারার তপ্ত আবহাওয়া,
মেরুর তুহিন স্পর্শ,
সমুদ্রের গভীর নিস্তব্ধতা,
আর ভরা গঙ্গার জোয়ার—
আমন্ত্রণ জানিয়েছে বারবার
আত্মসমর্পণ করতে।
মন্থন করতে বিনা দ্বিধায়
সুধা বাবিধি, নিঃসংকোচে,
সর্বশক্তি প্রয়োগে।
'আউট অফ বাউণ্ডস'
ও জানিয়েছে সোচ্চারে অস্থেও।
মৎস-শিকারীর ঔৎসুক্যও
দেখেছি কোথাও
নির্বাককে সবাক করেছি
আপন পৌরুষের দম্ভে।
অনিচ্ছাকে ইচ্ছায়—সবই আজ বিস্মরণের সীমায়।
শুধু দুটি ক্ষণিকের দেখা অদ্ভুত কালো চোখ
আমার স্মৃতিতে আজও অমলিন।
তাই নির্জন রাতের অন্ধকারে জীবনসায়াহ্নে
বার বার প্রশ্ন করি নিজেকে :
আমি কি হারিয়েছি হেলায়
যা ছিল একান্তভাবে আমারই ?
অমর্যাদা করেছি কুমারীর
চিরন্তনী না-বলা চোখের ভাষাকে ?

অনেক রাত্রি পার হ'য়ে আনন্দের নিমন্ত্রণে কেয়া...
অলস বেলার চাঁপার মত...
শিরশিরিয়ে ওঠে হাওয়া শিশির শিহরিতে আনন্দে...
কাছে আমার আকুলতায়
সুরের বাঁশির টানে চঞ্চল দিন...
দূর হোক নিকট, নিকট হোক নিবিড়
পথপরিক্রমা শুভ হোক, বিবিধ হোক
পূর্ব রেলপথ

Regd. No : R. N. 24669/73
CHETANIK (PROGRESSIVE LIT. QLY.) : Edited and Published by ATUL CH. BANERJEE from P.O. & Dist. Murshidabad, West Bengal and Printed by him from Cygnus Printing Co-operative Society Ltd., Berhampore, West Bengal

'চেতনিক' শারদীয় ১৩৮০ ও অন্যান্য সংখ্যাগুলির সম্পর্কে
মূল্যবান অভিমত :

['… …১৩৮১ সনের (২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা) সম্পাদকীয়তে নতুন চিন্তা, নতুন সুর ও নতুন প্রকাশ ভঙ্গী দেখে মনে মনে আপনাকে জানিয়েছি সাধুবাদ। অনেক কথা লেখার আছে। পরে লিখছি।…'

অধ্যাপক মণি বাগচি ১৯/৯/৭৪]

'স্বাগত চেতনিক'

একশো বছর আগে বাংলার যে নবাবী শহর থেকে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বের করে সাময়িক সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন, একশো বছর পরে সেই একই স্থান থেকে 'চেতনিক' নামধেয় নূতন ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির আবির্ভাব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এর আবির্ভাব ঘটেছে, একথা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করছি। বঙ্গদর্শনের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যে বিশেষভাবে স্মর্তব্য এই উক্তিটি : 'এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক।'

'চেতনিক' সম্পাদক শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে কতকটা এই আদর্শকে সামনে রেখেই পত্র-পত্রিকার আসরে আবির্ভূত হয়েছেন, তা এই পত্রিকার প্রাথমিক তিনটি সংখ্যা পাঠ করে উপলব্ধি করলাম। বাঙালির মর্মের কথা সেদিন বলেছিল বঙ্গদর্শন তার স্বল্পায়ু জীবনে এবং তা বলেছিল বলিষ্ঠভাবেই। আজ বিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে উন্মার্গগামী সাহিত্যিক ও কবিদের স্বধর্মে ও স্বচেতনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এই 'চেতনিক'। সম্পাদকের এই সৎ প্রয়াস, তাঁর নিজের কথায়, 'অপসংস্কৃতিরূপ হিরণ্যকশিপুর দাপাদাপির বিরুদ্ধে একটা কিছু করা'—সার্থক হোক এই কামনাই করি। সাম্প্রতিক কালের যথার্থ সাহিত্যবোধহীন ও বিকৃতরুচির তথাকথিত লেখকদের নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এই নূতন পত্রিকাটি সার্থকনামা হয়ে উঠুক—এই-ই আমার অন্তরের একান্ত অভিলাষ।"

স্বাঃ মণি বাগচি : কলকাতা-২৮ । ২৬/৯/৭৪

'চেতনিক ১ম সংখ্যা পড়ে খুশি হলাম। বেশ ভাল কাগজ হয়েছে।…… সম্পাদকীয়টি সুলিখিত… … খুবই সময়োচিত হয়েছে।……অন্যান্য রচনাগুলিও সুনির্বাচিত।… …'শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

'অবশ্যই প্রশংসার্হ।……' বেশ।

'সুন্দর করেছেন আপনার পত্রিকাটি (শারদীয় ১৩৮০)'

—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

'মফঃস্বলে বসে এধরণের পত্রিকা বের করা সামান্য কথা নয়।'

—ডঃ সুশীল রায়

মূল্য ১ টাকা

দ্বিতীয় বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

চেতনিক

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বর্ষ/তৃতীয় সংখ্যা
১৩৭৪-৭৫

চেতনিক
ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র

সম্পাদক : অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
লালবাগ মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ

সূচি

কণ্ঠে দেবায়

সম্পাদকীয়

জানেন নীরেন বাবু, আমি কিন্তু এখনো হাল ছাড়িনি। আপনার প্রতি-শ্রুতির কথা এখনো ভুলিনি। আর তাই এখনো প্রতীক্ষা ক'রে আছি একটি পরিচ্ছন্ন খাম কিংবা ইন্‌ল্যাণ্ডের যাতে থাকবে আপনার সত্যরক্ষার চকুলজ্জাবী নিদর্শন। মানুষের ওপর আমি সহজে বিশ্বাস হারাইনে, সাময়িকভাবে বিরক্ত হ'লেও [illegible]তে পারি যদিও। তাই যিনি আমাকে মিথ্যে কথা ব'লে নিজের কাজ গুছিয়ে[illegible]ন, যিনি নব্বই টাকার জায়গায় চল্লিশ টাকা দিয়ে বলেন সব ধার শোধ হ'লো তো আর আমি চক্ষুলজ্জাবশতঃ প্রতিবাদ করতে পারিনে, যিনি মূল্যবান ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি ধার নিয়ে নিজের গ্রন্থে ব্যবহার ক'রে সততার সঙ্গে তা

কেউও যেবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না, যিনি আমার পক্ষ থেকে আদায় করা টাকাগুলি আমাকে পাঠাতে বা সেকথা আমাকে জানাতেও দীর্ঘকাল ভুলে থাকেন এবং এই রকম আরো বহু ব্যক্তির ওপরই বিশ্বাস হারাইনে আমি। কারণ আমার ভাবতে ভালো লাগে এই ব্যক্তিগুলি যেসব অপরাধ করেছেন সেগুলো আমার সামনে বা গোচরে করলেও আসলে আমার কাছে করেননি, করেছেন নিজের নিজের বিবেকের কাছে। এবং একদিন না একদিন তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসবেনই ব'লবেন, 'আমরা ভুল করেছিলেম, তাই লজ্জিত।' এসব ভাবতে আমার ভালো লাগে। কারণ আমি জানি ওঁরা যে-আচরণই করুন-না আমার সঙ্গে, যে-ঘটনাই ঘটুন-না আমার বিরুদ্ধে, ওঁরা নিজেরা তো জানেন, এইসব অসংগত আপত্তিকর কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই একদিন ওঁরা ফিরে আসবেনই। আমার এই বিশ্বাসের সবটাই যে ভিত্তিহীন নয় তার কিছু কিছু প্রমাণ কিন্তু বিভিন্ন সময়ে আমি পেয়েছি।

তাই আজও আমি আপনার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলিনি। সেই যে গত বৎসর ৩রা জুলাই আপনি লিখেছিলেন না 'প্রবন্ধ লিখতে আমার উৎসাহ হয় না, কবিতাই পাঠাবো।...... লেখা হ'লেই যে পাঠাব তাও ঠিক। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়।'—সেই থেকে আমি প্রতীক্ষা ক'রে আছি কবে সেই অনির্দিষ্ট তারিখটি সুনির্দিষ্ট হ'য়ে উঠবে, কবে আপনি প্রতিশ্রুতি বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্যে তৎপর হ'য়ে উঠবেন।

কারণ 'চেতনিক' উন্মুখ হ'য়ে আছে আপনার কলম থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সারা বাংলায় ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য ধীভুর অসম্মানের কথা, অফুরন্তনার কথা, নিগ্রহের কথা, বঞ্চনার কথা, ক্ষুৎপিপাসার কথা অত্যন্ত সততার সঙ্গে সহৃদয় পাঠকসমাজে পৌঁছে দেবার সুযোগ পাবার আশায়।

নীরেন বাবু, আপনি নিশ্চয় ভুতু গাড়োয়ানকে চেনেন। সব গাড়োয়ানকে জড়ো ক'রে যে বলেছিলো: 'তব্ ভি ইয়ে ব্যাস্ মরা জলা লগতা। হম্ ভুনা সরাক চোনেসে হামরা তকলিফ্ মিট্ যায়েগা।' ভুতুর এই কথাগুলি আসলে একদিন আমিই ব'লে বেড়াতেম স্টেশনে-স্টেশনে অশিক্ষিত যাত্রীদের, কাটে-বাজারে নিরীহ খদ্দেরদের আসিসে তোলবার জন্যে। তফাতের মধ্যে শুধু 'হম্ ভুনা' না ব'লে বলতেম আমি বিশ্বাস করি, তোমরাও কর।' এসব ১৯৪৫-৪৬ সালের কথা। কিন্তু তারপরই আমি কেমন যুবছে পড়ছিলেম।

একদিন বহরমপুর থেকে আমার এক সহপাঠী বন্ধু লিভারটার ফোটোচা

(পরে বঙ্গবাসী) হুজ্জত হ'য়ে এসে উপস্থিত। হাতে একগুচ্ছের কাগজ। কাগজে, কাগজের মধ্যেই অবশ্য গোপীচন্দ্র শিস্ নেটারিত জোগাড় ক'রে তাও পার্টিশনের দাবিতে। আমি রাজি হ'তে পারিনি। এর কয়েক মাস পর খণ্ডিত স্বাধীনতা পেয়ে স্থানীয় স্কুলটি হলে এস ডি. ও-র সভাপতিত্বে যে বিজয়োৎসব হয়, সেখানে জাতীয় সংগীত গীত হ'তে থাকলে জাতীয় নেতাদের নির্লজ্জ পদলোলুপতায় তিক্তবিরক্ত হ'য়ে, ক্ষুব্ধ হ'য়ে আমার এক বন্ধু আর আমি উঠে দাঁড়াতে উৎসাহিত হইনি। উপস্থিত বহু ব্যক্তি এতে রুষ্ট হন। ক্রুদ্ধ এস. ডি ও কট্‌মট্‌ ক'রে তাকান দুই মূর্তিমান কালাপাহাড়ের দিকে। অবশ্য আরো পরবর্তী কালে বস্তুতঃ অনুতপ্ত চিত্তেই আমার অনুগত বহু ছেলেমেয়ের সামনে বহুবার বক্তৃতা দেওয়ার সময় পবিত্র জাতীয় সংগীতের মর্যাদার কথা ব্যাখ্যা ক'রেছি, গল্প ক'রেছি একজন অসুস্থ বৃদ্ধ দেশপ্রেমিকের জাতীয় সংগীতের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধাশীলতার। এমন কি সংস্কারবশতঃ এখনো উঠে দাঁড়াই জাতীয় সংগীত কানে আসামাত্র। কিন্তু মনে মনে বুঝতে পারি '৪৭ সালে আমি জাতীয় সংগীতের সামনে সেদিন যে-আচরণ ক'রেছিলেম তার জন্যে আজ আর লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই। আমার গলায় যথেষ্ট শক্তি থাকলে আমি চিৎকার ক'রে ডেকে ডেকে ব'লে উঠতেম : 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, ভুলো মাৎ ভুলো মাৎ। আর জাতীয় সংগীত তোমার আমার জন্যে নয়। আত্মপ্রবঞ্চনাবিলাসী মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির চিত্তবিনোদনের উপকরণমাত্র।' না-না, আমি সি-পি-এমের কেউ নই। যেমন পি-এমেরও কেউ নই আমার পরিচয় : দেশময় যে অসংখ্য অন্ন-উক্ত হতাশাক্লিষ্ট ভুখা পাড়োয়ান অহরহ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে আর বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে বলছে 'ইয়ে আজাদি হম্‌ কভি নেহি মাংগা' আমি তাদেরই একজন। আমি চিনতেম এক মানসিক দুর্বলতাগ্রস্ত সেই বিরাট পুরুষ গান্ধিজিকে, তাঁর অহিংসা নীতির প্রকৃত স্বরূপ ও বাস্তব সীমাকে, তাঁর নষ্ট সঙ্গীদলকে, তাঁর সর্বোদয়ের আন্তরিক দর্শন ও পরিকল্পনাকে। আমি চিনতে পারিনে আজকের বাগ-দুষ্ট কৃকলাস নেতাদের, চিনতে পারিনে সুপরিচিত ভারত-আবিষ্কারকের দুর্বার দুহিতাকে যিনি অনেক আশা জাগিয়ে হতাশার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন আমার মতো অসংখ্য নিঃসহায় দেশবাসীকে, চিনতে পারিনে এই দরিদ্র দেশে অট্টালিকাকাঙ্ক্ষী উদ্দেশ্যহীন অর্থহীন ঘনঘন খোলসপাল্টানো শিক্ষাব্যবস্থাকে, চিনতে পারিনে সভা-হাট-মিনার-ময়দান চারুদর্শন মন্ত্রীমশাইদের যাঁরা নাকি দরিদ্র ব্যক্তিদের মঙ্গলবিধানের জন্যেই বিল্ডির ওপর টাকা বসান, যাঁরা কোটি কোটি

অর্থব্যয়ে 'গান্ধিনগর' স্থাপন ক'রে দরিদ্র বুভুক্ষু দেশবাসীর কল্যাণের কথা চিন্তা করতে এসে কয়েক ব্যক্তি বাস ক'রে যান সেখানে, আমাদের বিগলিত কৃতজ্ঞতার মুক্তো কুড়িয়ে।

নীরেন বাবু আপনি সৎ, শ্রীল, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহৎ কবি। আপনাকে নিশ্চয়ই 'পরিচিত'দের বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে ক'রতে বাধা নেই। 'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ' ব'লে গেছেন ঋষিকবি। তাই আপনার ওপরও বিশ্বাস হারাইনি আমি। আজ না হ'লেও কোনো একদিন সেই খামটি নিশ্চয় আসবে যার মধ্যে সেই সরল শিশুটি ব'লে উঠবে 'রাজাটা ন্যাঙটো। কারণ ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, টুটা হ্যায়, ফুটা হ্যায়।' হাজার একাডেমি পুরস্কারও আপনার মুখ ভোঁতা ক'রে দিতে পারবে না। আর সভাভাষণের জন্যে নাকি ডিমক্রেসিতে উদার আমন্ত্রণ জানানো আছে। রাজার কুটুমরা তো তা-ই ব'লে বেড়ান। তাছাড়া এদেশে 'ভারত-রত্ন' হওয়া খুব সোজা। জহুরিতে জহর চিনতে নাই বা পারলো। উদার লোকশাস্ত্রকারেরা বিকল্প ব্যবস্থাও দিয়ে রেখে-ছেন…। আপনার যদি পিতার কোনো পরমাত্মীয়ের জোর থাকে তা'হলে আপনি চৌর্যবৃত্তিই করুন আর দাগাবাজিই করুন, যথাসময়ে রেডিওতে আপনার নাম ঘোষিত হবেই। আপনার কাছে উড়ে আসবেই খবরচক্র বায়সের ঝাঁক। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই এমন সস্তাদরের জোলো অরুচি জাগুক আপনার। আপনার জড়তা কেটে যাক। সপ্রতিভ ক্ষিপ্রতায় নেমে আসুন নিচে সাগ্রহে অপেক্ষমান ক্ষুব্ধ পাড়োয়ানের দলের মধ্যে। আঠাশ বছরের পংগু আজাদিকে সবল সার্থক ক'রে তুলুন। পঞ্চাশ কোটি অসহায় মুখে বুকে দেহে তুলে দি'ন তাকে। আসলে কবি-সাহিত্যিকেরাই পারেন নতুন যুগ নতুন সমাজ গ'ড়ে তুলতে। ইতিহাসের পাতা উল্টোলে অনেক নজির পাবেন খুঁজে। রাজনৈতিক নায়কেরা তো কবিদেরই ভাবসন্তান। আজকের নেতারা নির্বীর্য, শঠ, বৃহৎ জগৎ হ'তে বিমুখ। কারণ আজকের কবিরা দেউলে। তাই নেমে আসুন আত্মপ্রবঞ্চনার, কপটতার কোট গা থেকে টেনে খুলে। আর পারেন তো সংগে টেনে নিয়ে আসুন আপনার সহকর্মী বন্ধুটিকেও। তাঁর মধ্যে যে ছবি: দেখেছি তা আগমার্কা বস্তু নয়। মহত্তর সৃষ্টিতে তার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। তাঁকে নতুন ক'রে স্থির ক'রতে হবে: কস্মৈ দেবায়……? তাঁর নাম স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ করলেম না এবারের মতো। নমস্কার।

জয়প্রকাশজীর সর্বাত্মক বিপ্লব/সত্যেন সাহা

উদ্যোগ পর্ব

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে পরিচালিত গণ-আন্দোলন হল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আন্দোলন সুরু হয়েছিল বিহার রাজ্যে। আজ তা প্রায় দেশব্যাপী হয়ে উঠেছে। উত্তর ভারত তো চঞ্চল। দক্ষিণভূম হয়ত সাগ্রহে লক্ষ্য করছে উত্তর ভূখণ্ডের রাজ্যগুলিতে আন্দোলনের গতি প্রকৃতির দিকে। নিঃসংশয়ে বলা যায় অনেক আশা পল্লবিত হয়ে উঠছে জয়প্রকাশজীর আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে।

সাম্প্রতিক বিহারভূমির গণ-অভ্যুত্থানকে জয়প্রকাশজী দেখেছেন সর্বাত্মক এক বিপ্লবের পদক্ষেপ হিসেবে। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে জয়প্রকাশজী ও তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবের দর্শন শাসক দলের নিদ্রা হরণ করেছে। দিল্লীর মসনদে আসীন নেতৃবৃন্দ আজ খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। আর উদ্বিগ্ন হল ভারতের মস্কোপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি। কম্যুনিষ্ট পার্টি ও শাসক কংগ্রেস আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং জয়প্রকাশজী যে গণ-আন্দোলনের উদ্গাতা তার ভয়ে ভীত একদিকে যেমন শাসক কংগ্রেস, তেমনি শঙ্কিত হল কম্যুনিষ্ট পার্টি। বিহার আন্দোলনের মোকাবিলা করবার জন্য কংগ্রেস শিবিরে যেমন সাজ সাজ রব পড়েছে, তেমনি কোমর বেঁধে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে কম্যুনিষ্ট দল তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে।

জয়প্রকাশজীর অভিনব আন্দোলন ও তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবের দার্শনিক ভিত্তিভূমি ঠিক ঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার আগে জয়প্রকাশজীর রাজনৈতিক সত্তার ক্রমোন্মেষ একটু পর্যালোচনা করতে হয়। আধুনিক কালের রাজনীতি-সচেতন মানুষ এইটুকু জানেন যে, জয়প্রকাশ নারায়ণ হলেন আচার্য বিনোবা ভাবের 'সর্বোদয়' আন্দোলনের একজন প্রথমশ্রেণীর প্রবক্তা। প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক জীবনে তিনি অনুপস্থিত। অতীত সম্পর্কে আর একটু ওয়াকিবহাল যিনি তিনি জানেন যে রাজনৈতিক জীবন থেকে জয়প্রকাশজী অবসর গ্রহণ করে গান্ধী-শিষ্য ভাবেজীর সর্বোদয় আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু ইতিহাসের এই পর্যায় সম্পর্কে সামান্য বা ভাসাভাসা পরিচয়ের দৌলতে জয় প্রকাশজীর

সামগ্রিক ব্যক্তিত্বকে চেনা যাবে না। সর্বত্র যে ভারতবর্ষের সমাজবাদী আন্দোলনের তিনি পথিকৃৎ। বিহারে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। পড়াশুনার জন্যই তিনি গিয়েছিলেন আমেরিকায়। সেখানে কাজ করতেন এক খনিতে এবং অর্জিত অর্থ দিয়ে তিনি পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করতেন। বিশ বা তিরিশের দশকে একজন মননশীল তরুণের পক্ষে সমাজবাদী আদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা প্রায় একরকম অসম্ভব ছিল। জয়প্রকাশজী অনিয়ন্ত্রিত উন্নত পুঁজিবাদের চিত্র দেখেছিলেন প্রত্যক্ষভাবে। ব্যবসায়ের তেজী মন্দা দুইই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অতি-উন্নত পরিপক্ক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায়। সুতরাং তিনি সমাজবাদী মন্ত্র গ্রহণ করলেন প্রাণমন দিয়ে। ভারতবর্ষে জয়প্রকাশজী এলেন একজন সমাজবাদী হিসেবে মার্কসবাদী প্রত্যয় নিয়ে। ভারতবর্ষের মাটিও তখন সমাজবাদী ভাবনা চিন্তার অনুকূল। তরুণ সমাজ সমাজবাদ গ্রহণের জন্য উন্মুখ। পেলেন তিনি অনেক মেধাবী, মননশীল কৃতি সহকর্মী। ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া, শ্রীঅচ্যুত পটবর্ধন, শ্রীঅশোক মেহতা শ্রীমিনু মাসানী যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি গড়ে তুলতে। যোগ দিলেন উত্তরপ্রদেশের জনপ্রিয় জননেতা আচার্য নরেন্দ্র দেও। এমন কি এই দল গড়ে তুলবার পেছনে পণ্ডিত নেহরুর ভূমিকাও কিছু ছিল। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও দর্শন প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠল। স্টালিনপন্থী কম্যুনিষ্টরাও এল এর ছত্রছায়ায়। অবশ্য এই দলের মধ্যে তাদের অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ তরুণ সমাজকে মস্কোর অনুগামী কোরে তোলা। শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির জাতীয় কার্য নির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন এককালে। জয়প্রকাশজী স্তালিনবাদকে গ্রহণ করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন সমাজবাদী ঐক্য। স্তালিনবাদীদের উদ্দেশ্য তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু সর্বাত্মক ঐক্যের জন্য তিনি তাঁর দলের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তিরিশেও দশকে তিনি রচনা করেন 'Why Socialism'। উক্ত দশকে ভারতবর্ষের সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলনের একটা দিক নিশানা বলে এই রচনা সমাদৃত হয়। শ্রেণী সংগ্রামকেই তিনি ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করবার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত করেন স্তালিনকে এবং অন্ধ স্তালিন প্রীতির জন্য ভারতের কম্যুনিষ্টদের তীব্র ভাষায় তিনি সমালোচনা করেন।

মনে রাখতে হবে জয়প্রকাশজী আন্তর্জাতিক সোস্তাল ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনের সমালোচক ছিলেন। বিশেষ করে তিনি বিক্ষুব্ধ ছিলেন হিটলারের অভ্যুত্থানকালে জার্মান সোস্তাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নিষ্ক্রিয়তায়। জয়প্রকাশজী অন্যান্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভারতীয় দলগুলোর মত বিশ্বাস করতেন যে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পূর্বে চাই দেশে ইংরাজ শাসকের বিলোপ। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবির হিসেবে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা সব সমাজবাদীদের প্রাথমিক দায়িত্ব বলে তিনি মনে করতেন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের দোদুল্যমানতার বা তার আপোষকামিতার বিরুদ্ধতা করেও নেতৃত্বের উপর সর্বাত্মক আঘাত হানবার কথা তিনি কোনদিন চিন্তা করেন নি। এই কৌশলের হয়ত কোন তত্ত্বগত আবরণ থাকতে পারে। দক্ষিণপন্থী গান্ধী নেতৃত্বের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণের নীতি থেকে বিরত থাকবার কংগ্রেস সোস্তালিষ্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে হয়ত কিছু ব্যক্তিগত কারণ আছে। জয়প্রকাশজী পণ্ডিত নেহেরুর প্রভাবের বাইরে যাননি বা যেতে পারেন নি। গান্ধীজীকেও তিনি কোনদিন অস্বীকার করতে পারেন নি। জয়প্রকাশজীর ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে গান্ধী নেহরু অঙ্ক একটা মৌলিক উপাদান। অথচ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত জয়প্রকাশজী গান্ধীজী প্রবর্তিত অর্থনৈতিক দর্শনের কোনদিনই অনুগামী ছিলেন না। শ্রেণী সমন্বয় বা আদি ব্যবস্থার অনুকূলে তাঁকে একটা কথাও বলতে শুনিনি। কিন্তু গান্ধীজীর এক অদৃশ্য প্রভাব তাঁকে চিরকালই টেনেছে। মাসানী লিখলেন "Socialism Reconsidered"। মাসানী ত্যাগ করলেন তাঁর মার্কসবাদী প্রত্যয়। তিনি কংগ্রেস সোস্তালিষ্ট পার্টির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠলেন অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ বা অবাধ অর্থব্যবস্থার একজন উগ্র সমর্থক। মৌল দার্শনিক প্রত্যয়ে তখনও সংশয়ের কোন ছায়া পড়ে নি। জয়প্রকাশজী তখনও মার্কসবাদী। তখনও তাঁর বিশ্বাস শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের চালিকা শক্তি।

পরের অধ্যায় '৪২-এর আন্দোলন। দেশের জীবনে সে এক যুগ-সন্ধিক্ষণ'। ইংরাজ সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দেয় এমন যে কোন রকমের কর্মপ্রচেষ্টার তখন প্রবল বিরোধী হল কম্যুনিষ্ট পার্টি। ১০ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে জার্মান বাহিনী রুশভূমিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মহাযুদ্ধ নতুন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো। গড়ে উঠল ইঙ্গ মার্কিন শক্তির

সঙ্গে রাশিয়ার ঐক্য। সুতরাং যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী রইল না। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের কাছে তখন যুদ্ধ হয়ে উঠেছে জনযুদ্ধ। ভারতভূমিতে এই চরিত্রায়ণের ফলশ্রুতি হল ইংরাজ সরকারের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট দলের নতুন এক বোঝাপড়া।

দেশের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দ্বিধাগ্রস্ত। আন্দোলনের সর্বপ্রকারের ঝুঁকি নিতে তাঁরা অনিচ্ছুক। ইংরাজ সরকার কারারুদ্ধ করল কংগ্রেস নেতাদের। দেশ ফেটে পড়ল বিক্ষোভে। সুরু হল এক প্রবল গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেতা হলেন জয়প্রকাশজী। আন্দোলনের আঘাতে কোন কোন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ভেঙ্গে পড়েছিল। তার স্থানে এসেছিল গণ সরকার সাতারা বালিয়া, বিহার, তমলুক স্বাধীনতার আন্দোলনে এক একটি অবিস্মরণীয় নাম। ইংরাজ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে জয়প্রকাশজী আত্মগোপন করে আন্দোলনকে পরিচালিত করেছিলেন বেশ কিছুকাল। আত্মগোপনকালে স্বাধীনতার যোদ্ধাদের কাছে লিখেছিলেন তিনি দু'খানা চিঠি। ঐ চিঠি দু'খানা আগষ্ট আন্দোলনের পরিচয় বহন করবে ভাবিকালের ইতিহাসবিদদের কাছে।

নেতারা কারামুক্ত হলেন। কিছু পরে জয়প্রকাশজীও ছাড়া পেলেন। দেশবাসীর কাছে পেলেন তিনি অভূতপূর্ব অভিনন্দন। তিনি হয়ে উঠলেন একজন জাতীয় নেতা। কিন্তু দলের মুখপাত্রও তিনি। ইংরাজ সাম্রাজ্য তখন মুমূর্ষু। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান যে আসন্ন তা অনুমান করা তখন কারও পক্ষে খুব কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু আর একটা আঘাত হানতে হবে। জয়প্রকাশজী সেই কথাই শোনালেন দেশবাসীকে। কিন্তু নেতারা আন্দোলনের পথে যেতে একেবারেই অনিচ্ছুক। দেশে বিদেশে ঘটছে নতুন নতুন ঘটনা যার তাৎপর্য ছিল সুদুরপ্রসারী। যুদ্ধোত্তর বৃটেনের প্রথম নির্বাচনে রক্ষণশীল দল পরাজিত হল, আর জয়ী হল শ্রমিক দল। বিশ্বাসে সমাজবাদী। একজন সমাজবাদী হিসেবে জয়প্রকাশজী নিশ্চয়ই এটলিকে বিশ্বাস করতে পারতেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল বৃটেনের সমাজবাদী শ্রমিক সরকারের সঙ্গে আপোষে ভারতে স্বাধীনতা আসবে এমন চিন্তা জয়প্রকাশের মনে একেবারেই আসে নি।

অথচ আপোষকামী কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সামগ্রিক বিদ্রোহের কথাও তিনি বলতে পারলেন না। জেল থেকে বেড়িয়ে স্বাধীনতার যোদ্ধাদের কাছে

এরি লিখেছিলেন তাঁর তৃতীয় চিঠিখানা। সেই চিঠিতে তিনি আহ্বান করেছিলেন স্বাধীনতাকামীদের কাছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত এক আঘাত হানবার জন্য এই আহ্বানকে কার্যকরী করতে হলে নেহরু নেতৃত্বের সামনা-সামনি হতে হবে। সুতরাং আবার সেই নেহরু-গান্ধী প্রভাব তাঁকে নিরস্ত্র করল এক সঙ্কটময় মুহূর্তে। জয়প্রকাশজীর রাজনৈতিক সত্তার আর এক বাস্তাবরণের সন্ধান আমরা পাই তাঁর পরবর্তী দু'টি রচনার মধ্যে। তিনি লিখলেন "My Picture of Socialism"। সমাজবাদের মূল কথা হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ এবং সম্পত্তির সমাজীকরণ। মার্কসবাদীরা সামাজিক সম্পত্তিকে দেখেছেন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে। সিণ্ডিক্যালিস্টরা সামাজিক সম্পত্তি বলতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা বোঝেন নি। তাঁরা চেয়েছেন উৎপাদন শ্রমিকদের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত এক একটা শিল্প সংঘ এবং তাঁদের পরিকল্পিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্র অনুপস্থিত। কারণ রাষ্ট্রকে তাঁরা দেখেছেন এক দানবীয় পরস্বাপহারী ব্যবস্থারূপে। তাঁরা রাষ্ট্রের উচ্ছেদ কামনা করেছেন। মার্কস চেয়েছেন রাষ্ট্রের নামবিলোপ। এক আঘাতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে উৎখাত তিনি করতে চান নি। কারণ তাঁর মতে এই পরিকল্পনা অবাস্তব। সিণ্ডিক্যালিস্টরা উৎপাদক সংস্থা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের যৌথ মালিকানায় বিশ্বাসী। ব্যক্তিগত মালিকানা তাতে বিলুপ্ত হয় বটে, কিন্তু সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা তাতে বিলুপ্ত হবে। তাঁদের কর্মসূচীতে বা সমাজতান্ত্রিক রূপরেখা কার্যকরী হলে সম্পত্তির মালিকানা যাবে উৎপাদক সংস্থাগুলোর হাতে। ফলে সংস্থাধীন সম্পদ ব্যবহারের উপর কর্তৃত্ব থাকবে ঐ সব সংস্থা পরিচালকদের। সংস্থার শ্রমিকরাই যেহেতু পরিচালক, সেই হেতু উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকে শ্রমিকদের হাতে। হাব ডুবিং-এর সমালোচক মার্কসের সহকর্মী এঙ্গেলস্ এই ব্যবস্থার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে বিভিন্ন স্বতন্ত্র সংস্থার মধ্যে অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে আর্থিক লেনদেন বা ব্যবসা বাণিজ্য। পরিণামে আবার দেখা দেবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সব বৈশিষ্ট্য। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছাড়া সমাজতন্ত্রবাদ অচিন্তনীয়। ডুরিং সমালোচনায় এঙ্গেলসের বক্তব্য মার্কসের চিন্তা-সম্মত। ক্যাপিটেলের প্রথম খণ্ডে মার্কস্ ভাবী সমাজের যে রূপ রেখা এঁকেছেন তাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন শিল্প সংস্থার কোন স্থান নেই। পুঁজিবাদী কারখানায় শ্রমবিভাগের যে রূপ আমরা লক্ষ্য করি সমগ্র সমাজের পটভূমিতে

বিভিন্ন উৎপাদন সংস্থা সেই সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবে এক কেন্দ্রীয় পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্বে। আলোচ্য প্রবন্ধে জয়প্রকাশজীর মার্ক্সীয় এই রূপরেখা সংশোধন করার প্রস্তাব করেন। স্থানীয় ক্ষুদ্রাকৃত শিল্প সংস্থা পরিচালনার দায়িত্ব তিনি অর্পণ করতে চেয়েছেন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে। সমবায়মূলক সংগঠনকে সমাজবাদী সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে তিনি ঘোষণা করেন। অর্থাৎ তাঁর সমাজবাদী চিত্র সিণ্ডিক্যালিষ্ট আদর্শের অনুরূপ।

তাঁর পরবর্তী রচনা হল 'Transition to Socialism' সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পদ্ধতি নিয়ে মার্কস্বাদীদের মধ্যে দীর্ঘকাল বিতর্ক চলেছিল। সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে স্থির বিশ্বাসী ছিল। এই পথে যে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হতে পারে না সেই প্রত্যয়ের পক্ষে লেনিন নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে গেছেন সারাজীবন। সমাজতন্ত্রের পথ হল শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পথ। এবং এই পথে অনিবার্য ভাবে আসবে শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য। আলোচ্য প্রবন্ধে জয়প্রকাশজী নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির সম্ভাবনার দিকটাই কেবল উল্লেখ করেন নি। এই পথের প্রতি তার পক্ষপাতও তিনি ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্নে তিনি মার্কস্বাদী কাঠামোর বাইরে যান নি।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়টা নিশ্চয়ই অমার্কসীয় নয়। কিন্তু এর একটা নৈতিক দিক আছে। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হল সশস্ত্র গৃহযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ের পথ। গান্ধীজীর অহিংসনীতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজ তন্ত্রে উত্তরণের মার্কসবাদী ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং এই ক্ষেত্রে জয় প্রকাশজী গান্ধীবাদ ও মার্কস্বাদকে মেলাবার একটা ভূমি পেয়েছিলেন। তবুও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির কার্যকারিতা যে নিঃশর্ত নয় সে কথা নতুন ভাবে জয়প্রকাশজী জানালেন ১৯৪৭ সালে দলের কানপুর সম্মেলনের রাজনৈতিক বক্তব্যে। নির্দিষ্ট শর্তের অবর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর যে সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়েই ঘটবে এ কথাও তিনি শোনালেন উক্ত বক্তব্যে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তাকেও তিনি এই পরিপ্রেক্ষিতে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে দলীয় একনায়কত্ব হিসেবে তিনি গ্রহণ করেন নি। একদলীয় প্রথা তাঁর কাছে অগ্রাহ্য। রাজনীতিতে যে একটা নৈতিক প্রশ্ন আছে সেই বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন তিনি "Transition to Socialism"এ। কিন্তু প্রশ্নটার গুরুত্ব বহুলাংশে বেড়ে গিয়েছিল দলের

নালিক সম্মেলনে। তিনি চাইলেন এক সামগ্রিক নৈতিক বিপ্লব এবং এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার আহ্বান জানালেন রাজনীতি বহির্ভূত মানবমুখী চিন্তানায়ক ও দার্শনিকদের। অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা তিনি অকপটে স্বীকার করে নিলেন। উক্ত স্বীকৃতি তাঁর ব্যক্তিসত্তা বিকাশের একটা নবপর্যায়ের সূচনা।

পরবর্তী কয়েকটা বছরে তাঁকে আমরা দেখলাম দলীয় সংগঠক হিসেবে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত জীবনে। এল নতুন সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হিসেবে তিনি দলকে প্রস্তুত করতে চাইলেন কিন্তু ফলাফল আদৌ আশানুরূপ হল না। তাঁর দল কয়েকটা রাজ্যে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেলেও কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এত প্রবল যাতে তিনি নিশ্চয়ই খুব নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর কর্ম হল নিজ দলের সঙ্গে আচার্য কৃপালনীর নেতৃত্বাধীন কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির মিলন সাধন। এই মিলনকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন মার্কস্‌বাদ-গান্ধীবাদের মিলন সেতু হিসেবে। এই মিলনের পশ্চাতে তাঁর দুটো উদ্দেশ্য ছিল। লক্ষ্য ও উপায় সম্পর্কে পুরনো নৈতিক প্রশ্নের একটা রাজনৈতিক মীমাংসা বলে তিনি এই মিলন প্রচেষ্টাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সমাজবাদ দ্বন্দ্বমুক্ত এক শান্ত সমাজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চায়। কিন্তু হিংসাত্মক ও রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পথে এমন সমাজ কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুতরাং চাই শান্তিপূর্ণ পথ। কৃপালনীজী পুরনো গান্ধীবাদী নেতা। তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের যোগদানে সম্ভবতঃ নৈতিক প্রশ্নটার সমাধান হল বলে তিনি অনুমান করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ শাসক কংগ্রেস ও উগ্রপন্থী স্তালিনবাদী রাজনীতির বিকল্প হিসেবে শক্তিশালী দলীয় সংগঠনের প্রয়োজনে উক্ত মিলন তাঁর কাছে খুবই কাম্য ছিল।

এর পরেই আমরা দেখলাম জয়প্রকাশজীকে আচার্য ভাবের সর্বোদয় আন্দোলনের একজন পুরোহিত হিসেবে। সর্বোদয় একটা নৈতিক আন্দোলন— মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের গান্ধীবাদী প্রত্যয় যার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি গ্রামের পর গ্রামে গিয়ে প্রচার করলেন সর্বোদয়ের আদর্শ। আহ্বান জানালেন ভূস্বামীবর্গের কাছে ভূমিদানে অগ্রণী হতে। এ আন্দোলনে তিনি কতখানি সাফল্য অর্জন করেছেন বা তাঁর এই নতুন নিরীক্ষার মূল্য কতখানি তা তিনি এখনও দেশবাসীকে জানান নি। দলীয় রাজনীতি ত্যাগ করে তিনি সর্বোদয়ে

যোগ দিয়েছিলেন। রাজনীতির চৌহদ্দীর মধ্যে না থাকলেও তার আশে পাশেই তিনি ছিলেন। কারণ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিতে কোন রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে তিনি নির্বাক থাকতে পারেন নি। প্রায় অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁকে আমরা দেখলাম পণ্ডিত নেহরুর প্রতিপক্ষ হিসেবে পাটনার ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিরূপে। বিক্ষুব্ধ পাটনার ছাত্র সমাজ জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলেছিল। পণ্ডিত নেহরু তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। জয়প্রকাশজী দাঁড়ালেন ছাত্রদের পক্ষে। সম্ভবতঃ নেহরুর বিরুদ্ধে সেই ছিল তাঁর প্রথম বিদ্রোহ। অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন পাকিস্তানের আয়ুবতন্ত্রী সামরিক শাসনের প্রতি জয়প্রকাশজীর নরম মনোভাব প্রদর্শনে। সম্ভবতঃ তিনি পাক-ভারত বিরোধ একেবারেই পছন্দ করেন নি। অথবা তাঁর হয়ত ভয় ছিল যে উগ্র পাক বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে আবার সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যে কতখানি ভয়ঙ্কর তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর বিহারেই। এই দুটো অনুমান ছাড়া আয়ুবতন্ত্রের প্রতি তাঁর নরম মনোভাবের অন্য কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

রাজনৈতিক আবর্ত থেকে দূরে গেলেও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তিনি কোনদিনই উদাসীন থাকতে পারেন নি। রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই তিনি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। নীতি-বর্জিত রাজনীতির তিনি তীব্র সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। জয়প্রকাশজী জনজীবন থেকে বিদায় নেন নি। বরঞ্চ তিনি ভেবেছিলেন যে সর্বোদয়ের মাধ্যমে এক নয়া সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তিনি রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিরে আসেন নি, বা ফিরে আসবার কথা ভাবছেনও না। সম্ভবতঃ ও পথ এখন রুদ্ধ তাঁর কাছে। সর্বোদয়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর মনে নতুন কোন সংশয় নিশ্চয়ই জেগেছে। সর্বোদয়ের পুন-র্মূল্যায়ণে তিনি ব্রতী হবেন কিনা তা আমরা জানি নে। তবে প্রশ্ন নেই : এ ব্যাপারে যে দলীয় রাজনীতি বা সর্বোদয়ের কোনটিতেই তিনি ফিরে যেতে পারবেন না অথচ দুটির কোনটিকেই তিনি একেবারে অগ্রাহ্য করতেও পারবেন না দলহীন গণতন্ত্রের ধারণা অস্পষ্ট হলেও হয়ত এই পথে তিনি কোন নতুন দিক নিশানা দিতে পারবেন। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক এই পটভূমিতে বিচার করতে হবে জয়প্রকাশজীর সর্বাত্মক বিপ্লবের সাম্প্রতিক রণ-ধ্বনি।

বিবমিষা / বাণিক রায়

আমি সুখী লোকের সম্পর্কে খুব কম এসেছি, সুখী লোক দেখলেই কেমন অচেনা মনে হয়, কেননা অসুখে সারা পৃথিবী ভরে গেছে, প্রকৃত সুখীর চেহারা মনে পড়ে না, যারা সুখী বলে ভাবছে, মনে করছে, তারা মদে সুখী হয়ে আছে, চুরি করে টাকার মদে, রাজনীতির অনাচারের মদে, এবং পরকে ধাক্কা দিয়ে মদ গিলে সুখের চেহারা সর্বত্র। চৈতন্যের শান্তি কারো চোখে মুখে দেখি না। হঠাৎ দেখতে পেলে ভয় হয়, মনে হয় ছলনা করবার জন্যে সে এসেছে বুঝি, নতুবা আমি বুঝতে পারছি না।

আমার এক বন্ধু, সুশান্ত, তার একটি পরিচিত বিজ্ঞাপনের ফার্মে নিয়ে গেল, বন্ধুটি কিছুটা খ্যাপা, প্রেস হাতে নেই, পত্রিকা ওর লেখা ছাপায় না, কোনোদিন ওর নামে কোনো প্রকাশক বিজ্ঞাপন করে না, অর্থাৎ ওর নাম কেউ তেমন জানে না, কারণ সুযোগ পায়নি, তবু বই লিখতে চায়, গোটা কয়েক বই লিখেছে, নিজের পয়সায় ছাপিয়েছে, বিক্রির চেয়ে বিলিয়েছে বেশি যারা পেয়েছে তারা, পৃষ্ঠা উল্টেও দেখে নি, এবং অনেক কবিকেও দিয়েছে, যারা বই দিয়েছে আগ্রহে, যেখানে নিয়েছে, সেখানেই ফেলে গেছে, সুশান্ত পরে পড়ে থাকতে দেখে ব্যথা পেয়েছে মনে, এ হেন সুশান্ত একটি ইংরেজীতে বই লিখেছে, ধরে পড়ে অনেককে দিয়ে সংশোধন করে নিয়েছে লেখা, কিন্তু ভালো প্রচার দরকার সেই হেতু কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় একটি ফার্মে প্রচার, বিজ্ঞাপনের জন্যে আমাকে নিয়ে প্রবেশ করলো। ভদ্রলোক প্রস্তুত ছিলেন না দেখতে সৌম্য, ব্যবহারে অমায়িকতা, ঢুকতে দেখেই চেয়ার থেকে ওঠে দাঁড়ালেন আপ্যায়নের জন্যে, পরে সঙ্গে বললেন, বসুন, বসুন। আমরা হেসে চেয়ারে বসলুম দুজনে। বললেন ভদ্রলোক, বলুন কি ব্যাপার। সুশান্ত বললো, আমার একটি বই ছাপিয়েছি, আপনারা যদি প্রচারের ভার নেন এবং পরিবেশনের।

—কি বই ?

—কতকগুলি কবিতার অনুবাদ। সুশান্ত বললো।

- কবিতা ! আঁতকে উঠলেন, কবিতার অনুবাদ ! ও তাই চলবে না। আর আপনি তো ইংরেজী সাহিত্যে খ্যাত নন।

সুশান্ত বললো, খ্যাত হবো কি করে, আমি লিখি বাংলা। আর বাজারে সাহিত্যে লিখি না। সুতরাং এখানেও নাম কম।*

—কিন্তু আমরা তো ব্যবসা করি, যাদের চলে তাদের নিয়ে আমরা ভাবি। যদিও আমরা নতুন লেখকদের চালাবার চেষ্টা করেছি, রিভারশিপ তৈরী করবার চেষ্টা করেছি। বাংলা দেশে কোনো প্রকাশক যা করে নি।

বাইরে তাকিয়ে দেখলুম, একটি ট্রাম চলে গেল তারে শব্দ তুলে. শরতের তেজা পরিষ্কার আলোর রাস্তা পরিচ্ছন্ন, ফুটপাতের একটি গাছ থেকে বকুল ঝরে পড়লো, পরেই একটা ঠেলা পিষে গেল, ইলেকট্রিক তারের ওপরে একজোড়া কাক বসেছিল, হঠাৎ চিৎকার করে কোথায় উড়ে গেল দূরে।

ভদ্রলোক পরিচ্ছন্ন, সাদা টেরিলিনের বুশসার্ট পরণে, চুলগুলি কোঁচকানো, সামনে একটু পাক ধরেছে, টিকলো নাক, উন্নত কপাল, ফর্সা, দাঁতগুলি কথা বলবার সময় ঝকঝক করে ওঠে, গাল সুন্দর মসৃণ করে কামানো, দেহটা একটু ভারী হয়ে পড়েছে, হয়তো ভুঁড়ি একটু বেশি, কিন্তু চেয়ারে বসে আছেন বলে বোঝা যায় না। পাশে দুটো টেলিফোন, মাথার ওপর সুন্দর, দামী শেলফে মূল্যবান বই থাক থাক করে ভালোভাবে সাজানো, নরম গদিওয়ালা সোফা পাশে। এরই মধ্যে লোকজন কথা বলতে আসছে, কথা বলে চলে যাচ্ছে, ব্যবহারের মধ্যেও পরিচ্ছন্নতা, ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, হুকুমই করছে, কিন্তু এমন ভাবে করছে বোঝা যাচ্ছে না, কথা বলেই হাসছে, কর্মচারীরা এসে চলে যাচ্ছে, কেউ ক্ষুন্ন নয়।

সুশান্ত বললো, আপনাদের কি আপত্তি আছে নেবার?

হেসে বললেন ; না, আপত্তি নেই। আপনি বই ছাপিয়েছেন আমাদের আপত্তি থাকবে কেন? তবে যদি ছাপানো না হয়ে থাকে একটা অনুরোধ করবো, লেখাগুলো লণ্ডনের কোনো নামকরা কবিকে দিয়ে একবার দেখিয়ে নিতে। ওদের ওখেনে এরকম সংস্থা আছে, ওরা কাজ করে দেয়, এবং ভূমিকাও লিখে দেয়।

সুশান্ত বললো, আমি তো জানি না।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠিকানা বার করলেন বই থেকে এবং নিজেই টুকে দিলেন সুশান্তের হাতে। সুশান্ত বললো, যদি ধরুন এবার সম্ভব না হয়, তাহলে কি আপনি নেবেন না।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, নেবো, তবে বিক্রির কোনো গ্যারান্টি দেবো না,

আমাদের লোক চেষ্টা করবে, দেখাবে। শর্ত দুটো ; আমরা নিলে কিছুটি পার্সেন্ট দিতে হবে, অন্য কাউকে পরিবেশক করা চলবে না।

এই সময় এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, মাথার চুলগুলি পেকে গেছে, চেহারাভারী, ফর্সা. সুশান্তকে দেখতে পেয়েই বললেন, আরে সুশান্তবাবু কি খবর অনেকদিন দেখা নেই। ওদিকে আসেন টাসেন না তো।

সুশান্ত বললো সময় পাই না, আর আপনাদের ওখেনে গিয়ে হালে পানি পাই না। আপনার পত্রিকা আমাদের জন্যে নয়।'

হেসে ভারিক্কি চালে বললেন, কি যে বলেন. আসবেন। আপনারাই তো এখন চালাবেন। আমরা তো শেষ হয়ে এসেছি।

সুশান্ত বললো, শেষ হলেও টগবগিয়ে চলছে রঞ্জক সাহেব। আমরা জন্মেই পঙ্গু।

রঞ্জন বললো, তা এখানে কি দরকার ?

সুশান্ত বললো. এই ব্যক্তিগত, একটা বইয়ের ব্যাপারে।

কথা জমে উঠলো, কোনো কোনো কবির প্রসঙ্গ উঠলো, উঠতেই রঞ্জন অনেককে গালাগালি দিতে থাকলো , বিখ্যাত এক কবির নাম বলতেই ফার্মের লোকটি মুখ ঘুরিয়ে এমন এক ভাব করলেন ও বললেন, মনে হলো অমায়িকতার ভেতরে গর্ব ও দম্ভ লুকিয়ে আছে ; বললেন , কবি হবে আনন্দময়, মরোস্ হয়ে থাকে। ওকে দিয়ে কিছু হবে না। ইংরেজী প্রসঙ্গে কথা উঠতেই ভদ্রলোক বললেন. ওর কথা বাংলাদেশেই মানে, বাংলার বাইরে কেউ মানে না। রঞ্জন বলে উঠলেন, শুনলুম, বোম্বেতে আপনারা বাড়ী নিয়েছেন, হেসে বললেন, হঁ্যা নিই নি, ওনারশিপ নিয়েছি, তিন লাখ টাকা দিয়ে। আমি যাই নি। তবে শুনেছি ভালো, বাড়ি নয়, একটা ফ্লোর কিনেছি। ভাল জায়গা। রঞ্জন বললেন, দিল্লিতে এখন কেমন চলছে ? ভালো !

ভদ্রলোক বললেন, ভালো. খারাপ চলবে কেন ? আমি সব সময়ই আনন্দে থাকি, কি বই পড়ছেন নতুন ?

রঞ্জন বললেন, পড়ছি, তবে চোখটা কষ্ট দিচ্ছে। মেয়েটা তো বলছে, আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। বলে, তুমি তো বুড়ো। হেসে বললেন, কি যে বলে ?

ভদ্রলোক বললেন, আপনার বয়স কতো হলো,

—চুয়াল্লো।

ভদ্রলোক সুশান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, বলুন তো আমার বয়স কতো,

সুশান্ত বললো, ষাট হবে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আমার চৌষট্টি, আমি এখনও কার্যক্ষম, সব কাজ নিজে করি, না আমি বুড়ো হই নি, ক্লান্তিবোধ আমার নেই, আমি সর্বদাই আনন্দে থাকি। আমার বন্ধুরাও ভালো তাই আমি ভালো থাকি, আমার যা খরচ, তার থেকে আমি অনেক বেশিই উপায় করি, কিন্তু কাউকে ফাঁকি দিই না। আর আমার সিটেই আমি কিছু, বিদেশ থেকে অনেকে আসে, তারা দেখা করতে চায়, বলি আমি যেতে পারবো না তাই, এখানে এলে দেখা হবে। আমি ভালো আছি, আনন্দেই আছি। আমার কোনো আক্ষেপ নেই, অভিযোগ নেই, আমি ভালো, কারণ আমার বন্ধুরা ভালো।

সুশান্ত বললো ; আপনি বাংলাদেশে এসেছিলেন কবে।

ভদ্রলোক বললেন, আমার বাবা এসেছিলেন এখানে, আমার জন্ম পড়াশুনো সব এখেনে। বাড়ি আমাদের পাঞ্জাবে। তবে যাই নি কখনো। এলাহাবাদে আমাদের একটা বাড়ি আছে, আর এখানে। আমি বাঙালিই।

সুশান্ত বললো, আপনি সুখী বাঙালি, যা আমাদের দেশে নেই।

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন, রঞ্জন এর মধ্যে চুপ করে গেছেন, মাঝে কাকে নিয়ে কথা উঠেছিল, সুশান্তর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে গেল একরকম। রঞ্জন যাকে ভালো বলে, তাকে ভালো না বললেই বিপদ, এবং তারি ভালো বলার মধ্যে নিজের স্বার্থবুদ্ধির পরিচয় আছে। সে দেশে গণ-বিপ্লবের কথা বলতে চায়। ভদ্রলোক বললেন, আমি দেখেছি যারা রাইট তারা বই পড়ে না। তাই বলি ইফ ইউ আর রাইট, টার্ন লেফট। বলে হাসি। আমি বসে বসে এই সুখী ভদ্রলোককেই দেখছিলাম, সুখের স্বাচ্ছন্দ্যজীবনের মাধুর্য নিয়ে এসেছে। আমার কানের মধ্যে বাজছিল, আমার যা খরচ, তার অনেক বেশিই আমি উপার্জন করি। আমি অসুখে থাকবো কেন ? আমার বন্ধুরা ভালো তাই আমিও ভালো থাকি, সদা আনন্দে থাকি। ভদ্রলোক এক সময় কবিদের সম্বন্ধে এক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, কবিরা সদা আনন্দময় হবে, একালের কবিরা যে কী সব সময় মুখ গোমড়া থাকে। তাই সুশান্তবাবু আপনাকে দেখে মনে হয় না, বড্ডো সিরিয়াস। চোরকা নিশানা চোরি, কবিকা নিশানা নারী। বলেই হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। রঞ্জন সায় দিলেন মুচকি হেসে।

সুশান্ত বইয়ের ব্যাপারে আরো দুটো কাজের কথা বলে উঠে পড়লো, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ওর সঙ্গে বেরিয়ে এলুম, বস্তুর আমাদের গ্রাহ্যই করলেন না। সেদিন আর আমার আপিস যাওয়া হলো না, সুশান্ত জোর করে বললো, চল, আজ আমরা সিনেমা দেখি।

তখন তিনটে বাজে বাজে। সিঁড়ি দিয়ে নামছি, পান বিড়ি সিগারেটের দোকান সুশান্ত দুটো সিগারেট কিনলো, বললো পান খাবি? না করলুম।

সঙ্গে সঙ্গে সানকি হাতে চার পাঁচটি ভিখিরি এসে দাঁড়ালো, কান্নায় কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাইলো. পান বিড়ি সিগারেটওয়ালা হেঁকে উঠলো ওদের সামনে, ওরা প্রায় গায়ে লেপ্টে যাচ্ছে কিছুতেই যেতে চায় না। ওদের ব্যূহ ভেদ করে কোনো রকমে আমরা বাসে উঠলুম, আগেকার ইংরেজ পাড়ায় সিনেমা হাউসে ঘুরে বেড়ালুম কিছুক্ষণ টিকিট না পেয়ে; শেষে একটা স্পাই বইর ছবি পেলুম দেখতে। জাপানি ছবি: একটা বিষাক্ত সাপ কি ভাবে দাঁড়তে বাঁধা নরনারীকে ছোবল মারতে আসছে, আর বার বার একটি পুরুষ পা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, শেষ পর্যন্ত একটা চুলের কাঁটা দিয়ে ইলেকট্রিক চার্জ করে সাপটাকে মেরে ফেললো দুর্দান্ত পুরুষ। কাপড়ের মধ্যে চুম্বন ও আলিঙ্গন করতে করতে গোপনে সংবাদ পাঠাচ্ছে স্মাগলারদের সঙ্গে মেয়েরা মগ্ন হয়ে শুয়ে সংবাদ নিচ্ছে, শেষে স্মাগলারদের গুলি করে মেরে আনন্দে দুটি মেয়েকে নিয়ে প্লেনে চলে গেল সকলে, নগ্ন নারীর দৃশ্যে পর্দাটা ঝলমলিয়ে উঠলো। বেশ কাটলো কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা ঘরের অবাস্তব স্বপ্নে।

সুশান্ত আজ দিল দরিয়া, সিনেমা শেষ হতেই বললো চ, কিছু খাই।

বললুম, আমার ট্যাঁকে কিছু নেই।

হেসে বললো, তোর ট্যাঁকে কোনো কালেই কিছু থাকে না। চ, আমিই খাওয়াবো। সারিয়ে এসে পৌঁছলুম হেঁটে, মুসলমান বাজার পাড়া, বিভিন্ন রকম ফল বিক্রি হচ্ছে, লাল খয়েরি সাদা আপেল, বেদানা, মোশাম্বি, আখরুট, বয়মে ভর্তি দামি খাবার, ফলের বাক্সের পাতায় ভর্তি রাস্তা, কিছুটা পেরুতেই মাংসের দোকান, রাস্তার ওপরই বড়ো চাটু করে ডালডার সাদা পরটা ভাজছে, শিক কাবাব পোড়াচ্ছে, কাঁচা মাংসের গন্ধে জায়গাটা ভর্তি ভিখিরি গুলি পাশে দাঁড়িয়ে, ভয়ে এখানে আসতে সাহস পায় না, হয়তো গরম শিক পুড়িয়েই বিঁধিয়ে দেবে। একসঙ্গে পাঁচ সাতটি ভিখিরি ছেলেমেয়ে ভিড় করে থাকে, সানকি হাতে ভিক্ষা করে, বাসি ছেঁড়া রুটি পায় কখনো কখনো

ডাষ্টবিনে ফেলা মাংসের হাড় ও ভাঁড়ের খোল চেটে খায়, নষ্ট কমলালেবুর একটা অংশ বাদ দিয়ে অন্য অংশটা চেটে খায়, কুকুর এসে ঘেউ ঘেউ করে দাঁত বার করে খিঁচিয়ে ওঠে, ল্যাজ সোজা করে, তারপরে কুকুর ও ভিখিরি একই সঙ্গে ডাষ্টবিন থেকে খাবার খুঁটে খায়। তেলচেটা ন্যাকড়ায় ভিখিরি মেয়ের কোমর বাঁধা, বুকের কাপড় আছে কি নেই, ফুটপাথে থাকে, ফুটপাথেই হাগে মোতে, রাস্তা দিয়ে এগোনো যায় না। এই পাড়ায় মাংসের দোকানের আনাচে কানাচে যেন এদের ভিড়। এদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে শাদা বাড়িগুলি, শাদা জলের নীচে কালো মাটির মতো দেখতে। এদের দেখে আর খেতে ইচ্ছে হয় না। আবার দেশের চেহারাটা এই ভিখিরি মেয়েদের মতোই, গায়ে চিটচিটে ময়লা দুর্গন্ধ, ছেঁড়া ন্যাতা পরনে, বুকের কাপড় নেই মাথায় ময়লা ও নোংরা ঝাঁকড়া চুল, উকুনে কিলবিল করছে, কোলে রিকেটি তিনটি ছেলেমেয়ে, চেঁচাবার শক্তিও নেই, কিন্তু ওরাই ওর ক্যাপিট্যাল বা মূলধন, করুণা বা সমবেদনা জাগিয়ে ভিক্ষা করে খায়, তৃপ্তিতে আছে, শোয়, আরও বাচ্চা হয়, ফুটপাথ ছেয়ে ফেলে, মানুষের হাঁটবার জো থাকে না, তবু হাঁটতে হয়, বেঁচে থাকতে হয়। বাড়ি ওঠে। সুশান্ত আমার অবস্থা দেখে হেসে বললো, নাক সিটকোচ্ছিস কেন ?

বললুম, দেখতে পাচ্ছিস না ?

সুশান্ত নির্বিকারভাবে হেসে বললো, সারা দেশেই এই চেহারা।

—হ্যাঁ, কিন্তু পার্থক্য নেই, একই নরকে আছি, তবে নরক বলে মনে করছি না।

—মনে না করলে আর আপত্তি বা বাধা কোথায় ?

ভিখিরিদের একরকম ঠেলে ঠেলেই আমরা সাবিরের দোতলায় উঠলুম, উঠতেই অন্য চেহারা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে, তকতকে, শাদা উর্দিপরা খানসামা এলো অর্ডার নিতে। চাপ ও তন্দুরীর অর্ডার দিলো সুশান্ত।

সুশান্ত বললো, রাস্তাঘাট আর চলাই যায় না। যাদের গাড়ি আছে, তারা একরকম এড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের উপায় নেই। তারপর একটু থেমে বললো, এই অপমানুষদের বাঁচিয়ে রেখে কি দরকার, গ্রীসের মতো যদি মারতে পারা যেতো. আমি হেসে বললুম, দেশটা গ্রীস নয়, আর্যরা আমাদের পরাজিত করেছে। আর এখানে ওরা নিজেদের উন্নতি করেছে। এই সব ভিখিরি, বেকার, চোর, জোচ্চোর না থাকলে দেশে গণতন্ত্র থাকে না।

দেশে খাদ্য সঙ্কট, খরা, বন্যা, বেকারী-ছাটাই আছে বলেই তো বামপন্থীরা মিছিল বার করতে পারে। গণতন্ত্রের জন্যেই ওদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বংশ বৃদ্ধি করতে হবে, তাহলেই ভোটাধিক্য হবে। বাইরের দিকে নীচে তাকিয়ে দেখলুম, সারিবের চারপাশে ভিখিরি গিজগিজ করছে, সকলের হাতেই সানকি, ছেঁড়া ন্যাকড়া, তেল চিট্‌চিটে ময়লা গা, ঝঁাকড়া মাথা উলঙ্গ চেহারা বাড়িটা ঘিরে ধরেছে মাথায় করে। সুখী মানুষের কথায় প্রতিধ্বনি শোনা গেল মনে, আমি যা খরচ করি, তার চেয়ে বেশিই আমি উপার্জন করি, আমার কোনো অভিযোগ নেই, আমি ভালো আছি, কারণ আমার বন্ধুরা ভালো আমি এই বয়েসেও কেমন কাজ করে যাচ্ছি। মনে হলো ভদ্রলোক পাঞ্জাব থেকে এসে এখোন বাঙালি হয়েছেন। খাবার দিয়ে গেল খানসামা। সুশান্ত প্লেট টেনে নিয়ে খেতে শুরু করলো, আমিও খেতে আরম্ভ করলুম ওর দেখা দেখি। খিদে পেয়েছিল, ভালোই লাগলো। বিল উঠলো সাত টাকার মতো, সুশান্তই দিয়ে দিলো। কারণ ওর ইংরেজি কবিতার বই বেরুবে। আনন্দে টগবগ। নীচে নামতেই আবার ভিখিরি, চার পাঁচটা ভিখিরি প্রায় ঘিরে ফেললো, সুশান্ত একটাও পয়সা দিলো না, পয়সা দিলেই শ'খানেক ভিখিরি এসে জুটবে। কিন্তু নীচে নামতেই কাদায় নর্দমায় ভিখিরিদের চাপে গা গুলোতে লাগলো।

সামনে একটা দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াতে হলো। কতগুলি দর্জির দোকান, শাটার টেনে দিয়েছে; নীচের দিকে শাটারের এক ইঞ্চি জায়গা খোলা, দু'তিনটে দোকানের শাটারের নীচে দু'তিনটে করে বাচ্চা সানকি নিয়ে দাঁড়িয়ে শাটারের ভেতর দিয়ে সানকি গলিয়ে দিচ্ছে, আর কণ্ঠে কাতর আকুতি তুলে বলছে, বাবু, খাই নি, খাবো। ওরা হয়তো জানে, এই সময় দোকানের লোকেরা খাবার খায়, ফুটপাথের লোকেরাও এই দৃশ্যে অভ্যস্ত, ভেতরের লোকেরাও কিছু রাখছে না, ওদের এই ব্যবহারে, শাটারের ভেতর থেকে লোকেরা সানকির মধ্যে মাঝে মাঝে শশার টুকরো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, শশার টুকরো পেয়েই পরম আনন্দে বাইরে সানকি এনে গোগ্রাসে গিলছে, এমনিভাবে একটার পর একটা দোকানের শাটারের নীচে ভিখিরির বাচ্চাগুলি হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আর খাচ্ছে, এর মধ্যে সাত আট বছরের একটা বাচ্চা একটা শশার টুকরো পেয়েছে সে তারিয়ে তারিয়ে একটু একটু করে খাচ্ছে, ওর বোনই হবে, ওর থেকে বড়ো, একটু চাইলো হাত বাড়িয়ে, সঙ্গে সঙ্গে

বললো বাচ্চাটা, উঁ, আর তার পরেই পুরোটা মুখের ভেতরে দিয়ে চিবোতে লাগলো, দাঁত বার করে। পরক্ষণে আবার ওষুধ দোকানের শাটারের নীচে হাত গলিয়ে কাতর স্বরে খাবার চাইলো, মুখ চিবোচ্ছে অনবরত।

আমি আর দাঁড়িয়ে দেখতে পারলুম না, ঘেন্না হলো, বাইরের এই নরক আমার মনের ভেতরে ঢুকে গেছে সেখানে কৃমিকীটের সঙ্গে সাপ পেঁচা বাদুড় ইঁদুর ছুঁচো একই সঙ্গে খেলছে, সঙ্গম করছে, মলমূত্র ত্যাগ করছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জন্মাচ্ছে এবং মরছে, ওদের মরা দেহ ফুলে উঠছে আমার চারিদিকে, আর এক অদ্ভুত অশরীরী ছায়া, যে ছায়া মানুষের গলে-যাওয়া শবে তৈরী সমস্ত দিক ছেয়ে নেমে আসছে, আমি আঁতকে উঠলুম, আমার মনের মধ্যে ভয়ের আতঙ্ক ঘুলিয়ে উঠলো, মনে হলো, আমি জেগে নেই, ধীরে ধীরে ওদের সঙ্গে আমার দেহের কণা মিশে যাচ্ছে, মাথা ঠিক রাখতে পারলুম না। ভেতর থেকে বমি উগরে উঠলো, ওখেনেই বসে ফুটপাথের নর্দমায় বমি করলুম গলগল করে যা খেয়েছিলুম, একসঙ্গে বেরিয়ে এলো, বুক চিরে, মনে হলো রক্তবমি হবে গলা চিরে, সুশান্ত আমাকে ওঠাবার চেষ্টা করলো, পারলো না, রাস্তায় দু একজন লোক জুটে গেলো, কেউ হাসলো মনে করলো, মদ গিলেছি সহ্য করতে পারি নি, তাই উগরে বেরিয়ে আসছে। ওগরানো বমি ভিখিরিদের মধ্যেই পড়লো। সব নিঃশেষ হয়ে বেরুবার পর নিজেকে কিছুটা হাল্কা বোধ হলো, উঠে দাঁড়ালুম, সুশান্ত বললো, কি গাড়ি করবো ? বললুম, না, হেঁটে যেতে পারবো চল্। দুজনে আমরা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলুম, কাঁচা মাংস পোড়ার গন্ধ, আরবি হালিমের গন্ধ, লুঙ্গি, সঙ্গে শাদা দাড়ির দোলা, গাঁদ-ওঠা টিন, চীনে মেয়ের স্কার্টপরা শাদা পা, থ্যাবড়া নাকের মুখ, বোরখা পরা মুসলমানী...... ...এইসব দৃশ্য আমাদের ঢেকে ফেললো। সেন্ট্রাল এ্যাভেনিউতে এসে দাঁড়ালুম। রাস্তাটা অনেকটা ফাঁকা একটু জল তেষ্টা হলো ভয় হলো, অন্ধকার জমাট হয়ে উঠলো আবার আমার বুকে, বাইরের যা কিছু খাবো, প্রকৃতি যা দেবে মানুষের হাত দিয়ে, সব বমি হয়ে বেরিয়ে আসবে। প্রকৃতি চায় না আমরা কিছু খাই। এক অদ্ভুত অশরীরী ছায়া আমার চারপাশে, মাথার ওপরে আবার ভিড় করে দাঁড়াতে লাগলো, মনে হলো, আমার যন্ত্রণা আমার একাকিত্ব, আমার স্বাধীনতা, আমার স্বাতন্ত্র্য সব শেষ হয়ে গেছে, ছায়ার সঙ্গে ছায়া হয়ে মিশে যাচ্ছি, গাড়ি ঘোড়া লোকলস্কর যানবাহন কোথায় ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল ?

রাস্তা দিয়ে বিশ্বকর্মা পুজোর ভাসানের বাজনা বাজছে, ধুনো পুড়ছে। ঘণ্টা বাজছে, হল্লোড় হচ্ছে। ভদ্রলোকের কণ্ঠ ভেসে এলো : আমি ভালো আছি।

আদিবাসী বিয়ের গান—মুর্শিদাবাদ/পুলকেন্দু সিংহ

মুর্শিদাবাদ জেলায় সাঁওতাল, ওরাওঁ মালপাহাড়ী প্রভৃতি আদিবাসী বাস করে এর মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে সাঁওতালই প্রধান তারপরে বোধহয় ওরাওঁ।

মুর্শিদাবাদে হিন্দু, মুসলিম, জৈন, মেথর জেলে ওচাই সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা গান আছে। হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবার স্বতন্ত্র গান। শুধু গানই নয় গান, নাচ, ছড়া, রঙ্গ, কৌতুক, বাদ্য, অভিনয় সবকিছুই বিয়েকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

আদিবাসী সমাজে জীবনের সর্বক্ষেত্রে জন্ম, মৃত্যু, বিয়েতে গানের প্রচলন আছে। নৃত্য-গীত আদিবাসী সমাজে জীবনচর্চার অঙ্গ বিশেষ। সুতরাং বিয়ের মত একটি জীবনের পরমলগ্নে আনন্দোৎসবে যে প্রধান স্থান অধিকার করবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে! বিশেষতঃ যখন নৃত্য গীত ও সমবেত পান ভোজনই আদিবাসী সমাজের গোষ্ঠীজীবনের আনন্দ অনুষ্ঠানের প্রধান বা একমাত্র মাধ্যম।

এই জেলায় সাঁওতাল ও ওরাওঁ ছাড়াও কোঁড়া, লোধা, ভূমিজ, মাহালি, মালপাহাড়ী, মুণ্ডা, ইত্যাদিরাও আছে তবে তারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য। সুতরাং সাঁওতাল ও ওরাওঁদের নিয়েই আলোচনা করা যাক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে যে উচ্চ সমাজ - যাকে বলি সেই উচ্চ সমাজে প্রচলিত বহুবিধ আচার অনুষ্ঠান আমরা আর্যেতর আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। বিয়ের বহুবিধ নিয়মরীতিও অনার্য সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করে আমরা এখন আত্মস্থ করে নিয়েছি। উদাহরণের শেষ নাই।

হিন্দুসমাজে এয়োতির লক্ষণ সিঁথির সিঁদুর। সিঁদুর দান বিয়ের প্রধান অঙ্গ। সিঁদুরদানের কথাই ধরা যাক। সধবাদের সিন্দুর ধারণের প্রথা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে বহু প্রচলিত। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ এরাও বিয়েতে বধূর কপালে সিন্দুর দানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়। এদের মধ্যে সিঁদুর দানই বিয়ের মুখ্য আচার। বাঙালি হিন্দুদের অপেক্ষা এঁদের সমাজে সিন্দুরের মর্যাদা অধিক। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের মতে বাংলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল সমূহের হিন্দুরা প্রতিবেশী কোনও অনার্য বা আদিবাসী সমাজ এর কাছ থেকে বর কর্তৃক বধূকে সিন্দুর দান প্রথাটি গ্রহণ করেছে।

ওরাওঁদের বিয়ের গান :—মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমা, বহরমপুর মহকুমাতে বেশ কিছু সংখ্যক ওরাওঁ বাস করেন। এরা দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে তাদের অনেক কিছু যেমন বিস্মৃত হয়েছে তেমনি আবার অনেক আচার অনুষ্ঠান তারা অন্যদের কাছ থেকেও গ্রহণ করেছে। সুতরাং নির্ভেজাল ওরাওঁ সংস্কৃতি এখন হয়ত তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওরাওঁরা সাধারণতঃ গ্রামের প্রান্তে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে। ত'দের অনেকে 'ধাঙড়' বলে।

নতুন জীবনের চিন্তা উন্নত সমাজের সংস্কৃতির সাম্প্রতিক ধারা এদের জীবনে স্পর্শ করেছে। তবু এরা তাদের পুরাতন সংস্কার সংস্কৃতি ও সংগীতের আনন্দময় দিকটি এরা বর্জন করেনি বরং বুক দিয়ে সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

তার ফলে নিজেদের মধ্যে কখনো বা সংঘাত আসে—নতুন পুরাতনের সংঘাত। যেমন এদের বিয়েতে সাধারণতঃ দশ'বার মন মদ লাগে। স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সমবেত নৃত্য যারা শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছে—তারা ভাল চোখে দেখে না। এটাকে কুসংস্কার হিসেবে ভাবতে শিখেছে।

এদের বিয়ে সাধারণতঃ অভিভাবকেরা ঠিক করে দেয়। মেয়ের বয়স যখন ১০ | ১২ বছর ছেলের ১৯ | ২০ তখনই বিয়ের উপযুক্ত সময় হয়েছে মনে করা হয়। পণপ্রথা আছে। মাথায় সিঁদুর দেয়। এদের সামাজিক জীবনে অনেক হিন্দু আচার অনুষ্ঠান অনুপ্রবেশ করেছে।

বিয়ে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মধুর সময়। ওরাওঁদের জীবনেও বিবাহ উৎসব গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। নৃত্য, গীত, সমবেত পান ভোজন বিয়ের আবশ্যিক অঙ্গ। এদের নিজের রচিত ও নিজেদের মধ্যে প্রচলিত নিজস্ব সুরে সমবেতভাবে বিয়ের গান করে থাকে।

ছেলে মেয়েরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে (বেহাই বা বেহানদের সম্বোধন করে কখনো) নেচে নেচে গায়। ঢাক বা চড়বড়ি বাজে।

"বারাই কোই বারাই কোই সামজ আম মালা আম্বন"

এদের নিজস্ব কোন লিপি নাই। এরা সাত্রী ভাষায় কথাবার্তা বলে। সঙ্গীতও সাত্রী ভাষায় রচিত।

বিয়ে উপলক্ষ্যে ভাঁড়ের মধ্যে ধানের শিষকে গুছিয়ে বাঁধা হয়। তার ওপরে একটা গোল আড়াই ইঞ্চি থেকে তিন ইঞ্চি মত চাকতি বসিয়ে তার

ওপর কাঁচা কলাই-এর ডাল ও লবণ বসিয়ে তার মধ্যে সরষের তেল দিয়ে সেটি পলতে দিয়ে জ্বালান হয়। ওদের নিজেদের পুরোহিত থাকে। পরে ওটি ওঠাবার সময় ঢাক বাজবে। পাত্রটি বর-এর বৌদি ওঠাবে। তখনকার গান :—

"গান্দের বেনা চুচুর মালকা
সামাদান হেনা চাপচা"

বসে বসে মাদল বাজিয়ে বা ঢাক বাজিয়ে নিচের গানটি গাওয়া হয় :—

আখুয়া আখুয়া হেস্তে—হা—হা—হা—হা—
চিবা হরিবোল
আহা কাম্ কাম্ বালকাম্
আনচা ডানডি পরিকান।
বাবাই ফই বারাই সামাদা
আনটা ডাণ্ডি পারকান।

আরো কয়েকটি বিবাহ সঙ্গীত (বেঙ্গা ডাণ্ডি)

১। "আনার বানার বালটি চেহাই ডাণ্ডি গো পাটি
বণবাই কই বাবাই
দেরাই ডাণ্ডি গো পাটি॥"

২। "আনার বানার হালদি চুত্তা হান্দারা বানাদি
বারাই কই বারাই মামদ চুত্তা হান্দারা বালাদি॥"

৩। "ইন্নতা চেংরার মাতে আসমান সখনার
মাতে মরা ফালকান সখনার॥"

৪। চেয়াই সামাদ চিন্তা পিটিরিন আটাই চেয়াই
অন বিলমা তামুক বরাই বিয়াই
এংহান মুখান মেনাই এংহান দুঃখান সেনাই॥

"মুর্শিদাবাদ জেলা উদয়চাঁদপুর আস্তা শিবু পাচগিস ডাণ্ডী পরদাস। কালিয়া বিদ্ধিয়ার কি, পাহি নানা কানার সময়স্তা ডাণ্ডা॥"

অর্থাৎ এবার মুর্শিদাবাদ জেলার উদয়চাঁদপুর গ্রামের (বড়ঞা থানা) শিবু নামে এক বুড়ো গান গাইছে। সে গান হলো কনে খোঁজ করে কুটুম্ব করতে যাবার সময়কার গান :—

"হাটাব হাটাব হাটাব দশো জায়া বাজি হাটাব গে।

বেদরা মাচা কানিয়া রেঙ্কায় রে ॥"

অর্থ—হেঁটে হেঁটে হেঁটে চল দশজন মিলে অনেকদূর দেশে যেতে হবে কনের খোঁজে। যে কনের খোঁজে আমরা বেরিয়েছি।

"দশো ভায়ার বালে গেন্দাফুল গেন্দাফুল বাগায়।
যা তোর দশো ভায়া ভরায়ান দে
দশো ভায়া লাগেন গামবায় ॥"

অর্থ—যে বাড়ী কনে খোঁজ করে পেয়েছে সেই বাড়ীতে দশজন যে আনন্দ করছে সেই আনন্দ গান্ধা ও অন্যান্য ফুলের সঙ্গে তুলনীয়।

"আশি কসা গঙ্গা বিশো কসা যমুনা
যুমনাকে পার কারণে ধার দে
আমার বিশো ভায়ারে ॥"

অর্থ বরের বাবা বলছে এই ৮০ আশি ক্রোশ ও কুড়ি ক্রোশ যমুনা পার হয়ে এসে তেমনি আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে পার হতে পারি তার জন্য দশ বিশ জনকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সাঁওতাল বিয়ের গান :—মুর্শিদাবাদ জেলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুর্শিদাবাদ জেলাতে প্রায় পঁচিশ হাজারের মত সাঁওতাল আছে (১৯৭১)। এরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে নিজেদের গ্রামে বা পল্লীতে বসবাস করে। জীবিকার প্রয়োজনে স্থানান্তরে গেলে সংঘবদ্ধ ভাবেই যায়।

এরা মূলত কৃষিজীবি তথা কৃষি শ্রমিকের কাজ করে। মাটি কাটা, শিকার ও অন্যান্য শারিরীক পরিশ্রমের কাজ এরা করে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই। এদের বর্ণমালা নাই। এরা অষ্ট্রীক গোষ্ঠীভুক্ত। নিজেদের সাংস্কৃতিকে বেজায় ভালবাসে। তবে এদের জীবন থেকেও নির্ভেজাল নিজস্ব সংস্কৃতি লোপ পেতে বসেছে। সমন্বয় এর হাওয়া লেগেছে। তবুও আদিম সংস্কৃতির প্রতি অন্তরের আকর্ষণ এখনো অম্লান। গোষ্ঠীজীবনে নিজস্ব সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে এরাও সচেষ্ট। জন্ম-মৃত্যু বিয়ে তিনটি ক্ষেত্রেই সাঁওতাল সমাজে নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রধান অবলম্বন। সমবেত নৃত্য-গীত ও পান ভোজন এদের সাংস্কৃতিক জীবনের বিরাট অংশ অধিকার করে আছে।

সাঁওতাল সমাজে নারী অপেক্ষা পুরুষের সম্মান বেশী। যদিও নারী অবশ্যই শ্রদ্ধেয়া—এরা নারীকে অসম্মান করে না। তরুণ বয়সেই ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। ছেলেদের 'পণ' লাগে। পণের জন্য ১২ (বার) টাকা,

২ (দুই) বিশ ধান একটি গরু ইত্যাদি। খাওয়াতে হয়। কাপড় চোপড় লাগে। গয়নাগাঁতি দেবার সাধারণতঃ রেওয়াজ নাই। নিজেদের পুরোহিতই বিয়ে পরিচালনা করেন। নতুন সম্পর্ক (ন'সম্বন্ধ) র সময়ে ১৪। ১৫ জন পর্যন্ত মেয়ের বাড়ি আসে। সে সময়ে দু'বেলা ভাত, মাছ, মাংস দিতে হয়। যার বাড়িতে ন'সম্পর্কের জন্য লোকেরা আসে তাকেই খরচ চালাতে হয়। অপারগ হলে পাড়ার বা গ্রামের লোকেরা অনেকসময় যৌথভাবে খরচ বহন করেন। কারণ এটি তাদের পল্লীর বা গ্রামের সম্মান রক্ষারও অন্যতম অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য হয়। ন' সম্বন্ধর পর বিয়ের যতদিন অবশিষ্ট থাকে কাপড়ে ততটা গিঁট দিয়ে রাখা হয়। এক একদিন গেলে এক একটি গিঁট খোলা হয়। বিয়ের দিন বরযাত্রীর নিজেদের খাবার নিজেরা নিয়ে আসবে। না জানিয়ে যদি তারা হঠাৎ মেয়ের বাড়ী ঢোকে তাহলে পনের টাকা পর্যন্ত জরিমানা হয়। বিয়ের লগ্ন উপস্থিত হলে জল আর একখানি শালপাতা দিয়ে পাত্রপক্ষকে আহ্বান করা হয়। বিয়ের আগে পর্যন্ত পাত্রপক্ষ মেয়ের বাড়ীর বাইরে অপেক্ষা করবে সদলবলে। যতক্ষণ না বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কন্যার বা পাত্রের বাপ-মা না খেয়ে থাকবে। কন্যা ঘরের ভেতর থাকবে। গ্রামে এসে উভয়পক্ষ (কন্যা ও পাত্রপক্ষ উভয়েই) মিলে নৃত্য গীতে অংশগ্রহণ করবে। মদের জন্য পাত্র পক্ষ ৬ সের চাল দেবে। বিবাহ অনুষ্ঠানে পারস্পরিক পরিচয় পর্বের শেষে কন্যাপক্ষ বরযাত্রীদের খাওয়াতে পারবে। তারপর কন্যাপক্ষ তাদের নতুন জামাইকে গ্রামের সব পাড়ার প্রতি ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আসবে। এর পর পাত্রের বড় ভাই স্থানীয় কয়েকজনের সাহায্যে কন্যাকে ঘর থেকে বার করে আনবে। তিনজনে মেয়েকে উঁচু করে ধরবে। আর পাত্রকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসবে। ঘটির জলে আমের শাখা চুবিয়ে পাত্রকন্যা পরস্পরকে জলের ছিটে দেবে তিন থেকে পাঁচবার। তারপর শালপাতায় রাখা সিন্দুর পাত্র তিনবার মাটিতে ফেলবে। সেই সিন্দুর তিনবার কড়ে আঙুল দিয়ে তুলে কন্যার সিঁথিতে তিনবার মাটিতে ফেলবে। সেই সিন্দুর তিনবার কড়ে আঙুল দিয়ে তুলে কন্যার সিঁথিতে তিনবার দিয়ে দেবে। শেষে ঐ সিন্দুর কন্যার দাদা বা মামাকেও দিতে হবে। বিয়ের পর পাত্র-কন্যা এক ঘরে থাকবে।

বিয়ের বাড়ীতে বিবাহ অনুষ্ঠানের পর কন্যাপক্ষ বরের বাড়ীতে যায়। অভিভাবকেরা ছেলে মেয়ের বয়স হলে ছেলেমেয়েদের জন্য পাত্র কন্যা নির্বাচন

করেন। বলাবাহুল্য সাঁওতাল তরুণ তরুণীরা অভিভাবকদের নির্বাচিত পাত্র-পাত্রী গ্রহণ করেন। ব্যতিক্রমও আছে। অনেকসময় তরুণ নিজেই কোন মেয়েকে পছন্দ করে বিয়ে করতে পারে। তার নির্বাচিত পাত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠান মাধ্যমে বিয়ে হয়। বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক সামাজিক ভাবে অনুমোদিত নয়। তবে বিবাহপূর্ব যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান জন্ম নিতে দেখা যায় এবং অনুষ্ঠান না করেও অনেকসময় একসঙ্গে বাস করতে দেখা যায়। সময় সুযোগ মত হয়তো একদিন সামাজিক ভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। এক স্ত্রী থাকতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ সামাজিক অন্যায় বিবেচিত হয় এবং পাঁচজনের কাছে বিষয়টির বিচার হয়।

বহরমপুর থানার 'সংস্কার' গ্রামে জনৈকা সাঁওতালকে দেখা যায় যে বাইরে থেকে একটি সাঁওতাল মেয়েকে নিয়ে আসে। একসঙ্গে থাকে। শুনলাম মেয়ের মা শিগ্রী ছেলের কাছে ক্ষতিপূরণের জন্য আসবে এবং কন্যার জন্য তাদের প্রাপ্য দাবী করবে। তাদের 'পাওনা' মিটিয়ে তবে ছেলেটি ঐ মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে সামাজিক বিচারে গ্রহণ করতে পারে। ঐ গ্রামে জনৈক সাঁওতাল নিজের স্ত্রী থাকা সত্বেও অন্য সাঁওতাল রমণীকে বিয়ে করে। তার এই কাজটি সাঁওতাল সমাজে নিন্দিত হয় ও সামাজিক ভাবে তাকে শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের একাধিক বিয়ে হয়ে থাকে সাধারণতঃ পূর্ব স্বামী ত্যাগ করলে অথবা মারা গেলে এরকম হয়।

বিয়ের গান :—এরা বিয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক রকম গান করে। সমবেত ভাবে। সারারাত জেগে পান ভোজন করে। বানাম (একতারা বিশেষ) টামাক (নাকরা) তুংগা (মাদোল) ঝাঝ (পিতলের বড় কাঁসর) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। বাদ্যযন্ত্রগুলি এরা নিজেরাই করতে পারে। স্ত্রীলোকেরা সুন্দরভাবে কাপড় পরে। মাথায় পরিচ্ছন্ন চুল বেঁধে ফুল গোঁজে। কোমরে হাত দিয়ে পরস্পর গোল হয়ে বা অর্ধবৃত্তাকারে সুসংবদ্ধভাবে পা ফেলে বাদ্যের তালে তালে বিয়ের গান করে নৃত্য করে। বাঁশীও বাজে। বাঁশের বাঁশী। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই একসঙ্গে এই সমবেত নৃত্যে অংশ নেয়।

কয়েকটি বিবাহ সঙ্গীত :—

১। হি চি রি জি হি মি

তোকারে জনমলেন

হিম্বিরি দংদ পিপিরি দ—
হিপিরি হিপিরি দংদ পেপিরি দং

*   *   *   *

২। আকোই বহয়া নিমদ
হিহিরি নিন্দ নিনিরি নিন্
আকইয়ে যতনা নিমদ
হিহিরি নিমদ পিপিরি নিম
বাবারে বহয়া নিমদ
গোগয়ে যতনা নিমদ নিম দারে দ।

*   *   *   *

৩। ফেটি চালান গিদয়ে
নেপকান বালায়া বাবুর পর
উতুরন দাকরিক বলায়াজ
বেহই—বাবু রপর বলায়া
হে গি বুয়েবু জমবু
রেমকে রেবু তাগাই না।

বড়ঞা থানার কুণ্ডল গ্রামের মুগুই হেমব্রম এর নিকট থেকে গৃহীত।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য ১৯৭৩ নভেম্বরে নতুন দিল্লীর সঙ্গীত নাটক একাডেমী মুর্শিদাবাদ জেলা আসেন। এই জেলায় গ্রামীণ সংগীতগুলির রেকর্ড ও ফিল্ম গৃহীত হয়। Field officer Sri Govind Vidyarthi মহাশয় দলের নেতৃত্ব করেন। আমরা এই জেলার আদিবাসী নৃত্য গীতকেও প্রাধান্য দিই। সাগরদিঘী থানার মুনিগ্রাম, নয়াপাড়া ও চাঁদপাড়ার সাঁওতালী নৃত্য-গীত গৃহীত হয়। ফিল্ম ও রেকর্ডভুক্ত করা হয়। জেলা-শাসক মহাশয় ও বর্তমান জঙ্গীপুর মহকুমা শাসক যথাক্রমে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ দে আই এ-এস এবং শ্রী এন্, ভি, জগন্নাথন, আই-এ এস মহাশয়দ্বয় উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে [২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৪] সাঁওতালী নৃত্য-গীত অনুষ্ঠিত হয় বহরমপুর-এর স্কোয়ার ফিল্ডের পতাকা অভিবাদনের সময়। গত ১৩শে জুন ১৯৭৩ আমার পরিচালনায় ও মাননীয় জেলা-শাসক মহাশয়-এর উদ্যোগে জেলার যাবতীয় গ্রামীণ গীতির অনুষ্ঠান হয় সেখানে উদয়চাঁদপুরের ওরাওঁদের সমবেত নৃত্যগীত বিশেষত তাদের বিয়ের গান

পরিবেশিত হয়েছিল। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিক বৃন্দ সেই নৃত্যানুষ্ঠান দেখে মুগ্ধ হন।

আমাদের জেলার সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি, বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলিও আদিবাসী নৃত্যগীতের যদি ব্যবস্থা করেন তাহলে উভয়পক্ষই উপকৃত হবেন।

নতুন দিল্লীর সঙ্গীত নাটক একাডেমি কর্তৃক গৃহীত নয়াপাড়া গ্রামের সাঁওতাল রমণীদের পরিবেশিত বিয়ের গান: –

ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র—বাঁশী বানাম, তুংগা, লাকরা, ঝাঁঝ ইত্যাদি এরা সাগরদিঘী থানার নয়াগ্রামের একটি মাঠে (চাঁদপাড়া) পরস্পর ধরাধরি করে মাদলের ছন্দে ছন্দে পা ফেলে ফেলে বাঁশীর সুরে নৃত্যসহ এই গান পরিবেশন করেন। পেছনে নালাকাল, সারি সারি তালগাছ আর দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ উচ্চনীচ প্রান্তর। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তারা বিয়ের গান গেয়ে ওঠেন অপূর্ব ছন্দে মাধুর্যময় কণ্ঠে—

"ওকাতে মাইকু-ইদিমিয়া এভি যোজন দাদা গাডা পারম
চিকাতে মাইলে বাড়ায় মিয়া হাঁনে নেল কান তাল বাড়ি
বাংলা। আনা আতেতেকু ইদিইয়া।"

অর্থ—তোমাকে কোথা নিয়ে যব। অনেকদূর। নদীপারে কি করে তোমাকে জানব কতদূরে নিয়ে যাবে। ঐ যে তালবাবি বাংলা ঐখানে নিয়ে যাবে।

উপরোক্ত গানটি সাগরদিঘী থানার চাঁদপাড়া গ্রামের সোনা হেমব্রম ও তাঁর সহশিল্পীবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত হয়।

বহরমপুর থানার চাতরা গ্রামের যোসেফ শোরেন এর কাছ থেকে শোনা বিয়ে উপলক্ষে অন্য দু'একটি গান: –

১। সান্তাল দি সোন মস্তাল হর সান্তাল সমাজ গরলবে বন তাহে কান নন্ত রিমিল চিতান বিবিন পাড়ায়া ফল হেন্দে বিমিন বে বন হাডডাও আকালী।

২। ভগ আন্তি নীতু দাইনা আন্তি মজ আন্তি তফাৎ আতু তাকিন সিদ হা কানু—মহারাজ কিন্ উপেলা কানা।

৩। আসদানী গেল টাকা বং দাইনা গোলাচার। মিদ হয় কালু বাইশি রলাং সিনিং বাকাবা।

সাম্প্রতিক বাংলা মঞ্চে ব্রেশ্‌ট্‌ নাটকের চর্চা

চিররঞ্জন দাস

সম্প্রতি বাংলা থিয়েটারে অপেশাদারী গ্রুপ থিয়েটারগুলির একাংশে ব্রেশ্‌টের নাটক ও ব্রেশ্‌টীয় রীতির অভিনয়ের একটা উদ্যোগও উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিছু কিছু নাট্যসংস্থা ইতিমধ্যেই ব্রেশ্‌টীয় কিছু নাটকের বাংলা রূপান্তর, অনুবাদ ঘটিয়ে বা ব্রেশ্‌টীয় পদ্ধতিতে মৌলিক নাটক প্রযোজনা করে সুনাম কিনেছেন। কিছু কিছু প্রযোজনা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে, কিছু নাটকের ব্যাপক অভিনয় ঘটছে এবং অভিনীত নাটক সম্পর্কে ব্রেশ্‌টীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপিতও হচ্ছে।

বার্টোল্ট্‌ ব্রেশ্‌ট্‌ বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, পরিচালক এবং নাট্যতত্ত্ববিদ্‌। জাতিতে তিনি জার্মান হলেও দীক্ষায় ছিলেন মার্কসবাদী। এবং তাঁর সমস্ত শিল্প কর্মে, সৃষ্টি ও প্রযুক্তিবিদ্যায় ছিল মার্কসবাদের বিজ্ঞানজাত ফলাফল। তাই ব্রেশ্‌টের জীবিত দশায় তো দূরের কথা স্বাধীনতার পরবর্তী-কালেও এদেশে ব্রেশট্‌ চর্চা যেমন হয়নি তেমনি তাঁর ঐশ্বর্যময় জীবনবাদী নাটকের সাথেও এদেশের পরিচয় ঘটেনি। সম্প্রতি ঘটছে এবং ব্রেশ্‌ট্‌ নাট্যপ্রিয় জগতে পরিচিত হচ্ছেন। এটা আনন্দের কথা, ভরসার কথা। যখন নাট্যবিষয়বস্তুতে জীবন সন্দর্শনের নামে বিকার অবক্ষয়, নীতিহীনতা, নিয়তি, শূন্যতা ও সংগ্রামহীনতার খোলাখুলি অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করেছে এবং পেশাদারী মঞ্চের ষ্টাইলে চমক ও অর্থমোহে প্রয়োগের নতুনত্ব ও আধুনিকতার নামে অবৈজ্ঞানিক ও জটিলতার বিভিন্ন খিঁচুড়ি প্রকরণের দাপাদাপি শুরু হয়েছে তখন ব্রেশ্‌ট্‌-এর নাটক বা ব্রেশ্‌ট্‌ চর্চা রীতিমত সাহসিকতা এবং বলিষ্ঠতার ইঙ্গিতবাহী। অর্থাৎ তথাকথিত আধুনিকতার জটিল মারপ্যাঁচ ও চেতনাবিহীন শিল্প বিষয়ের বিরুদ্ধে ব্রেশ্‌ট্‌ একটি প্রতিরোধ। জার্মানীর থিয়েটার আন্দোলনে ব্রেশ্‌ট নিজেই তাঁর সৃষ্টি ও থিয়েটার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন অবক্ষয়, নীতিহীনতা, জীবন বিমুখীনতার বিরুদ্ধে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিরোধ প্রাচীর হয়ে। তাই সম্প্রতিকালের বাংলা থিয়েটারে তাঁর আগমন ও চর্চা জীবনবাদী থিয়েটারের যাত্রা পথের অনিবার্য ফলশ্রুতির পরিচায়ক।

কিন্তু ব্রেশ্‌ট্‌ পশ্চিমী থিয়েটারের তথাকথিত আধুনিক হঠাৎ সাড়া জাগানো নাট্যকার ছিলেন না বা তাঁর নাট্যরীতিও নিছক রীতিভাঙার

নতুনত্বের চমক ছিল না। তাঁর নাটক ও নাট্যরীতি দু'টোই ছিল বিজ্ঞান। শিল্পও যে পুরোপুরি বিজ্ঞান ও বিশ্লেষণ ধর্মী হতে পারে, ব্রেশ্‌ট্‌ সেটাই প্রমাণ করেছিলেন। মার্কসবাদ যেমন আপ্তবাক্য বা নিছক একটা আদর্শ নয়, বিজ্ঞান এবং তাকে আয়ত্ব করতে প্রয়োগ করতে হয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং সেখানে ফাঁক ও ফাঁকি থাকলে তা বিভ্রান্তি আনতে বাধ্য এবং এই বিভ্রান্তিই সমাজ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণে যেমন ভুল সিদ্ধান্তে এনে জনমানসকে বিভ্রান্ত করতে পারে তেমনি তার ফলাফল বিপরীতও হতে পারে। ব্রেশ্‌টের নাটক উপস্থাপনা এবং তাঁর প্রয়োগতত্ত্বও সঠিক বিশ্লেষণের মধ্যে আয়ত্ত ও প্রয়োগে না গেলে তা নিছক নতুনত্বের তাগিদে বাহাদুরি সর্বস্বতায় যেতে বাধ্য এবং তার ফলাফল বিপরীত ধর্মী হবেই। তাই ব্রেশ্‌ট্‌ চর্চা ও প্রয়োগ হুজুগেপনা না হয়ে বিশ্লেষণ ও মননশীল হওয়া আবশ্যক। একজন শিল্পীর সারা জীবনের অনুশীলন ও সাধনার আহৃত ফল আকস্মিক দাপাদাপির মাধ্যম না হওয়াই ভালো।

সম্প্রতি বাংলায় ব্রেশ্‌টের 'সমাধান', 'সন্ত্রাস', 'তিনপয়সার পালা', 'ভালো মানুষের পালা', 'মাদার ক্যারেজ', 'সেনোরাকরার রাইফেল', 'গ্যালিলিও', 'পাঁচু ও মাসী', 'ভীতু ভীমের ভাবনা', 'বিধি ও ব্যতিক্রম', 'আর টুরো উই', ইত্যাদি নাটক অনূদিত ও রূপান্তরিত কিংবা ছায়াবলম্বনে রচিত হয়ে অভিনীত হয়েছে। এর অনেকগুলিই বহুল অভিনীত ও জনপ্রিয়। বাংলা ভাষায় মৌলিকভাবে রচিত অনেক নাটকেই ব্রেশ্‌টীয় রীতি অনুযায়ী প্রযোজিত বলে দাবি করা হয়।

কিন্তু আমার প্রশ্ন এখানেই—ব্রেশ্‌টের নাটকগুলি (যা অনূদিত বা রূপান্তরিত) বা বাংলা মৌলিক নাটকগুলি কি আদৌ ব্রেশ্‌টীয় ধর্ম ও রীতি অনুযায়ী সঞ্জীবিত? ধরা থাক যে-নাটকগুলি রূপান্তরিত হয়েছে (যেমন, তিন পয়সার পালা, ভালো মানুষের পালা, পাঁচু ও মাসী, ভীতু ভীমের ভাবনা ইত্যাদি) সেগুলিতে কি আদৌ ব্রেশ্‌টের ভাবনার মৌলিকত্ব রক্ষা করা হয়েছে? আমরা জানি কোন ভাষার সাহিত্য সঠিকভাবে অনূদিত অবস্থায় পরিবেশিত না হয়ে তা বাঙালী জল-মাটি মানুষের রূপে রূপান্তরিত হলে তার স্বাদ (flabour) ও ঘটনাক্রমের সাযুজ্য বা বিকাশ ব্যাহত এবং অবাস্তব হওয়ার আশংকা থাকে। এবং তা অনেকটা শিব গড়তে বানরও হতে পারে। পশ্চিমী জীবনধারার সাথে আমাদের জীবনধারার মিলও যেমন আছে, অমিলও

বহু আছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থাকে চট করে-যেমন উড়িয়ে দেয়া যায় না তেমনই জোর করে সাযুজ্যও করে তোলা যায় না। এক দেশের জীবনধারার সাথে অন্যদেশের জীবনধারার মানবিক উপাদানের মিল থাকলেও তার প্রকাশভঙ্গী অর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। ধরা যাক্ 'ভালো মানুষের পালা'র ভালো মানুষ মেয়েটি। তার জীবনধারার যত সৎ উপাদান তা বাঙালি মানসিকতার সাথে মিলতে পারে কিন্তু বাঙালি জীবনে ফুলের দোকান থেকে সুরু করে কলের মালিক হওয়ার পরিক্রমাগুলি এবং সততা যাচাইয়ের স্তরগুলি আমাদের চোখে অবাস্তব ঠেকে। আবার 'পাঁচু ও মাসী'র মধ্য দিয়ে যে দ্রুত ভঙ্গুর অবক্ষয়ী সমাজের স্লেষাক্ত চেহারা তুলে ধরে ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে সজোরে নাড়া দেবার চেষ্টা হয়েছে তা বাঙালীয়ানার পোষাকে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না। কেননা জার্মান পটভূমিকায় ঐ বিষয়টা বহুল আলোচিত এবং সমস্যা সম্পর্কে তৎকালীন জনগণ যথেষ্ট অভ্যস্ত এবং সেই কারণে তার একটা বাস্তব মূল্যও আছে কিন্তু বাঙালী পরিবেশের সমস্যার কিঞ্চিৎ বাস্তবতা থাকলেও অভ্যস্ততার অভাবে তা শ্রুতিকটু অশ্লীল হওয়াই স্বাভাবিক যদিও ব্রেশ্‌টের ঐ নাটক অশ্লীল বলে বিদেশে কখনও অভিযুক্ত হয়নি। 'তিন পয়সার পালা'তে ব্রেশ্‌ট শুধু কিছু চরিত্র নিয়ে মজা করেন নি, পরিষ্কারতঃ তিনি সমাজের দু'টি অংশের মধ্য দিয়ে শ্রেণীবোধ, শোষণ সংগ্রাম এবং বুর্জোয়াসুলভ ভড়ং ও মোড়কের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চেয়েছেন। কিন্তু শ্রেণীবোধ ও শ্রেণী সংগ্রাম অবলুপ্ত হলে আর যাই হোক তাতে ব্রেশ্‌টের চিন্তা ও উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাবেনা। 'ভীতু ভীমের ভাবনা' ব্রেশ্‌টের নামে এক আশ্চর্য্য প্রতারণা। 'মাদার ক্যারেজের' কোন সূত্র বা ভাবধারা এত প্রতিফলিত হয়েছে জানি না। কিন্তু ভীমের আখ্যানের মধ্য দিয়ে যে আখ্যানগুলি তুলে ধরা হয়েছে তাতে ইতিহাসের গতিপ্রবাহের কোন শ্রেণী বিশ্লেষণ নেই ববং আখ্যানভাগ এমনভাবে তৈরী হয়েছে যাতে চলতি সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহই জাগতে পারে, অথচ ব্রেশ্‌ট্‌ দুনিয়াটা পাল্টে দিতে চেয়েছেন শিল্পের মাধ্যমে। পুরাতন ও চলতি সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে শ্রেণীবিহীন, শোষণহীন সমাজ গড়তে চেয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর নিজের যেমন কোন দ্বিধা ছিল না তেমনি তার শিল্প কর্মেও কোন দুর্বলতা ছিল না।

পূর্বেই বলেছি ব্রেশ্‌ট্‌ যে জীবন দর্শনকে আশ্রয় করে শিল্প কর্মে নিযুক্ত

হয়েছিলেন তাকে যথাযথ আয়ত্ত ও অনুশীলন না করলে বিভ্রান্তি আসতে বাধ্য। তাছাড়া রূপান্তরিত নাটকে কতগুলি সমস্যা থেকেই যায়। দেশ-জল মাটি-জীবন-সমস্যা'র রূপান্তরে বাস্তবতা আনতে রচনা প্রযোজনায় কিছু কিছু স্বাধীনতা নেয়া হয়ে থাকে এবং এই স্বাধীনতা কখনও আকাঙ্খিত বস্তুর বদলে অনাকাঙ্খিত বস্তু এনে ফেলে আর তাতে শিব গড়তে বাঁদরের ভয় থেকেই যায়।

ঠিক এই ধরণের অভিযোগ অনূদিত নাটক অর্থাৎ 'আর টুয়ো উই', 'সমাধান', 'সন্ত্রাস', 'সে দিবস', 'সেনোরাকারার রাইফেল', 'গ্যালিলিও', 'বিধি ও ব্যতিক্রম' বা 'কাকেশিয়ান চক সার্কেল' সম্পর্কে করা যায় না। কেননা এসব নাটকে মূলকে রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে।

কিন্তু ব্রেশ্‌ট্‌ চর্চার আর একটি বিপদ সম্প্রতি দেখা দিয়েছে মৌলিক কিছু বাংলা নাটক এবং প্রযোজনা নিয়ে। সে যেমন নিজের ইচ্ছে মত উদ্ভট, আজগুবী রীতি সবকিছুই ব্রেশ্‌টের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন। নাটকে সূত্রধার, কিংবা গায়ক, কবিতা বলা ইত্যাদি ব্যাপার আকছার ঘটছে এবং সব কিছুই ব্রেশ্‌টের দোহাই দিয়ে ঘটছে।

নাটকে সূত্রধার, ভাষ্যকার, গান, কবিতা বলা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ব্রেশ্‌ট্‌ নাটকে নতুন আনেন নি। পুরনো গ্রীক, এমনকি ভারতীয় নাটকে এবং উনিশ শতকের বহু নাটকে এ সব জিনিষ ভুরি ভুরি ব্যবহার করেছিলেন একটা বিশেষ রীতি ও উপস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। যেমন অতীতের ভারতীয় নাটকে সূত্রধার, চারণ বা নান্দী থাকত; তারা দৃশ্যের পারম্পর্য রক্ষা করত কখনও নাটকের মূল সূত্রের পূর্বাহ্নে ইঙ্গিত দিত। কিন্তু ব্রেশ্‌ট্‌ সূত্রধারকে ব্যবহার করলেন ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে। তাঁর প্রস্তুনা রীতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে এবং যুক্তির মধ্য দিয়ে সত্যে উপনীত হওয়া। তাই সূত্রধার ঘটনার ব্যাখ্যা দেন, চরিত্ররা কখনও গায়ক হয়ে অবস্থা, প্রতিবেশ বা সমস্যার ব্যাখ্যা করে গানের মধ্য দিয়ে বা কবিতার মধ্য দিয়ে। দর্শক বা পাঠককে বাস্তব থেকে কল্পনা লোকে নিয়ে যায় কিন্তু পরমুহূর্তেই তাকে এনে হাজির করে আরও বাস্তবে অর্থাৎ থিয়েটারের বাইরে তার জীবন গণ্ডীর মধ্যে। থিয়েটারের বিষয়ের সাথে তার জীবনের অবস্থার তুলনামূলক বিচার করায়। একেই তিনি Alienation Effect বলেছেন। ঠিক এই ব্যাপারগুলি তাত্ত্বিকভাবে অনুধাবন করার ব্যাপার আছে এবং সেটা না ঘটলে ব্রেশ্‌ট্‌ ভক্ত হতে চাইলেই সেটা কুলক্ষে হওয়া সম্ভব নয়।

ব্রেশ্‌ট্-অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা মৌলিক নাটক লিখছেন তাঁরা ব্রেশ্‌টের এই মূল বিষয়টি হয় অবজ্ঞা করেন না হয় সযত্নে এড়িয়ে যান। কিন্তু ফল যা বেরোয় তা অ-নাটকীয়, বিরক্তিকর এবং অবৈজ্ঞানিক। তাঁর প্রয়োগরীতির বিকৃতি ও অজ্ঞানতাও দর্শকমনকে ভুল শিক্ষা দিচ্ছে। অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্রেশ্‌টের নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তরিত প্রযোজনা সম্পর্কেও এই অপ্রিয় কথাটি বলতে হয়।

ব্রেশ্‌ট্ Illusion এর পুরো পক্ষপাতী ছিলেন না। এক্ষেত্রে তাঁর মত ছিল Illusion মানুষকে স্তম্ভিত ও বিচারবুদ্ধিহীন করে তোলে এবং Illusion এর Effect কোনক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক এবং কখনও তা বাস্তব অবস্থার সাথে তুলনামূলক বিচার করায় না। যেমন, Emotion তার ধর্ম অনুযায়ী মানুষকে উত্তেজিত করে, হাসায়-কাঁদায়, অনুভূতিকে তীব্রভাবে নাড়া দেয় কিন্তু বুদ্ধির জগতকে আঘাত করে না। ব্রেশ্‌ট্ এই বুদ্ধির জগতকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, বুদ্ধি দিয়ে ঘটনা বা ঘটনার রসকে পাশা-পাশি অনুভব ও বিচার করালে তার ফলে সুদূর প্রসারী অর্থাৎ নাটকের বাইরেও স্থায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি Emotion বিরোধী। অনেকে এই কথা বোঝাতে চান, কিন্তু ধারণাটা ভ্রান্ত। অনাবশ্যক Emotion-কে তিনি বর্জন করতে বলেছেন কিন্তু চরিত্র বা ঘটনা বিন্যাসে বিচারবুদ্ধিকে সামনে রেখে Emotion-কে গ্রহণ করেছেন। ঠিক এই পদ্ধতিতেই অনাবশ্যক আড়ম্বরপূর্ণ সাজ সজ্জা, আলো বা মঞ্চ প্রকরণকে তিনি বর্জন করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল, আড়ম্বর চোখ ও বুদ্ধি ধাঁধিয়ে দেয় এবং নাট্য সংঘাতে দর্শক চিত্তকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে। ঠিক তেমনি আকস্মিক নাটকীয়তা (theatrical trick) বা চমক পুরোপুরি বর্জন করতেন কেননা এই দুটো ব্যাপারই বুদ্ধিবৃত্তিকে নাড়া না দিয়ে দর্শককে স্তম্ভিত করে দেয় এবং আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ব্রেশ্‌টের নাট্যগ্রন্থনারীতি ছিল বর্ণনাত্মক। বর্ণনার মধ্যেই তিনি গল্প সাজাতেন, চরিত্র ও নাট্য সংঘাত সৃষ্টি করতেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে যেন অনিবার্য গতিতে টেনে নিয়ে যেতেন। এই বর্ণনার চঙ্‌কে অনেকটা মহাভারতের সাথে তুলনা করা যায়। মহাভারতের কর্মকাণ্ড ঘটে যাবার পর তা শুকদেব বলছেন জন্মেজয়কে। যেমনটি ঘটেছিল তার বর্ণনা। কিন্তু বর্ণনার মধ্যে প্রবেশ করলে সেটা যে বর্ণনা সেটা অচিরেই আমরা ভুলে যাই। ব্রেশ্‌টের নাট্যগ্রন্থনায় মূল শর্ত অনেকটা

এই রকমই কিন্তু তিনি বর্ণনার ব্যাখ্যা দিতেন বিজ্ঞানী মনোভঙ্গীতে। পুরনো বা ভিনদেশী ঘটনাকেও সম-সাময়িকতার সূত্রে বাঁধা দিতেন নাটকের পাশা-পাশি। তাঁর নাটকের গানগুলিও ঘটনার বর্ণনা কিন্তু তা যেন জীবন্ত সংলাপের মত। ছন্দে ছন্দে গীতিময়তার মূর্ছনা কিন্তু গীতিনাট্য নয়। চরিত্রের অভিব্যক্তি, চালচলন ছন্দোবদ্ধ, তাৎপর্যময়, নৃত্যের ঝঙ্কারে পূর্ণ কিন্তু অপেরা বা নৃত্যনাট্য নয়। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। চরিত্রকে তিনি গোপন করতেন না তথাকথিত নাটকীয়তার জন্য, দর্শক সমক্ষে উপস্থিত রাখতেন। মূল বিষয়ের অভিনেতারা আলোর বৃত্তে, মঞ্চ সজ্জার ইঙ্গিতে নাট্যবস্তু অভিনয় করেন কিন্তু যে মুহূর্তে নাট্যবস্তুকে দর্শক চিত্তের মোহাচ্ছন্নতা থেকে সরিয়ে বুদ্ধির দরজায় এনে ফেলা প্রয়োজন, সেই মুহূর্তে অভিনেতা আলোর বৃত্ত থেকে তার পাশের আবছায়া অন্ধকারে সরে যান—দর্শককে যেন একটা ধাক্কা দেন—'তুমি যা দেখছিলে তা বিচার কর'। তাই তাঁর নাট্য গ্রন্থনার সাথে বিশেষ অভিনয় পদ্ধতি, মঞ্চ-সজ্জা ও আলোক ও ধ্বনি প্রয়োগরীতি একটি অচ্ছেদ্য ও অনিবার্য সূত্রে আবদ্ধ। ব্রেশ্‌টীয় রীতির এগুলো প্রাথমিক সর্ত। আর সেই সর্তের ভিৎ হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। ঘটনা, বিষয় এবং তার বিকাশ, প্রয়োগ ও রীতিকে তিনি ঠিক নেতি এবং ইতিবাচক দু'টো কার্যের সংঘর্ষণে একটি গুণগত মৌলিক Effect এর পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

ব্রেশ্‌ট্‌-চর্চায় প্রয়োগ-পদ্ধতির অনুসরণে, আহরণে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা আবশ্যক। দুঃখের বিষয় বহুল অভিনীত ব্রেশ্‌টীয় বাংলা প্রযোজনাগুলিতে এই বিজ্ঞান অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর নাম জড়িয়ে খ্যাতনামা প্রযোজকরা স্ব-কপোলকল্পিত প্রযোজনার ধরণকে জনমানসের সামনে তুলে ধরে, ব্রেশ্‌ট সম্পর্কে একটি গোলকধাঁধা তৈরি করে দিচ্ছেন। আশা করি এই বিভ্রান্তি দূর হয়ে ব্রেশ্‌টকে ব্রেশ্‌ট্‌ হিসাবে তুলে ধরার সৎ মানসিকতা আমাদের মধ্যে দেখা দেবে।

ভট্টমাটির টেরাকোটা-টেম্পল/মনীষিমোহন রায়

মুর্শিদাবাদে এখন ট্যুরিষ্টকুলের পৌষমাস। দেশময় বিল অথবা ঝিল জুড়ে যেমন নানাবর্ণের ট্যুরিষ্টপাখি আর হংসকুল এসে তাদের শোভায় সাজানো সলিল-সংসার বিছিয়ে বসে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারীকে কেন্দ্র ক'রে তেমন এইসময় নানানজাতের ধারাবাহিক ট্যুরিষ্টবৃন্দ এসে জমতে থাকেন। ইদানীং অবশ্য বছরের অন্যান্য সময়ও কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন (অবশ্যই নিঃসঙ্গ নন) ভ্রমণকারী যে এখানে আসেন না এমন নয়, তবে পৌষমাসেই সম্ভবত তার মূলপ্রবাহ সাগরসৈকতের অবিরাম তরঙ্গের মতো মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ে। চটুল-চপল যুবক-যুবতী কিংবা তরতাজা ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে গুরুগম্ভীর প্রবীণ অনুসন্ধানী পর্যন্ত সকলেই আসেন এখানে। অজানা অচেনা মানুষের প্রোফাইলে ভরে যায় চারদিক। সুখী সুখী সৌখিন পোষাকে সজ্জিত যুবক যুবতীরা ইতিউতি চলাফেরা করে; কখনো মৃদু কখনো তীব্র উচ্চনাদ তোলে—অসংখ্য যানবাহনের ধ্বনিতরঙ্গ মুখর করে তোলে দশদিক হাজারমজা মুর্শিদাবাদ শহর সরগরম হয়ে ওঠে তখন।

তবে পরিতাপের কথা, প্রচারের অভাব অনবধানতায় ট্যুরিষ্টকুলের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায় এমন অনেক কিছু—প্রসাদগুণে যার তুলনা মেলে না। এমন কি হামেশাই গিল্টিকরা নকলসোনা অকৃত্রিম কাঞ্চনমূল্যে বিকোয় বাজারে।

রাণীভবানী এক মহিয়সী নারী অথবা রাণীর নাম। তাঁর মন্দিরময় বড়নগর—যার মন্দিরে মন্দিরে টেম্পল-টেরাকোটার অমলিন শিল্পমাধুরী বাংলার স্থাপত্যশিল্পে গিরিশৃঙ্গের গরিমা নিয়ে বিরাজ করছে; মরসুমী ট্যুরিষ্টকুলের এক অঙ্গুলিমেয় ভগ্নাংশ কচিৎ কখনো সেখানে এসে পৌঁছয়। তবে সান্ত্বনা এইটুকু যে বাংলার মন্দিরময় বড়নগরের কথা এখনো কোনো কোনো ভ্রমণ-কারীর কানে হিব্রুভাষার মতো দুর্বোধ্য শোনায় না। কিন্তু মুর্শিদাবাদ (লালবাগ) শহরের অপর পারে মাত্র চার পাঁচ মাইলের মধ্যেই যে মুর্শিদাবাদের কোনারক-সদৃশ একটি অনন্যসাধারণ টেরাকোটা-টেম্পল এখনো মাথা উঁচু করে অনাদরে অবহেলায় স্বীয় অস্তিত্বকে কোনমতে টিকিয়ে রেখেছে, তার খবর প্রায় কেউ জানেন না। প্রচার আর পরিচর্যায় কৌলিন্যে পুষ্পবিলাসীদের

বাগানে কস্‌মস্‌-জিনিয়ার বড়ই কদর, কিন্তু লাজুক বনমল্লিকা তার চমকবিহীন রূপের পশরা নিয়ে অকালে অঝোরে অহরহই শুধু ঝরে যায়।

ভট্টমাটি বা ভট্টবাটির ওই পরিত্যক্ত এবং বিবিক্ত পোড়ামাটির কারুকাজ-কুশলতায় সম্পন্ন অসামান্য ছোট্ট মন্দিরটির সঙ্গে লম্বাচওড়া কোনো রাজাবাদশার স্মৃতি বিজড়িত নয়। ইতিহাস যেটুকু পাওয়া যায় তাতে কোনো যথার্থ অনুসন্ধানীরই মনের অবিদ্যা কাটবে না। তবে আমি বুঝি না, সঠিক ইতিহাস না জানলেও আপনার-আমার মন্দিরটির শিল্পমহিমাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে বাধাটা কোথায়? আমরা তো অনায়াসেই সেইসব নাম-না-জানা শিল্পীবৃন্দের উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের উজ্জ্বলতম অভিবাদন উৎসর্গ করতে পারি।

মৃতশিল্পের কারিগরীতে পশ্চিমবাংলার একচ্ছত্র অধিকার। কেষ্টনগর-কুমোরটুলির কথা ছেড়ে দিলেও খোদ বহরমপুর শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপগুলিতে বছরের বিভিন্ন সময়ে যে ধরণের নিখুঁত-নিপুণ মাটির প্রতিমা-রাজির দর্শন মেলে, প্রকৃতপক্ষেই ভূ-ভারতে তার তুলনা নেই। এই মৃতশিল্পের মতোই টেরাকোটা অর্থাৎ মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির সূক্ষাতিসূক্ষ্ম অলংকরণ পশ্চিমবাংলার মৌলিক শিল্প-অবদান। যার পীঠস্থান হ'ল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর। প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে বাঁকুড়ার সেই কুশলী শিল্পকুলই মূলত পশ্চিমবাংলার তাবৎ টেরাকোটা টেম্পলের অনুপম স্রষ্টা।

ভট্টমাটির এই অনুপম মন্দিরের সমীপবর্তী হতে হলে প্রথমে আপনাকে লালবাগ মহকুমা-শাসকের অফিসসংলগ্ন ঘাটে এসে পৌঁছতে হবে। ফেরীঘাটে পার হয়ে যান ভাগীরথী। ঘাট এবং ঘাটের চারপাশের ভুবনমোহিনী শোভা আপনাকে কিছুক্ষণ বিমোহিত করে রাখবে। তারপর সিধে পশ্চিমমুখো নবগ্রাম-গামী পীচবাঁধানো পথ ধরে এগুতে থাকুন, তিনচার মাইল সাইকেল অথবা রিক্সা-যোগে। বাস পাবেন না, কেননা অসাধারণ অনিয়মিত। বরং এই শীতের প্রহরে কোনো উৎসাহী সঙ্গী পেলে এটুকু পথ আপনি হেঁটেই মেরে দিতে পারেন পথপ্রান্তরের মানুষজনের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে – বেশ আভিযানিক মেজাজ নিয়ে। আর তাছাড়া আপনার আমার জন্য তো আর নয়- আলস্য-মন্থর ভ্রমণট্রমণ। তাই দুপাশের ভূ-প্রকৃতি, গাছ-গাছালি পরখ করতে করতে এগিয়ে চলুন।

চারিদিকে চারিপাশে এখন ঝকঝকে কমলালেবু রঙা রোদ্দুর। সুশীতল সমীরণ আপনার স্নায়ুতে স্নানের শান্তি নিয়ে আসবে। এক অচেনা মাধুরীর

স্পর্শে ভরপুর আপনার মন। সকল কর্মে সকল মননে ক্রিয়া করছে ইতিহাস-চেতনা, প্রকৃতিপ্রণয়, রোমান্স-রোমাঞ্চ—আরও কত····· কত যে কি! দুমাস আগে শরতে এলে দেখতেন ইতিউতি কাশের কুঞ্জ।

কিছুদিন পর শুরু হবে আকাশে আকাশে শিমুল আর কাঞ্চনের অপ্রতিহত যুগলবন্দী। বসন্তবাতাসে ভেসে বেড়াবে আমের মুকুলের অবশ করা সুগন্ধ।

এখন ধানকাটা হয়ে গেছে। রাঙামাটির বুক জুড়ে শূন্যতা—মানচিত্রের মতো জটিলসূক্ষ্ম সর্পিল রেখা আঁকা। তবু, আপনি তো শহুরে মানুষ—তাই অবারিত আকাশের নীচে, উধাও হয়ে যাওয়া পথপ্রান্তরের মধ্যিখানে কখনো কখনো আপনার মনে হবে অবিরল বৃক্ষরাজির অমলিন পত্রপুঞ্জ ঘন ঘন যেন অতন্দ্র আবেগে পথের দুপাশে খুশির জোয়ারে লুটোপুটি খাচ্ছে। আরো এগোন দেখবেন, পথের ধারের জলাশয়ে আপনমনে ফুটে আছে টকটকে লাল শীতের শালুক। একটু দূরে কিনারে কিনারে কল্মিলতার নক্সাকাটা পুষ্করিণীর স্বচ্ছসলিলে পানকৌড়ি ডুব দিচ্ছে, ভেসে উঠছে—উড়ে বসছে গাছের শিখরে।

পথিমধ্যে কিছু কিছু আখের ক্ষেতে আপনার নজর পড়বে। দেখবেন, তড়িঘড়ি করে এলোপাথাড়িভাবে দু'চারখানা আবার ভেঙে বসবেন না! বরং গরুরগাড়ি বোঝাই আখ, ওই যে চলেছে আপনার চোখের উপর দিয়ে, ওই গাড়ির চালকের সঙ্গে একটু ভাব জমিয়ে নিন। দেখবেন, মানুষগুলি গরুরগাড়ির চালক হলেও নিতান্তই একেবারে গোমড়ামুখো গাড়োয়ান নয়!

এভাবেই হেসে খেলে, আহা, কাটিয়ে দেওয়া যেতো যদি দিগ্বিদিকহীন কয়েকমাস!······

তবে লালবাগের অফিসঘাট থেকে এই পীচবাঁধানো পথ ধরে মাইল তিনেক আসবার পর দক্ষিণমুখো একটা মেঠো পথ ধরে আপনাকে অতিক্রম করতে হবে কমবেশি আরো এক কিলোমিটার পথ।······

তারপর ওই দেখুন, নীল দিগন্তে ফুলের আগুন। সর্ষেক্ষেত নাকি পুষ্পক্ষেতের মাঝখানে ওই দাঁড়িয়ে আছে ভটমাটির টেরাকোটা টেম্পল। গঠন ভঙ্গিমায় ঋজু—সূক্ষ্মতা আর সৌকুমার্য তার অঙ্গের ভূষণ। পঞ্চরথ প্যাটার্নে তৈরী, পঞ্চচূড়া সমন্বিত এই নিঃসঙ্গ শিবমন্দির। উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম—চারিদিকে চারিপাশের মন্দিরগাত্রে পুরাণ ইতিহাস এবং সুনিপুণ মিথুন-মূর্তি থেকে শুরু করে সমকালীন জীবন প্রবাহের এক বহুকোণ-মাধুরিমণ্ডিত সজীব-

শোভন শোভাযাত্রা। বড়নগরে আপনি রাণীভবানী প্রতিষ্ঠিত একাধিক অনন্য-সাধারণ টেরাকোটা-টেম্পল দেখতে পাবেন – কিন্তু* একটিমাত্র মন্দিরের একই অঙ্গে এতরূপ আপনি অন্যত্র কোথাও খুঁজে পাবেন বলে মনে হয়না।

ইতিহাস যেটুকু পাওয়া গেছে, তা হ'ল মোটামুটি এইরকম: দর্পনারায়ণ রায় ছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে একজন পদস্থ কর্মচারী। কানুনগো দর্প-নারায়ণের সহযোগী কানুনগো জয়নারায়ণ রায় কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পরিবারকে এই ভট্টমাটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন পর্যন্ত গ্রামটির অন্য কোনো নাম ছিল নিশ্চয়ই। যেহেতু উক্ত ব্রাহ্মণকুলের উপাধি ছিল ভট্টাচার্য্য, সেহেতু ওই অঞ্চল বা গ্রামটি পরবর্তীকালে ভট্টমাটি বা ভট্টবাটি বলে পরিচিত হয়। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে উক্ত ব্রাহ্মণকুলের কোনো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি মন্দিরটির নির্মানকার্য্য সমাধা করেন। তারপর কালস্রোতে মহামারী জাতীয় কোন বিপর্যয়ে গ্রামটি ক্রমে পরিত্যক্ত হয়। বর্তমানে ওই মৌজায় কোনো ব্রাহ্মণের বাসস্থান নেই এবং মন্দির ও সংলগ্ন জমির অধিকারীসহ গ্রামবাসীরা সকলেই মুসলমান।

পরের ইতিহাস পথের ধারের খানাখন্দ আর মাটির গভীরে মাটি হয়ে আছে। ঐতিহ্যের অচলায়তন আঁকড়ে ধরে তার অনড় অনুকরণ নিন্দনীয় নিশ্চয়ই, কিন্তু ঐতিহ্যের শিকড় থেকে রসগ্রহণ করে তার ইতিহাসচক নিদর্শন-সমষ্টির সৃজনশীল সংরক্ষণ থেকে বিচ্যুত হওয়া নিঃসন্দেহে কিছু কম নিন্দনীয় নয়। পুরাকীর্তি এবং মূর্তিকলা নিয়ে অনেকেই অনেক সময় বহু অশ্রুক্ষেপ করেন। কিন্তু শ্রমপরাঙ্মুখ কোনো নিঃসঙ্গ অশ্রুমোচনের অন্ধকূপহত্যায় এই সংরক্ষণকার্য্যের উন্নতিসাধন কোনমতেই সম্ভব নয়।

সার্বিকভাবে পরিত্যক্ত প্রচার এবং পরিচর্যাবিহীন ভট্টমাটির এই টেরাকোটা টেম্পল এখন ক্রমে এক অনিবার্য অবক্ষয়ের চরমসীমায় পৌঁছে যাচ্ছে। জংলা গাছ এবং আনুষঙ্গিক মালিন্যের হৃদয়বিদারক শিকড়ে পরিক্লিষ্ট এর সূক্ষ্মতা আর সৌকুমার্যের অমল মহিমা। *

* সম্পাদকীয় সংযোজন:—

আলোচিত মন্দিরটি, প্রায় বছর পনেরো আগে আমার দেখার সুযোগ হয়। সে-সময় মন্দিরটি ছিল জঙ্গল পরিবেষ্টিত। অনেক সন্তর্পনে কাঁটা গাছের আশ্লেষ এড়িয়ে মন্দিরের কাছে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম, তার দেয়ালে

পোড়ামাটির যে অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন দেখলাম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছিলাম। মনে পড়ছে তখন ভেতরে একটি বিশাল শিবলিঙ্গ দেখেছিলাম। মন্দিরটি সম্পর্কে পরে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করি, কিন্তু তেমন বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। শুধু এইটুকু খবর সংগ্রহ করেছিলাম, যে শিবলিঙ্গটির নাম 'রত্নেশ্বর'। এবং 'সম্ভবতঃ নবাবদেরও পূর্ববর্তী ভট্টবাটীর' কোনো 'রাজা এটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন'। জানিনা এই রাজা 'ভট্টবাটীর কানুনগো'-বংশের অথবা ডাহাপাড়ার 'বংগাধিকারীদের' কেউ কিনা অথবা তাঁদেরও পূর্ববর্তী রাজা শশাংক কিনা। এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র ক'রে ঐতিহাসিক গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। স্মর্তব্য যে স্থপতিশিল্পের যা চিরাচরিত মাধ্যম সেই পাথরের চিরকালই অভাব সমতলভূমিপ্রধান বাংলায়। আর সেইজন্যেই বাংলার প্রতিভাবান শিল্পীরা মাধ্যম হিসেবে পোড়ামাটির ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন বহু প্রাচীন কাল থেকেই, যদিও এই পোড়ামাটির শিল্পচর্চা সাফল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে মধ্যযুগে। যাই হোক, বছর দেড়েক আগে আমি শুনতে পাই যে ওই মন্দিরের শিবলিঙ্গটি আর মন্দিরে নেই। মুর্শিদাবাদ শহরস্থ জনৈক জমিদার তাঁর প্রায় গৃহসংলগ্ন নতুন মন্দিরে বেশ কয়েক বছর আগে সেটি নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। উক্ত অধুনা স্বর্গত জমিদারের দুই পুত্রের সংগে আলোচনার ফলে সম্প্রতি জানতে পারলাম যে তাঁদের মন্দিরে দশবারো বছর আগে নিকটবর্তী কোনো স্থান থেকে একটি বিরাট শিবলিঙ্গ এনে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং শিবলিঙ্গটির এখানে নামকরণ করা হয়েছে 'ধরণীশ্বর' ব'লে। তবে তাঁরা ব'লতে পারলেন না এটি 'ভট্টবাটী' থেকেই আনা হ'য়েছিল কিনা। সে যাই হোক, আমরা প্রস্তাব করছি মূল রচনা বর্ণিত 'রত্নেশ্বর' নামক মন্দিরটি ভারত সরকার অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবিলম্বে অধিগ্রহণ ক'রে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করুন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ওপর অনুসন্ধান ও গবেষণা চালানোর দায়িত্ব অর্পণ করুন। অন্যথায় মুর্শিদাবাদ জেলায় টেরাকোটা শিল্পের সম্ভবতঃ এই দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নিদর্শনটি (প্রথমটি বড়নগরে) অচিরে প্রকৃতি ও অবিবেচক মানুষের আক্রমণে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে।

—)•(—

ছন্দ-চক্র

হীরালাল দাশগুপ্ত

আবার ছায়ার মিছিল থেমে যায়।
অন্ধকার ছবিগুলো বোবার কথার মতো
নিগূঢ় ইঙ্গিতে নীল অন্ধকারে কেঁপে কেঁপে ওঠে।
টালির টিনের আর খোলার চালের ফাটা দিয়ে
ছায়াদের মুখে বুকে মৃত্যুর শব্দ পড়ে এক দুই তিন
চুয়ে চুয়ে কর কর শব্দ পড়ে টস্ টস্ কোরে
সারা রাত সারা রাত' সারা রাত ধোরে।

শহরের শ্রান্ত দেহ নেশা-নগ্ন রূপসী-নিদ্রায়
অকস্মাৎ দুঃস্বপ্নের কৃমি ক্লিন্ন বিভীষিকা দেখে
স্ফুরিত তির্যক হোয়ে যায়।
লাঠি হাতে ঠক্ ঠক্ কৌতুকে সময় হাসে
ধারালো ক্ষুরের হাসি দাঁত বের কোরে
সারা রাত সারা রাত সারা রাত ধোরে।

আবার মিছিল শুরু হয়! ছায়ার মিছিল!
শাদা মাথা ঈগলের অতিকায় পাখার ঝাপটে
ধুলো হোয়ে উড়ে যায় অমৃতের পুত্রদের হলুদ পিপাসা
আর, পোকা-কাটা ফুস্‌ফুসের ফাঁকাশে নিশ্বাস।
দুই বেলা দুই গ্রাস পচা গন্ধ মৃত্যু দিতে জলন্ত জঠরে
মানুষেরা নিজেদের দলে দলে সংখ্যায় ভাগ ভাগ কোরে
সারা দিন সারা দিন সারা দিন ধোরে।

আবার মিছিল থেমে যায়।
বিসর্পিল অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখে
আবার রাত্রি তোলে ফণা।
আবার আমার ঘরে

ঘনীভূত সময়ের গদি-আঁটা খাটের তলায়
ইঁদুরের অন্ধকার বেড়ালের অন্ধকারে মাথা ঢুকে মরে।
টেবিলের খোলা খাতা কবিতার অক্ষরে অক্ষরে
ফাটা ছাদ চুঁয়ে চুঁয়ে কত কত মৃত্যু পড়ে টপ্ টপ্ কোরে
সারা রাত   সারা রাত   সারা রাত ধোরে !

ম্লান মাঘ-সন্ধ্যার কুয়াশা থেকে
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবিতাকে ভালবেসে

গান ভালবেসে

শব্দের জগতে তুমি, স্বপ্নের জগতে

তুমি আর মহাশ্বেতা, ভুবনমোহিনী

কোমলতা

কখনো বা উদাত্ত গম্ভীর, কখনো বা

করুণায় মানবিক

শিয়রে সমস্ত রাত

ম্লান মাঘ সন্ধ্যার কুয়াশা থেকে জেগে-ওঠা

নবজন্মে, পবিত্র শপথে,

তাঁর আশীর্বাদ।

কালো মহল্লা

মূল কবিতা : ল্যাংস্টন হিউজ (১৯০২-১৯৬৭)
অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কী হয় স্থগিত স্বপ্নের দশা

তার দশা বুঝি কড়া রোদ্দুরে
শুকানো আধশুকানো আঙুর ?

নাকি দগ্‌দগে পুঁজের পাঞ্জিকা
জ্বালিয়ে উড়াও ?
চারপাশে বুঝি চিনির বহর
অকথ্য সম্ভবতের সিঁড়ি ?

সে কি রীতিমতো বোকার মতন
সেঁধিয়েই যায় !

নাকি তার শেষ দিগ্বিদারণ !

মুসৌরি

সুধীর নন্দী

পথ চলতি
হঠাৎ দেখি ক'টা পাহাড়
কাঁধে কাঁধে মাথা দিয়ে
দুপুর বেলা ঘুমোচ্ছে ;
শীত পড়েছে
ভিজে রোদ্দুরে
আর পাতাঝরা গাছের আগায় ;
কাকেরা উড়ে বেড়াচ্ছে
রা নেই মুখে ;
সব কেমন যেন নিঃঝুম, নিস্তব্ধ ।
শীতের হিমেল হাওয়া
বরফ গলা জলে স্নান সেরে
মুসৌরি পাহাড়ে উঠে এলো ;
রোদ্দুর পোয়াচ্ছে ওরা
খুশির আমেজে ভরপুর ।
নীচের ডুন ভ্যালি
আশ্চর্য্য নিথর,
পাখিরাও কেমন যেন মৌনী হ'য়ে গেছে ।

শীতের কাঁপন নেই কোমল সজ্জায়,
রং বেরঙের পাতা বাহার,
ফুল-ফোটানোর আড়ম্বর নাই বা রইল ;
বর্ণাঢ্য পত্রগুচ্ছের
সে কী সমারোহ !
আকাশ গাঢ় নীল ;
লাল-কালো-সবুজ পীতবর্ণা
প্রকৃতির জঠরে শিশু হ'য়ে
তলিয়ে গেলেম
এক অতলান্ত তমিস্রার মধ্যে ;
একটু একটু ক'রে নেমে চলেছি
নানান্ রঙের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
সোমনামবুলিস্টের মত
সেই বিস্মৃত অতীতের সুখ-স্মৃতিতে—
আমি পাহাড় ছিলেম,
মাটি ছিলেম,
গাছ হ'য়ে আলোর পানে চেয়েছিলেম
উদ্বাহু হ'য়ে ,
সেই দিনটিকে আজ ফিরে পেলেম ,
মুসৌরি পাহাড়
তুমি, আমি অভেদাত্মা ।

ছিল, আজ নেই

কবিরুল ইসলাম

একদা আমার স্বপ্ন ছিল, আজ নেই
স্বপ্নহীন কেউ বেঁচে বর্তে আছে ভাবতে পারো ?

এই কয়েটিরও ছিলো জিভ—
গাইতো গান একদা মধুর
আজ নেই ।

আজ পড়ে আছে ধু ধু পোড়ো জমি
নতুন বিপ্লব নেই
স্বপ্নগন্ধে অঘ্রাণে উদ্ধার নেই
নেই মাঝে দেশের আড়াল
স্মৃতির অভাবে নেই কোনো সুখ।

একদা আমারও স্বপ্ন ছিলো॥

রাজা রামমোহন

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

রামমোহন ব্রিস্টলে মারা যাননি, মারা গেছেন নিজের দেশেই
কেন না আমরা আর রাজা-টাজা বুঝি না মোটেই
তিনি ত রণ-পায়ে চড়ে হাজার মাইল এগিয়ে গেছেন
কয়েকশো বছর তাঁর হাতের ভেতর ধুলিমুঠি
আমরা একদিন না যেতে যেতে ঘুমিয়ে পড়ছি
পুকুরে বাথটবে চড়ে ভাবছি ভাসছি অকূল পাথারে
তেলেজলে আহা আমরা মসৃণ দুপুরগুলি
ছিপ হাতে নদীজলে দিচ্ছি বিসর্জন… …
আর রাজা—যে আমার চোখ খুলে পৃথিবী চেনালো
যে আমার ভূতপ্রেত ঘাড় থেকে নামালো সেদিন
তাকে আমি ভুলেই গিয়েছি
কেন না তেমন-তেমন রাজকথা শুনি না এখন
কেন না এখন আমরা লিলিপুট হ'য়ে শুধু এ ওকে ধাক্কাই মারছি
রামমোহন, তোমার রণ-পা যদি হ'ত চাবুক এখন
তাহলে নিশ্চয় আমরা বহুক্ষণ জাগতে পারতাম।

কেন লিখি নিজেই জানিনা

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

এখনো কবিতা লিখি কেন লিখি নিজেই জানিনা,
যেহেতু সূর্য ওঠে, ফুল ফোটে, পাখি গান গায়,

কিংবা পাল্কী বয়ে চলে, তব তব চেউ-এর মাথায়,
তাই কি কবিতা লিখি, বুণাকে বাজাতে চাই বীণা ?

স্মৃতিকে আড়াল করি বারে বারে কেউ তো ধরে না,
সংখ্যাগুলো ব্যঙ্গ করে বন্ধ করে আমার চেষ্টাকে,
স্মৃতি সুধা রস পানে পিপাসিত আকণ্ঠ আমাকে
"এই যে বলুন" বলে' স্নিগ্ধকণ্ঠে পিপাসা হরে না।

তবে কি বৃথাই চেষ্টা, শুধু খেলা আপনার মনে,
শুধুই আলস্য লীলা, জল দিয়ে আলপনা আঁকা,
কখনো হবে না সোজা এ পৃথিবী চিরদিন বাঁকা
আমাকে দেবে না সুখ শ্রান্তিহরা কবোষ্ণ ইন্ধনে।

তখন হঠাৎ শুনি বজ্রধ্বনি অন্তর কাঁপিয়ে,
"ব্যথার আনন্দ তোর, অপর যা কী হবে তা নিয়ে"।।

তুমি তা বিশ্বাস কোরো

সনাতন মিত্র

তোমাকেই যদি বলি আমার শাখায়
জীবনের কোনো পাখি মধুকণ্ঠে শোনায় ন গান
তোমাকেই যদি বলি বসন্তকে আকণ্ঠ ঘৃণা করি
কেননা এখন ভালবাসার সময় নয়
যদি বলি শয়তান পথেঘাটে ওঁৎ পেতে বসে
এ সময় মানুষের একতা আশা সংগ্রামের কত প্রয়োজন
পৃথিবী বদলে দিতে গ্যালন গ্যালন রক্ত চাই
সারা দেশ জুড়ে শুধু একটিই পথ
সেই পথে শুয়ে আছে লক্ষ দেবশিশু
সে পথের মাঝে মাঝে শৃঙ্খলে আবদ্ধ যুবা শয়তানের উলঙ্গ থাবায়

তবু যদি মৃত্যুর মুখোমুখি হৃদয়ের একটিও পদক্ষেপ পড়ে
আমি তবে হেঁটে যাবো ওই পথ ধ'রে

ও পথেই অতীতের ভালবাসা জন্ম নেবে আগামী দিনের সূর্যালোকে
পল্লবিত পত্রপুষ্পে স্বাধীনতা নামধারী একটি উৎসবে

তুমি তা বিশ্বাস কোরো কাউকে বিশ্বাস করা যদিও এখন অনুচিত
কেননা এখন দুঃসময়, চারিদিক বড়ো অন্ধকার।

যখন আসলে কিনা

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শুনলে না পেত্তায় যাবে ভায়া
ইদানীং
একদল অশ্বেতরে এ-বন শাসন করে
যে-বন শাসন করতো কিংবা করতে পারতো
পুরুষসিংহেরা আর পুরুষব্যাঘ্রেরা

এ-বনে এখন তাই
বেঘোরে হরিণী মরে
ঘৃণায় বিদায় নেয়
বনশুয়োরের গোঁ
সংকোচের বিহ্বলতায়
দেওদার লজ্জাবতী হয়
ক্ষুদ্রতম ছায়ার ওপর

দেখে দেখে নপুংসক
আমরাও ঠা ঠা ক'রে হাসি
যখন আসলে কিনা কান্নাই সংগত ছিলো
কিংবা সংগত ছিলো অসি নিষ্কাশন।

এখনি বলা যাবে না

ব্রজগোপাল রায়

এখনি বলা যাবে না কোন্‌দিকে মোড় নেবে...
কোন্ অবিস্মরণীয় ভবিষ্যৎ সৃষ্টি হবে
সময়ের অববাহিকায় ;

এখনো ঘোঁয়াটে ঘোঁয়াটে আকাশ
নদীতে চলের উচ্ছ্বাস
এপারে ওপারে ভুরিভুরি শস্যের চাষ ;
আর মিছিলের পায়ে পায়ে জড়ানো
অলস-অভ্যাস - প্রতিদিন…
প্রতিদিন ক্লান্ত হয়ে নামে পথের ধুলায়।

এখনি জনতার স্বীকৃতি পাবে কিনা কোন মতবাদ
বলা যাবে না।
অথবা, কোনদিন এই সব ভুয়া সত্য
সিংহদ্বার ভেঙে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে
সব দুর্গের সঞ্চিত রসদ অবাজক হাতের চেটোয়,

এখনি বলা যাবে না
সময়ের তালে তালে আমরা
এগিয়ে এসেছি কিনা উত্তর ঘাঁটিতে।
এবং এখন যৌবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা
নেবে কিনা কোন এক আশ্চর্য-শপথ ;
উদ্‌বৃত্ত রক্তের চাপে বুকের ভেতর বুকে
যে-প্রচণ্ড স্রোত
ভেঙে চুড়ে দিয়ে গেলে সম্মুখের বাধায় পর্যন্ত
হৃদয়ের উর্বর স্বাদে ভ'রে যাবে বিষণ্ণ মাঠ
সবুজ-সবুজ শস্যে পূর্ণ বুকের ভাঁড়ার
খুলে দেবে লৌহ কপাট।

এখনি বলা যাবে না
আমরা পৌঁছে যাব কিনা
সেই চূড়ান্ত-মানব-সীমায়
যেখানে ঘাসফুলের রং-এর মৌতাত,—
জোছনামুখর রাত দিন দিনরাত, —
বিবর্ণ অতীত মুছে দিয়ে কোজাগরী চাঁদ
একরাশ এলোচুলে ছড়াবে সৌরভ…

উঠোনে উঠোনে পাতা
প্রতিবেশী—সকলের চোখেমুখে হাতেপাতে
হৃদয়ের স্বাদ ;
সব মাঠ আল ভেঙে
হ'য়ে যাবে বিশাল আকাশ,
সব নদী মিলেমিশে সাগরের জল
অথৈ অতল।

এখনি বলা যাবে না
কোন্‌দিকে নেবে বাঁক—
উড়ন্ত আকাশে পরিশ্রান্ত অশান্ত পাখিদের ঝাঁক।

প্রেস ভোটার তালিকা মুদ্রণের কাজে সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত থাকায় এবং লোড শেডিঙের দরুণ দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ার জন্যে আমরা খুবই লজ্জিত। তবে ৪র্থ সংখ্যা যথাসময়ে এপ্রিল মাসের শেষাশেষি প্রকাশ করতে চেষ্টা করা হবে।

—সম্পাদক/চেতনিক

শারদীয় (৩য় বর্ষ ১ম) সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ঃ

প্রবন্ধ ঃ শরৎ সাহিত্যের মূল্যায়ন ঃ নারায়ণ চৌধুরী
আবার কোবাবাদ : ডঃ সুধীর করণ
ত্রিপুরী/কুকিদ : অধ্যাপক জগদীশ গণচৌধুরী

গল্প ঃ : মাণিক রায়

কবিতা ঃ হীরালাল দাশগুপ্ত/বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/সথাই কিছু/শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়/কবিরুল ইসলাম/ফজল-এ-খোদা (বাংলা দেশ) প্রভৃতি।

ত্রৈমাসিক 'চেতনিক' প্রকাশিত হয় ঃ জানুয়ারী/এপ্রিল/জুলাই/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (পূজা সংখ্যা)

বার্ষিক চাঁদার হার : ১০ টাকা। ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

প্রয়োজনবোধে সম্পাদক প্রকাশার্থে প্রেরিত যে কোনো লেখার পরিবর্তন-সাধন করতে পারেন।

ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমাণিক সরকার : মফঃস্বল শহরে এতো উচ্চাঙ্গের পত্রিকা অভাবনীয়।

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র : 'দেশ' পত্রিকার বাইরে এমনি একটি উচ্চাঙ্গের নির্ভীক সাহিত্যপত্রিকার অভাব বোধ করছিলাম আমরা অনেক দিন থেকে।

মণি বাগচি (যিনি পূর্বে 'চেতনিক'-কে 'বঙ্গদর্শন-এর' সঙ্গে তুলনা করেছিলেন) : এবারের সম্পাদকীয়টি আরও উচ্চগ্রামে বাঁধা দেখলাম। আপনার বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।

ডঃ অমলেন্দু মিত্র : চমৎকার!... এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকার সকলেরই পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত।

সম্পাদক/'বেতার বাংলা' (ঢাকা) : শুনেছি শারদীয় চেতনিক খুব সুন্দর হয়েছে। এক কপি হাতে পেলে খুব খুশি হবো।

মুর্শিদাবাদের খবর (বহরমপুর) : ...মফঃস্বল বাংলার এই পত্রিকাটি সমস্ত বাংলা দেশে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এর বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় যেন গ্রানিট পাথরের গাঁথুনি। সাহিত্য সংস্কৃতি তথা সমাজব্যবস্থার ভিত্ ধরে নাড়া দেয়। এর সব প্রবন্ধগুলিই এককথায় সুলিখিত ও সিরিয়াস। চেতনিক পত্রিকাটিও সিরিয়াস পাঠকদের জন্যই বোধ হয়।

Regd No.: R. N. [illegible]

CHETANIK (Progressive Lit. Qly.) year 2 No. 3 : Edited and Published by ATUL CH. BANERJEE from P. O. & Dist. Murshidabad, West Bengal and Printed by him from Cygnus Printing Co-operative Society Ltd., Berhampore, West Bengal.

শারদীয় (চেতনিক ১৩৮১) সম্পর্কে ঃ

ডঃ সরোজমোহন মিত্র ঃ '...খুব খুশি হয়েছি, সূচীপত্রের ওপর একবার চোখ দিলেই বোঝা যায় আপনার এই সংখ্যাটি কতো মনোজ্ঞ এবং সুন্দর হয়েছে...।

অধ্যক্ষ ডঃ সুধীর করণ ঃ কবিরুলের কাছ থেকে চেতনিক পেয়েছি। খুব ভাল হয়েছে।...সত্যিই বিস্ময়কর।

ডঃ শিশিরকুমার সিংহ ঃ নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি মণীন্দ্র রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিজিত ঘোষ এবং স্থানীয়দের মধ্যে ডঃ রমেন্দ্রনাথ দেব সুব্রত মুখোপাধ্যায় (আকাশবাণী, আগরতলা) খুব প্রশংসা করেছেন। একজন বলেছেন এতো ভালো সাহিত্য পত্রিকা খুব কম প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যাপক সুব্রত পাল ঃ আজকাল সাহিত্যচর্চা কুখ্যাত কলকাতাকেন্দ্রিক। যাঁরা তা করেন তাঁদের অধিকাংশই অনেকেই পল্লীর, তবু তাঁরা প্রায়ই এই ঔপনিবেশিক চিন্তায় ভোগেন যে কলকাতা ছাড়া বাংলায় আর কোন চিন্তাকেন্দ্র নেই, কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও ভাবুক মানুষ নেই। আপনার পত্রিকা পড়লে এই উন্নাসিকেরা দ্বিতীয় চিন্তায় নিরত হবেন। 'চেতনিক' আপনার প্রচেষ্টায় পল্লী বাংলার চিন্তন-আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। [শেষ মলাটে দেখুন

মূল্য দু'টাকা পঁচিশ পয়সা

চেতনিক

চেতনিক

প্রধান উপদেষ্টা
অধ্যক্ষ অমরেন্দ্রনাথ সান্যাল
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (মহিলা)
কলকাতা-৯

আহ্বায়ক
ডঃ শিশিরকুমার সিংহ
অধ্যাপক, মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ
আগরতলা, ত্রিপুরা

সহযোগী
জীবেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী
সহ প্রধান শিক্ষক,
নিমতিতা হাই স্কুল
নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ
পূর্ণেন্দু সিংহ
পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ

সহযোগী
দীপক চট্টোপাধ্যায়
পি পি সি ডি
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৭ সি মসজিদবাড়ী স্ট্রীট
ক'লকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
পঞ্চানন চক্রবর্তী

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
পোঃ ও জেলা মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবংগ

ফর্ম—৪

অষ্টম আইন অনুসারে 'চেতনিক' সম্পর্কে ঘোষণা

প্রকাশন স্থান	পোঃ ও জেলা মুর্শিদাবাদ
প্রকাশন সাময়িকতা	ত্রৈমাসিক
মুদ্রাকর প্রকাশক সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীর নাম, জাতীয়তা ও ঠিকানা	অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয়তা ভারতীয় পোঃ ও জেলা মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবংগ

আমি অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংগে ঘোষণা করছি যে উল্লিখিত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক। চেতনিক

দ্বিতীয় বর্ষ/চতুর্থ সংখ্যা
১৩৭৪-৭৫

চেতনিক
ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র

সম্পাদক : অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
লালবাগ/মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ

ফুটুস্

সম্পাদকীয়

অল্প কিছুদিন আগে কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিলো : পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করার অপরাধে তিনজন শিক্ষক গ্রেফতার। তর্ক উঠতে পারে এঁরা গ্রেফতার হ'লেন, না শহিদ হলেন? অবশ্য তাঁদের মুক্তি দাবি ক'রে অভিভাবকদের মিছিল বের হ'য়েছিলো কিনা সে-সম্পর্কে সংবাদপত্রে কোনো খবর [illegible] দেখা যায়নি। অথবা জানা যায়নি তাঁরা জামিনে মুক্তি পেয়ে থাকলে সে-সময় অভিভাবকসমাজ তাঁদের কণ্ঠে সগর্বে মাল্যদান ক'রে-ছিলেন কিনা। তবে ট্রেনে ব'সে কাউকে কাউকে—অনুমান করি তাঁরা অভিভাবক ন'ন—শিক্ষিত কলেবরে মন্তব্য ক'রতে শুনেছিলেম : 'তিন-তিনটে অপদার্থ নচ্ছার শিক্ষক! এরা দেশকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়!' হায় [illegible] সমাজ, তোমার শাসনে শুধু হতভাগা এই তিনজন-ই পতিত হ'লো! সংবাদপত্রসেবীর দূরদর্শী চোখের আড়ালে এমনি আরো কতো আদর্শ শিক্ষক

ছাত্রজনকদের মনস্তুষ্টিসাধনে একনিষ্ঠব্রতী হ'য়ে আছেন তার খবর কি সত্যিই তুমি জানো না? এ-কথা কি কোনো বিবেকবান ব্যক্তি অস্বীকার ক'রতে পারবেন যে শুধু কাগুজে অভিজ্ঞান-ই আজ শিক্ষকপদলাভের একমাত্র ছাড়পত্র ব'লে গণ্য? শিক্ষকোচিত মানসিকতার প্রশ্ন আজ বেমালুম উপেক্ষিত!

আমি বিভিন্ন স্থানের কিছুসংখ্যক প্রধান শিক্ষক এবং আদর্শনিষ্ঠ কিছু প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা ক'রেছিলেম। তাঁদের বক্তব্য থেকে সংগৃহীত এই সারাংশটুকু আপনাদের কাছে নিবেদন করা কর্তব্য ব'লে মনে করছি: অনেক বিদ্যালয়েই কিছু অনাচারী শিক্ষক আছেন যাঁরা বিদ্যালয়-বহির্ভূত অবকাশকালে ছেলে পড়ানোর নামে অগণিত ছেলে ধ'রে থাকার সুকঠিন কাজে নিজেদের নিয়োজিত ক'রে রাখেন এবং যথাসময়ে এই ছেলেদের বার্ষিক উর্ধ্বগতি অব্যাহত রাখার কর্তব্যে মরিয়া হ'য়ে ওঠেন। এই কর্তব্যসাধনকল্পে তাঁরা সর্ববিধ কলাকৌশল অবলম্বনে সিদ্ধহস্ত। এমন কি ছাত্রদের এবম্বিধ ন্যায়সংগত স্বার্থরক্ষার্থে স্বীয় সহকর্মীদের অপমান করতে এঁদের সুরুচি শিহরিত হয় না। এঁদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার উপায় নেই। কারণ ওপরের ক্লাসের ছাত্রদের অর্ধেকেরও বেশি এবং মাস্তানসদৃশ ছাত্রদের সকলেই এঁদের দ্বারা 'ধৃত' ও বৃত। প্রয়োজনে এঁরা এদের লাঠিয়ালের মতো ব্যবহার ক'রতে সমর্থ। অধিকন্তু এদের অভিভাবকেরা এইসব মুশকিল আসান শিক্ষকদের স্বা-সুলভ সার্ভিসের বিনিময়ে এঁদের অনুরাবক হ'য়ে থাকেন। এমন কি নিজেরা শুদ্ধ হ'য়ে এই দ্রোণকাকদের সমাজদোষের গণ্ডুষরূপে ধারণ ক'রে রাখেন। কারণ বিগতস্পৃহ গলিতনখদন্ত এই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রেরা তো সন্তানদের 'স্বার্থের' কথা ভেবে কৃতঘ্ন হ'তে পারেন না। কাজেই বিদ্যালয়কর্তৃপক্ষ—তাঁদেরও কেউ-কেউ অভিভাবকত্ব বা আত্মীয়তাসূত্রে এঁদের সংগে সম্পর্কিত—এমন কি সংখ্যাগরিষ্ঠ হ'য়েও অবশিষ্ট নিরীহ শিক্ষকেরা, ভয়ে হোক নির্ভয়ে হোক, এঁদের পিতৃসম্বোধন ক'রে কৃতার্থ বোধ করেন। স্বভাবতঃই কৌতূহলী প্রশ্ন উঠতে পারে: মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষক বিদ্যালয়ের, ফলতঃ সমগ্র জাতির, সর্বনাশ ক'রে যাচ্ছেন আর সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও অন্য শিক্ষকেরা হাত গুটিয়ে ব'সে আছেন—এটা কি খুব সুস্থ চিত্র! ব'লতেই হয়: না, মোটেই না। এইখানেই আমার মনে প'ড়ে যায় রুশ কবি ইয়েভতুশেঙ্কোর আত্মজীবনীর একটা লাইন: 'বদলোকেরা, এমন কি যখন নিজেরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারছেনা তখনো, কোনো কুমতলব চরিতার্থ করতে একজোট হয় আর সফলও হয়। কিন্তু সৎ

লোকেরা একজোট হ'তে পারে না আর তাই তাদের সৎ প্রচেষ্টাগুলি ব্যর্থ হ'য়ে যায়।'

একটা জাতির চরিত্র ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে তা নির্ভর করে তার শিক্ষা-নীতি ও সেই নীতির বাস্তব রূপায়ণের গুরু দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত তাঁদের চরিত্রের ওপর। প্রথিতযশা শিক্ষাসংস্কারক ডঃ টমাস আর্নল্ড্-অনুসৃত শিক্ষা-দর্শের মূল লক্ষ্য ছিলো ছেলেমেয়েদের 'moral principle', 'gentlemanly conduct' এবং 'intellectual ability'-র যথোচিত স্ফুরণ। আজকের যুগে নিশ্চয় আমরা অনেকে আরো দুয়েকটি গুণ অন্তর্ভুক্ত করতে চাইবো এই তালিকায়। তবে উল্লিখিত গুণগুলি যে শিক্ষানিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্ফুরিত হওয়া একান্ত আবশ্যক এ-সম্পর্কে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু তাদের সামনে যদি উপযুক্ত আদর্শ উপস্থিত না থাকে, বরং জীবন্ত বিপরীত চিত্রই চলাফেরা ক'রতে দেখে তারা অনুক্ষণ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষগুলির ভিতরে বাইরে, তাহ'লে কি ক'রে তাদের অন্তরে জাগবে নৈতিক নিয়মনিষ্ঠা, কি ক'রে তারা আয়ত্ত ক'রবে সজ্জনোচিত সদাচার, কোন্ দায়িত্ববোধসম্পন্ন মালীর সস্নেহ পরিচর্যায় চারাবৃক্ষের বৃদ্ধিবৃত্তি লাভ ক'রবে মহীরুহের মহতী পরিণতি? ছাত্র-দের অপরাধসমস্যা নিয়ে আমরা বিব্রত। আমরা অহরহ তাদের আচরণে দোষ-ত্রুটি দেখি। প্রতিকারে শাস্তি দিতে নির্লজ্জের মতো বেত্রপাণি হই। কিন্তু একবারো ভেবে দেখিনে আমাদের নিজেদের যোগ্যতাহীন চালাকি, সর্বস্বচরিত্র কী বিপুল পরিমাণে দায়ী তাদের এইসব স্খলিত আচরণের জন্যে। এ-সম্বন্ধে জীবনস্মৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান অভিমতটি স্মরণ ক'রতে অনুরোধ করি আপনাদের। '...অপরাধ করা ছাত্রদের আর ক্ষমা না করা শিক্ষকদের ধর্ম। ...ছেলেদের অপরাধকে তাঁহারা বড়দের মাপকাঠিতে মাপিয়া থাকেন, ভুলিয়া যান যে ছোটছেলেরা নির্ঝরের মতো বেগে চলে,—সে-জলে দোষ যদি স্পর্শ করে তবে হতাশ হইবার কারণ নাই, কেন না সচলতার মধ্যে সকল দোষের সহজ প্রতিকার আছে; বেগ যেখানে থামিয়াছে সেইখানেই বিপদ, সেইখানেই সাবধান হওয়া চাই। এই জন্যই শিক্ষকদের অপরাধকে যত ভয় করিতে হয় ছাত্রদের তত নহে। কিন্তু শাস্তির ভার বড়দেরই হাতে...।' বিচার এবং শাস্তি-বিধানের নিরঙ্কুশ অধিকার যদি থাকতো ছাত্রদের নিজেদের হাতে তাহ'লে বড়োদের বহু সোনার চাঁদের মতো আপাতনির্মল উজ্জ্বল মুখ পোড়া হাঁড়ির তলার মতো রূপ ধারণ করতো। তাহ'লে সারা বছর ধ'রে ছেলেরা পরীক্ষার

হলে বই নিয়ে ঢোকবার জন্তে গ'ড়ে তুলতো না তাদের মানসিক প্রস্তুতি। তাহ'লে একশ্রেণীর ক্লীব শিক্ষক ছেলেদের হাতে অসংকোচে বই তুলে দিতো না পরীক্ষাকক্ষে, কিংবা বাড়িতে ব'সেই তাদের 'হল্' থেকে পিছ্‌লে বের ক'রে নিয়ে আসা প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখে দিতো না চুক্তিমতো অর্থ কিংবা কিছু কালাচুরির বিনিময়ে। পরীক্ষাফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে আসা এক-ই যান্ত্রিক ভুলে-ভরা উত্তরপত্রগুলি পরীক্ষণের ভান ক'রতে ক'রতে বিরক্ত হ'তে হ'তো না নিরীহ পরীক্ষকদের। ফলতঃ অদূর ভবিষ্যতে একদিন মূর্খ পণ্ডিতের হাতে আপনার পুত্র-পৌত্রের শিক্ষার ভার তুলে দেবার আশংকা থাকতো না, কাগজে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আর জজ্ জুরিস্টের অজ্ঞতার খড়্গাতলে বাড়িয়ে দেওয়ার দরকার হ'তো না আপনার আমার অনিচ্ছুক গলা।

একটা গল্প বলি। এক বৃদ্ধ কবিরাজ অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েছে। ছেলেকে ডেকে বললে, যা তো বাছা, কামারের কাছ থেকে একটা দা গড়িয়ে নিয়ে আয়। ওই কুলুংগিতে আছে লোহা আর খানিকটা ইস্পাত। তবে সাবধান, কামার সেটা যেন ইস্পাত চুরি না করে। ছেলে ব'ললে, না না, একতিলও ইস্পাত চুরি ক'রতে দেবো না। শেষে দা তৈরি হ'য়ে এলো। বৃদ্ধ ব'ললে, হ্যাঁরে বাছা, ছোটো ছেলে পেয়ে কামারবেটা আবার ইস্পাত চুরি ক'রে বসেনি তো? ছেলে ব'ললে, খেপেছো! আমি তেমন কাঁচা ছেলেই নই। তারপর কোমর থেকে ইস্পাতটুকু বের ক'রে ব'ললে, আসলে ইস্পাতই দিইনি। তার চুরি করবে কি!

সেই কথাই ব'লছিলাম। আমরা সবাই একে অপরকে ইস্পাত ফাঁকি দিয়ে চ'লেছি। আর নিজেদের কাল্পনিক কৃতিত্বে মুগ্ধ হ'য়ে আহ্লাদে আটখানা হচ্ছি। অসৎ শিক্ষকেরা দিচ্ছে ছাত্র আর অভিভাবকদের ইস্পাত ফাঁকি। শিক্ষকসম্প্রদায়কে ফাঁকি দিচ্ছে সরকারি আমলা আর অবিবেচক অভিভাবকেরা। ক্ষতিটা কার? শুধু ছাত্রের? শুধু শিক্ষকের? না, গোটা দেশের, গোটা জাতির? দা-এর আকার একটা তৈরি হচ্ছে-ঠিকই, আমরা চাই বা না-চাই। তবে কোপ মারবার আগেই হ'য়ে যায় সেটা সাতটুকরো। শিক্ষানীতিতে যতোই তাত্ত্বিক বিপ্লব ঘটানো হোক না. শিক্ষক যদি অসন্তুষ্ট থাকে, শিক্ষককে যদি চোট্টা হ'তে দেওয়া হয় তাহ'লে জাতির মেরুদণ্ড বেঁকে যাবেই। সব উন্নয়ন প্রকল্পপরিকল্পনা ব্যর্থ হবেই। এই ছাত্র এই শিক্ষক এই অভিভাবক এই আমলাগোষ্ঠী সবাই আমরা একটা পচা সমাজের পাঁক থেকে শামুক গুগ্‌লি হ'য়ে-ব'সে ভাবছি

নিজেদের গরজ। এ-সমাজ থেকে বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ জন্মাবে না। জন্মাবে না রামমোহন রবীন্দ্রনাথ। এখানে করে পাবে মধুকণ্ঠ কোকিলের পরিবর্তে বিকৃতরুচি কর্কশকণ্ঠ বায়সকুল।

সুমহান শিক্ষানায়ক, পর্বতপ্রাজ্ঞব্যক্তিত্বসম্পন্ন দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সাহিত্য ও রাজনীতির তীব্র সমালোচক হিসেবে নির্ভীকতা প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে এডওয়ার্ড টম্‌সন্ ব'লেছিলেন, 'He was incapable of inrtellectul dishonesty.' আমরা কি আজকের সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই intellectual dishonesty-র অপদার্থ বলি নই? আজ আমাদের সামনে কোথায় ব্রজেন্দ্রনাথের প্রজ্ঞালোকিত চরিত্রাদর্শ, বিদ্যাসাগরের ইস্পাতদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, বিবেকানন্দের সংকীর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ অবিসংবাদিত লোকগুরুত্ব, এমন কি রবীন্দ্রনাথের সত্যভাস্বর পরিণামদর্শিতা? আজ গ্যয়টের মতো এমন একজন সৎ ও শক্তিধর কবির দরকার নয় কি যিনি রোগার্ত সমাজদেহের দিকে অংগুলিনির্দেশ ক'রে অভ্রান্ত চিকিৎসকের মতো ঘোষণা করবেন: Thou ailest here and here!' তবে? যোগ্য একক নেতৃত্বের যখন অভাব তখন আমাদের মতো সীমিতক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কি চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারবেন? না, পারা উচিত? বিন্দু বিন্দু বারি নিয়েই বারিধি। আসুন, আমরা যাঁরা শিল্পী-সাহিত্যিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিদ্ তাঁরা একজোট হই। অণুর শক্তি বিশ্লেষণে আর মনুর শক্তি সংশ্লেষণে। আমরা এক হই, অভেদ হই। অনুসন্ধান করি, সিদ্ধান্ত করি। পরে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করি: সমাজদেহটা প'চে গেছে। সমস্ত সমাজকাঠামোটাই পাল্টে ফেলতে হবে। দুয়েকজন কদাচারী শিক্ষক, দুয়েকজন কপট ইন্দ্রিয়দাস শিল্পী, দুয়েকজন নিমু ভট্‌চায্, জ্যোতি নন্দী, সমর বসুকে ইন্‌ক্রিমিনেইট্ ক'রে কী লাভ? গোটা কাঠামোটাই তচ্‌নচ্ ক'রে দিতে হবে। শক্ত কাঠামোর ওপর নতুন সমাজ গ'ড়ে তুলতে হবে। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত একটা স্বাস্থ্যকর শান্তিপূর্ণ জনদরদী সমাজ সৃষ্টি করা যেখানে ডিমক্রেসির ভেকধারী অসৎ রাজনীতিজ্ঞের স্থান হবে না, ইস্‌সেন-ঈপ্সিত চরিত্রাভিজাত্য (aristocracy of character) হীন অসৎ শিক্ষকের স্থান হবে না, যেখানে ছাত্রদের শুষ্ক মস্তিষ্কে ডিপ্লোমা আর সার্টিফিকেইটের শুষ্ক কাগজ গুঁজে দেওয়া হবে না, দেওয়া হবে বিদ্যা আর যোগ্য বৃত্তি, যেখানে অধিকাংশ মানুষ হা-অন্ন হা-অন্ন ব'লে হা-হুতাশ ক'রবে না, মনে করতে পারবে এই দেশ, এই মাটি, এই সম্পদ আমার। এই দেশের কল্যাণ আমারই কল্যাণ। নইলে বাপু যতোই আকাশে বোম ফাটাও আর মহাকাশে রকেট পাঠাও, পেটের আগুন না নিভলে মনের আগুন নিভবেনা। আর মনের আগুনে পুড়তে পুড়তে শেষে একদিন গোটা জাতটাই ফুটস্ হ'য়ে যাবে॥

বার্ট্রান্ড রাসেল

অন্নদাশঙ্কর রায়

আপনার 'বার্ট্রান্ড রাসেলের আত্মজীবনী' প্রবন্ধটি * দু'বার পড়েছি। এককথায় বলতে পারি প্রবন্ধটি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হয়েছে। বহু স্থানেই আপনার সঙ্গে আমি একমত। তবু আমাদের দৃষ্টিকোণ এক নয়।

প্রথমে দুটো একটা তথ্য প্রসঙ্গে বলি। রাসেলের ঐ গ্রন্থের † দ্বিতীয় তৃতীয় খণ্ড আমি পড়িনি। Encyclopædia Britannica-র যে সংস্করণটি আমার কাছে আছে সেটি ১৯৬৪ সালের। তাতে রাসেলের বিস্তৃত জীবনী আছে। সেটি আরম্ভ হয়েছে এই ভাবে—

"...English philosopher, famous also for his eloquent championship of individual liberty, which made his position in the intellectual life of his time comparable with that of Voltaire in the 18th century or with that of J. S. Mill in the 19th... .. His godfather (in a purely social sense) was J. S Mill. At the age of three he was left an orphan. His father, Lord Amberley, had wished him to be brought up as an agnostic ; to avoid this he was made a ward of court and brought up by his grandmother at Pembroke lodge, in Richmond park. Instead of being sent to school he was taught by governesses and tutors and thus acquired his perfect knowledge of French and German."

ইংলণ্ডে সব ছেলেই স্কুলে যায়। রাসেল স্কুলে না গিয়েই সরাসরি কলেজে যান। সেখানে ডবল ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে Fellow নির্বাচিত হন। দুর্লভ সৌভাগ্য।

এর পরে Paris-এ কিছুদিন British Embassy-তে Attache পদে থেকে Alys Pearsall Smith-এর সঙ্গে বিবাহ। তার পরে Berlin-এ

* শ্রীনারায়ণ চৌধুরী লিখিত এই প্রবন্ধটি 'লেখা ও রেখা' পত্রিকার কার্তিক-পৌষ (১৩৮০) সংখ্যায় প্রকাশিত।

† The Autobiography of Bertrand Russell 1872-1914, 1914-1944, 1944-1967.

কয়েক মাস কাটিয়ে 'German Social Democracy' নামক গ্রন্থ রচনা (1896)। প্রথম গ্রন্থই রাজনীতি বিষয়ক।

এর পরে লণ্ডনের বাইরে Haslemere এ Cottage নিয়ে একান্তভাবে দর্শন অধ্যয়ন ও A Critical Expo ition of the Philosphy of Leibnitz' রচনা (1900)। তিন বছর বাদে 'The Principles of Mathematics' প্রকাশ (1903)। এর পর Whithead এর সহযোগে 'Principia Mathematica' (তিন খণ্ড, 1910, 1912, 1813)।

ইতিমধ্যে Fellow of Royal Society' নির্বাচিত (1908)—অতি দুর্লভ সৌভাগ্য। তাঁর নিজের কলেজ তাঁকে Lecturer পদ দেয় 1910 সালে। দিতে পারত, যদি তিনি চাইতেন, পনেরো বছর আগে। সেই পনেরো বছর তিনি চাকরি না করে স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনা করেন। "During all this period Russell lived simply and worked hard."

"Lived simply and worked hard"—তাঁর সারাজীবন সম্পর্কেও খাটে একথা। কখনো তিনি বিলাস বাসনের ধার ধারেননি।

কেম্ব্রিজে চাকরি পাবার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। রবীন্দ্রনাথ এর একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা লেখেন 'পথের সঞ্চয়' পুস্তকে। যদি পড়ে না থাকেন সংগ্রহ করে পড়বেন।

এর পর এল প্রথম মহাযুদ্ধ। "After World War I broke out he took an active part in the No Conscription Fellowship. He was fined £ 100 as the author of a leaflet criticizing a sentence of two years on a conscientious objector. His library was seized to pay the fine ; it was bought in by a friend, but many valuable books were lost. His college reprieved him of his lectureship. He was offered a post at Harvard University, but was refused a passport He intended a course of lectures (published in the U. S. as **Political Ideals** in 1918) but was prevented by the military authorities. In 1918 he was sentenced to six months' imprisonment for a pacifist article he had written in the **Tribunal.**"

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রথম মহাযুদ্ধকালে তাঁর চাকরি যায়, অন্য কোনো চাকরি জোটে না, জরিমানা দিতে হয়, জেলে যেতে হয়। বাইরে গিয়ে চাকরি

করতেও দেওয়া হয় না। এই অবস্থায় তিনি তাঁর বুদ্ধোপকরণের shares কবি Eliot কে দেন। Wittgenstein-এর আসবাব ক্রয়ের প্রয়োজন বা সামর্থ্য তাঁর ছিল না, ওটা পরোপকারের পর্যায়ে পড়ে। 'Bargain' মানে 'দাঁও' নয়।

রাসেল বংশের একটি বৈশিষ্ট্য এঁরা individual liberty বা civil liberty-র জন্যে সর্বদা সচেষ্ট। পিতামহ লর্ড জন রাসেল civil liberty-র জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন। Reforms Act-এরও তিনি একজন সূত্রধার। Crimeaর যুদ্ধে এঁর সায় ছিল না, যদিও সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয় এঁর এখানে বসেই। বারট্রাণ্ড 'শান্তিবাদী' না হলেও 'যুদ্ধবাজ' ছিলেন না। কেউ যদি স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যায় তা হলে তিনি বাধা দিতেন না, কিন্তু কাউকে বলপূর্বক যুদ্ধে ধরে নিয়ে গেলে তিনি প্রতিবাদ করতেন। ইংলণ্ডেরও এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে সে দেশে conscription ছিল না, যেমন ছিল ফ্রান্সে, জার্মানিতে, রাশিয়ায়। প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকেও conscription ছিল না। কিন্তু কয়েক বছর বাদে দেখা গেল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলে জোর ক'রে সৈন্য সংগ্রহ করা চাই। সেসময় conscription প্রথম প্রবর্তিত হয়। এটা ইংলণ্ডের ঐতিহ্যবিরোধী। রাসেল পরিবারের ঐতিহ্যবিরোধী। সুতরাং এই ইস্যুতেই রাসেল প্রতিবাদী বলে দণ্ডিত হন। Conscription এড়াতে পারলে রাসেলের সঙ্গে যুদ্ধকালে দেশের নেতাদের সংঘাত বাধত না। তবে তিনি যুদ্ধে সায়ও দিতেন না। বহু মনীষী সায় দেননি। প্রথম মহাযুদ্ধ ইংলণ্ডের জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে যায়। যুদ্ধে জিতেও ইংলণ্ডের কোনো সান্ত্বনা ছিল না। অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন একটা আস্ত generation যুদ্ধে নিহত হয়। সে gap পূরণ করা অসম্ভব।

এমনিতেই একজন অগ্রগণ্য intellectual হিসাবে তাঁর নাম সকলে জানত। যুদ্ধকালে তাঁর অনমনীয় মনোভাবের জন্যেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ডবল ফার্স্ট ক্লাসের মতো এটাও একপ্রকার ডবল কীর্তি। কিন্তু এই সময় তিনি অন্য দু'টি কারণে অধিকাংশের অপ্রিয় হন। একটি তো তাঁর marriage and morals সংক্রান্ত সাফ কথা। অন্যটি তাঁর রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্বদেশের Establishment বিরোধী মতবাদ। আপনি তাঁকে ধনতন্ত্রী বলে নিন্দাবাদ করেছেন। তখন কিন্তু ধনতন্ত্রবিরোধী বলেই নিন্দাবাদ শোনা যেত। তিনি পার্লামেন্টের জন্য দাঁড়ান Independent Labour

এরপর পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় দেখুন

শরৎ সাহিত্যের মূল্যায়ণ

নারায়ণ চৌধুরী

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য প্রতিভা। এই প্রতিভার কোন জোড়া খুঁজে পাওয়া যায় না বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আগে ও পরে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই শরৎচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বহুবিস্তারী প্রতিভাসম্পন্ন লেখক, তাঁরা দু'জন রসসৃষ্টিতে যেমন অনন্য তেমনি মনীষা ও বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে বিচিত্রপথ সন্ধানী জিজ্ঞাসায় তৎপর; পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্রের পর কথাসাহিত্যে কেউ কেউ এসেছেন যাঁরা শরৎচন্দ্রের তুল্য প্রতিভার অধিকারী না হলেও বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে দূরপ্রসারিতভাবে সম্প্রসারিত করেছেন। যেমন বিভূতিভূষণ বাংলা উপন্যাসে একটি নূতন আয়তন যোগ করেছেন—প্রকৃতিপ্রেম; তারাশংকর রকমারি চরিত্রের স্রষ্টা; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সমাজ-স্থিতির সবচেয়ে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক লেখক ও বাস্তবতার সর্বাগ্রগণ্য শিল্পী। কিন্তু যেখানে শরৎচন্দ্র তুলনারহিত এবং পূর্বাপর সকল চূড়ান্তের ঊর্ধে স্থিত, সে হলো কথাসাহিত্যের মনোহারিত্বের ক্ষেত্র। এমন মনোহারী ও লোকপ্রিয় গল্প-উপন্যাস আর কেউ সৃষ্টি করে যেতে পারেননি বাংলা ভাষায়। শরৎচন্দ্রকে বাংলার পাঠক সম্প্রদায় 'অপরাজেয়' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। অভিধাটি অকারণ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অপরিসীম সৃষ্টিকুশলতার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছেন; কিন্তু কথাসাহিত্যের সীমিত ক্ষেত্রে একে দেখতে পাই, শরৎচন্দ্র তাঁর লেখার যাদুতে বাংলার পাঠকচিত্তকে যেরূপ গভীরভাবে সম্মোহিত করেছেন এমন ওই দুই অগ্রগামী ও দিকপাল লেখকের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। মনোজ্ঞতার শিল্পে শরৎচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

মনোজ্ঞতা তথা লোকপ্রিয়তার শিল্পকে স্বভাবতঃই নিম্নস্তরের শিল্প জ্ঞান করার একটা সহজ প্রবণতা আমাদের সকলেরই মধ্যে কম-বেশী রয়েছে। বিশেষ বিশেষ লেখকের বেলায় এ কথা সত্য হতে পারে কিন্তু শরৎচন্দ্রের বেলায় এ কথা আদৌ সত্য নয়। লোকপ্রিয়তার অজুহাতে শরৎচন্দ্রকে খাটো করে দেখবার উপায় নেই, কেননা শরৎচন্দ্র নিছক লোকপ্রিয় শিল্পীই নন, আরও অনেক কিছু। তাঁর সে সব বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধেই আমরা কতক পরিমাণে চেষ্টা করবো, তবে গোড়াতেই যে-কথাটা বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়া

দরকার তা হলো তাঁর মত জনপ্রিয় শিল্পী আজও পর্যন্ত বাংলার কথাসাহিত্যের আসরে দ্বিতীয় আবির্ভূত হয়নি। বাংলার পাঠকপাঠিকার হৃদয়াসনে সুদৃঢ় অধিকার স্থাপনায় শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব অবিসম্বাদী ও সর্বাধিক।

কোন্‌ গুণে শরৎচন্দ্র এই অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন? সে এইজন্য যে, তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে কেবলমাত্র মানুষের উপরই তাঁর সকল মনোযোগ সংহত করেছিলেন—মানুষ-ব্যতিরিক্ত কোন অবাস্তব প্রসঙ্গের উত্থাপনায় সময় ও উদ্যম ক্ষেপ করেন নি। মানুষ ও মানুষের হৃদয় এই ছিল তাঁর একান্ত অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। মানুষ যে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে বাস করে সেই পারিপার্শ্বিকের উন্মোচনে তাঁর তাদৃশ উৎসাহ দেখা যায়নি, নিসর্গের রূপ বর্ণনায় তাঁর সামান্যই অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়েছে, এমন কি যে মানুষ বা মানুষী তাঁর মুখ্যমনোযোগের বস্তু, তার দৈহিক রূপসৌন্দর্য বর্ণনায়ও তিনি পাতার পর পাতা ভরাতে যাননি বঙ্কিমচন্দ্রের কিংবা অন্য দু-একজন অগ্রগণ্য লেখকের ধরণে। তাঁর একমাত্র চিত্রিতব্য বিষয় ছিল মানুষ ও তার মন। চরিত্রসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে তিনি বিশেষ আনন্দ পেতেন। তবে সেখানেও কথা আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত জটিল কুটিল মনের বিশ্লেষণের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না, সমাজের প্রচলিত অনুশাসন বা সংস্কারের সঙ্গে অন্তরের সহজ প্রবৃত্তির যে-সংঘাত, সেই সংঘাতজনিত আলোড়নের ছবি ফুটিয়ে তোলাতেই ছিল তাঁর শিল্পিমনের সমধিক স্ফূর্তি। শরৎচন্দ্র তাঁর বর্ণিত চরিত্রগুলির আবেগজীবনের রূপায়ণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাঙালী যে অত্যন্ত ভাবাবেগপরায়ণ জাতি সেটা শরৎচন্দ্রের লেখা পড়লে যত সুনিশ্চিত-ভাবে উপলব্ধি করা যায় এমন বোধকরি আর কারও লেখা থেকে যায় না। অচরিতার্থ প্রেম, সমাজ নিষিদ্ধ অথচ তৎসত্ত্বেও অদম্য ভালবাসার আবেগ, বন্ধ্যাত্বের বেদনা তথা মাতৃত্বের ক্ষুধা, সন্তানবাৎসল্য, ভ্রাতৃস্নেহ, নারীর সেবাপরায়ণতা, বিদ্রোহের তেজ, প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগকে শরৎচন্দ্র অতিশয় চমৎকার শিল্পরূপ দান করেছেন। বাংলার সমাজজীবন, বিশেষ, পল্লী সমাজজীবনের চিত্ররূপ উপস্থিত করতে গিয়ে দুটি কাজ তিনি বিধিমতে নিষ্পন্ন করেছেন। এক, বাংলার পল্লীবাসী সাধারণ নর-নারীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের উদ্ঘাটন, দুই বাংলার সমাজে প্রচলিত একাধিক গতানুগতিক মূল্যবোধকে সজোরে আঘাত হানা। অর্থাৎ, তাঁর লেখনী বাস্তবিকতা ও আদর্শবাদ—এই দুই খাতেই যুগপৎ প্রবাহিত হয়েছে।

বাঙালী চরিত্রের মানসিক গঠন বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবের ধাত বিশ্লেষণ করে তারপর তিনি তার কতকগুলি অনুচিত সংস্কারকে চূড়ান্ত রকমের সমালোচনা করেছেন। বাঙালীর অন্তরে তিনি বিদ্রোহের আগুন পুরে দিয়েছেন। এইখানেই তাঁর শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা।

শরৎচন্দ্রের এই শিল্প সার্থকতা বিধানে ভাষা তাঁর একটি প্রধান সহায় হয়েছে। এমন মনোমুগ্ধকর ভাষা বাংলার খুব কম লেখকেরই লেখনীমুখে নিঃসৃত হয়েছে। শুধু ভাষা বললে কমই বলা হয়, বলতে হয় তাঁর স্টাইল, ভাষার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত তাঁর ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ। শব্দ সম্পদ, শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠনের রীতি, চিন্তার ছাঁচ, বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গী সব জড়িয়ে এবং সে সবকেও ছাড়িয়ে তাঁর এই স্টাইল। স্টাইলের জাদুতে শরৎচন্দ্র বাঙালীর চিত্ত হরণ করেছেন। শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে লিখিত এক পত্রে শরৎচন্দ্র বিনয় করে অবশ্য বলেছেন যে, "ভাষার ওপরে দখল আমার চিরদিনই কম; শব্দসম্পদ যে কত সামান্য এ সংবাদ আর যার কাছেই লুকোনো থাক্, তোমাদের কাছে থাকবার কথা নয়।" কিন্তু এই বিবৃতিকে সত্য বলে গ্রহণ করবার কোনই হেতু নেই। আর যদি সত্য বলে গৃহীত হয়ও সেক্ষেত্রেও বলবার কথা এই যে, ওই যে তিনি শব্দ সম্পদের 'সামান্যতা" নিয়ে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন ওর মধ্যেই রয়েছে তাঁর ভাষার যথার্থ শক্তি। নিসর্গবর্ণনা, প্রতিবেশচিত্রণ, বর্ণিত চরিত্রসমূহের দেহ সৌষ্ঠবের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ এ সমস্ত অবান্তর বিষয়ের বিবরণ দানে তিনি তাঁর মনোযোগ ক্ষেপ করেন নি বলেই তাঁর শব্দসমুদ্র স্বভাবতই 'সামান্য' রয়ে গেছে। কিন্তু শব্দসম্পদের বিশালতা বা বিস্তারের মধ্যে তো শিল্পীর চাতুর্য নিহিত থাকে না, শিল্পীর চাতুর্য নিহিত থাকে যে সমস্ত শব্দ নিয়ে শিল্পীর সচরাচর কারবার সেই সমস্ত শব্দ সাজাবার কায়দার মধ্যে এবং কোথায় কোন্ শব্দের উপর ঝোঁক আরোপ করতে হবে তার ভঙ্গীর মধ্যে।

এই মানদণ্ডে বিচার করলে শরৎচন্দ্রের ভাষার কি কোন তুলনা হয়? শরৎচন্দ্রের যে কোন উপন্যাসের যে কোন পরিচ্ছেদের বর্ণনাংশের যে কোন পাঁচ-ছয় লাইন পর পর তুলে আভ্যন্তর পাঠের রীতিতে বিচার করলেই বুঝতে পারা যাবে তাঁর শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, শব্দের ওজন ও সংযম, অন্বয়ের রীতি, অভীপ্সিত অর্থের স্পষ্টতা ও লক্ষ্যাবোধিতা। এই থেকে আরও একটা কথা যা মনে আসে তা হলো এই, যে শরৎচন্দ্র মূলতঃ পল্লীভিত্তিক লেখক হলেও

তাঁর ভাষাশিল্প ছিল মননশীলতাপুষ্ট অর্থাৎ নাগরিক। নাগরিক বৈদগ্ধ্যের মতোই তাঁর স্টাইল ভঙ্গুর। জহুরীসুলভ নিপুণতায় পাথর কেটে কেটে কারুকাজ করে বসানোর মত তিনি প্রতিটি শব্দ মেপে মেপে ওজন করে বসাতেন। শব্দগুলির উচ্চারণগত ধ্বনি এবং পাঠকের মনের উপর সেই ধ্বনির সম্ভাবিত প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে বিচার করে দেখে তবে তিনি শব্দ ব্যবহার করতেন। এই প্রক্রিয়া ভাষাশিল্পের একান্তই নাগরিক প্রক্রিয়া। মননশীলতা এর পরতে পরতে বিধৃত। যাকে বলে 'অশিক্ষিতপটুত্ব' কিংবা দৈবানুগ্রহপুষ্ট 'কবিপ্রসিদ্ধি', তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই—এ সম্পূর্ণই সচেতন মনের এক শিল্প। অনুশীলন ভিন্ন এ শিল্প আয়ত্ত হয় না, পরিমার্জনা ভিন্ন এ শিল্পের সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় না।

শরৎচন্দ্র যে কতবড় ভাষাশিল্পী ছিলেন তার যথাযথ মূল্যায়ণ এখনও হয়নি। হলে দেখা যাবে তিনি এই ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু লেখকেই নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। ভাষার অসাধারণ চিত্তাকর্ষক ক্ষমতা তাঁর হাতে বাঙালী পাঠকের অন্তরে প্রবেশের আসল চাবিকাঠিটি তুলে দিয়েছে। আর বাঙালী পাঠকও যে তাঁকে তাঁদের অন্তরের আসনে অচলপ্রতিষ্ঠ অধিকার দান করেছেন তা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ এই ভাষার গুণে প্রভাবিত হয়ে। প্রভাবক্রিয়াটা কখনও সজ্ঞান স্তরের, কখনও অজ্ঞান। বোধহয় খতিয়ে দেখলে অজ্ঞান অংশই বেশী। বাঙালী পাঠক তাঁদের অজ্ঞাতে অথবা অর্ধজ্ঞাতসারে শরৎ-সাহিত্যের ঐকান্তিক ভক্তে পরিণত হয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের রচনারীতি থেকে এইবারে শরৎচন্দ্রের রচনার বিষয়ের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক কিয়ৎ পরিমাণে।

সকলেই জানেন শরৎচন্দ্র নারীচরিত্র অঙ্কনে পুরুষচরিত্র অপেক্ষা সমধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। নারীচরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি যেন তাঁর অন্তরের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়েছেন। শুধু যে পল্লী বাংলার মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত স্তরের সাধারণ সতীসাধ্বী পতিগতপ্রাণা গৃহবধূ, বাল-বিধবা, অরক্ষণীয়া অনূঢ়া কন্যা, প্রৌঢ়া জননী প্রভৃতি নানান ধরণের নারীচরিত্রই তাঁর অভিব্যক্তব্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা-ই নয়; সমাজ-সৌধের বহির্ভূত সাধারণের অবজ্ঞাত তথাকথিত পতিতা ও অসতীদের উপরও তিনি তাঁর শিল্পীচিত্তের মমত্ব অর্পণ করেছেন পরম ঔদার্যে। তাদের বহিরঙ্গ ক্লেদাক্ত জীবনের

অন্তরালস্থিত সহজাত নারীত্বের মহিমাকে রূপায়িত করেছেন একান্ত যত্নে। এই-জন্য তাঁকে সমাজের রক্ষণশীল অংশ থেকে কম নিন্দাবাদ সহ্য করতে হয়নি কিন্তু সমস্ত কটু সমালোচনার ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর মানবিকতার অবস্থানে অবিচলিত থেকেছেন। মানুষের স্খলন-পতনকে অতিক্রম করেও যে তার অন্তর্নিহিত মানব-মহিমা অক্ষয় থাকে এই ভাবটিকে তিনি বারবার তাঁর পাঠকের মনোযোগের সামনে তুলে ধরেছেন অকম্পিত হস্তে। সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী, বিজলী প্রভৃতি চরিত্র এই মন্তব্যের অসংশয় প্রমাণ।

পক্ষান্তরে, পতিপ্রাণা সতী-সাধ্বী নারীর আদর্শ তুলে ধরেছেন বিরাজ-বৌ, সুরবালা (চরিত্রহীন), সরযূ (চন্দ্রনাথ), অন্নদাদিদি (শ্রীকান্ত), ষোড়শী (দেনা-পাওনা), প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। শ্বশুরকুল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা আত্মমর্যাদাদৃপ্তা নারীর মহিমা ফুটিয়েছেন পরিণতমনাই উপন্যাসের কুসুম চরিত্রের মধ্য দিয়ে। পল্লীসমাজ-এর রমা বৈধব্যের অভিশাপদীর্ণা ও সামাজিক মূল্য-বোধের সঙ্গে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতির নিরন্তর সংঘাতে ক্ষতবিক্ষতহৃদয়া নারীর এক বেদনাকরুণ উদাহরণ। বিন্দুর ছেলের বিন্দু আর রামের সুমতির নারায়ণী, বড়দিদির মাধবী আর মেজদিদির নামচরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে স্নেহ-বাৎসল্যের এক অপরূপ স্নিগ্ধতার আলেখ্য। অরক্ষণীয়ার পোড়াকাঠ জ্ঞানদার চরিত্রে রূপ পেয়েছে কোন কোন নারীর আপাত-রুক্ষতার খোলসের অন্তরালে যে স্নেহের ফল্গুধারা বহমান থাকে তার দ্যুতির ঔজ্জ্বল্য। পল্লীসমাজের জ্যাঠাইমা চরিত্রে পাই প্রৌঢ়া জননীর বিচক্ষণ সংসারবুদ্ধি ও ন্যায়ের প্রতি পক্ষপাত।

কিন্তু এসব কম-বেশী বাঙালী সংসারের পরিচিত কাঠামোর চিরাচরিত নারীরূপের ছবি। শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রের মিছিল ওইখানেই শেষ হয়ে যায়নি। তিনি কতকগুলি বিদ্রোহী চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন। যেমন, অভয়া (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব), সুনন্দা (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব), কিরণময়ী (চরিত্রহীন), কমল (শেষ প্রশ্ন), প্রভৃতি। অভয়া নিরুদ্দেশ স্বামীর সন্ধানে প্রতিবেশী যুবক রোহিণীকে সঙ্গে করে বর্মা মুলুকে এসেছিল। স্বামীর খোঁজ সে পেয়েছিল কিন্তু তার কদর্য জীবনযাত্রা ও অত্যধিক বিকৃত রুচির পরিচয় পেয়ে স্বামীর সঙ্গে একত্র ঘর করার ইচ্ছা তার উবে যায়। ইতিমধ্যে রোহিণী তাকে মনে মনে ভালবাসে। রোহিণীর প্রেমকে মর্যাদা দিয়ে অভয়া তারই সঙ্গে ঘর বাঁধে ও স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে থাকে। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাহসিক চরিত্র এই অভয়া। আমাদের

পুরুষ শাসিত সমাজের পুরুষের স্বার্থানুকূল একতরফা অনুশাসনাদির বিরুদ্ধে অভয়া এক মূর্তিমতী বিদ্রোহিনী নারী। পুরুষ দাম্পত্যজীবনের পবিত্রতাকে নষ্ট করে কদাচারী হলে তার কোন সাজা নেই, নারী একটু বেচাল হলেই তার উপর সমাজের রোষ বজ্রাগ্নির মত নেমে আসে—এই নিতান্ত অন্যায্য সংস্কারটাকেই আঘাত করতে চেয়েছে অভয়া তার অদ্ভুত আচরণের মধ্য দিয়ে। অভয়ার তুল্য নির্ভীক দ্বিতীয় আর একটি চরিত্র নেই গোটা শরৎ সাহিত্যের বিস্তৃত আয়তনের ভিতর। শরৎচন্দ্র প্রয়োজনবোধে কতখানি বিপ্লবী হতে পারেন তার দৃষ্টান্ত রেখেছেন অভয়া চরিত্রের মধ্যে।

শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বের সুনন্দাও একটি বিদ্রোহিনী চরিত্র। তবে তার বিদ্রোহের জাত আলাদা, বিদ্রোহের কারণ ভিন্ন। দৈব জীবনের সমস্যাদির সঙ্গে সে-বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক নেই। সুনন্দা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা, বধূ হয়ে শ্বশুরগৃহে আসার পর শ্বশুরকুলের সকলের স্নেহ ও আদরে বেশ সুখেই তার দিন কাটছিল, কিন্তু একটি অন্যায়ের প্রতিবিধানে তেজস্বিনী প্রতিবাদিনীর ভূমিকা গ্রহণ করে সে আশ্চর্য চরিত্র-মহিমার পরিচয় দিল। কোন একটি ঘটনায় যেদিন সে জানতে পারল তার ভাশুরের অর্জিত সম্পত্তির সবটাই এক অনাথিনী তাঁতি-বৌ ও তার শিশুপুত্রকে ঠকিয়ে কৌশলে কেনা সম্পত্তি, সেদিন সে মুহূর্তমাত্রেরও দ্বিধা না করে স্বামী-পুত্রের হাত ধরে শ্বশুরের ভিটা ত্যাগ করে এক পোড়ো বাড়ীতে এসে ঠাঁই নিলে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার শত উপরোধেও আর প্রাচুর্যের সংসারে ফিরে গেল না। অন্যায়কে রুখতে গিয়ে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণের এই গৌরবজনক ঘটনা আরও মহিমান্বিত হয়েছে এই কারণে যে, এই ক্ষেত্রে অন্যায় অসহিষ্ণুতা এসেছে এক গ্রাম্য নারীর কাছ থেকে, যে শ্রেণীর নারী জমিজিরাত সংক্রান্ত বৈষয়িক ব্যাপারে পুরুষের প্রশ্নহীন আনুগত্য স্বীকার করে নিতেই সচরাচর অভ্যস্ত। কিন্তু সুনন্দার তেজটুকু এসেছে কোথা থেকে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তার তেজের উৎস হলো তার সন্ন্যাসীকল্প শাস্ত্রজ্ঞ পিতার শিক্ষা, যে-শিক্ষায় ধর্মকে সব-কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। বাংলার অজ-পাড়াগাঁর অভ্যন্তরেও যে এমন মহীয়সী চরিত্র থাকতে পারে সেইটা একটা মস্ত বাঁচোয়া ও সর্ববিধ প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করেও বাঙালী জাতির টিকে থাকার পক্ষে একটা মস্ত যুক্তি।

কিরণময়ী একটি অত্যাশ্চর্য চরিত্র। এমন বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রতিভ সর্বস্বাবমুক্তা সনাতনশাস্ত্র শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী নারী বোধকরি শেষপ্রশ্নের কমলও

নয়। কমলের সঙ্গে কিরণময়ীর মূলগত পার্থক্য এখানে যে, কমল মুখে সনাতন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও আচরণে ভারতীয় নারীর স্বভাবগত সংযমে যুক্তা। সে একাদশী তিথিতে হবিষ্যান্ন করে, প্রায়ই আলু-ভাতে ভাত ফুটিয়ে খায়, কঠোর নিয়মপালনে বদ্ধ তার জীবন। কিরণময়ীর ওসব বালাই নেই। সে যা বিশ্বাস করে তা-ই করে। সে ঈশ্বর মানে না, শাস্ত্রের পবিত্রতায় বিশ্বাস করে না, ভোগবাসনা-বঞ্চিত রিক্ত নারীজীবনে স্বামী বর্তমানেই অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে অনুচিত সম্বন্ধ পাতে। প্রতিহিংসার তাড়নায় পত্নীপ্রেমে মাতোয়ারা এবং তার প্রতি উদাসীন উপেন্দ্রকে জব্দ করবার মতলবে তার অনভিজ্ঞ ভাই দিবাকরকে প্রলুব্ধ করে বর্মা মুলুকে ভাগে, আরও কত কী করে। কিন্তু এ স্বৈরাচার অশিক্ষিতা নারীর স্বৈরাচার নয়, এর পিছনে আছে যুক্তি দিয়ে আচরণকে সমর্থন করবার প্রখর মননশীলতা। শাস্ত্র পড়েই সে শাস্ত্রকে অস্বীকার করতে শিখেছে। স্বামী বেঁচে থাকতে স্বামীর সহায়তায় সে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি তন্ন তন্ন করে ঘেঁটেছে, তার ফলে শাস্ত্রনির্মাতা পুরুষদের কাপট্য আর ভণ্ডামিটাই শুধু তার চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপনের কোন কারণ সে খুঁজে পায়নি।

কিন্তু এমন যে সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী কিরণময়ী, সে কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলো না। বুদ্ধি আর প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে সে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র শেষ অবধি তাকে পাগল বানালেন কেন? তিনি কি কিরণময়ীকে তার বিশ্বাসে বিজয়িনী রেখে চরিত্রহীন উপন্যাসের অন্তিম উপসংহার করতে পারতেন না? এইখানেই ধাঁধা, আর এই ধাঁধার উন্মোচন-চেষ্টার মধ্যেই আমরা শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের দ্বৈধতার পরিচয় পেতে পারি।

আমার মনে হয় শরৎচন্দ্র একই কালে একজন প্রথম শ্রেণীর বিদ্রোহী লেখক ও রক্ষণশীল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর রক্ষণশীলতা এসেছিল তাঁর রাঢ়দেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণের বংশাগত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার থেকে; আর বিদ্রোহের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর বাউণ্ডুলে ভ্রাম্যমাণ ভবঘুরে জীবনযাত্রার চক্র থেকে। কৌলিক সংস্কারে তিনি রক্ষণশীল আর জীবনাচরণে তিনি বিদ্রোহী, বিপ্লবী। এই দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কখনও রক্ষণশীল সত্তা জয়ী হয়েছে, কখনও বিদ্রোহী সত্তা। আলোচ্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কিরণময়ীর পরিণাম চিত্রণে, শরৎচন্দ্র রক্ষণশীলতার কাছে, আত্মসমর্পন করেছেন। খুব সম্ভব নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এ কাজ তিনি করেছেন। তাঁর সামনে দুটি দৃষ্টান্ত এ ব্যাপারে পূর্ব-

উদাহরণের কাজ করেছে—বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের অন্তিমে কুন্দনন্দিনীর বিষপানে আত্মহত্যা ও কৃষ্ণকান্তের উইল এর শেষে বিজলভাবের ভঙ্গিতে স্বৈরিণী বিধবা রোহিণীর হত্যা। শরৎচন্দ্র অবশ্য আত্মহত্যা বা হত্যার পথে যাননি মস্তিষ্কবিকৃতির পথে কিরণময়ীর 'উন্মার্গগামিতার' শাস্তিবিধান করে-ছেন। কিন্তু ফল একই দাঁড়িয়েছে। আত্মহত্যা বা হত্যা জনিত মৃত্যুই হোক আর উন্মাদাবস্থাই হোক, লৌকিক বিচারে দুই ধরণের অবস্থাই মৃত্যুর সামিল।

পূর্বসূরীর দৃষ্টান্ত ছাড়াও এ ব্যাপারে কিছু বস্তুগত কারণ শরৎচন্দ্রকে রক্ষণশীলতার অনুকূলে প্রভাবিত করে থাকবে। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র থেকে তার কতকটা আঁচ করা যায়। চরিত্রহীন 'ভারতবর্ষ' মাসিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ভারতবর্ষ মাসিকের পরিচালকবৃন্দ উপন্যাসটি immoral বলে মত প্রকাশ করেন ও পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দেন। স্বভাবতঃই শরৎচন্দ্র এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে (প্রমথবাবু ভারতবর্ষ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন) লিখিত এক চিঠিতে নিতান্ত আক্ষেপের সুরে জানান, বইখানাকে immoral বলায় ভারতবর্ষের পরিচালকদের গোঁড়ামিই শুধু প্রকাশ পেয়েছে, সাহিত্যবুদ্ধি প্রকাশ পায়নি। সে যাই হোক, তাঁদের যখন সকলেরই এত আপত্তি, সেইজন্য "যাতে এটা in strictest sense moral হয় তাই উপসংহার করিব।" (শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ, দ্বাদশ সম্ভার, পত্র-সঙ্কলন, পৃঃ ৩৬৩)।

তারই ফলে কিরণময়ী চরিত্রের এবংবিধ পরিণতি। পরিণতিটি স্বাধীন ইচ্ছা প্রসূত নয়, অভিমান প্রসূত।

ভাষার কোষাগার

সুধীর কুমার করণ

ভাষা হিসাবে সেই ভাষাই তত বেশি প্রগতিশীল, যে ভাষার শব্দভাণ্ডারে জমা আছে প্রচুর শব্দ-সম্ভার। শব্দই হচ্ছে ভাষার কোষাগারে মূল্যবান মণিমুক্তা। সেই কোষাগারে যতবেশি মণিমুক্তা সঞ্চিত থাকবে, ততবেশি ঘটবে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। এই কারণেই শব্দের দেশ-বিচার এবং জাত বিচার

করতে নেই। ভূতল থেকে যেমন শ্রীবস্ত্র আহরণ করার বিধান আছে, তেমনি বিদেশ থেকে শব্দাবলী আহরণের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ না-থাকাই ভালো। অবশ্য, একথার অর্থ এ নয় যে,—নির্বিচারে সব কিছুই গ্রহণ করতে হবে। কোন শব্দ গ্রাহ্য কোন্ শব্দ অগ্রাহ্য তা' বিচার-বিবেচনা করেই গ্রহণ করতে হবে। চেয়ারে না বসে কেদারায় বসবো কিংবা চলচ্চিত্র দর্শন না ক'রে সিনেমা দেখবো,—তা'ও কালের বিচারে নির্ধারিত হ'য়ে যাবেই।

এ বিষয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রগতিশীল ভাষা হচ্ছে ইংরেজি। কমপক্ষে—হাজারের কাছাকাছি ভারতীয় শব্দকে ইংরাজ জাতি সাহেব বানিয়ে ফেলেছে। তাতে তাদের ক্ষতির চেয়ে লাভই হয়েছে বেশি। বাংলা ভাষাও বেশ কিছু ইংরাজী শব্দকে জাতে তুলে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে পরিস্ফুট করেছে। সেই শব্দগুলিকে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই শাড়ি ধুতি পরানো হয়েছে। তা'তে তাদের জৌলুস বরং বেড়েছে, বলা চলে। লণ্ঠন, লাট, হাসপাতাল, মেম (সাহেব) পুলিস, গেলাস, লম্ফ, বাক্সো, বেঞ্চি, আপিস, আপিল, রসিদ টেবিল-কে আর আমরা পিতৃগৃহে পাঠাতে রাজি নই। সেখানে ফিরে গেলেই ওদের চেহারা বদলে যাবে। ওরা হবে, ল্যান্টার্ণ, লর্ড, হসপিটাল, ম্যাডাম, পোলিশ, গ্লাস, ল্যাম্প, বক্স্, বেঞ্চ, অফিস, এপিল, রিসিট এবং টেব্ল্।

এইভাবে অনেক বিদেশী শব্দকেই আমরা আত্মস্থ করেছি, কখনো স্বরূপে কখনো বা ঘোমটা পরিয়ে। কিন্তু এ ব্যাপারে সব ভাষাকেই টেক্কা দিয়েছে—ইংরাজি ভাষা। পৃথিবীর সব ভাষা থেকেই ওরা শব্দ সম্পদ আহরণ করেছে; যত পেরেছে দু'হাত ভরে নিয়েছে; তারপর খোপদুরস্ত ক'রে তা'র বেশ কিছুকেই গৃহবন্দী করেছে। মহাত্মা, মহারাজা, রাজা, নওয়াব, দরবার, ধর্ম, কর্ম, নির্বান, যোগ, গুরু এমন কি হুইল অব্ জাগেরনট্-কেও ওরা অভিধানস্থ করে ছেড়েছে। দৈনন্দিন জীবনে এদের প্রয়োজনীয়তা তেমন ভাবে স্বীকৃত নয়।

ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হওয়ার অনেক আগেই বেশ ভারতীয় শব্দ, ভারতীয় পণ্যসম্ভারের সঙ্গে চালান হয়ে গিয়েছিল প্রতীচ্য ভূখণ্ডে। গ্রীক ও রোমক বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্য আরব বণিকদের মাধ্যমে প্রাচীনকালে বেশ জমজমাটই ছিল। হাতীর দাঁত, মণিমুক্তো, মশলাপাতি, রেশমিবস্ত্র প্রভৃতি আহরণ করা হ'ত ভারত ভূখণ্ড থেকে; সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভারতীয় শব্দও গুটিগুটি পায়ে হেঁটে যেতো সেই সব দেশে। পরবর্তীকালে, অনেক

ভারতীয় শব্দ-রূপসী ঐসব দেশ থেকেই ইংল্যাণ্ডে যাবার ছাড়পত্র পেয়ে যায়। ফলে, ইংরাজিভাষায় সরাসরিভাবে ভারতীয় অনেক শব্দ যেমন গৃহীত হয়েছে, তেমনি অনেক ভারতীয় শব্দ আরব-পারস্য গ্রীস-রোম পেরিয়ে চলে গেছে ইংল্যাণ্ডে। সেই সব শব্দরূপসীকে দেখলে এখন অবশ্য ভারতীয় বলে চেনা যাবে না, কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ তাদের ঠিকুজী বিচার ক'রে জাত নির্দেশ করে দিয়েছেন। সেই প্রাচীনকালেই কর্পূর উড়ে গিয়ে ক্যাম্ফর হয়ে গেল; মালয়ালম্ ভাষার শব্দ 'চন্দনম্' হয়ে গেল স্যাণ্ডাল। শুধু কি তাই —শর্করা হয়ে গেল সুগার। আরব গিয়ে যে ভারতীয় শর্করা, শকর নাম নিয়ে আরব মুলুকের বাসিন্দা হল,– তাই হল মিষ্টিমুখী সুগার। দক্ষিণ ভারতীয় 'মাংকা' হ'ল ম্যাংগো। সংস্কৃত শৃঙ্গবের শব্দটি আরবদেশ আর গ্রীসদেশ ঘুরে বিলাতে পৌঁছে, হ'ল জিন্‌জার। এমন কি জিন্‌জারের প্রভাবে একটি দ্বীপের নাম-করণও হয়ে যায়—জান্‌জিবার। জান্‌জিবার ছিল ঐ বস্তুর ব্যবসায়িক ঘাঁটি। এ কালে অবশ্য আমরা শৃঙ্গবের-কে অচ্ছুত ক'রে দিয়েছি। তাঁর স্থান নিয়েছে সংস্কৃত আর্দ্রক-জাত 'আদা' শব্দ। মৃগনাভির সৌরভ গিয়ে পৌঁছুলো 'মুষ্ক' থেকে; তাই হ'ল ইংরাজি মাস্‌ক্। তেঁতুলের প্রতিশব্দ ছিল আরবী ভাষায় ট্যামার শুধু ট্যামার নয়, ট্যামার-ই-হিন্দ্ অর্থাৎ হিন্দুদেশীয় ট্যামার ইংরেজরা লুফে নিয়ে বানিয়ে দিল ট্যামারিনড্।

এম্‌নি ক'রে অনেক ভারতীয় শব্দ রূপসী তাদের অজ্ঞাতসারেই কখন পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গনা হয়ে গিয়েছে।

ওরা পান খেতে অভ্যস্ত নয়, পান ও-দেশের বস্তু ও নয়। কিন্তু ওদের শব্দভাণ্ডারে যাঁর নাম বিট্‌ল্ (betel) তাঁ'র জন্মভূমিও ভারতবর্ষ। আর্য ভাষার পর্ণ-জাত পান ওরা গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করেছে—মালয়ালাম্ ভাষার 'বেত্তিলা' শব্দ থেকে, যার অর্থ পান-ই। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, আমাদের 'পাট' ওদের ভাষায় জুট্। কিন্তু এই পাটরাণীকে ওরা পেলো কি ক'রে! আর, কোনরূপ লুটপাট করে সংগ্রহ করলেও, ওকে ওরা 'জুট্ নাম দিল কেন! ভাষাতাত্ত্বিকগণ তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে বেড়িয়ে একসময় ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন—সব ঝুট্ হ্যায় অর্থাৎ পাটকে ওড়িয়া ভাষায় ব'লে ঝুট-অ, মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলে বলে ঝোট্। বালেশ্বরের বন্দর থেকে এই পাটরাণী তখন জাহাজে চড়তেন ব'লে সেই পিতৃগৃহের নামই তাঁর থেকে গেল ঈষৎ একটু পরিবর্তিত হ'য়ে। ঝুট্ হয়ে গেল জুট্। একসময় বাঙলাদেশের

খড়োবাড়ি ওদের এমনি পছন্দ হয়ে গেল যে, ওরা বানিয়ে ফেললো 'বাংলো'। মালপত্র ভরতে হ'লে থলে চাই। ওরা নিয়ে গেল গানিব্যাগ। গানি হ'ল সংস্কৃত গোনি আর আর ব্যাগটি ওদের নিজস্ব। পর্তুগীজ পাঁও মানেই রুটি, আমরা কিন্তু বলি পাঁউরুটি। তেমনি গোনি মানেই ব্যাগ, ওরা বলে গানিব্যাগ।

ইংরাজ বনিকরা একসময় এসে যখন ব্যবসা করার জন্য জাঁকিয়ে বসলো, তখন দারুণ দাবদাহের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্বাভাবিক কারণেই লেনদেন হ'ত বটগাছের তলায়। এদেশী বেনেরা বটগাছের তলাতেই বসতেন। ওদেশী সওদাপাতি করার জন্য। ফলে বটগাছের সাহেবী নামই হয়ে গেল বেনিয়ান ট্রি অর্থাৎ বেনে-গাছ—অস্যার্থ বেনিয়া-রা যে গাছের তলায় বসে 'বেওসা' চালায়। এইভাবে বনিকদের জামার নামই হয়ে গেল বেনিয়ান।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা ব্যবসা করতে এসে সোজাসুজি বেশ কিছু ভারতীয় শব্দের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে গেল। 'ম্যাংকা' নামে দক্ষিণ ভারতীয় শব্দের কথা আগেই বলেছি, যার আর্যভাষার নাম আম্র। কালিকটে এতো ভালো জাতের কাপড় বোনা হ'ত যে একজাতীয় কাপড়ের নামই হয়ে গেলো ক্যালিকো। ছিঁট বা ছিট কাপড়কে ওরাও নিয়ে গেল, নাম দিল—ছিঁট্জ্ (Chintz)। রাজ্য বিস্তারের জন্য সেপাই চাই ফলে এদেশী সৈনিকদের ওরা "সিপয়" বলেই চালিয়ে দিল। সেপাই যখন আছে তখন তার উর্দিও চাই। ছাইরঙের বা খাক্ রঙের কাপড় দিয়ে বানানো হ'ল উর্দি। ফলে—ওদের পোষাকের নামই হয়ে গেল খাখী বা খাকী। মাথায় ছাম্পো (হিন্দী) করতে গিয়ে ওরাই তৈরী করলো স্যাম্পু।

এমন উদাহরণ আছে হাজার শব্দের।

পাল্কি চড়ে মেমসাহেবরা নিজেদের 'কুইন' বলে মনে করতো বলে—ওদের কর্তারা ভারতীয় পাল্কির নামের সঙ্গে 'কুইন' জুড়ে দিয়ে করলো পালাংকুইন। তামিল 'কারি' (বাংলা তরকারি) বেশভূষা না বদলেই সাহেবী খানায় ঢুকে পড়লো। মালয়ালী ভাষার উপর টেক্কা দিয়ে সেগুন গাছের নামে ওরা টিক্ দিয়ে রাখলো। সেগুন গাছের মালয়ালী নাম টেক্কা। ভারতবর্ষ থেকেই ওরা নিয়ে গেল 'পায়জামা'।

আমরা সবাই জানি; বাঁশের ইংরাজি ব্যাম্বু চা-এর ইংরাজি টি! কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, ব্যাম্বু আসলে মালয় দেশের এবং টি হচ্ছে চীন

দেশীয়। এইভাবেই টম্যাটো আর পট্যাটো আমাদের কাছে সাহেব সেজে এলেও ওদের গাঁই গোত্র একেবারেই আলাদা। ওদের আদি বাস আমেরিকায়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে ইংরাজি ভাষায় যে সব শব্দ গৃহীত হয়েছে এবং এই গ্রহণ করার ঝোঁক এখনো যেমন প্রবল, তাতে স্বভাবতঃই এই ভাষার শব্দসম্ভার অন্য যে কোন ভাষার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি। গ্রীক এবং ল্যাটিন্ ধাতু থেকে—ওরা তৈরি ক'রে চলেছেন নতুন নতুন শব্দ। ঐ সব প্রযুক্ত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বস্তুপুঞ্জের উপর।

এই ভাবেই ওরা লুট করেছে—দুনিয়ার সব ভাষার কোষাগারে হানা দিয়ে। লুট করার কাজে লাগবে বলে 'লুট' শব্দটিকেও ওরা বন্দী করে রেখেছে। বেচারি লুট পুরোপুরি ভারতীয় লুণ্ঠন-বংশধর। ওদের বর্বরের সঙ্গে আমাদের ডাকাত-কেও রেখেছে 'ডকোয়েট' নাম দিয়ে। শেষ পর্যন্ত "ঘেরাও" করার কায়দাটা ভালো লেগেছে বলে ওকে ডেকে নিয়ে অভিধানস্থ করেছে।

সারা পৃথিবী জুড়ে এখন ইংরাজির জয়যাত্রা। ইংরাজি ভাষার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে এই,—এ ভাষা অনেক কিছুকেই আপনার ক'রে নিতে জানে। তার উদারতাই তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষার আসনে বসিয়েছে।

নির্বোধ

বার্ণিক রায়

সকালবেলার নিত্যনৈমিত্তিক কাজে সকালবেলায় অনেকটা সময় কেটে যায় রতনের। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগে থাকে, তারপর কোনোদিন ঘুম হয় কি হয় না, কিন্তু পাঁচটা নাগাদ উঠে পড়ে, কোনো বোধ হয় না, শুধু কাজ করে। কাজের মধ্যে বোধের বেদনা হারিয়ে যায়; অনুভব করতে পারে না। স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি আছে; তাও একদিন হারিয়ে যায়; সত্যি কোনো নারী আছে কিনা, অর্থাৎ যাকে নিয়ে পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের এতো কেরামতি। সেও একদিন মরে যায়। নিজেই হিটার জ্বালিয়ে চা করে, পাঁউরুটি সেঁকে, আলু ডিম সেদ্ধ করে, ডিম ছাড়ায়, আলু সেদ্ধর ওপর নুন ও গোলমরিচ ছড়িয়ে দেয়, বাচ্চাদের দাঁত মাজিয়ে খেতে দেয়, এবং ঘড়ির কাঁটা

রেখে, কতোক্ষণে সোয়া ছ'টা বাজবে, বাজলেই পোষাক পরিয়ে টেনে নিয়ে যায় স্কুলে. স্কুলে যেতে যেতে আঁচ করে নেয় তাকে বাজারে যেতে হবে। হাতে ব্যাগ থাকে। বাজার করে ফিরেই সকালের কাগজটা একটু পড়ে. তার পরেই চান করতে যায়, ঘড়ি দেখে, সাইরেন বেজে উঠে. একটা ভাজা ও কোনোরকমে মাছের তরকারি দিয়ে আলো চালের ভাত গেলে, তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে বুকে চাপ ধরে, মনে হয় মরে যাবে, চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ খাদ্যটা গলা থেকে পাকস্থলীতে যায়। যকৃতে জমতে থাকে, তারপর অফিসে গিয়ে টেনসন কে কার বিরুদ্ধে লাগছে, ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে, এমনি ভাবেই সপ্তাহ কাটে, মাস কাটে, বছর ঘুরে যায় রতনের জীবনের আয়ু এগোয় অন্ধকারের দিকে, ঘন চুল পাতলা হয়ে টাক পড়ে, সটান গালের চামড়ায় কুঞ্চন দেখা যায়। এর মধ্যে চিন্তা ভাবনা অনুভব, দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, বিদেশি শত্রু, ভিয়েতনামের যুদ্ধ, কোর্টের কেরামতি, সি-আই-এ ক্রেমলিন ইনটেলিজেন্স গ্রুপ মার্কসবাদ ফ্যাসিজম কোনো ব্যাপারই রতনকে বিব্রত করতে পারে না, ন্যাড় তো এমনিই হয়ে আছে, দেশের সংবাদপত্র ও সরকার এমনিই রতনকে নগ্ন করে দিয়েছে, শুধু মাসের শেষে বাজার করতে যাবার সময়, মুদির দোকানের বিল মেটাতে গিয়ে মনে হয়। শুধু নগ্ন নয়, নগ্ন হয়ে ক্ষেপে গিয়ে কুকুরের মতো আশে পাশের লোককে কামড়াতে ইচ্ছে হয়, তবু লোকগুলি কেমন শান্ত নির্বিকার, আর্ম চেয়ারে বসে, ইনটেলেকচুয়াল দাড়ি রেখে মার্কসের উদ্বৃত্ত মুনাফার থিওরি আওড়ায়, বৌকে বগল কাটা ও বুক খোলা ব্লাউজ পরিয়ে স্তনবৃন্ত উঁচু করে লোকের সামনে বসতে দেয়, ঘন ঘন বুক থেকে শাড়ির আঁচল খসে যায়, আর যারা কাজ করে দিনে ছ'থেকে আট টাকা মজুরি পায়, তাদের অধিকাংশই চোরের দলে নাম লিখিয়েছে, ওয়াগন ব্রেকার ও মাস্তানদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে উপরি আয় করে, খায়, দায়, মেয়ে নিয়ে ঘোরে, ভোটের সময় তৎপর হয়ে ওঠে, দু দলের কাছেই টাকা খেয়ে ফুলে ওঠে, বোম মারে, ছুরি চালায় শাসকদলের দলের হয়ে গুলি ও বোম মারলে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে নেতার ডাকে ছেড়ে দিয়ে বসোগোল্লা চা খাওয়ায়, এই তো দিন, এই দিনের অর্ধ রাত্রি, রাত্রির মানে আলোর হাহাকার, হাহাকারে চিৎকারে বন্ধ্যা সময় স্থির হয়ে হাঁ করে আছে। শীত পড়েছে, সকাল বেলা মলিদার চাদর জড়িয়ে রতন বাজারে যায়, বাচ্চারা লাল সুয়েটার মোজা জুতো পরে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটে, কুয়াশার আস্তরণে সারা

জায়গা আচ্ছাদিত, সমস্ত শহরটা কুয়াশায় ভরা, আকাশ আলো বরে গেছে ছুঁচৈরের মতো কিন্তু শব্দও কোথাও নেই হাতে তুলে নিয়ে বাজাবে, কুয়াশার অন্ধকারে পোকার মতো মানুষগুলি কিলবিল করছে চারধারে। রতনও এমনিভাবে এগোচ্ছে পোকার মতো।

পথে যেতে যেতে দু'একটি লোকের সঙ্গে কথা হয়। হাসে, মুখ বাদান করে, প্রসারিত মুখ সঙ্কুচিত হয়ে যায়, তারপর শুধুই স্থবিরতা ও জড়তা। তরকারি, মাছ, শাকসব্জি, ডাল ভাত এবং ভাতডাল সব্জি শাক মাছ তরকারি অপিস রুটিনওয়ার্ক, ঘাম ক্লান্তি ঘুম না ঘুম জাগা মুখ ধোয়া ও চা পান চান করা ভাত খাওয়া, এই এই, এই ছাড়া জীবনের কোনো মানে নেই। নয় ওষুধ খেয়ে চেতনা জাগাতে হয়, নতুবা চেতনা বা সংবেদনা মারতে হয়।

রতন একদিন অবাক হয়ে গেল বাজারে যেতে যেতে। রতনের ছেলেটাই দেখালো বস্তুটাকে, এর আগেও হয়তো দেখেছে, কিন্তু খেয়াল করে নি, কারণ বিস্ময় ও কৌতূহল নেই আর রতনের কেরানির চাকরি করে, তারপর দলাদলি, দলাদলি না করে এ যুগে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না. বাইরে পার্টি, অপিসে সহকর্মী ঘরে স্বামী স্ত্রী ছেলে[illegible] সুতরাং বিস্ময় কোথায় থাকবে। দেখলো এই শীতের সময় একটি [illegible] লোক বসে আছে খালি গায়ে. পরণে একটা চেক কাটা লুঙ্গি, মাথায় অত্যধিক ময়লা গামছা বাঁধা. মুখে কোনো দাড়ি নেই, জুলপির কাছে চুলগুলি কাঁচাপাকা বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে, ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে, বুকের পুরুষ স্তন একটু ঝোলা। উচ্চতার চেয়ে শরীরের ব্যাপ্তি বেশি, চেহারার রং কালো, মনে হয় একতাল মাটির স্তূপ বসে আছে, চোখ দুটো গোল বড়ো বড়ো, সামনে একটা ন্যাকড়া পেতে দিয়েছে, চার কোণে চারটে ভাঙা ইট দিয়ে চেপে রেখেছে, যাতে কাপড়টা উড়ে না যায়. একটা অ্যালুমিনিয়ামের ভাঙা টোল খাওয়া টোপকানো মগ, মগটাকে একটা ফুটো করে নারকোলের দড়িতে বেঁধেছে, মগের ভেতর জল, জলের মধ্যে এক খণ্ড ইট, আর একটা কাঠি. দড়িটার অনেকগুলি গিঁট, কোমরের কাছে জড়ো করানো দড়িগুলি পাকিয়ে আছে, লোকটার পাশ দিয়ে গেলে লোকটা কিছুই বলে না শুধু ঘোরের মতো দৃষ্টিতে টলটল করে তাকিয়ে থাকে, চোখ তুলে দেখে, কথা বলে না। এ হেন নিরীহ প্রাণীর ভিক্ষে জোটে না, করুণা পরবশ হয়ে দু'একটি মুদ্রা হয়তো ছুড়ে দিয়েছে সব শুদ্ধ বারো পনেরো পয়সা হবে। রতন পয়সা দেয় না, পাঁচটা পয়সা দিয়ে ওর কি

উন্নতি হবে, আর রতনও রোজ পাঁচ পয়সা করে দিতে পারে না, নিজেই ভিখিরি অন্যকে আর কি দেবে। কিন্তু এই মাটির মতো স্থূলকায় থলথলে লোকটাকে দেখবার জন্যে এখন প্রতিদিনই সকালে বাজারে যেতে রতন একটা কৌতূহল বোধ করে। কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় বসে না, আজ বসলো শুকনো খালের ওপর রাস্তার ধারে একটা গলির মোড়ে, পরের দিন বড় রাস্তার পাশে বাসের রাস্তার ওপরে পরের দিন একটা চায়ের দোকানের পাশে, এতো নিরীহ, গোবেচারী লোক আমি দেখি নি, রতন ভাবে। হঠাৎ একদিন দেখে দাড়িতে মুখ ভরে যায়, ভাইকিংদের মিশ্র নোংরার মতো কাঁচা পাকা দাড়ির সঙ্গে ময়লা জমে থাকে, হাতগুলি ফরসা। রতন একদিন ওর সামনে দাঁড়ালো, দেখলো ওকে, ওকে দেখতে পেয়েই ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দেখালো, ইঙ্গিত করলো ছড়ানো জামায় কিছু পয়সা দেয়, মুখে কোনো স্বর নেই, ধ্বনি নেই, উচ্চারণ নেই, রতন ওর সামনে দাঁড়িয়ে রইলো, ঠোঁটটা নাচালো মুখটা নাড়ালো একটু, স্থূল শরীরে দেহটা একটু কাঁপলো শুধু, রতন পয়সা দিলো না, বুঝতে পারলো রতনের কাছ থেকে পয়সা পাওয়া যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতের বুড়ো আঙুল তুলে জানালো, কিছুই না? কিন্তু কোনো কথা নেই। তারপর আপনমনে মগটার দড়ি ধরে টানলো, একটু শব্দ করে উঠলো তারপর মগটাকে আবার মাঝখানে স্থাপন করলো, এবার আপনমনেই একটু একটু নাড়লো দড়িটা, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, রতন লোকটার শরীরের চারদিক দেখছিল, পচা মোষের মতন গায়ে ময়লা, মাছি, অক্ষপোকা বসে, ওঠে না ওর শরীর থেকে মাথার চুলগুলি পড়ে গিয়ে টাক পড়েছে, আজকে আর মাথায় পাগড়ি নেই, এতো নিস্পৃহ আনন্দের বিশালতা কোথাও দেখা যায় না, বাস গাড়ি ট্যাক্সি যায়, ধুলো ওড়ে, ওকে ঢেকে ফেলে, আস্তরণ ফেলে দেয়, কিন্তু ও ঠিক মাটির মতোই স্থির, মাটিতে মাটি পড়ে পুরু হয়ে ওঠে।

লোকটা হাবা ও কালা। চোখেরও স্পর্শের বোধ আছে, এই বোধেই সে তাকায় কিন্তু ওর শরীরের স্থূলতা ওর স্পর্শবোধকে পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে। এই চোখের দেখায় জগৎকে সে জানে। রতন বুঝতে পারে না, কে ওকে খাওয়ায়, খাবার জোটে কি করে, এবং শরীরটা ওর ঠিকই আছে, ব্যাধি বা বিকার নেই, মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে আছে, প্রকৃতি ওকে প্রকৃতির সন্তানের মতো বুকে করে রেখেছে যেন, তাই রৌদ্রে শিশিরে বৃষ্টিতে সামনে তফাত নো

কাকড়া পেতে ময়লা ঘাসে শুয়ে থাকে, চোখ বুজে পৃথিবীর স্বাদ নেয়, আনন্দে কারণ ওর চেতনা নেই, প্রতিস্পর্ধী হবার ওর বাসনা নেই, বিচ্ছিন্ন নয়। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় লোকটা পুলিশের স্পাই নয়তো। কি জানি হতেও পারে, স্পাই, ভিখিরি, অচেতনতা, হত্যা ও অপরাধ একই, চেতনার মধ্যেই পাপপুণ্যের পার্থক্য। পাখির গানে পাপও নেই পুণ্যও নেই, আছে শুধু প্রকৃতি, মানুষ তাকে সৃষ্টি করেছে চেতনায়, তাই মানুষের দুঃখ তাই তার অহংকার, এই অহংকারই তাকে মৃত্যু এনেছে। লোকটার সঙ্গে প্রকৃতির কোনো যোগ নেই, লোকটাকে প্রকৃতিই টেনে নিয়েছে কোলে। না এসব কি ভাবছে রতন। এও মনের এক বিকার। শীত গড়িয়ে গ্রীপঞ্চমী আসে, বাতাসে উত্তাপ উপলব্ধি করা যায়, জড় পৃথিবী জড়িয়ে জড়িয়ে ওড়ে পৃথিবীর গায়ে রতনের জগৎও এমনি গড়িয়ে চলেছে, শুধু আয়ুর ক্ষয়, কোনো তাৎপর্য কোনো ইঙ্গিত কোনো ভবিষ্যৎ কোনো ইতিহাস নেই, তবু বেঁচে আছে, কারণ মৃত্যু হচ্ছে না, মৃত্যুর একটা কি অর্থ আছে, কি জানি, রতন ভাবে এখন গেলেই হয় শীত চলে যাবার পর প্রথম বৃষ্টিতে প্রচুর মশা জন্মে, তারপর কোথায় যায়, পৃথিবীতে প্রকৃতি অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাণ সৃষ্টি করে নষ্ট দেয়, পৃথিবীর চামড়ার ওপর কয়েকদিন সুড় সুড়ি কেটে তারপর পৃথিবীর চামড়ার ভেতরে আলো বাতাসে লুকিয়ে পড়ে, পৃথিবীর কত অসংখ্য জীব জন্মাচ্ছে মরছে, আমরা তার কোনো খোঁজ খবর জানি না, তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে রতন নামে এক প্রাণী বা কীট যদি মরে যায়, তাহলে এমন কি হবে?

না, আর এই লোকটাকে দেখবার কৌতূহল হয় না, একে দেখার প্রথম বিস্ময় কবে মরে গেছে, জড় পৃথিবীতে লোকটা জড়ের মতোই রতনের মনের কাছে লেপটে আছে, নূতন কোনো বোধ নেই। ওকে দেখে মনে হয় এটাই যেন স্বাভাবিক। এটাই হওয়া উচিত।

কথা শোনে না, কথা কইতে পারে না, স্থবির, ময়লা, নোংরা, কালো থলথলে মাটির মতো চেহারার স্থূল লোকটা নিরীহ গোবেচারীর মতো চেয়ে থাকে, এমন কি ওকে কেউ ঘৃণাও করে না, করুণা করে একটা পয়সাও ছুঁড়ে দেয় না, ও আছে, অথচ কোথাও নেই, আয়ুর অন্ধকারে আকাশের নীচে চিতার আগুনে নির্বিকার লোকটা একদিন শেষ হয়ে যাবে নিয়মে। রতনের হঠাৎ মনে হয়, ওর কাছের পৃথিবী এমনি লোকটার মতোই অসংখ্য প্রাণীর

মতো নিসর্গের সঙ্গে ময়লা হয়ে জড়িয়ে আছে, কোনো চেতনা নেই, কথা নেই, শোনে না, উচ্চারণ করে না শুধু স্থূল মাটির মতো মাটি হয়ে বসে আছে সামনের বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে বলে। এই জগতেই বাস করছে সে এখন।

দুদিন বাজারে যায়নি বৃষ্টির জন্যে। তৃতীয় দিনে বাজারে যেতে গিয়ে একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখলো সে। রাস্তায় ন্যাকড়া কুড়ুনে ডাস্টবিনে ময়লা খুঁটে খাওয়া কয়েকটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে লোকটার সামনে, একটা বাচ্চার ঠোঁট এত চওড়া ও উল্টানো যে অশ্লীলতা লেগে একটা কাঁচা মাংসের থকথকে ছবি নিয়ে আসছে, চোখটা উল্টে বেরিয়ে পড়ছে, নরক থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় মিছিলে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা নিরাকার লোকটাকে ইট মারছে, কৌতুকে, আনন্দে, নিষ্ঠুরতায়। লোকটার টাক মাথাটায় ওপর লেগে কিছুটা কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে, রক্ত গাল বেয়ে নীচে নামছে, ওর সামনে বিছানো ন্যাকড়ায় ওপর, দু একটা তপ্ত রক্ত পড়ে জমে কালো হয়ে গেছে, কিন্তু লোকটার কোনো চেত-ভেদ নেই, দেখছে, আর বুড়ো আঙুল দুটো উঁচু করছে, চোখ দুটো গোল গোল করে তাকাচ্ছে কিন্তু উঠছে না পর্যন্ত, সেই নরক বিছানো বাচ্চাটা আর একটা চাকলা মারলো, লোকটার মাথায় আঘাত করলো ঠং করে, কিন্তু কিছু বললো না, শুধু একটু রক্ত বেরিয়ে পড়লো। রতন বাচ্চাগুলিকে একটু তাড়া দিয়ে ধমকালো, ওরা হেসে দৌড়ে গেল দূরে।

নির্বোধ লোকটা নীরবে নিস্পৃহ বসেই আছে, মাথা থেকে পায়ের কাছে শুধু রক্তের ফোঁটা পড়ছে টপ টপ করে, মাটিতে মিশে যাচ্ছে, লোকটা বসেই আছে নিস্পৃহভাবে। রক্তও ওর চেতনাকে নাড়াতে পারে না।

ত্রিপুরী ফুমুগ

—জগদীশ গণচৌধুরী

বাংলাদেশের পূর্বপ্রান্তে এবং আসামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত আগেকার নৃপতি-শাসিত ত্রিপুরা বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গরাজ্য। এই ক্ষুদ্র প্রদেশটির আয়তন মাত্র ১০,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা, ১৯৭১ সালের আদমসুমারী মতে, ১৫,৫৬,৩৪২। এ রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; এছাড়া আছেন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উপজাতি।

এখানকার উপজাতিরা কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যেমন—ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং, উচই, হালাম, কুকি, লুসাই, মঘ, চাকমা প্রভৃতি। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে উপজাতদের সংস্কৃতি সরল, আর সমতলবাসী বাঙালিদের সংস্কৃতি জটিল। সরল ও জটিল এই দু'ধরণের কৃষ্টি দীর্ঘ কয়েক'শ বছর শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বাস করলে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও সংমিশ্রণ প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে। তবে সরল সংস্কৃতির উপর প্রভাব পড়ে বেশি এবং এতে পরিবর্তনটাও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। জটিল সংস্কৃতি দেয়, সরল সংস্কৃতি নেয়। এটা বিশ্বজোড়া রীতি। ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি।

ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া ও রিয়াংদের কথাভাষায় বহু সাধারণ প্রবাদ ও ধাঁধা রয়েছে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—তাঁদের ধাঁধার নমুনা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করা। তাঁদের ভাষায় ধাঁধাকে বলা হয় কুমুগ। তবে এসব ধাঁধা শুধুমাত্র গ্রাম্য ত্রিপুরীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও এগুলো বলেন। প্রতিটি ধাঁধাকে (ক) (খ) ও (গ) এই তিন অংশে ভাগ করে প্রথমাংশে ত্রিপুরীভাষায় ধাঁধাটি বলা হয়েছে, দ্বিতীয়াংশে বাংলা অনুবাদ এবং শেষাংশে সমাধান বলে দেওয়া হয়েছে।

আর দশটি ভাষায় ব্যবহৃত ধাঁধার যেসব বৈশিষ্ট্য ত্রিপুরী ধাঁধারও সেসব আছে। ধাঁধায় থাকে প্রশ্ন ও উত্তর, সমস্যা ও সমাধান। প্রশ্ন বা সমস্যাটি স্পষ্ট ও পরিষ্কার; কিন্তু উত্তর বা সমাধানটি বাহ্যিক কলেবর ও রূপক দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। আসলে যা বোঝাতে চায়, তাকে উপমা দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়। প্রশ্নকর্তা যেন গাছের পাতায় পাতায় বিচরণ করেন; উদ্দেশ্য—উত্তরদাতার মনোযোগকে দূরে বিক্ষিপ্ত ক'রে, চিন্তাকে ধাঁধিয়ে জলঘোলা করে, তাকে বোকা, আর নিজেকে চতুর বলে জাহির করা এভাবে ধাঁধা কিছু-ক্ষণের জন্য সংবেদন সৃষ্টি করে; এতে—বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা হয়, সাময়িক নির্মল আনন্দ পাওয়া যায় এবং সারাদিনের শারীরিক শ্রমজনিত কষ্টের লাঘব হয়। ধাঁধা আজও গবেষককেও ভাবিয়ে তোলে, দুর দুরান্তের কল্পলোকে বিচরণ করায় এবং কদাচ 'সমাধান' দিতে পারলে নিজেকে বড়ই চালাক ও বুদ্ধিমান বলে দাবী করার সুযোগ এনে দেয়। ধাঁধার স্রষ্টা কে বলা মুস্কিল; তবে সামগ্রিকভাবে একটি সম্প্রদায়ের বুদ্ধিদীপ্ত সরস চাতুর্যের, আকর্ষণের, পরিবেশের ও পরিবর্তনের অন্যতম সূচক হ'ল ধাঁধা।

ত্রিপুরী সমাজে বিভিন্ন সময়ে ধাঁধার চর্চা হয়। বিয়েতে, পুজোপার্বনে, যেকোন দিন সন্ধ্যেবেলা, কাজকর্মের অবসরে বা কয়েকজন মিলে দীর্ঘপথ চলার সময় ধাঁধা, গল্প, রূপকথার চর্চা করা হয়। বনজঙ্গল, পাহাড়, নদ-নদী, বন্য জন্তু প্রভৃতিই তাঁদের প্রাচীন পরিবেশের প্রধান উপাদান। এসব থেকে তাঁদের প্রবাদ ও ধাঁধার বহু উপকরণ আহৃত হয়েছে। সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের ফলে তাঁরা যতই আধুনিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে আসছেন, ততই প্রবাদ ও ধাঁধার নোতুন নোতুন উপাদান পেয়ে কাজে লাগাচ্ছেন। ফলে দেখা যায় রাজা, দেশলাই, বাতি, তালা, ঢেঁকি, কেরোসিন, মশারী, খই, মুড়ি প্রভৃতি দিয়ে ধাঁধা তৈরি করা হচ্ছে।

১। ক) অর-অ মুগ-অ,
অর-অ মুগিয়া,
থরাইলুংনি মুসা।

খ) এখানে দেখা যায়,
এখানে দেখা যায় না,
তারাবনের বাঘ।

গ) বিদ্যুত চমক।

২। ক) আ-ম পুংলাই মুসাইয়া,
মুত চাতাই দুক চাইয়া,
সেপ বাই নাই ওয়া সাইয়া,
হাসাম কুচুক কাসগিয়া

খ) বাঘের মতো শব্দ করে, কিন্তু
বাঘ নয়,
বনজঙ্গলের মতো অথচ বন
জঙ্গল না,
বাঁশের কঞ্চি ভাঙতে যেমন
শব্দ হয়, তাই হয়, কিন্তু
কঞ্চি নয়,
পাহাড়ের মতো খাড়া, তবে
পাহাড় না।

গ) তুপখাই পাখী,
ধুনা তুলো ও এলোমেলো
সুতো,
ধানক্ষেতের নাড়া,
বাঁশের বেড়া।

৩। ক) কেঙ্গুয়া গুলা তুই-অ বাঘলাই।

খ) লোকটি কুঁজো হলেও জলে
নাবে লাফ দিয়ে।

গ) বঁড়শি।

৪। ক) কপাংন কুপই চা-অ

খ) মরাকে খায় জ্যান্ত।

গ) বঁড়শির টোপ দিয়ে মাছ ধরা।

৫। ক) গলা চমরক থেপ তকইয়া।

খ) যে কলস কাঁকে নিতে অসুবিধে

গ) ডিম।

৬। ক) চারকোণা পুকুরি
আচুক তংগ চৌধুরী।

খ) চতুষ্কোণ পুকুরে
বসে আছেন চৌধুরী।

গ) পিঁড়ি।

৭। ক) চিবুক কুখই লামা হিম

খ) মরা সাপ, পথ দিয়ে চলে।

গ) গো-মানুষের দড়ি।

৮। ক) চেলাগা কাইমা কয়া কুরইন সুফাং তান।

খ) একজন কাঠুরিয়া দা/কুড়োল ছাড়াই গাছ কাটে।

গ) কাঠঠোকরা পাখী।

৯। ক) তাংগ ইয়া মুগ, নাইগাই ভুগ পাইয়া।

খ) হাত দিয়ে ধরা যায় কিন্তু চোখে দেখা যায় না।

গ) নিজের মাথা।

১০। ক) তুই কুরই ক চক।

খ) জল ছাড়াই নৌকা চলে।

গ) দোলনা।

১১। ক) তুই ককং ককং

খ) জলের ধারে বর্ষি বাওয়া।

গ) জুমে কাওন ধানের দোদুল্যমান গাছ।

১২। ক) তাখুক নইরগ, পামা সেগলাই

খ) দুই ভাই পথ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে।

গ) মানুষের দুই পা।

১৩। ক) তান খেলে পুইয়া, তান খেলাই খুইনাই।

খ) কাট্‌লে মরে না, না কাটলে মরে।

গ) সদ্যোজাত শিশুর নাভি।

১৪। ক) তুই সিচিং বিচিং, আবিমা মুখু

খ) জলের ভেতর শিশুকে ঘুম পাড়ায়।

গ) স্রোতধারার বাঁধ।

১৫। ক) তাখুকনই কান সপাই।

খ) দুই ভাই কুস্তি লড়ে।

গ) দোচালা ঘরের চাল।

১৬। ক) তাখুক চিনিরগ দগাথাওআই বুলাই।

খ) দুয়ার বন্ধ করে সাতভাই নিজেদের মধ্যেই মারামারি করে

গ) খইভাজা।

১৭ ক) তুই ককং কক; হামচাং চাকছা

খ) নদীর তীরে আগুন জ্বলে।

গ) জোনাকি পোকা।

১৮। ক) দন দস্ত লগর-অ ঝগড়-অ, জন-অ দস্ত থরণ্।

খ) খুলে নাড়ালে শব্দ হয়, বন্ধ করলে শক্ত হয়ে এঁটে যায়।

গ) তালা।

১৯। ক) নক বুরং বুরং ফকিসা মসা।

খ) প্রতি ঘরে ফকির নাচে।

গ) ঘরের চালে দোদুল্যমান ঝুল।

২০। ক) নগনি বেরে নক বুসা।

খ) ঘরের ভেতরেই ছোট ঘর।

গ) মশারী।

২১। ক) নখা গুরুম, ওয়াতই ওয়াইয়া

খ) মেঘ ডাকে, অথচ বৃষ্টি হয় না

গ) হুকো।

২২। ক) নাইচা সুকছাও, তাংছা ইয়া-সুক ইয়া।

খ) দেখা যায়, কিন্তু ধরা ছোঁয়া যায় না।

গ) আকাশ।

২৩। ক) নথা নাকাও কুপাই বির-অ।

খ আকাশে মরা পাখী উড়ে।

গ) উড্ডীয়মান ঘুড়ি।

১৪। ক) পুমালে ছির-ইয়া,

দড়িচে ছিমু।

খ) ছাগল হাঁটে না, দড়ি হাঁটে।

গ) কুমড়ো ও কুমড়োর লতা।

১৫। ক) বুমা কা বর বগ

বুমা ত বর বগ।

খ) মা যতই কাঁদে,

সন্তান ততই বলে।

গ) কর্মরত চরখা।

২৬ ক) বুফাং ফাংথা,

বুপাই থাইমা,

বুচলই লেথাই পাইয়া।

খ) গাছ তিনটি,

খোলস একটি

বীচি অগণিত।

গ) উনুন, ডেকচি ও ভাত।

২৭। ক) বার কর্ম, বার নাই

আচুক পেথা, আচুকনাই।

খ) হলুদ রং-এর ফুল,

পদ্মাসনে বসে আছে, পিঁড়ি নাই।

গ) কুমড়োফুল ও কুমড়ো।

২৮। ক) বুরইমা মানামছাওঅ,

ভাই ছয় কুড়ি ছয় জন

মছাওঅ।

খ) এক মহিলা নাচায়,

নাচে ছয় কুড়ি ছয় জন।

গ) কুলোয় তুলে ধান ঝাড়া।

২৯। ক) বুপাই আই মিলিক, বুলাই

লাই মিলিক

চাথাইলে থুরিক মুরিক।

খ) ফলগুলো সুন্দর, পাতাগুলো

চিকন,

খেলে মুখ আঁকা বাঁকা হয়।

গ) লঙ্কা।

৩০। ক) বুফাং হাংমা

বুলাই লাইমা।

খ) গাছও একটা

পাতাও একটা।

গ) হাতপাখা।

৩১। ক) বাগ খুংমা পুম পলবাইয়া।

খ) একটি বাগানে ফুল তুলে শেষ

করা যায় না।

গ) নক্ষত্রখচিত আকাশ।

৩২। ক) মাইতাং তাংমা নক কুফলং।

খ) একছড়া ধানে ঘর ভরে যায়।

গ) জ্বালানো বাতি।

৩৩ ক) মাইমুং য়াপাই তুই মাথাগিয়া

খ) হাতীর পায়ের ছাপমারা

যায়গায় জল জমে না।

গ) কচুপাতা।

৩৪। ক) রাজানি পাই ফাকিমা বাথে

চাকেন ভুঐ তাংগ।

খ) রাজার পাই একবার মাত্র

প্রসব করে মারা যায়।

গ) কলা গাছ।

৩৫। ক) রাজানি লাথা তাংগই মাইয়া।

খ) রাজার লাঠি ধরা কষ্টকর।

গ) সাপ।

৩৬। ক রাজানি কিচিপ তাংগই মাইয়া।

খ) রাজার পাখা ধরা যায় না।

গ) ভীমরুলের বাসা।

৩৭। ক) রাজানি পাকড়ী সরচিনি সরই সর্বাই লাংলিয়া।

খ) রাজার পাগড়ি ভাঁজ করতে করতে শেষ করা যায় না।

গ) দীর্ঘ পথ।

৩৮। ক) দা কুরই নকতাং

খ) দা ছাড়াই ঘর বানায়।

গ) মাকড়সার জাল।

৩৯। ক) বুমা অংথা থমথম বুমা অংথা বাপেয়েং থোয়ং।

খ) মা বসে আছে, ছেলে নাচছে

গ) ধান ভানার তামামক্সি।

৪০। ক) মুসই রাংচাক খায় রুরুক, তথা কছম নারু রুক।

খ) সোনার হরিণ যতই পালায় পেছনে কাল কাক ততই বসে

গ) জুমের টিলায় আগুনের লাল শিখা এবং পরে রাশি রাশি কাল ছাই।

শিল্প-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে লেনিন/মনীষিমোহন রায়

'শিল্পের ইতিহাস কী মনোহর। মার্কসবাদীর পক্ষে কতই না শেখবার··· শিল্পচর্চায় নিজেকে নিমগ্ন করবার সময় এবং সুযোগ আমার হ'ল না, হবে না—একথা ভেবে সত্যিই বড় দুঃখ হয়।'—এই ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর শিল্পগতপ্রাণ কোনো রসবেত্তার নয়, এ উক্তি বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরাজেয় স্রষ্টা ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিনের—শিল্পের মনোহর বিশ্বে যাঁর ছিল সজাগ ও সমর্থ দৃষ্টি। অনুপম এক পরিশীলিত চেতনায় শাণিত, অতুলনীয় এই মানুষটি অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসায় পাঠ করেছেন পুশকিন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনাবলী। আর গোর্কির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখ্যের ইতিবৃত্ত তো সর্বজনবিদিত। লেনিনের সজাগশোভন কিরণসম্পাতে গোর্কির জীবনও হয়েছিল আলোকিত, উজ্জীবিত। সাহিত্যে গোর্কির সেই অবদান শুধু রাশিয়াকেই উদ্বুদ্ধ করে নি—ভল্গা থেকে গঙ্গাবধি ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে তার দুর্জয় জোয়ার।

সেই দুর্বার জোয়ারের অশোচনীয় যৌবনচিহ্নে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে বিশ্বের সর্বহারা মানব-সংসার। লেনিনের নেতৃত্বে এক নতুন প্রাণের আলোয় স্ফূর্ত হয়েছিল একদিন রুশদেশের শৈত্যের কান্তার—তারপর অচিরেই দেশে দেশে ছড়ালো তার জ্বালাময় জ্বালাহর ইস্তাহার।

মারখাওয়া সেই, পোড়খাওয়া সব লক্ষ মানুষ বহুযুগের পরিত্রাণহীন প্রতারণা আর নিরঙ্কুশ শোষণের বন্ধনকে নির্ভয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে টকটকে লাল সূর্যের সন্ধানে ভাস্বর হয়ে উঠলো। প্রমাণিত হ'ল, সমাজতন্ত্র অপরিণামদর্শী পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থারই সুনিশ্চিত ফলশ্রুতি। পুঁজিবাদের মধ্যেই নিহিত তার ধ্বংসের মারণাস্ত্র। শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণীসংগ্রামের কঠিনকঠোর পথ ধরে অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে রক্তের অক্ষরে অনিবার্যভাবে বহন করে আনে সেই মারণাস্ত্র—কবর রচনা করে মানবতার চরমতম শত্রুর।

চিরায়ত রুশ সাহিত্যের প্রতি লেনিনের ছিল সুগভীর আকর্ষণ। ব্যক্তিগত পাঠাগারে অসংখ্য কবিতা এবং সাহিত্যগ্রন্থে লেনিন রচিত মন্তব্যগুলি সেই আনুষঙ্গিক অভিনিবেশেরই উজ্জ্বল উদাহরণ। বিপ্লবের পর এক সময় তরুণদের যখন তিনি প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের প্রিয় কবি কে?' তরুণবৃন্দ সোৎসাহে উত্তর দেয়, 'মায়াকোভস্কি'। উত্তর শুনে লেনিন সন্তুষ্ট হতে না পেরে হেসে বলেন, আমার তো মনে হয়, পুশকিন আরও ভালো'।

কবিতা এবং কবিতার কর্ম লেনিনকে আলোড়িত করেছে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত কবি অরুণ মিত্র অনূদিত লেনিন রচিত তিন শতাধিক পংক্তিবিশিষ্ট দীর্ঘ কবিতাটির (যতদূর জানা যায় এইটি তাঁর একমাত্র কবিতা) এবং অনু-বাদকের ভূমিকা থেকে কিছু অংশ প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি: 'একদিন বালটিকের তীরে বেড়াতে বেড়াতে লেনিন তাঁর সঙ্গীকে বলেন যে পার্টি জনগণের মধ্যে প্রচারকার্যের জন্যে কাব্যের ফর্মকে যথেষ্ট ব্যবহার করছে না; তাঁর দুঃখ এই যে, প্রতিদ্বন্দ্বী সোস্যাল-রেভল্যুশনারি দল এ বিষয়ে অনেক বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। কাব্য সৃষ্টি যার তার কর্ম নয়, তাঁর সঙ্গী একথা বলাতে লেনিন বলেন যে, যার এমনি লেখার হাত আছে, যথেষ্ট পরিমাণ বৈপ্লবিক সদিচ্ছা আর বুদ্ধি থাকলে সে বৈপ্লবিক কবিতাও লিখতে পারে। সঙ্গী তাঁকে চেষ্টা করে দেখতে উপদেশ দিলে তিনি একটি "কাব্য" রচনা করতে আরম্ভ করেন এবং তিন দিন বাদে পড়ে শোনান। এই দীর্ঘ কবিতায় লেনিন ১৯০১-১৯০৭ সালের বিপ্লবের একটা চিত্র দিয়েছেন যাকে তিনি বলেছেন প্রথম "বসন্ত", তারপর রূপ

দিয়েছেন প্রতিক্রিয়ায়, যাকে তিনি বলেছেন "শীত", আহ্বান দিয়েছেন মুক্তির জন্যে নতুন সংগ্রামের।' লেনিন রচিত উক্ত কবিতার কিছু অংশ :

বসন্তকে বরফের শিকলে বেঁধে
শীত-জল্লাদ অকালে মারলো তাকে।
কাদার ছোপের মতো এখানে ওখানে দেখা যায়
তুষার কবরে শোয়া শোচনীয় গ্রামগুলির
ছোট ছোট কালো গির্জাচূড়া।

অপর কিছু অংশ : –

আমাদের উপর নেমে এল উজ্জ্বল সুন্দর বসন্ত,
ম্রিয়মান দুর্গত দেশে স্বর্গের উপহারের মতো,
জীবনের অগ্রদূতের মতো, সেই লাল বসন্ত !

* * *

ঝকঝকে লাল সূর্য তার রশ্মির তলোয়ারে
ফেড়ে ফেললো মেঘ, ছিঁড়ে গেল কুয়াশার শবাচ্ছাদন।

* * *

নিদ্রিত মানুষকে আকর্ষন করলো সে আলোকের দিকে।

* * *

নদীর মতো প্রবাহিত হল জনতা
যেমন করে বসন্তে জেগে ওঠে জলস্রোত।

বেটোফেনের সঙ্গীতের প্রতি অপরিসীম অনুরাগের কথা উল্লেখ করে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী লিখেছেন, 'বেটোফেনের সিম্ফনি শোনবার সময় লেনিনের ভাবান্তর দেখে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে যাই। · লেনিনকে দেখা যেত সদা কর্মব্যস্ত ··কিন্তু বেটোফেনের সঙ্গীত আসরে লেনিন যেন বসেছিলেন নিস্পন্দ···সেই অপূর্ব সুরসৃষ্টির মধ্যে নিজেকে তিনি একেবারে সঁপে দিয়েছিলেন।'

বিপ্লবের পর লেনিনের নির্দেশানুসারে সর্বপ্রথম উচ্চতর সঙ্গীত শিক্ষাকে সর্বস্তরের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে একই সারিতে স্থান দেওয়া হয়। যদিও লেনিন তথাকথিত সংস্কৃতিবিশারদ ছিলেন না এবং পল্লবগ্রাহিতা যেহেতু ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ সেহেতু, শিল্পসংস্কৃতি সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ভাষ্য তিনি রচনা করে যান নি —কেননা, সদাসক্রিয় কর্মময় জীবনে সে সময় বা সুযোগ তাঁর ছিল না। তথাপি, লেনিনের পত্নী ও অন্তরঙ্গ সহযোগিনী ক্রুপস্কায়ার (যিনি ছিলেন

বিশিষ্ট রাষ্ট্রকর্মী, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রাচীন সদস্য ও বিখ্যাত শিক্ষাবিদ) বিবরণে জানা যায়, লেনিন চিরায়ত সাহিত্যের শুধু একজন নিবিষ্ট পাঠকই ছিলেন না, ছিলেন তার রসবেত্তা সমালোচক। পুশকিন, তুর্গেনেভ, লের্মন্তভ, নেক্রাসভ, চেনিশেভস্কি, তলস্তয়, চেকভ্, উসপেনস্কির থেকে গ্যেটে, হাইনে, গোর্কি এবং দেশ-বিদেশের আরো অনেকে ছিলেন তাঁর হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত।

সঙ্গীতের সুদূরপ্রসারী প্রণোদনা তাঁকে খুবই উদ্দীপ্ত করেছে এবং নিভৃত গৃহকোণে সঙ্গীতের কলি নিজকণ্ঠে গেয়েছেন বহুবার। সাইবেরিয়ায় নির্বাসনকালে লেনিনকণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি প্রায়শই মুখর করে তুলতো নিকেতন। ক্রুপস্কায়া লিখেছেন, 'গানের কথাগুলি তাঁর কণ্ঠে কী ভাবে বেজে উঠতো তা না শুনলে বোঝানো মুসকিল।'

তলস্তয়ের 'জীবন্ত শব' নাটকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন লেনিন; আবার কোনো কোনো নাটকের 'অকিঞ্চিৎকরত্ব বা অভিনয়ের অবাস্তবতায়' বিরক্ত হয়ে উঠতেন। যথার্থ রসবেত্তার মতোই অহেতুকী নাটুকেপনা বা মেলোড্রামাপূর্ণ দৃশ্যের শিথিল উপস্থাপনায় হাঁপিয়ে উঠতেন লেনিন। পক্ষান্তরে, সঠিক শিল্পগুণ সমন্বিত নাটকাভিনয় দেখে যথাসময়ে সোল্লাসে বলে উঠতেন, 'বেশ উৎরেছে'।

বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও শিক্ষার জনকমিশার (যিনি শিল্প-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে নানা প্রবন্ধের রচয়িতা) লুনাচারস্কির 'লেনিন স্মৃতি'তে সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে লেনিনের পর্যালোচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, 'সিনেমার প্রতি ভ্লাদিমির ইলিচ যে অসীম আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তা সবাই জানে।'

ক্লারা সেৎকিনের (জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মকর্তী ও জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) উক্তি প্রসঙ্গত বিশেষভাবে স্মরণীয়, 'জনগণকে যিনি দেখতেন মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই লেনিন স্বভাবতঃই জনগণের বহুমুখী সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এটাকে তিনি মনে করতেন বিপ্লবের সর্বোত্তম সুকৃতি এবং কমিউনিজম রূপায়ণের নিশ্চিত গ্যারান্টি বলে।'

মানবজীবনের সর্বাঙ্গিন বিকাশে শিল্পসৃষ্টির অমোঘ ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে 'What is to be done' গ্রন্থে লেনিন তাঁর স্বকীয় অভিমত

খুব স্পষ্ট করেই তুলে ধরেছেন, 'কখনো কখনো মানুষ যদি ঘটনাকে মনে মনে অনেক আগে থেকে এক সার্বিক চিত্র হিসেবে দেখতে না পেতো, তার মানসিক প্রতিরূপটি যদি আগেই কল্পনায় না আনতে পারতো; তবে আমি ভাবতেই পারি না কোন শক্তি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতো তার সাহিত্য, শিল্প এবং বিজ্ঞান।'

বিপ্লবের পর লেনিন স্বাক্ষরিত প্রথম নির্দেশনামায় সুস্পষ্ট অক্ষরে লেখা ছিল, 'শিল্পকলাকে অতি অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জন্য সংগ্রাম করতে হবে, ...কিন্তু শৈল্পিক মূল্যকে লঙ্ঘন করে নয়।' মানব ইতিহাসের এই মনোহর বিশ্ব যেন সতত শ্রমজীবী সাধারণ নরনারীর বাস্তব স্বার্থ ও মানবীয় ধ্যানধারণায় সঞ্জীবিত থাকে। তাতে কল্পনা থাকবে, কিন্তু অসার অলস কাল্পনিকতার অলীক স্বর্গে যেন তার অধিষ্ঠান না হয়। তাই শিল্পকে জনগণের অন্তরের কাছাকাছি পৌঁছেই যুগপৎ শিল্প-সাহিত্য ও জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়ন সম্ভব হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে শিল্পীদের অগ্রণী এবং সক্রিয় হতে হবে। সংগ্রামসংকুল সাহসিকতা ও পৌরুষদৃপ্ত বৈপ্লবিক সত্ত্বাকে রাখতে হবে সচেতন, সদাজাগ্রত। কোনো আপোষকামী সুবিধাবাদ অথবা হতাশাক্লিষ্ট জীবনবিমুখী হতঃশ্বাস যেন সাহিত্য-শিল্পের ত্রিসীমানায় প্রবেশাধিকার না পায়। তাই শিল্পীর অপরিহার্য মহত্ব কোথায় নিহিত—সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন ঘোষণা করেছেন, 'An artist truly great must have reflected in his work at least some essential aspects of revolution.—বলা বাহুল্য এই aspects of revolution শুধু রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমিত থাকবে না—মানব-জীবনের সার্বিক পরিপ্রেক্ষিতে এর সঠিক প্রতিফলন প্রয়োজন। লেনিনের কথায় 'Art belongs to the people. Its roots should be deeply implanted in the very thick of the labouring masses . It must unite and elevate their feelings, thoughts and will. It must stir to activity and develop the art instincts within them. (On art and literature : V. I. Lenin). আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব সর্বোন্নত শিল্পকলা। কারণ—'There can be no real and effective "freedom" in a society based on the power of money, in a society in which the masses of working people live in proverty and the handful of rich live like parasites.... The freedom of the bourgeois writer, artist or actress is

simply masked (or hypocritically masked) dependence on the money-bag, on corruption, on prostitution.'.. It will be a free literature, because the idea of socialism and sympathy with the working people, and not greed or careerism, will bring ever new forces to its ranks'

শিল্প হ'ল জনগণের সম্পত্তি। পাবলো নেরুদার কথায়, 'কবিতাকে রুটির মতো সবাই মিলে ভাগ করে খেতে হবে।' শুধু কবিতা নয়, সকল শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। শিল্প কখনোই মুষ্টিমেয় পরশ্রমজীবীর শখের সম্পত্তি নয়। শিল্প বা সংস্কৃতি সমাজের আত্মিক শক্তিকেই বলদান করে। ছিন্নমূল ভাববিলাসের মতোই সারবস্তাহীন শিল্পগুণবিবর্জিত কোন বস্তুকে আবার যথার্থ শিল্পকর্ম হিসেবে গণ্য করাও বিভ্রান্তিকর। শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ এবং সম্পূর্ণ করবার জন্ম প্রাচীন শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্বের ইতিবাচক সারাংশ সুনির্বাচিতভাবে পরিগ্রহণ করতে হবে। পরিগ্রহণ করতে হবে ধ্রুপদী সাহিত্য-শিল্পের অমূল্য অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ 'মানবতার মুহূর্তে'র (মার্কস কথিত) অবিস্মরণীয় নিদর্শনগুলিকে এবং আয়ত্ত করতে হবে তার কলাকৌশলগত আঙ্গিক-প্রকরণ। আবার আঙ্গিককৌশলের উদ্ভট ও অপ্রয়োজনীয় বাগাড়ম্বরকেও বর্জন করে শিল্প-শরীরকে শাণিত করতে হবে মেদবিহীন চিক্কনতায়। কেননা, শিল্পকলা প্রহেলিকাপূর্ণ 'স্ফিংক্স্' জাতীয় কোন রহস্য নয়; তা হ'ল সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিরাট একটি আত্মিক শক্তি। শিল্প হচ্ছে, বাস্তবতার যে গুরুত্বময় ও জীবন্ত রূপগুলি সোজাসুজি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে তারই জনগ্ম প্রতিচ্ছবি। গণচেতনায় তা জাগিয়ে তোলে মহৎ ভাবাবেগ। তাদের সুশৃঙ্খল শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তোলে। জীবনের নঙর্থক ও অগণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে সমাজের ঘৃণা অত্যন্ত প্রখরভাবে প্রকাশ করে; সদর্থক আনন্দ আরো তীব্রভাবে অনুভব করতে সমাজকে সক্ষম করে তোলে।

লেনিন বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির শত্রু কিন্তু হবে অসাধারণ প্রবল। সে হয়ে উঠবে 'পাঁচালো, চতুর, নাছোড়বান্দা।' অনেক কিছুকেই হয়তো মনে হবে নির্দোষ, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে ধরা পড়বে— শিল্পী হয়তো নিজেও পুরোপুরি সজাগ নন প্রগতিবাদীর-বিরোধী ঠিক 'এক ঝলক চ্যাটচেটে, দুর্গন্ধী, শ্বাসরোধকারী গ্যাস।' সে ক্ষেত্রে প্রচণ্ডভাবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। শুধু তৎপরতার সঙ্গে পরিত্যক্ত নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ

সুস্পষ্টভাবেও প্রয়োজন। সঠিকভাবে জানতে হবে, কাকে সমর্থন করতে হবে, কাকে সংশোধন করতে হবে এবং যথাসময়ে তিরস্কার করতে হবে কাকে।

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে লেনিনের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হ'ল, জাতীয় সংস্কৃতির ধ্বনিকে কেন্দ্র করে। লেনিনের মতে, 'জাতীয় সংস্কৃতির ধ্বনি হ'ল একটি বুর্জোয়া জোচ্চুরী।' প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বহুমুখী উপাদান। প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে শোষিত জনগণ—আর তাদের জীবনযাপনের অবস্থানেই অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ। অথচ এই সঙ্গে প্রতিটি জাতির মধ্যেই একটা বুর্জোয়া সংস্কৃতি আছে অধিপতি সংস্কৃতি হিসেবে। তাই জাতীয় সংস্কৃতি হ'ল আসলে জমিদার, যাজক ও বুর্জোয়াদের সংস্কৃতি লেনিন বলেছেন, 'আমাদের ধ্বনি গণতন্ত্রের এবং বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি।' আর এই ধ্বনি সামনে রেখে প্রত্যেকটি জাতির সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করতে হবে শুধু তার গণতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহ—যা নিঃসন্দেহেই জাতির বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে।

শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধু বিশেষ একটি জাতি নয় সমগ্র মানবসমাজ অতীতে যা কিছু অর্জন করেছে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে না শেখালে ইতিহাস অসতর্ক ও নৈরাজ্যবাদকে কোনোদিনই ক্ষমা করবে না এবং বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার যা কিছু সর্বাধুনিক তার যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ থেকেও সমাজকে বঞ্চিত করবে। তাই চিরায়ত সাহিত্যের প্রতি ছিল লেনিনের সুগভীর আকর্ষণ। সেইজন্যই তিনি একদা আলোচনাকালে মায়াকোভস্কিঅপেক্ষা পুশকিনের প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

১৯৩০ সালে রাশিয়ার বৈদেশিক সমিতির চেয়ারম্যান এফ্ পেত্রোফের বিবরণে জানা যায় লেনিন রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রসস্রষ্টাদের অন্যতম বলে মনে করতেন। গভীর মনোসংযোগে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন ভিন্ন রচনা পাঠ করেছেন এবং গোর্কি প্রমুখ মহান লেখকদের সেইসব রচনাসমষ্টি পাঠ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'পার্সোনালিটি', 'ন্যাশনালিজম্', 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস এবং বিভিন্ন নাটক ও কবিতাবলীর একটি সংকলন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রচিত 'এক্স ওরিয়েন্তে লুক্স' (প্রাচ্যের আলোকরশ্মি) নামে একটি গ্রন্থ লেনিন তাঁর নিজস্ব পাঠাগারের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের

শিক্ষাদর্শন সম্পর্কেও ছিল তাঁর অপরিসীম অনুসন্ধিৎসা।

লুনাচারস্কির 'লেনিন স্মৃতি'তে বা ক্লারা সেৎকিনের বিবরণে সংস্কৃতি প্রসঙ্গে লেনিনের ভূমিকায় যে গুরুত্বপূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সংস্কৃতিপ্রশ্নে তিনি তড়িঘড়ি করে ঢালাওভাবে কোনো ছাঁচে-ঢালা পথ অনুসরণের পুরোপুরি বিপক্ষে ছিলেন। ঘূর্ণিতমস্তক দ্রুততায় রাতারাতি এ ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত পরিণতিতে উপনীত হওয়ার বিপজ্জনক হটকারিতা থেকে বিরত হয়ে, সৃজনশীল শ্রম ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় শাণিত এবং যুক্তিগ্রাহ্যভাবে পরীক্ষিত ও সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধ, তাকেই শুধু গ্রহণ করতে হবে। বাক্যবাগীশদের লেনিন বিদ্রূপ করেছেন, যারা ভাবতো পিস্তল থেকে মুহূর্তেই প্রলেতারীয় সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলা যায়, যার অ আ ক খ থেকে ইঞ্জিন-কামান পর্যন্ত কিছুই আগের মতো হবে না। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে তাদের সংস্কৃতির ফলশ্রুতি আত্মস্থ করবার জন্য অগ্রণী কর্মীদের শীর মস্তিষ্ক তাই যুগপৎ পরিগ্রহণ ও পরিবর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

আজ দেশের অভ্যন্তরে এক ভয়ানক পরিচর্যার আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে পুষ্ট আত্মঘাতী অপসংস্কৃতি আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত। যদিও সমাজব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি ও চরিত্রের ওপরই অপসংস্কৃতির এই কুৎসিত প্রবাহের গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কেননা, পুঁজিবাদী সমাজে মুনাফার উদগ্রবাসনা চরিতার্থের প্রয়োজনেই মানবিক বোধগুলি ক্রমে শোচনীয়ভাবে বাণিজ্যের লেনদেনের বিষয় হয়ে ওঠে এবং শিল্পীর স্বাধীনতা পর্যবসিত হয় শোচনীয় এক হাস্যকর ভণ্ডামীতে। তবু সর্বোত্তম সমাজব্যবস্থা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কঠিনকঠোর লড়াইয়ের পাশাপাশি সুনিপুণ সতর্কতা ও সঠিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সর্বহারা মানবসংসারের সেই অসামান্য বিশ্ববিজয়ের মহান স্রষ্টার সংগ্রাম শাণিত জীবনের এই আলোকিত অংশের প্রতি আজ আমাদের দৃষ্টিকে তাই বিশেষভাবে নিবদ্ধ রাখতে হবে। কারণ লেনিন শুধু বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরাজেয় স্রষ্টাই নন - তিনি আধুনিক পৃথিবীর সুষ্ঠু ও সুস্থ জীবনমুখী সাংস্কৃতিক চেতনারও একজন সঠিক উদ্গাতা। তাঁর কাছে পাঠ না নিলে আমাদের মনন ও চেতনার সূক্ষ্মতর স্তরগুলিও থেকে যাবে অসংস্কৃত, অনালোকিত।

॥ গড়িয়ার গান—মুর্শিদাবাদ ॥

—পুলকেন্দু সিংহ

বোলান বা জারি গান মুর্শিদাবাদের জনসমষ্টির সংগে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এছাড়াও আরো কিছু অপ্রধান লোক-গীতি ও ছড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে যার সঙ্গে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর জনসমাজের ততখানি নিবিড় সম্পর্ক হয়তো নাই, কিন্তু এই জেলার অঞ্চল বা নির্দিষ্ট এলাকার সঙ্গে যেসব লোক-সঙ্গীত বা ছড়া কিংবা লোক-সংস্কৃতির বিশেষ একাত্মতা আছে, তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখ্য হচ্ছে আলোচ্য 'গড়িয়ার গান'।

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার প্রাচীন গ্রাম হিলোড়ার তরুণ সাহিত্যসেবী শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ-এর সহায়তায় ঐ গ্রাম থেকে গড়িয়ার গান সম্পর্কে বিচিত্রতর ও চমকপ্রদ তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়েছে। গড়িয়ার গানের মধ্য দিয়ে গ্রাম-মুর্শিদাবাদের অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে এখনো আদিম বিশ্বাস ও ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়াদির যে কতখানি প্রভাব আছে তা জানা যাবে। এখানকার লোকসমাজে যে আদিবাসী প্রভাব (অষ্ট্রিক ইত্যাদি) কতখানি সক্রিয় এসব আলোচনার মধ্যে তার পরিচয় মিলবে। এবং সমাজতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান উদাহরণ (যা প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে প্রাপ্য) হিসেবে অবশ্যই গণ্য হবে।

গড়িয়া পুজা গ্রামাঞ্চলে আশ্বিন মাসে জিতাষ্টমীর সময় হয়ে থাকে। এই পুজার প্রচলন হয় সাঁওতালীদের দ্বারা। ক্রমে এটা হরিজন ও তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই পুজোর কারণ হিসেবে জানা যায় যে—অপদেবতাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা এই পুজো করে থাকে। এর ফলে অপদেবতা গ্রামের লোকের কোন ক্ষতি করতে পারে না। মানুষ মারা গেলে তাদের মৃত আত্মাদের পুজার নিমিত্ত এই গড়িয়া পুজা।

এই পুজো যেখানে হয় সেখানে একটা বেদী তৈরী করা হয়। বেদির পাশে একটি নিমগাছ থাকে—অর্থাৎ নিমগাছের নিচে বেদি তৈরী হয়। বেদির নিচে থাকে সাতটি মরার মাথা। হনুমানের বাচ্চা হলে পরে তার যে ফুল পড়ে সেই ফুলকে লুকিয়ে নেওয়া হয়। এবং সেই ফুল যেখানে পুজারী বসে সেখানকার মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়। এবং সেখানে হাতিশুড়া গাছ, ফুল গাছ,

দুর্গাঝাপ গাছ, কালীঝোপ গাছ, একখণ্ড সিঁদুর, হলুদ, তামার পয়সা দু'টি, হরিতকী ৮টা, মাটির নিচে গর্ত করে রেখে দিতে হয়। এ'ছাড়া আসনের কাছে রাখতে হয় ছটপটির গাছ। নিম গাছে শাপলা ফুল এবং পদ্ম-ফুল ঝুলিয়ে রাখতে হয়। ফুলগুলি লাল রঙের হয়। এবং সবকটি ফুল জন্মায় জলে। ফুল ঝুলিয়ে রাখার কারণ জলের তলে 'কিচ্‌নি' নামে যে অপদেবতা থাকে তাদের খুশি করতে এই ফুল ঝোলানো হয়। যেন কিচ্‌নিরা গাছে ঝুলে আছে! ঐ ফুলে পুজারী মন্ত্র পড়ে দিলে তখন সেই ফুল কেউ তাবিজ করে নেয়। কেউ বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখে কেউবা চিবিয়ে খায়, যাতে অপদেবতা তাদের উপর ভর করতে না পারে, তাঁদের কোন ক্ষতি করতে না পারে। স্ত্রীরোগে ঐ ফুল বেশ কাজ দেয়।

ধূপ-ধুনো সহকারে পুজোয় বসে পুজারী বা পুরোহিত। এই পুরোহিত হচ্ছেন হরিজন। ৫ মিনিট মত সময় তিনি ধ্যানস্থ থাকেন। ইতিমধ্যে একে একে ভক্তবৃন্দের সমাগম হতে থাকে। পুরোহিত গান আরম্ভ করেন। ঢোল ও করতাল বাজে। ঐ সময়কার গান :—

হিমসাগর তেল মায়ের কেশে কোকিল আলতা হাতে
মায়ের দুহাতে দুখানা পত্র মনোরঞ্জিত নাচিতে আসে
এস এস মা! এই শ্মশান ঘাটে—
মা নাচ করিতে করিতে আসে।

এরপর দেখা যায় বেদির পাশে উপবিষ্ট ভক্তবৃন্দের মাথা দুলতে থাকে। মা তখন তাদের মাথায় 'ভর' করেন। ক্রমশ মাথার দোলা জোর হয়। অবশেষে তারা লাফালাফি শুরু করে দেয়—মাথা দোলায়। তখন পুজারী আবার গান শুরু করে দেয়—

গড়িয়ামায়ের পুজো দেবরে।
মায়ের আসন টলেরে।
টলে সিংহাসন।
গড়িয়ামায়ের পুজো দেবরে।
কার স্বপ্নেতে বন্দি আছে মা আসি দাও দরশন রে
মায়ের পুজো দেব, সন্ধ্যা দেব, বাতি দেবরে।
এই শ্মশান ঘাটেরে।

এই গান চলতে চলতে যদি হঠাৎ সকলে ঝিমিয়ে পড়ে তাহলে জানতে

হবে—কেউ বন্দ করেছে, মাকে আসতে দিচ্ছে না -তখন পুজারী "হট্‌ বরাবর ইট্‌" বলে হুংকার দেন আর পুনরায় গান শুরু করেন—

তারা মা ভবানি, কার কাছেতে হলে, মা বন্দীগো
পাষাণ হইয়া কি আছো মাগো ?
খোল খোল মা দুয়ার দেখিগো !
যে জন কালী বলে তাকে তার কোন বিপদ থাকে গো ?
দলপিপি কি হতে পারে কৃষ্ণের বাঁশীগো
খোল-খোল মা দুয়ার খোল গো !

দলপিপি অর্থ—পানকৌড়ি, এখানে মন্দকারী ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে উক্ত কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর দেখা যায় পুজারী সমেত সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। এর অর্থ সমস্ত অপদেবতা তাদের উপর ভর করেছে। কিছুক্ষণ নাচার পর সকলে বেদির উপর রক্ষিত কুশ গাছের তৈরী মোটা চাবুক একটি করে হাতে তুলে নেয়। পরস্পর পরস্পরকে চাবুক দিয়ে মারামারি শুরু করে দেয়। চাবুকের আঘাতে হাত, পা, পিঠ ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরে পড়ে। তবুও চলে নৃত্যসহ এই আদিম ও বীভৎস উন্মাদতা। তারপর একজন দাঁড়িয়ে মা কালীর ভঙ্গিতে চিৎকার করে ওঠে "হট বর হট বর"। পুজারী বুঝতে পারেন গড়িয়া মা এবার চলে যাবেন। তখন তিনি একটি পাত্রে মণ্ডা, পাঁঠার রক্ত, চিনি রেখে দেন নৃত্যরত সকলের সামনে। জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে ? কোথায় থাক ? "ওরে আমি…নিমগাছে থাকি।" ইত্যাদি। তুমি কি খাবে ?—'আমি রক্ত খাব'—উত্তর হবে।

এরপর একবাটি সদ্যকাটা পাঁঠার রক্ত তাকে দেওয়া হয়—সে তখন চুমুক মেরে রক্ত খেয়ে ফেলে। এইভাবে কেউ খায় মণ্ডা, কেউ খায় চিনি, কেউবা ধুপের ধোঁয়া। সকলের খাওয়ার শেষে গড়িয়া মাকে বিদায় দিতে হয়। আরম্ভ হয় গান :— যাচ্ছ মা কাঁপায়ে হিয়া

মা, বাঁয়ের চরণ আগে দিয়া,
রক্ষা করো মা তুমি আসিয়া
তোর সন্তান মা কাঁদে আজি
রক্ষা কর মা দিবানিশি
রক্ষা কর মা রক্ষা কালী।

প্রধান পুরোহিত জোরে জোরে বলে ওঠে—রাম, রাম, রাম, তখন সকলে আস্তে আস্তে বসে পড়ে। অর্থাৎ অপদেবতা পালায়।

এইভাবে সাতদিন পুজোর পর ঘট পুষ্করিণীতে ফেলা হয়। অপদেবতা দূর হয়ে গ্রামের মঙ্গল হয়।

স্মৃতি সত্তা স্বপ্ন

হীরালাল দাশগুপ্ত

তাহোলে কি রোমাঞ্চিত আমার অতীত আর
স্বপ্নসন্ধিক্ষণকম্প্র এই বর্তমান
যুগ যুগ আবর্তিত বিন্দুতে বিন্দুতে
অন্তঃশিল্প জন্ম মৃত্যু মূঢ় চেতনার
বর্ণহীন বাঞ্জনার ক্লান্তিকর ধারাবাহিকতা ?

তাহোলে কি
এই বস্তুগতিস্বচ্ছন্দের লাবণ্যযোজনা
শূন্যের ঢেউয়ে ঢেউয়ে শূন্যে মিশে যাবে ?
দেয়ালে টাঙানো এই সাদাকালো আলোছায়া
স্বপ্নশিশিরভেজা পলাতকা ক্ষণিকার ছবি,
সবুজের ঘনগন্ধমত্ত অন্ধকারে
শব্দহীন পায়ের আওয়াজ,
বেড়ালের অগ্নিচোখে সময়ের শিকার সন্ধান,
প্রাণপিপাসায় এই প্রতিদিন প্রাণান্ত প্রবাহ,
এ কি শুধু ছায়াদের ছায়ায় মিছিল ?

সময়ের ঘূর্ণমান সংকেতে সংকেতে
আমার সত্তাবীজে অগণিত আরক্তিম প্রাণ
হবে নাকি প্রলয়ের অগ্নিজবা স্ফোটন উন্মুখ ?
এই প্রেম শান্তি সাম্য স্বাধীনতা স্বপ্নইন্দ্রজাল ?
ভূগোলের বল্মকে ইতিহাস মত্তবিহ্বলতা
আলেয়ার বৃত্তপথে কবন্ধের অন্ধ চঙ্ক্রমণ ?

তাহোলে কি
মিথ্যা এই অরণ্যের সবুজ পিপাসা,
আকাশের সাথে নিত্য সমুদ্রের সিক্ত অভিসার,
নক্ষত্রের নীলসুরে শিশিরের গান ?

স্মৃতি সত্তা স্বপ্নের কল্পনার ছায়াপথে পথে
মায়াবিনী বেদেনীর বিচিত্র সাপের খেলা।
সময়ের উদ্বন্ধনে
সময়ের অপমৃত্যু
শরীরের এলোমেলো গূঢ়তম গোপনে গোপনে !

বকখালি

সুধীর নন্দী

কী নীল আকাশ
তারার চুমকি বসানো ;
অফুরন্ত শান্তি।
সমুদ্রের বুক থেকে মন্থর প্রশ্বাস—
ঝিরঝিরে বাতাস
ঝাউপাতার ফাঁক দিয়ে
এসে আলতো ছুঁয়ে গেল
আমার আঙ্গিকে ;
পশ্চিম আকাশের
ডুবে যাওয়া সূর্যের আলোর রং মাখা
তার সর্বাঙ্গে।

কেমন একটা অদ্ভুত সুগন্ধ।
সমুদ্র ডাকছে ;
কেমন যেন একটা স্তিমিত
চাপা কণ্ঠের আহ্বান।

উৎকর্ণ হ'য়ে আছি
সেই মেঘমন্দ্রিত আহ্বান কখন আসবে
ঝাউবনের ওপার থেকে
বালিয়াড়ির ঝরকা রন্ধ্রপথে !

সমুদ্রের সেই ডাক
পাকদণ্ড শব্দ নির্ঘোষে
কৈ শুনলেম না ত
বায়ুকন্যাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ।

সমুদ্র বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে
বকখালির আকাশের নিচে
নিঃঝুম পরিমণ্ডলে
শুধু ঘুম আর ঘুম ;
তুমি, আমি সবাই
নিদ্রিত, অচৈতন্য ।

এই ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যে কখন জাগবে
কে জানে ?

সবাই থেমে আছি

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

সবাই থেমে আছি তাই মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ
মাঝে মাঝে চমকে দেবার মত কথাবার্তা
খোশগল্পে বিভোর সকলে
সকালের কাগজ কিংবা সপ্তাহের পত্রিকায় কিংবা
মাসান্তিক চিত্রিত সংখ্যায়

যে যেখানে আছি সবাই এক একটি আমলাগোষ্ঠী
নিজেদের স্বেচ্ছাচারী আইনকানুন কিংবা সুযোগসুবিধা নিয়ে
এক একটি দুর্গে অধিষ্ঠিত

মারাঠাশক্তির সেই টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন স্বদেশ
পরস্পর চিনি হাত বাড়াই ঢাকঢোল বাজাতে
কিন্তু মিশি না আদৌ, মিশে যাই না

রক্তের ভিতরে কোন শব্দও শুনি না
শুধু এ ওর গায়ের ওপর হেলে পড়ে সার্কাস দেখাই
আসলে আমরা সবাই থেমে আছি
তাই দ্রুত যেতে গিয়ে উল্টে যাচ্ছে গাড়ি
ফুটপাথে উঠে যাচ্ছে ট্যাক্‌…
ভারতবর্ষ, তুমি কি ঘুমোচ্ছ
তুমি থেমে আছো ভাবতে কার ভাল লাগে
থামলেই আগুন জ্বলে, রক্ত ঝরে যায়।

এসো

কবিরুল ইসলাম

এসো প্রতিমুহূর্তে নিজেকে প্রতিপক্ষ করি।

এসো হে আমার সহযোদ্ধা
যুদ্ধ দাও
জেনো আমি প্রস্তুত।

এসো প্রতিমুহূর্তে এই মৃত্যু
আর আপোষ আর অসম্মান থেকে উদ্ধার করো
মৃত্যু বড়ই তুচ্ছ, কিন্তু এই প্রয়োজনহীন টিঁকে-থাকা
নপুংসক।

এসো হে শববাহকবৃন্দ
এই দীর্ঘ শবযাত্রাকে ফিরিয়ে দাও
এসো
পূর্বদিকে মুখ ফেরাই।

এসো প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রস্তুত করি।

রাহুমুক্তির দিন

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

অথচ গ্রহণ নয়, তবু সূর্য কালো হয়ে আসে।

দু'দিকের গাছপালায় মড়ার খুলির মতো ভুক্কা ফুটে ওঠে,
রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই পাশে ঝোলে স্মৃতির কঙ্কাল,
মহাশূন্য ঝলসে যায় চমকে-ওঠা হাড়ের সংকটে।

নির্বাচিত পঙ্গপাল নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ফসলের রস চুষে খায়,
সমস্ত বিকেল জুড়ে গোপনে গোপনে বেলা যায়,
তখনি সে আসে, তার বাঁ-হাতে বাঁকানো তলোয়ার,
সূর্য টুকরো টুকরো ক'রে কৃষ্ণপক্ষ আকাশে ছড়ায়।

নানা রূপে তাকে দেখি, কখনো স্টেশনে, ফেরিঘাটে,
বাঁ পাশে ঝোলানো ব্যাগে বাঁশীগুলি উঁচু হয়ে থাকে,
হাত-পা বাঁধা আদালতে হাসিমুখে শেকল বাজায়,
কখনো মিছিলে, জেলে, কখনো সে পুলিশ নাচায়।

দেখি, আর রাস্তাঘাটে টলমল রক্তের কলস
হঠাৎ ফাটিয়ে দিয়ে সেই ছেলে অন্ধকারে হাসে,
ভাসে মৌন ডালপালা, মৌসুমীঅঞ্চল ভরা প্রতিটি সকালে
সূর্যের ঢাকনা খুলে সব রোদ নিচু করে ঢালে।

যদিও গ্রহণ নয়, ভারতীয় সূর্য তবু অন্ধকারে ঢাকা,
পাহাড় পেরিয়ে নদী, নদীর পাঁজরে দোলে আধখানা চাঁদের পতাকা,
খেতখামার কারখানায় তার গল্প বলাবলি হয়,
ভাঙা কেরাণির ছেলে খরস্রোতে বিশাল বিস্ময়,
কিছু দেশদ্রোহী লোক রাষ্ট্রদ্রোহী ব'লে তাকে কাগজে ছাপায়
সে যখন কথা বলে অন্ধকারে কাঁপে গ্রাম, শব্দগুলি প্রান্তর কাঁপায়।

যতদূর চ'লে যাই, দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাসে লক্ষ লক্ষ কৃষক-কঙ্কাল,
স্মৃতিতে মশাল জ্বলে, জ্বলে রক্ত, জ্ব'লে যায় চিন্তার চিতায়।

তোর কপালে দুঃখ আছে

ফজল-এ-খোদা

মা বলতেন—
'খোকা তুই বড় বেশী কথা বলিস
তোর কপালে দুঃখ আছে !'

আমার এ এক দোষ , আমি বড় বেশী কথা বলি
আমি বলি, কথা দিয়ে কখনো কি কথা রাখা যায়
নাকি কোনদিন রাখা গেছে—
কথা দেয়া যায়, কথাতো যায় না রাখা ।

আমার এ এক দোষ, আমি বড় বেশী কথা বলি ।

ফড়িঙের পিছু পিছু যখন ছুটেছি অকারণ
সারাদিনি নদীর জলে কাটতো সারাবেলা
বাটুল চাঙ'র হাতে ঝোপ ঝাড়ে দুপুর গড়াতো
সে বয়সে আমি কত কথাই না বলতাম
"মা তোমায় বড় হলে লাল পেড়ে ডুরে শাড়ী এনে দেব
সোনার কাঁকন কানপাশা নাকফুল
আরো অনেক অনেক কিছু এনে দেব দেখে নিও।"

মা বলতেন—
'খোকা তুই বড় বেশী কথা বলিস
তোর কপালে দুঃখ আছে !'

আজো মাকে দেয়া সেই কথা
আমি রাখতে পারি নি ।

আমার এ এক দোষ, আমি বড় বেশী কথা বলি ।

মনে পড়ে সেই ঘুড়ি ওড়াবার কথা
মতির হাতের ঘুড়ি কেটে গিয়েছিল বলে সেকি কান্না
শেষে কথা দিতে হোল
লাল নীল সাদা রকম রকম ঘুড়ি কিনে দেব বড় হলে

এখন সবুজ অঙ্কুরকে কথা দেয় যেমন সহজে
বড় হলে মারবেল এনে দেবে হাজারে হাজার
মন্তিকে আমার দেয়া সেই কথা আজো রাখতে পারিনি !

আমার এ এক দোষ, আমি বড় বেশী কথা বলি।

মা বলেন আমি অনেক বেশী কথা বলতাম
হয়তো জাহানারার মনে আছে.
শিউলী তলায় বৌ বৌ খেলা ছলে
ওকে কথা দিয়ে ফেলি ওর পুতুল বিয়েতে
অনেক বাজনা এনে দেব
মিনির বাবার মত বড় হলে
যেমন পাশের বাড়ী এনেছিলো রমার বিয়েতে,
এখন জাহানারার মেয়ে রানী রুনি রঞ্জনাকে,
আমার মতন কেউ কথা দিচ্ছে বাজনা আনবে
তাদেরও পুতুলের বিয়ে দিতে—
আমি জাহানকে দেয়া কথা রাখতে পারিনি, আজো !

এ আমার এক দোষ !

মা বলতেন -
'খোকা তুই বড় বেশী কথা বলিস
তোর কপালে দুঃখ আছে।'

মনে আছে ঠিক বিয়ের প্রথম রাতে
কথা দিয়েছিলাম সুন্দরী নববধূ সুমনা মাহমুদাকে
সে ছাড়া কারো কথা মনে আনব না
সে ছাড়া কারো চোখে চোখ রাখব না
আর কারো প্রেমে ভুলেও কখনো হবনা মলিন।
সব গেছে - সব কথা গেছে !

আমার এ এক দোষ. আমি বড় বেশী কথা বলি
কথায় কথায় শুধু কথা দিয়ে ফেলি।

মা বলতেন—
'খোকা; তুই বড় বেশী কথা বলিস
তোর কপালে দুঃখ আছে !'

ঈশ্বরের জন্মে জন্মে

ব্রজগোপাল রায়

ভী-ষণ কষ্ট…ভয়ানক কষ্ট – কষ্ট ভয়ানক…
সেই মহামতি চার্ণক
সুপ্রাচীন বৃক্ষের সারি কেটে ছেঁটে
পাকে পাকে বসিয়েছে সময়ের হাট
আজ সে শুধু স্মৃতি—ইতিহাস বিষাদ…
কালের বয়সের মত বিষণ্ণ ধোঁয়াটে !

ঈশ্বর—কেমন যেন   একদিন একরাশ পাপে
ভরাডুবি হ'য়েছিল   অথচ প্রাণ তার
বিনষ্ট হ'তে হ'তে অলৌকিক সূর্যতাপে
পাহাড় জমিয়ে গেল মানুষ আর মানুষীর বুকের ভেতর
জন্ম অবধি ঈশ্বরের জন্মে জন্মে
আদিমতার বিশস্ত   স্বাক্ষর।
এখনো তো এ পৃথিবী পুড়ে পুড়ে
হ'য়ে আছে তামাটে ‥
স্বপ্নেরা অমানিশার জোনাকির মত
একা—একঘাটে
অস্পষ্টতার কুহেলীতে প'ড়েছে ঢাকা…
অগণিত বোবাছায়া করোটির স্নায়ু ধ'রে টানাটানি করে…
জ্যোছনার ফুলঝুরি   বুকের ব্যথার মত
নিহত রাত্রির রক্তে মাখা,

সবুজের কোমল বনানী, হায়, আজ ঝরাপাতা বুকের ফসল !!

ভয়ানক কষ্ট ‥ভী—ষণ কষ্ট…
ব্রহ্মাণ্ডের পাঁজর বেয়ে আজো নেমে আসে
সে—ই তৃষ্ণার্ত কুয়াসার ঢল…… !!

মরীচিকা

সনাতন মিত্র

স্বচ্ছ নির্ঝরের মতো গণতন্ত্র

শাল্মলীতরু স্বাধীনতা

এইসব শব্দগুলো এদেশে এখনো
সুপ্রাচীন ভূর্জপত্রে খুঁজে পাওয়া যায়

সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রে সবটাই মরীচিকা শুধু
গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, জন্মগত অধিকার, ইত্যাদি ইত্যাদি…।

আয়নায় যে-মুখ

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি সামনে দাঁড়ালেই
আয়নায় যে-মুখ ফোটে
আশৈশব ভেবে আসছি
ওটা আমার-ই
আর মুগ্ধ হ'য়ে নিজেকেই করি তারিফ

অংগারক-আচ্ছন্ন খণ্ডছিন্ন এই পরিবেশে
মজবুত মুদ্গর একটা চোখে পড়ে না কারো
যে বলবে হেঁকে
ও-মুখ তোমার নয় বেবকুফ্ !
ওটা অন্তরীক্ষচারী কোনো রঙিন্ মাতালের তামাসা

কিংবা কোনো বিশস্ত চন্দাবং এগিয়ে এসে
লোষ্ট্রাঘাতে বিচূর্ণ করে না জাদুকরী আয়নাটা
হাত ধ'রে টেনে নামায় না সিংহাসন থেকে আমাকে
দেখায় না নির্মম বন্ধুর মতো সেই অনন্ত পথ
যে-পথে একবার-ই নয়
সতেরো বার বিধ্বস্ত করা যায়
দুর্ধর্ষ মোগলবাহিনী।

Partyর টিকিটে। ঐ পার্টি যাঁদের পার্টি তাঁরা সোশ্যালিস্ট শ্রমজীবী। বস্তুত Shaw, Wells, Webb দম্পতীর মতো রাসেলও ছিলেন একপ্রকার না একপ্রকার সমাজতন্ত্রী পরিবর্তনের পক্ষপাতী। অথচ Marxist ন'ন। তখনকার দিনের ইংরেজ Marxist-রাও পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে পরিবর্তন চেয়েছিলেন, বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে নয়। কেবল রাসেল কেন, তাঁর মণ্ডলীর প্রায় সবাই সোভিয়েট রাশিয়ার বৈপ্লবিক শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। শ্রমিক নেতারা তো আরো বেশি ক'রে সোভিয়েট বিরোধী। এখনো তাই।

এটা একটা ঐতিহাসিক বিস্ময় যে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য অভিজাত বা বুর্জোয়া রাজনীতিকরা নন, lower middle class বা upper working class এর হিটলার মুসোলিনিরা। দেখতে দেখতে Fascism ও Nazism মাথা তোলে। ইংলণ্ড সেটা এড়ায়, কারণ তার মেরুদণ্ড তার solid middle class. "দু'দিকের চরমপন্থীদের আমরাই সামলে রাখছি," আমাকে বলেছিলেন ইংলণ্ডের এক আলাপী। 'আমরা' এখানে 'আমরা মধ্যশ্রেণীর লোক।' মধ্যশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল নয়।

ইংলণ্ডের পেণ্ডুলাম কখনো কোনো চরম প্রান্তে যাবে না। না চরম দক্ষিণে, না চরম বামে। সে দেশের শ্রমিকরাও এটা চায় না। শ্রেণীযুদ্ধ তাঁদের কল্পনার বাইরে—যদিও সেখানেও কমিউনিজম নিষ্ক্রিয় নয়। Labour Party কিছুদিন বাদে ক্ষমতার আসনে বসার পর তার সোশ্যালিস্ট মতবাদও লোকের গা-সওয়া হয়ে যায়। লোকে সোশ্যালিস্টদের ডরায় না। Marriage and morals সংক্রান্ত মতও ক্রমে সহজ হয়। যুদ্ধে পুরুষ সংখ্যা কমে গেছে, অনেক মেয়ের বিয়ে হয় না, হবেও না—তা বলে কি সঙ্গসুখ থেকে তারা চিরবঞ্চিত হবে, সন্তানসুখ থেকেও? জনমত ওদের দিক থেকেও ভাবে। ওদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। ইতিমধ্যে ওরাও ভোটাধিকার পেয়েছে। ওদের ভোটেরও মূল্য আছে।

এর নীট ফল, রাসেল বা Wells বা Shaw-কে কেউ আর advanced thinker ব'লে অতিরিক্ত মর্যাদা দেয় না। Intellectual circle এও তাঁরা back number. রাজনৈতিক মহলেও তাঁরা কারো পক্ষে ভয়াবহ নয়। ভয়াবহ হয়ে ওঠেন Hitlar, Mussolini, Stalin, Franco, অপর পক্ষে capitalistদেরও আর সে দোর্দণ্ড প্রতাপ নেই। তাঁদের প্রতিহত করেছে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ Trade Union Movement তথা solid labour vote.

Shaw, Russell, Wells প্রভৃতির প্রভাবের মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হয় ১৯৩০ নাগাদ। Rollandরও, রবীন্দ্রনাথেরও। আসলে ওঁরা একটি idealist generation. ওঁরা অভিজাত না বুর্জোয়া এটা অবান্তর। এদিক থেকে বিচার করাটাই ভুল। তাঁদের নেতৃত্বের মূলে যা ছিল তা তাঁদের শ্রেণী-সত্তা নয়, তাঁদের আদর্শবাদ। তবে সেই আদর্শবাদ তাঁদের মধ্যেই ছিল, তাঁদের ভাইদের বা জ্ঞাতিদের মধ্যে ছিল না। এর কোনো class explanation নেই। যেমন আপনার বা আমার কোনো caste explanation নেই।

কলেজ জীবনে আমি রাসেলের 'Roads to Freedom' ও 'Principles of Social Reconstruction' প'ড়ে তাঁর পক্ষপাতী হই। তখন তো মনে হয় নি যে তিনি ধনতন্ত্রের পোষক। না, ধনতন্ত্রেরও নয়, রণতন্ত্রেরও নয়, গণতন্ত্রেরই সমর্থক তিনি ও গণতান্ত্রিক মাধ্যমে যতদূর যাওয়া যায় ততদূর যাত্রারও তিনি পোষক। এ রকম লোক কখনো রক্তাক্ত বিপ্লব সমর্থন করতে পারেন না। যিনি স্বদেশে conscription-এর বিরোধী তিনি বিদেশে military বা labour conscription-এর অনুমোদন করতে পারেন না। রলাঁ বা রবীন্দ্রনাথ যদি সোভিয়েট রাশিয়ার military conscriptfon-এর ও forced labour-এর অনুমোদন ক'রে থাকেন তবে সেটা কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে। তাঁদের জীবন-ই এর জীবন্ত প্রতিবাদ। 'Soviet Russia **minus** military conscription and forced labour and liquidation of Kulaks and purge of all opposition elements by violence and bloodshed'—এমন যদি হতো তা হলে আদর্শবাদীরা একবাক্যে সমর্থন করতেন। কিন্তু তা তো নয়। এতদিনে ওটা settled fact হয়ে গেছে।

আদর্শবাদীদের পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ নেওয়া সম্ভব ছিল না। যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁরা পরে disillusioned হন। তা বলে তাঁরা মার্কিন ধনতন্ত্রেরও পক্ষপাতী নন। উক্ত ধনতন্ত্র ১৯৩০ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার পর থেকে রণতন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। তার economy তখন থেকেই war economy. যুদ্ধ যদি বরাবরের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়, ধনতন্ত্র নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। মানুষ যতই অহিংসার মর্ম বুঝবে ততই যুদ্ধবিরোধী হবে। যতই যুদ্ধবিরোধী হবে ততই ধনতন্ত্রের যুদ্ধপরায়ণতার বিরোধী হবে। গান্ধী-বাদই ধনতন্ত্রের প্রবলতম শত্রু।

রাসেল গান্ধীবাদী না হলেও গান্ধীবাদীদের কাজই প্রকারান্তরে ক'রে গেছেন। তাঁর শেষজীবনের কার্যকলাপ সামরিকতাকে দুর্বল করেছে। সামরিকতার সে প্রেস্টিজ আর নেই। ধনতন্ত্র এখন যার ওপর ভর ক'রে দাঁড়িয়েছে সে নিজেই কমজোরী। বহু যুবক draft (conscription) এড়িয়েছে।

রাসেলের 'Marriage and Morals' বেরয় 1929 সালে। তিনি Nobel Prize পান 1950 সালে। Nobel Prize পুরোনো বইয়ের জন্যে দেয় না। আপনার লেখায় হয়তো ভুল আছে। হতেও পারে যে রাসেলের ঐ দিকটাই সুইডেনের লোকের অতি প্রিয়। ও দেশের Marriage and Morals রাসেলের অনুগামী বা রাসেলই ওর অনুগামী। আপনি একে বুর্জোয়াদের সঙ্গে equate করেছেন। কিন্তু সুইডেনের শ্রমিকরাও কম যায় না। রাজত্ব তো ওদেরই হাতে। সোভিয়েট-এর Marriage and Morals সম্বন্ধে আপনার ধারণাটাই তেমনি অলীক যেমন অলীক বুর্জোয়া Marriage and Morals সম্বন্ধে। কেউ শাদাও নয়, কেউ কালোও নয়—black and white moralityর যুগ গেছে।

Regd No. : R. N. [illegible]
CHETANIK (Progressive Lit. Qly) year 2 No. 4 : Edited and Published by ATUL CH. BANERJEE from P. O. & Dist. Murshidabad, West Bengal and Printed by him from Cygnus Printing Co-operative Society Ltd, Berhampore, West Bengal.

'চেতনিক' সম্পর্কে আরও কয়েকটি মূল্যবান অভিমত

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় :

'চেতনিক বেশ উঁচুদরের পত্রিকাই হচ্ছে। কলকাতায়-ও এর মতো পত্রিকা খুব বেশি নেই। এর জন্যে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানবেন।' ২৯-৪-৭৫

'আপনার সম্পাদকীয় রচনাগুলি ভালোই লেগেছে। নির্ভয়ে ও অকপটে নিজের বক্তব্য ব'লে যান। ফলাফল আপনার হাতে নয়। মা ফলেষু কদাচন।'
১৭-৫-৭৫

শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী

'চেতনিক (২য় বর্ষ) তৃতীয় সংখ্যার কিছুকিছু লেখা পড়লাম। আপনার সম্পাদকীয়টি সুলিখিত। রচনার মধ্য ও শেষভাগে যে মনোভাবের অভিব্যক্তি দিয়েছেন তার সঙ্গে পুরোপুরি আমি একমত।' '……এই সংখ্যায় জয়প্রকাশ নারায়ণ সম্পর্কিত রচনাটি (শ্রীযুক্ত সত্যেন সাহার) বেশ ভালো লেখা।……'

কবি হীরালাল দাশগুপ্ত

'আপনার সম্পাদকীয়টি (৩য় সংখ্যার) পড়লাম। চমৎকার!'

সম্পাদক 'বেতার বাংলা' (ঢাকা)

'সত্যিই আপনার 'শারদীয় চেতনিক' (১৩৮১) বেশ ভাল হয়েছে। কতকগুলি রচনা সমকালীন সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে বিবেচিত হবে বিশ্বাস করি।… …'

'চেতনিক'-এর পরবর্তী তৃতীয় বর্ষ প্রথম (জুলাই) সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ :—

প্রবন্ধ : অন্নদাশঙ্কর রায় / নারায়ণ চৌধুরী / সত্যেন সাহা (বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পাঠকদের অনুরোধে জয়প্রকাশ সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রবন্ধ) / ডঃ শিশিরকুমার সিংহ

গল্প : বাণিক রায়

কবিতা : হীরালাল দাশগুপ্ত / মধাই কিছু / ডঃ সুধীর নন্দী / ডঃ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় / কবিরুল ইসলাম / মণিভূষণ ভট্টাচার্য / [illegible] খোকা (ঢাকা) প্রভৃতি।

'চেতনিক'-এর বার্ষিক চাঁদার হার ১০ টাকা। ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ত্রৈমাসিক 'চেতনিক' প্রকাশিত হয় মোট চার বার : জুলাই | সেপ্টেম্বর অক্টোবর (শারদীয়) | জানুয়ারি | এপ্রিল।

মূল্য দু'টাকা পঁচিশ পয়সা

দীয়/হৈমন্তিক

তনিক

১৩৮২

৩য় বর্ষ ১ম ও ২য় (যুগ্ম) সংখ্যা

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতিক্ষেত্রে
'অঘোরপন্থী'-দের দুর্নীতি বিকৃত রুচি ও
চেষ্টাকৃত দুর্বোধ্যতার বিরুদ্ধে অক্লান্ত
সংগ্রামরত ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র
প্রকাশকাল : জুলাই/পূজা/জানুয়ারী/
এপ্রিল ।
প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭৩

চেতনিক

সম্পাদক । অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পোঃ ও জেলা মুর্শিদাবাদ : পশ্চিমবঙ্গ

·· দূর থেকে যতদূর অনুমান করতে পারছি প্রেস-এর অসুবিধাই আপনাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা। প্রেসের মর্জি মাফিক চলতে হ'লে পত্রিকা কোন সময়েই নিয়মিত প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। যেমন আপনাদের শারদীয় সংখ্যা পূজাবকাশের পূর্বে বেরুতে পারলো না কেবল ছাপাখানার অসুবিধার জন্যই। এমন কি মধ্যবর্তী একটি (৩য় বর্ষ ২য়) সংখ্যার প্রকাশ পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হয়েছে একই কারণে। এ বিষয়ে স্থায়ী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারলে ভাল হয়। ····· নারায়ণ চৌধুরী

চেতনিক

৩য় বর্ষ ১ম ও ২য় (যুগ্ম) সংখ্যা প্রগতিশীল ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র

প্রকাশকাল : জুলাই/পুজা/জানুয়ারি/এপ্রিল

সম্পাদক ॥ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পোঃ ও জেলা : মুর্শিদাবাদ/পশ্চিম বংগ

সূচী

অথ খ্যাসারি প্রসংগ
(সম্পাদকীয়)

কাকপক্ষীর কুনজরের আশংকায় মজবুত বাড়িখানার মাথায় আগেই চাপিয়ে-ছিলেম চালাই করা ছাদ। হঠাৎ খেয়াল হ'লো ঘরে আমার নিশ্চয় কেষ্টনগরের মশার উৎপাত হয়েছে। তাই ঝট্‌পট্‌ একখানা মশারি ম্যানেজ ক'রে নিয়েছি। দিনদুপুরেও মশারির অভ্যন্তরেই অবস্থান করি। এবং মশারির ভিতরেই উনুন জ্বালিয়ে মতলব করেছি খ্যাসারির ডাল রান্না ক'রে বান্না দিয়ে পরিবেশন ক'রে সস্তায় নাস্তা করাবো আপনাদের মতো সুরসিক ঔদরিকদের। কাল্পনিক মশককুলের আশংকায় মশারির বাইরে যেতে ভরসা হয় না। তাই এই বিদুরের খুদকুড়ো যা জুটেছে তাই দিয়েই জুড়োতে চাই আপনাদের জঠরজ্বালা। খ্যাসারি খেলে কঠিন রোগ হয়—এ খবরটা অসাধু পসারিদের আষাঢ়ে রটনা ব'লে মনে করাই অতএব বুদ্ধিমানের কাজ।

তবে মশাই, একটা মুশ্‌কিলের কথা এখন থেকেই মাথা চাড়া দিচ্ছে আমার মনে। উনুন না-হয় ধরানো গেলো। ডালও গড়ানো গেলো ডোল থেকে ডেক্‌চিতে। ধ'রে নেওয়া গেলো সেই উনুনের আগুন লেহন করলো না লোভী জিভ মেলে মশারির চাল কিংবা চার চোয়াল। এবং নির্ঝঞ্ঝাটে এক সময়ে রান্নাও হ'লো উপাদেয় খ্যাসারির ডাল। ধ'রে নিলেম ঝাঁঝার সচ্ছিদ্র আশ্রয়ে ধরা-ও দিলো সেই ব্রহ্মবাদসহোদর খ্যাসারির ডালের পর্যাপ্তপরিমাণ তরলিত চন্দ্রিকা। কিন্তু সেই ডালধারিণী ঝাঁঝা কী-উপায়ে পৌঁছে দেবো কিংবা উপুড় ক'রে দেবো আপনাদের পাতিত পদ্মপত্রে! কারণ মশারির চার চোয়ালের কোনো প্রান্তাংশটুকুও আমি উত্তোলিত হ'তে দিতে রাজি নই। মশা-য় আমার বড়ো ভয়। কোনো বরাভয়ই আর আমাকে নির্ভয় ক'রতে পারছে না। আত্মীয়পরিজন, অনুগৃহীতঅনুগ্রাহকগণ যেই আসুক না কেন আমাকে সান্ত্বনা দিতে—আমি তাঁদের যদিও বলছি তোমাদের সহানুভূতিতে আমি অভিভূত, তোমাদের কাতরতায় আমি দ্রবীভূত, তোমাদের সান্ত্বনাচক সংঘনাদে আমি নতীভূত তবু আমি প্রত্যেককেই দেখছি ভ্রূভংগিদের সংকুচিত নিকটনজরে। শুধু ভয় কেউ বুঝি মশারি ফাঁক ক'রে মশা ঢুকিয়ে দিলে আমার সুরক্ষিত বিশ্বসংসারে। মশাতংকে আমি থাকি সদা মিয়মাণ।

অবশ্য কেউ যদি ব'লে বসে 'আপনার দেহে তো রসা-র অভাব নেই, তবে মশা-য় এতো আতংক কেন মশাই? মশার হুল আপনার দেহের দুর্ভেদ্য

বসাবরণ ভেদ ক'রে রক্তমোক্ষণে অক্ষম যখন তখন তো আপনি দুর্দম দুর্জয় —তাহ'লে ভেবে আমার জুতসই জবাব দেবার মতো কিছুই পাবো না খুঁজে। তবে ভরসা রাখি এমন বিপজ্জনকভাবে কেউ আমাকে বেওকুফ্ বানাতে চাইবে না। হে আমার স্তাবকবৃন্দ, আমি তোমাদের ইাক ছেড়ে ব'লতে চাই : এ আমার একপ্রকার হাড়মুট্‌মুটি রোগ। সতিনের বেটিকে বটিতে কুটে ঝোল না খেলে এ-রোগ সারবার নয়। এ-রোগ যার হয়েছে একমাত্র সে-ই জানে এর কী জ্বালা। সব সময়ই ব্যস্ত থাকতে হয় নতুন-নতুন ফন্দিফিকির উদ্ঘাটন-উদ্ভাবনে। চিত্ত সর্বদাই চঞ্চল। এবম্বিধ মানসবৈক্লব্যের কবল থেকে আর বুঝি আমার নিস্তার নেই। ন্যু ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্ভিং ক্রিস্টল (Irving Christol)-এর একটা নিষ্ঠুর উক্তি আমার বুকের হাড়ের পাহার থেকে পাহারে ক্রমাগত ঠক্কর খেয়ে ফিরছে : No one who has ever had a nervous breakdown is ever quite the same afterwards, no matter how pleased a doctor may be with his condi ion.' [Vide his article entitled 'AMERICA RECOVERS FROM THE FRANTIC 'SIXTIES : SPAN VOL. XIV NO. 9] মনের কব্জা যার একবার বিকল হ'য়েছে ভবিষ্যতে সে আর কোনোদিন ঠিক আগের মতো অবস্থা ফিরে পায় না চিকিৎসক যতোই খুশি হোন-না কেন তার অবস্থা দেখে।

তাহ'লে কি আমি সবেগে সেই অমোঘ পরিণতির পানে ধেয়ে চ'লেছি যার চৌহদ্দির চৌকাঠ পেরিয়ে কেউ কখনো ফিরে আসে না ? গল্পের সেই থুথ্যুরে বুড়ি মরতে অস্বীকার ক'রেছিলো এই অজুহাতে যে সে ম'রলে তার কুলগাছ আগলাবার লোক মিলবে না। কুলগাছের মোহিনীমায়ার মোহে মুগ্ধ আসক্তি-আবদ্ধ বুড়ির পরিণতি কী হয়েছিলো তা অনুমান করা কঠিন নয়। বেচারির মাথায় মোদ্দা একটা বুদ্ধি খেলেনি। কুলগাছটা কেটে ফেলে সেই কাঠের চিতায় নিজে উঠলেই সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবতঃ অসম্ভব হতো না। আমিও তাই ভাবছি : আমার এই সাধের জমিজিরেত শত্রুর কবলে প'ড়তে দেবো না ব'লেই যখন চিকে আর মশারিতে তাকে সুরক্ষিত সংক্ষিপ্ত ক'রে নিয়েছি তখন একান্তই যদি অন্তেকাল উপস্থিত হয় তাহ'লে আকণ্ঠ খ্যাসারির ডাল গিলে ওই উনুনের আগুন মশারির চালে চোয়ালে লাগিয়ে দিয়ে জমিজিরেতসহ-ই না-হয় ভয়ংকর শেষের সেদিনের মোকাবিলা করা যাবে। সতিনকন্যাকে 'ছাই খা' বলার তৃপ্তিটুকু নিয়েও অন্তত যেতে পারি যেন এই ধরালোক ছেড়ে পরলোকে। জ—য় হিন্দ !

অন্তরাল

অমিয় চক্রবর্তী

কোয়ালা, কোয়ালা।
এখনো আছ উঁচু ডালে
অন্তরালে
ঘুমিয়ে থাকো রাত সকালে
সারাজীবন—
একটু আধটু চোখ খুলেছ (কী দেখেছ),
বনাকীর্ণ প্রাণের রণন
শিরায় স্বনন
ঝিমিয়ে এল, সব ভুলেছ :
মৃদু শূন্যে হাওয়ার দোলা—
হে কোয়ালা।

কোয়ালা, কোয়ালা।
আমরা তো চোখ খুলি, বুঁজি
মানবসংসারে,
কথার ধাঁধায় হারাই, খুঁজি
শেষের পারে—
প্রাণের ধারে
তুমি যা পাও তাই কি বুঝি।
কার দেওয়া কেউ জানিনা তা
উঁচু ডালে ভোর সকালে
শিশির বিন্দু, কচি পাতা
পথা—তোমার এই আড়ালে

দেশে যাবো তীর্থ দূরে
তোমার দেশের মুগ্ধ সুরে
গলায় মালা,
বিদায়-সন্ধ্যা-তারার জ্বালা।
হে কোয়ালা ॥*

মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া
অগস্ট, ১৯৭৫

---

*২৪শে অগস্ট ১৯৭৫ U.S.A. থেকে ডঃ চক্রবর্তীর পত্রাংশ :
...অস্ট্রেলিয়ায় কোয়ালা নামে একটি অতি আশ্চর্য জন্তু অরণ্যে থাকে— তারা সকলেরই প্রিয়, তাদের জীবনযাত্রাও অপরূপ। কোয়ালারা থাকে য়ুক্যালিপ্টস্ বা গাম গাছের উচ্চ ডালে, প্রায় সারাজীবন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। খায় শুধু কচি পাতা আর শিশির বিন্দু। এত লাজুক আর অন্তরালবর্তী তাদের জীবন, এবং দেখতে এত সুন্দর যে কোয়ালাকে ভোলা শক্ত। তাদের উদ্দেশে ওই লীরিকটা লিখেছিলাম অস্ট্রেলিয়া থেকে বিদায় নেবার সময়।...'

ক্যা মী লি অ্যা ন্

চলমান দৃশ্য নাট্য

হীরালাল দাশগুপ্ত

প্রথম দৃশ্য।
বিরংসার রহস্যরূপসী হারেম!
ধীরে ধীরে রক্তমুখী নীল রাত্রি নামে।
বিচিত্রবর্ণের সুগন্ধ অন্ধকার আলো।
সুরে সুরে ছন্দে ছন্দে
তরংগিত অংগে অংগে জীবনের মৃত্যুবিলাস!
রহস্যমুখর সারা রাত।
সহস্র সহস্র সারা রাত
বর্ণের। গন্ধের। শব্দের।
দ্বিতীয় দৃশ্য!
জীর্ণ কুটির। ফুটো চাল। ভাঙা বেড়া।
কবি খোজে ছন্দের মিল।

গৃহিণীর বিশীর্ণ শরীর
ভাষাহীন দুই চোখে হলুদ হতাশা।
কবি শুধু ছন্দপতন ধ্বনি শোনে।
অদূর হারেম থেকে ভেসে ভেসে আসে
রক্তনীল গোলাপের সুর।
অভিভূত কবি
মাটির সবুজ ছেড়ে নক্ষত্রের নীলে নীলে খোজে
চিরন্তনী নীলনয়নাকে
ছন্দোময়ী অরূপ রূপসী!
তৃতীয় দৃশ্য।
রাজপথে কংকাল মিছিল!
উর্বশীরা নেমে আসে হেঁসেলে ভাঁড়ারে।
ট্রাম বাসে ভিড় ঠেলে দশটা-পাঁচটা করে
ভীষ্মাস ভাইআনো।
চিরন্তনী উড়ে যায়
প্রেতায়িত ধুলো বালি ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়।
কবিতার ছদ্মনামে লাঙলের ফলায় ফলায়।
দৃশ্য চতুর্থ।
অদ্ভুত পশুদের অস্তিত্বের বিকার ব্যঞ্জনা।
কেউ হাসে। কেউ নাচে। কেউ গান গায়।
কেউবা বেহুঁস বেতাল হোয়ে পড়ে যায় মঞ্চের ওপর।
হঠাৎ একটা বাঘ ক্লেদাক্ত শুয়োর হোয়ে যায়।
দর্শক আভাস পায়
পরবর্তী দৃশ্যের প্রস্তুতি চলে।
এ নাট্যের শেষ নেই
রাত্রি আর দিন শুধু ধীরে ধীরে দৃশ্য বদলায়।

অন্ধকার আরও পাথর

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সপ্তাশ্বের বল্গা টেনে টেনে দৈনিক নাটক
ক্লান্ত বোধ স্বাভাবিক সন্ধ্যার আকাশে।
নিকম্প সূর্যকণ্ঠ ছড়ায় রক্তাক্ত ছায়া
দিগন্তের নীলাচল জুড়ে ধূসর ব্যথার।
অনেক মনীষিবাণী, তা বুকের খণ্ড খণ্ড কথা

শরীরী সাক্ষাৎকারে ক্ষণে ক্ষণে দাঁড়ায় সমুখে।
চারিদিকে বিজ্ঞতার ভান রাত্রিকে প্রশ্রয় দেয়,
ঘনশক্ত পাথরের পাহাড়ের মতো অন্ধকার।
তারে ধুয়ে মুছে ফেলা কতটা সম্ভব বলো
শুধুমাত্র বক্তৃতার অবিরাম শিলাবৃষ্টি দিয়ে?
সে প্রশ্নেরই আনাগোনা পথে-প্রান্তে কলে ও কলেজে,
ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা তো নিপাত ভূতলে, কে দেবে উত্তর?
সহসা বোমার শব্দ, ট্রাম-বাস জ্বলে জ্বলে ছাই —
এ দুর্বোধ্য সাসানিতে অন্ধকার আরও পাথর!
নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, পুকুরের বুকের ওপর
জলের আড়াল থেকে মাছেদের ভয়ার্ত বুদ্বুদ।

তোমাকে দেখতে চাই একবার

কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত

তোমাকে দেখতে চাই একবার
তুমি যৌবনের তেজে বহু আকাঙ্খায়
বাঘের মতো উদ্দীপিত;
দুই হাতে অনেক বিবর্ণতা ভাঙতে ভাঙতে
শোনিতে ঐক্যে বেঁধে
আবার এক নতুন নির্মাণে
দারুণ ঐশ্বর্য গড়ে তুলতে চাইছে।

আর তখন
তোমাকে একবার উদ্দীপিত হতে দেখলে
আমিও ভীষণ ঝড়ো হাওয়ার মুখে,
নড়বড়ে চাড়ির ভেতরে
দরজায় পিঠ দিয়ে প্রাণপণে দাঁড়াতে।

রবীন্দ্রচেতনার স্বরূপ / ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ও ভারতের জনসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কৌতূহলের অন্ত নেই। কারণ এই নতুন যুগের কবি এমন একটি দর্শন তাদের সম্মুখে এনেছেন যা প্রকৃতই অতি মূল্যবান। তিনি শুধু মহাকবি ছিলেন ব'লেই এই কৌতূহল নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় রয়েছে অল্প সংখ্যক লোকের। বিশেষতঃ বাংলার বাইরের লোকের পক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্যের রসাস্বাদন সম্ভব হয়নি। বড়জোর শতকরা একজন উচ্চশিক্ষিত লোক ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে কিছুটা পরিচয় রাখেন এর। তবু তাঁরাও যখন কৌতূহলী তখন বুঝতে হবে অন্তত বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য একটি নতুন জীবনবার্তা এনে দিয়েছে। সাধারণ লোক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠিক সাহিত্যিক আলোচনা শুনতে চায় না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাণী, তাঁর জীবনের এবং অনুভূতির ছন্দোময়তার উপলব্ধি খুব দুরূহ নয়।

রবীন্দ্রদর্শনের নিগূঢ়তাকে, অনির্বচনীয়তাকে গ্রহণ করবার জন্যে আমাদের মানসিক প্রস্তুতি কতোটুকু? উৎসবশেষে যখন আলোকোজ্জ্বল মঞ্চের ওপর যবনিকাপাত হবে তখন কোন্ শাশ্বত প্রেরণা আমাদের উদ্বুদ্ধ ক'রতে থাকবে, কোন্ শস্য আমাদের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকবে চিরকালের সম্পদ হয়ে? শুভ্রুগেই সব শেষ হলো, না অন্তরে কিছু রেশ রেখে গেল? রবীন্দ্রকাব্য, রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে অন্য কোন্ বিচিত্রলোকের সন্ধান পাব আমরা? —এসব বিষয়ে স্থির চিত্তে আত্মজিজ্ঞাসার অবকাশ এসেছে।

সমাজজীবনে কবির স্থান :

কবির অভাবে সমাজের ক্ষতি কী? কবির সাহায্যে সমাজের সমৃদ্ধি হয় কতোটুকু? সূর্যালোক, মলয়পবন ও বসন্তের অভাবে জীবন হয়তো কোনক্রমে চলে যেত। কিন্তু জীবন হ'ত তাতে অত্যন্ত রিক্ত, দারিদ্র্য ও বৈচিত্র্যহীন। ব্যবহারিক জীবনে কবির প্রয়োজন না থাকতে পারে। কিন্তু যে-শক্তি মানুষের মনে নবীন আশার সঞ্চার করে সেই শক্তির জন্যেই কবির আবির্ভাবের প্রয়োজন। কবির আবির্ভাব সম্ভব হয় কারণ সমাজের অবচেতন মনে জীবনকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলবার একটা আকূতি আছে। উপযুক্ত পরিমাণে আলো-বাতাস যোগাতে পারে যে মাটি কেবল সেই মাটিতেই বনস্পতির জন্ম সম্ভব। কবি মানুষের চিত্ত থেকেই রসাহরণ

করেন। সাধারণ মানুষের মনে রয়েছে অস্ফুট চেতনা, অস্ফুট আকাংক্ষা, অস্ফুট স্বপ্ন। কবির কাব্যে মানবজীবনের সেই অস্ফুট আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিষাদ-বেদনা সুস্পষ্ট রূপ পায় অনুপম সৌন্দর্যে। এক হিসেবে মূক জনসাধারণই কবিকে সৃষ্টি ক'রেছে। অন্যদিকে কবির কল্পনার প্রসারতাই আমাদের সৃষ্টি করে। সমাজের মনে যদি সৌন্দর্য-সৃষ্টির আকূতি না থাকতো তা'হলে রবীন্দ্রনাথের জন্ম সম্ভব হ'তো না এই বাঙালি সমাজে।

মহাকবির অভিধা :

মহাকবি আখ্যা এমন কবিকে আমরা দিইনে যিনি শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি ক'রেই নিবৃত্ত হন। যিনি জাতির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, পথনির্দেশ করেন, বিভিন্ন আদর্শের সংঘাতে বিচলিত, বিমূঢ় জাতিকে যিনি মুক্তি ও পরিপূর্ণ আত্ম-বিকাশের অভ্রান্ত ইংগিত দেন তাঁকেই ব'লবো মহাকবি। তিনি জাতির মনের গতি ও প্রকৃতির খবর রাখেন, নাড়ী নক্ষত্রের খবর রাখেন এবং সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এমন এক রূপলোকের সৃষ্টি করেন যেখানে জাতি অনির্বচনীয়ের সন্ধান পায়, মুক্তির সন্ধান পায়। রবীন্দ্রনাথ জীবনের যে-রূপ আমাদের সামনে তুলে ধ'রেছেন তাকে পরিপূর্ণ রূপ দেবার একটা গভীর আগ্রহ নিশ্চয় আমাদের মনে র'য়েছে। নইলে তাঁকে মহাকবি ব'লে স্বীকার ক'রে নেবার কোনো সার্থকতা নেই।

কবিকৃত্য :

সাধারণ জীবনযাত্রা অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নির্বাহিত হয়। এই সীমাকে অতিক্রম করবার প্রেরণা আমরা আমাদের জীবনে কোথাও খুঁজে পাইনে। কবির কাজ এই সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠবার নির্দেশ প্রদান, নতুন দিগন্তের উন্মোটন, বৃহত্তর জীবনবোধের সৃষ্টিসাধন, উদার, মুক্ত, বিস্তৃত জগতের সন্ধান দান।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন :

প্রকৃতির পরিবর্তমান সৌন্দর্য কেবল দৃশ্যবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে না। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ যদি জন্মায় তাহ'লে আমাদের জীবন আরো সুন্দর হয়। তাই প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্যকে অন্তরে গ্রহণ করতে হবে। গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গেও আমাদের নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। মানবাত্মার আমন্ত্রণ তারায় তারায়। প্রকৃতির সংগে মানবাত্মার এমন নিগূঢ় সম্পর্ক আছে যে তার অনুশীলন করলে আমরা বৃহত্তর জীবনকে আস্বাদন ক'রতে পারি।

সুষ্ঠু জীবন :

সুষ্ঠু জীবনযাত্রা কী ক'রে নির্বাহ করা যায়? রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে যে-সব অনুভূতি বিদ্যুচ্চমকের মতো আমাদের মনে জেগে ওঠে তাদের যদি ধ'রে রাখতে পারি, যদি মহৎ অনুভূতিকে জীবনের ছন্দে গেঁথে তুলতে পারি, তাহ'লে সুষ্ঠু জীবনযাত্রা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ :

কবি আনন্দের এমন একটা বেগ অনুভব করেন যার প্রচণ্ড আলোড়নে তাঁর কাব্য পাঠে আমাদের এই গতানুগতিক জীবনের প্রাত্যহিক ঝিমুনিটা কেটে যায়। কবি যখন বর্ষার বর্ণনা করেন, বর্ষার মেঘসমারোহের মধ্যে বিদ্যুচ্চমকের বর্ণনা করেন তখন আমাদের অন্তরেও একটা উত্তেজনা একটা তীব্র আবেগের সৃষ্টি হয়। তাঁর বর্ণিত বসন্তের সৌন্দর্যের হাটে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করি। কবির কাব্যপাঠকালে আমরা পার্থিব জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে যাই।

কবির আধ্যাত্মবাদের ভিত্তিভূমি : আধুনিক জীবনবেদ ও ঔপনিষদিক তত্ত্বের সমন্বয় :

জড়বিজ্ঞানের যুগ, নাস্তিকের যুগ—যা যন্ত্রসভ্যতার বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে, পুরাতন গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে নতুন নতুন ঐশ্বর্যোপকরণ সৃষ্টি ক'রছে—সেই যুগে তিনি উপনিষদের বাণী শুনিয়েছেন। তাই ব'লে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ন'ন। তিনি ব'লেছেন প্রগতিশীল জাতিসমূহের সংগে সমতা বজায় রেখে ব্যবহারিক ঐশ্বর্য-উৎপাদন এবং ভোগ করার সংগে সংগে প্রয়োজনসাপেক্ষে ত্যাগের জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। ভোগের আসক্তি এমন হবেনা যাতে, প্রয়োজন হ'লে, ত্যাগের প্রবৃত্তি না-জাগে।

আধুনিক জীবনবেদ ও উপনিষদের তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন কবি। উপনিষদের ভগবৎ অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের মৌলিক আবিষ্কার নয়। ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের নৈকট্যবোধ দু'হাজার বছর পরে রবীন্দ্রকাব্যে প্রতিধ্বনিত হ'ল। তবে ঔপনিষদিক অনুভূতি উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতি কতকগুলি ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে বিচিত্রভাবে ভগবানের লীলা অনুভব ক'রেছেন। আমরা যদি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মূলানুসন্ধান করি তাহ'লে তার মধ্যে দিয়েই ভগবানের সম্পর্কে

নৈকট্যবোধ আসবে। কবির মতে এর জন্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উপাসনার প্রয়োজন নেই। সেটা 'পারলৌকিক বৈশ্বয়িকতা'। 'আধ্যাত্মিকতা' নয়। প্রকৃতিসম্পর্কে চেতনার মধ্যে দিয়েই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংগে একাত্মতাবোধের মধ্যে দিয়েই ভগবানের সংগে যোগাবিষ্কার সম্ভব। ভগবৎ উপলব্ধি সম্পর্কে এই তত্ত্ব কবি তাঁর বহু ও বিচিত্র রচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করেছেন।

ঋতুচক্র প্রাকৃতিক নিয়মের, বৈজ্ঞানিক নিয়মের অধীন। রবীন্দ্রনাথ এ-কথা স্বীকার ক'রেও ব'লেছেন এইটিই একমাত্র সত্য নয়, গভীরতম সত্য নয়। ভগবান মানবমনে বিচিত্রানুভূতি সৃষ্টির মানসে প্রকৃতির সৃষ্টি ক'রেছেন। এর মধ্যে দিয়ে একটা আনন্দলীলার প্রবাহ বইছে। এবং এই আনন্দলীলার মধ্যে দিয়েই ভগবান মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ ক'রছেন। জড়-বিজ্ঞানকেও তিনিই পরিচালিত ক'রছেন।

মানবজীবনের তাৎপর্য :

মানবজীবনের পরম লক্ষ্য যদি হয় ভগবৎ উপলব্ধি তাহ'লে মানবজীবনের তাৎপর্য কী? অনন্ত জন্মের ভিতর দিয়েই মানবজীবনের সার্থকতা। এক জীবনে এই সার্থকতা, এই পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। বহুজীবনের অভিজ্ঞতার পর মানুষ ভাগবৎ মিলনতীর্থে এসে উপনীত হয়।

অভ্রান্ত পৌনঃপুনিকতায় জীর্ণ ক্লান্ত পৃথিবীর যে রূপান্তর ঘটছে, বাল্য-যৌবন-বার্ধক্য-ক্রমান্বয়ে এই যে পরিবর্তন হচ্ছে তা একটি সুপরিকল্পিত নৃত্যছন্দে ঘটছে। এলোমেলোভাবে নয়। জীর্ণকে ঝেড়ে ফেলা আর নতুনকে গ্রহণ নৃত্যের তালে-তালেই ঘটছে।

এই জীবন বিচ্ছিন্ন নয়, অনন্তকালে বিস্তৃত, সৌরলোকে ব্যাপ্ত। সৌর-জগতের কেন্দ্রস্থলে মানুষকে স্থাপনের কারণ সৌরজগতের দূরতম নক্ষত্রলোকের সংগে যেদিন সে একাত্মবোধ ক'রতে পারবে সেদিন-ই হবে সে পরিপূর্ণ। সকলের রশ্মি, সকলের প্রভাব প্রতিটি মানুষের ওপর এসে প'ড়ছে। মানুষের জীবনের কোন সীমা নেই।

রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ রসোপলব্ধি :

গান কী? সুরের যাদু, শব্দযোজনকৌশল, ভাবানুভূতির গভীরতা এই তিনের সুষম সমন্বয়। ভাববস্তুকে যখন আমরা গ্রহণ ক'রতে পারি তখনই সেই গান হয় জনপ্রিয়। রামপ্রসাদের গান এই অর্থে জনপ্রিয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগীত এই অর্থে জনপ্রিয় নয়। আজকাল বহু উৎসবানুষ্ঠানেই

রবীন্দ্রসংগীত গীত ও শ্রুত হতে দেখা গেলেও তাঁর সংগীতের ভাববস্তুকে উপেক্ষা ক'রে আমরা তার সুর ও শব্দযোজনকৌশলের প্রতিই আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে অভ্যস্ত। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'—এই বহু প্রচলিত গানটির 'অসীম' কথাটিকে বাদ দিয়ে বাকি অংশের ভাবটুকুকে গ্রহণ করতে চাইলে তা অর্থহীন হবে। 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে' ভগবানকেও ভক্তের কাছে এগিয়ে আসতে হয়। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আলোকাবরণে আত্মগোপন ক'রে নেমে আসছেন তিনি। জ্যোতিষ্কালোকের পিছনেও এক উজ্জ্বলতর জ্যোতির অস্তিত্ব রয়েছে। এই জ্যোতিই ভগবান।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা মহাকবি আখ্যা দিয়েছি ; কিন্তু তাঁকে আমাদের জীবননিয়ন্ত্রণের অধিকার দিইনি। ভগবৎ-উপলব্ধি তাঁর জীবনে গভীরভাবে জড়িত ; তাকে বাদ দিয়ে তাঁর কাব্যোপলব্ধি সম্ভব নয়।

সমগ্র জীবন তাঁর কাছে একটি পবিত্র হোমযজ্ঞরূপে প্রতিভাত। সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা ও নীচতাকে এই হোমানলে আহুতি দান করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সমস্ত পর্যায়েই এই উপলব্ধি দেখি। জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই ভগবৎ উপলব্ধি আমাদের নেই। তবে কী-ক'রে তাঁর কাব্যের রসাস্বাদন ক'রবো? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এমন এক জগতের জন্যে যে জগৎ ভগবানের অস্তিত্বে, ভগবানের লীলায় বিশ্বাসী। আমাদের পূর্ব পুরুষদের জীবনে উপনিষদ, বৈষ্ণবপদাবলী প্রভৃতি ভগবৎ-উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ সরাসরিভাবে এই যুগের অবিশ্বাসী, সংশয়ী ইউরোপীয় সমাজের জন্যে লেখেননি। তিনি লিখেছেন এমন জাতির জন্যে যারা নির্বিবাদে ভগবানের অস্তিত্বকে মেনে নিয়েছে, যারা রামচন্দ্রের অবতারত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেনি, যারা বিশ্বাস করে শ্রাবণঘন গহন মেঘের আবরণে আত্মগোপন ক'রে ভগবান মানুষের কাছে নেমে আসছেন।

বুদ্ধির অনধিগম্য যদি কিছু না-থাকে তাহ'লে যুক্তিবাদী বুদ্ধিমানশ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্যজাতির মধ্যে যুদ্ধ বাধে কেন? যারা মানুষকে এতো বেশি মূল্য দিয়েছে সেই পাশ্চাত্ত্য জগতে কিসের এমন অভাব ঘটেছে যার ফলে তারা ভীত, চঞ্চল, দিশাহারা? জগতের সমস্যার সমাধান করতে হ'লে মৈত্রী, প্রেম, ভালবাসাকে সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে রবীন্দ্রকাব্যের এই ভাগবৎ-উপলব্ধির সম্পর্কে সচেতনতার প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মবোধ যে ভাববিলাসমাত্র নয়, এটি যে অপরিহার্য-রূপে আমাদের জীবনে গ্রহণযোগ্য পাশ্চাত্ত্য জগৎও এ-সত্য উপলব্ধি ক'রতে পেরেছে, যদিও রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয়লাভের সুযোগ তাদের জীবনে অত্যন্ত সীমিত।

আধ্যাত্মিক উপলব্ধি-ই রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রধান দিক। তবে এ ছাড়াও সাধারণ মানুষের সৌন্দর্যোপলব্ধির উপযোগী অজস্র কবিতাও রচনা ক'রেছেন কবি। কাজেই এই অধ্যাত্ম-উপলব্ধিবাদ দিয়েও রবীন্দ্র সাহিত্যের আংশিক রসাস্বাদন সম্ভব। তবে কবিকে গ্রহণ ক'রবো অথচ কবির অনুভূতিকে গ্রহণ করবো না—এটা কারো পক্ষেই কল্যাণকর নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের সংস্পর্শে এসে অন্ততঃ কিছু লোক-ও যদি এই উপলব্ধি লাভ ক'রতে পারেন তা হ'লেও সমাজের পক্ষে মঙ্গল।

DR SRIKUMAR BANERJEE
M. A., Ph. D., M. L. C.

Phone · 46-2827
31 SOUTHERN AVENUE
CALCUTTA-29

My dear Atul,

I am glad that you took this verbatim copy of my centenary speech on Radindranath at Murshidabad and gladly give you my permission to publish it under the title you have suggested.

Yours affectly,
Sd/- Srikumar Banerjee

সাহিত্য ঃ নন্দনতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে

ডক্টর সুধীর নন্দী

সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করতে গিয়ে সমালোচক বললেন, যে, সাহিত্যের ভেলাতে সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক একই সঙ্গে পাড়ি জমায়। সহিতত্ব হল সাহিত্যের মূলে। আমাদের নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে এই সহিতত্ব কথাটির মনস্তাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পটভূমিতে আলোচনা করা হবে।

শিল্পী অর্থাৎ সাহিত্যিক সৃষ্টির কোনও এক দেবদুর্লভ মুহূর্তে অনুভূতির তথা আবেগের চিত্রটিকে ভাষার আরশিতে ধরে দিয়ে সহৃদয় সামাজিকের কাছে তা উপস্থিত করতে চান; লেখা ছাপা হয়, 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'। উদাহরণ দিই, ক্লাসিক উদাহরণ।

মৈথুনক্রিয়ারত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধ হনন করল। দস্যু রত্নাকর আবেগউচ্চকিত এক নিবিড় মুহূর্তে সেই বিয়োগান্ত নাটক দর্শন করলেন। তাঁর মনে যে কারুণ্যরস সঞ্চারিত হল তিনি তাকে সঞ্চারিত করে দিলেন সহৃদয় সামাজিকের মনে, এমন কথা বলা হয়। কি করে করলেন? কেমন করে করলেন? কবির মনের ভাব কেমন করে রসিকের মনে সঞ্চারিত হয়, তার পর্যালোচনার অবকাশ আছে। সমালোচক এই তত্ত্বটিকে সত্যের মর্যাদা দিয়ে বসেন কোনও রকম বিচার বিশ্লেষণ না করেই। তাঁরা ধরে নেন যে পাঠক ত সহজেই কবির কথা বুঝতে পারবেন। আমাদের প্রশ্ন হল: সত্যি সত্যিই পাঠক অনায়াসে কবি বা সাহিত্যিকের মনের অন্দরে প্রবেশ করে তার আবেগ এবং অনুভূতির কথা বুঝতে পারেন কি? পাঠক বা সমালোচকের পক্ষে কবির অনুভূতির জগৎ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রতীতি জন্মাতে পারে কি?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের থেকে 'মালিনী'র কয়েকটি কথা তুলে দিই।

> "রাজকন্যা আমি, দেখি নাই
> বাহির-সংসার—বসে আছি এক ঠাঁই
> জন্মাবধি চতুর্দিকে সুখের প্রাচীর,
> আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির
> কে জানে গো। বন্ধ কেটে দাও মহারাজ!

ওগো ছেড়ে দে মা—কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা—যে মোর অন্তর্যামী
অগ্নিময়ী মহারাণী, সেই শুধু আমি।"

কবি এখন মালিনীতে রূপান্তরিতা ; মালিনীর ভূমিকায় মহাকবি যে অনুভূতির কথা বললেন সে কথা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। শুধু আমরা কেন মালিনীর মাতা রাজমহিষীর কাছেও এই আবেগ-অনুভূতির স্বগতোক্তি একেবারেই হেঁয়ালিপূর্ণ। মালিনীর মাতা রাজমহিষী, তাঁর গর্ভে মালিনীর জন্ম। তিনও তাঁর বালিকা কন্যার এই অন্তহীন অনুভূতিলোকের কোনও সন্ধানই রাখেন না, হয়তো এই অনুভূতিলোকের দুর্বোধ্যতাব ইঙ্গিত কবিগুরু দিতে চাইলেন তাঁর পাঠককে তাই তিনি রাজমহিষীর মুখ দিয়ে বলালেন :

মহিষী ॥ "শুনিলে তো মহারাজ ? এ কথা কাহার ?
শুনিয়া বুঝিতে নারি। এ কি বালিকার !
এই কি তোমার কন্যা ! আমি কি আপনি
ইহারে ধরেছি গর্ভে !"

রাজমহিষীর 'শুনিয়া বুঝিতে নারি'র স্বীকৃতি সমস্ত পাঠকের। আধুনিক সেমান্টিক্সে এই শব্দের অর্থের অনির্দিষ্ট তত্ত্বটিতে প্রায় স্বীকৃত সত্যের মর্যাদায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কবি যে অর্থে কথা বলেন সাহিত্যিক যে অর্থে শব্দ ব্যবহার করেন সে অর্থটুকু দুরধিগম্য।

আমরা যখন আমাদের সাধারণ ব্যথাবেদনার কথা বলি, সেই ব্যথা বা বেদনার কথা, আমাদের যে সাধারণ সুখ বা আনন্দের কথা বলি সেই সুখ বা আনন্দের কথা কি একান্ত প্রিয়জনেরাও বুঝতে পারেন ? সাহিত্যিকের উত্তুঙ্গ অনুভূতির কথা পাঠকের বোধগম্যতার বাইরে থাকে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আরও উদাহরণ দিই (এই উদাহরণটি দিয়েছেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ) :—

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে কণ্বমুনির সেই উক্তি স্মরণ করুন। তিনি তপোবনতরুদের ডাক দিয়ে বললেন

'ওগো সান্নিহিত তপোবন তরুগণ,
তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান,
সাধ ছিল যার সাজিতে তবু

স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু,
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে,
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহো বিদায় !'

জানিনা তপোবনতরুউদ্দিষ্ট কণ্বের বাণী এ যুগের কোনও পাঠকের বোধগম্য হবে কি না ? এ যুগের নগরবাসী মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির হল অনাত্মবন্ধন। নাগরিক সভ্যতাপুষ্ট পাঠক বা সমালোচক মানুষ এবং প্রকৃতির কথকথিত একাত্মতাটুকু অনুধাবন করতে পারবেন না বলেই মনে হয় আর তা না পারলে শকুন্তলা কাব্যের আবেদন বহুলাংশেই এ যুগের পাঠকের কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কালিদাসের সমকালীন পাঠকেরাও কবিকথিত কণ্বের সূক্ষ্ম বেদনাটুকুকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। শকুন্তলা নাটকের পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে আসুন, সে অঙ্কে আরম্ভেই কবি রাজার প্রণয়রঙ্গভূমির যবনিকা ক্ষণকালের জন্য সরিয়ে দেখিয়েছেন—

রাজপ্রেয়সী হংসপদিকা নেপথ্যে সংগীতশালায় আপন মনে বসে গান করছেন :

"নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
চূতমঞ্জরি চুমি',
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছে
কেমনে ভুলিলে তুমি !"

এই গানের অন্তরস্থিত ভাবটি হল এই দৃশ্যটির মর্মকথা। এই প্রত্যাখ্যানের বেদনা অধিকাংশ পাঠকপাঠিকার কাছেই অবোধ্য। অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন বললেও ভুল হয় না। রাজা দুষ্মন্তের অপরাধ এই যুগের পাঠক পাঠিকার কাছে ক্ষমার অযোগ্য নয়। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলেই তা এযুগে হৃদয়বিদারক বলে গণ্য হয় না এযুগের মেয়েরা বা ছেলেরা প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে দ্বিতীয়বার কেন বহুবারই প্রেমের রাজপথে বা চোরাগলিতে অনুপ্রবেশ করে থাকে। সেই প্রত্যাখ্যানকে সেই বিয়োগান্ত পরিস্থিতিকে absolute বা স্বয়ম্ভর করে তুলে জীবনকে মরুভূমি করার কথা তারা ভাবতেই পারে না। অতএব কাব্যে যখন অনুভূতির, আবেগের কথা বলা হয় আর সে কথা না বললে কাব্য কাব্য

হয়েই ওঠে না তখন আমরা বলব যে কবির অনুভূতির অনুকরণ করা পাঠকের পক্ষে দুঃসাধ্য। এক যুগের পরিবেশ অন্য যুগে অলভ্য; একই কালে একই পরিবেশে বাস করে আবার দুটি মানুষের মনোগত পরিবেশ বিভিন্ন হয়, এই সত্যটি এখন সর্বজনস্বীকৃত। মহাকবি কালিদাসও এই সত্যটিকে স্বীকার করেছেন: 'ভিন্নরুচিহি লোকাঃ' ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি। তাই আমরা কেউই একই জিনিষ দেখিনা, একই জিনিষ বুঝিনা, একই জিনিষ জানিনা। অর্থাৎ অতিপরিচিত দেখার বস্তুটিকে আমরা সকলেই ভিন্ন ভাবে দেখি। আবার উদাহরণ দিই—আপনি আমি শিমুল সজনে গাছকে দেখেছি চর্মচক্ষে, শিমুল গাছের তুলো হয়, সজনে গাছ থেকে ডাঁটা পেড়ে খাই, বড়জোর সজনে গাছ শুঁয়োপোকার উপদ্রবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আরও অনেক জ্ঞানবান গুণবান পাঠক আছেন, শিমুল সজনে হয়তো তাঁদের আরও কিছু স্মৃতিচারণে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যে শিমুল সজনে কবি রবীন্দ্রনাথকে ঋণে আবদ্ধ করে, কোন্ এক অনাদিকালের মায়ায় কবিমনকে আচ্ছন্ন করে সে শিমুল সজনের কথা আমরা জানি না। গাছের এই অলথ সামান্য শক্তি—এই অমৃতময় রূপ, এই রূপ দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, হয়তো বৃক্ষের আরও মহত্তর রূপ দেখেছিলেন বৈদিক ঋষিরা। সেই দেখা হল 'দর্শন' করা, সীমার মধ্যে অসীমকে প্রত্যক্ষ করা। রবীন্দ্রনাথ গাছ দেখতে গিয়ে সেই দেখার কথা তাঁর একটি প্রবন্ধে বললেন, "এই গাছের রূপটি যে তাঁর আনন্দ রূপ, সে দেখা এখনও আমাদের দেখা হয় নি মানুষের মুখে যে তার অমৃতরূপ, সে দেখার এখনো অনেক বাকি—'আনন্দরূপমমৃতং' এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেইদিনই তারা সার্থক হবে। সেইদিনই তাঁর সেই পরম সুন্দর প্রসন্ন মুখ, তাঁর 'দক্ষিণং মুখং', একেবারে আকাশে তাকিয়ে দেখতে পাব। তখনই সর্বত্র নমস্কারে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়বে—তখন ওষধি বনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না—তখন আমরা সত্য করেই বলতে পারব: যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।"

অতএব চর্মচক্ষে দেখাটা দেখা নয়। মন দেখে, মন শোনে, সেই মনই চল রূপকার; সেই মনই বক্তা আবার সেই মনই শ্রোতা; সে মন রং লাগায়। সেই মনই আবার রং অবলোকন করে। অতএব একের দেখা একের শোনা চিরকালই অপরের কাছে অদৃশ্য এবং অশ্রুত থেকে যায়। একথা কাবা কথা নয়, এ সত্য মনস্তত্ত্বসম্মত। সাহিত্যের যথাযথ সমালোচনা

তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা সাহিত্যিকের কল্পনা থেকে পাঠকের কল্পনায় সঞ্চালন (Communication)-কে সম্ভব বলে মনে করব। অর্থাৎ যখন সাহিত্যিকের দেখা, সাহিত্যিকের শোনা পাঠকের 'দর্শনে' এবং 'শ্রবণে' রূপান্তরিত করতে পারব তখনই সাহিত্য সমালোচনার সামগ্রী হয়ে উঠবে। কবি ওয়ার্ডস্‌বার্থ emotions recollected in tranquillity-র কথা বলেন, সেই আবেগঅনুভূতির নিবিড়তা যদি চিরকালের জন্য অন্যজনার জানার বাইরে থেকে যায় তাহলে কেমন করে কাব্যের এবং সাহিত্যের সমালোচনা সম্ভব হবে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সমালোচনার অর্থই তো হল, সমালোচক বিচার করবেন, কবি তাঁর অনুভূতির কথা, তাঁর ভাবাবেগের কথা, তাঁর হৃদয়উদ্বেলতার কথা যথাযথভাবে পাঠককে জানাতে পেরেছেন কি না। এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে এই অনুভূতি বা আবেগের উদ্দীপন কবির জীবনদর্শন কবির জীবনাদর্শ কবির জীবনবাদ এ সবের দ্বারা অতি নির্দিষ্ট। অতএব কবির আবেগ অনুভূতির যথার্থ অনুধাবন করতে পারলেই আমরা মনে করি কবির মানস-সত্তা তথা জীবনসত্তাকে অবলোকন করা হল। কবির অনুভূতিলোক সাহিত্যি-কের অনুভবের জগৎ চিরকালের জন্য পাঠকের নাগালের বাইরে থেকে যায় বলেই পাঠকের পক্ষে তার নিজের মনোমত একটি রসের জগৎ সৃষ্টি করে তাতে অবগাহন করা সম্ভব হলেও পাঠক কখনই সাহিত্যিকের সৃষ্ট জগতে প্রবেশ করতে পারেন না আর সে অনুপ্রবেশটুকু না ঘটলে সাহিত্যসমালোচনাও সম্ভব নয়। তাই আমাদের মতে কাব্যরসের অনুভব, সাহিত্যরসের আস্বাদন করা সম্ভব হলেও সাহিত্য বা সাহিত্যিকের সমালোচনা করা সম্ভব নয়। অতএব বলা চলে 'সাহিত্য সমালোচনা' কথাটি সোনার পাথর বাটি, যার মধ্যে চিন্তাগত স্ববিরোধিতা নিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

লেখকের সংকট / অন্নদাশঙ্কর রায়

আমি যে কাজ ভালোবাসি সে কাজ করতে পেলে দিনে আঠারো ঘণ্টা খাটতে রাজি আছি। কিন্তু তার বিনিময়ে যেন আমাকে আমার সংসার চালানোর মতো সংস্থান দেওয়া হয়। নয়তো আমাকে বাধ্য হয়ে এমন কিছু

করতে হবে যার থেকে সংসার চালানোর মতো অর্থ আসে। কিন্তু তা যদি করি তা হলে আমি যে কাজ করতে ভালোবাসি সে কাজ করা হয় না। করা হয় এমন কিছু কাজ যে কাজ আমার ভালো লাগে না।

যা ভালোবাসিনে তা করা আমার প্রতিভার অপব্যবহার। যা ভালোবাসি তা করতে না পারা আমার প্রতিভার অব্যবহার। এই অপব্যবহার ও অব্যবহার আমাকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিত। প্রয়োজনের কাজ ও প্রেমের কাজ এই দু'ভাগে প্রতিদিনকে ভাগ করে দিতে হতো। প্রয়োজনের কাজ না করলে প্রেমের কাজ করার মতো সংস্থান জোটে না। প্রেমের কাজ থেকে অর্থ যদি বা কিছু আসে তা প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। প্রেমের কাজ থেকে অর্থ নেওয়া উচিত কি না এবিষয়ে সংশয় জন্মায়। সংশয় উচিত নয়। কারণ সেইটেই আদর্শ। যারা যে কাজ ভালোবাসে তারা সে কাজ করবে। কবিরা কবিতা লিখবে। চিত্রীরা চিত্র আঁকবে। নর্তকরা নাচবে গায়করা গাইবে, বাদকরা বাজাবে। ভাস্কররা গড়বে মূর্তি, নির্মাতারা নির্মাণ করবে মন্দির। অভিনয় করবে অভিনেতারা। খেলা দেখাবে খেলোয়াড়রা। যুদ্ধ করবে সৈনিকরা। রাজ্য চালাবে রাজনীতিকরা। বিচারের ভার বিচারকের। উপরে। আইনজ্ঞের উপরে আইনের ভার। চিকিৎসার কাজ চিকিৎসকের অর্থ নেওয়া উচিৎ নয়, এই যদি হয় নীতি তা হলে তো সমাজকেই করতে হয় এদের সকলের ভরণপোষণের প্রয়োজনোপযোগী ব্যবস্থা। কিন্তু তা করতে গেলে দেখা যাবে মুড়ি মিছড়ির একদর। কিংবা মুড়ির দর মিছরির চেয়েও বেশি। গুণোপযোগী না করলে সে ব্যবস্থাও ধোপে টিকবে না। ডাক্তারে ডাক্তারে অনেক তফাৎ। এঞ্জিনীয়ারে এঞ্জিনীয়ারেও তাই। শিল্পীতে শিল্পীতেও তাই। সৈনিকে সৈনিকেও তাই। সোভিয়েট রাশিয়াকেও এ তফাৎ মেনে নিতে হয়েছে। এখন আর প্রয়োজন অনুসারে নয়, গুণ অনুসারে পারিশ্রমিক। তবে তোমার যদি প্রয়োজন না থাকে তুমি কম নিতে পারো, নাও নিতে পারো। সমষ্টির জন্যে যে ব্যবস্থা সেটা গুণোপযোগীই হয়ে থাকে। তবে সমাজকে এটাও দেখতে হয় যে গুণ যাদের নেই তাদেরও প্রাণ আছে, প্রাণরক্ষার তাগিদ আছে. সে তাগিদ মেটানোর জন্যেও ন্যূনতম ব্যবস্থা চাই।

আসল কথাটা হলো, লেখক যা লিখবে রাজা বা রাষ্ট্র বা সমাজ বা জনসাধারণ বা পাঠকসম্প্রদায় বা প্রকাশক বা সম্পাদক সে লেখার বিনিময়ে লেখককে সংসার চালানোর মতো অর্থ বা অন্ন সরবরাহ করবেন সে যদি

তার লেখার বিনিময়ে কিছুই না পায় বা যৎসামান্য পায়, তাকে যদি ন্যূনতম প্রয়োজনের জন্যে দিনের অধিকাংশ সময় ভাবতে ও খাটতে হয় তা হলে তার কবিতার ধারা আপনি রুদ্ধ হয়ে যায় বা কোনো মতে নিয়মরক্ষার জন্যে সে যা লেখে তা ছাত্রদের রুটিন বেঁধে অঙ্ক কষার মতো ব্যাপার হয়। কবিতা এমন অপ্সরা নয় যে তোমার যখন সময় হবে তারও তখন সময় হবে। বরং তার যখন সময় হবে তখনি তোমার সময় হওয়া চাই। নয়তো সে চলল নিরুদ্দেশ হয়ে।

লেখার জন্যে কিছুই দেব না, এটা একটা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সব জিনিসের দাম আছে, এর যেন কোনো দামই নেই। এটা যেন সময়সাপেক্ষ নয়, অথবা নয় অন্নবস্ত্রনির্ভর। যে লেখে সে যেন মানুষই নয়, তার যেন ঘরসংসার নেই। অথচ একথা যেই তুললে অমনি তোমার লেখার চাহিদা গেল বন্ধ হয়ে। তোমার লেখা আর ছাপা হবে না। তুমি লিখতে চাও তো নিজের ঘরে নিজের জন্যে লেখো। নিজের খরচে ছাপাও। কিন্তু যে কাজ আমি ভালোবাসি তার বিনিময়ে কেউ যদি কিছু দিতে না চায় আর অভিমান-বশত আমিও যদি তা সমাজকে না দিই তা হলে তা শুধু আত্মতৃপ্তির জন্যে, তা লোকতৃপ্তির জন্যে নয়। এটা যে কোনো লেখকের পক্ষেই ক্ষতিকর। সে দিন দিন নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে। লোকজনের সঙ্গে খাপছাড়া বনে যায়। লেখা দশজনের তৃপ্তির জন্যেও বটে। তারা দাম দিক আর নাই দিক একবার তো পড়ুক, পড়ে তৃপ্ত হোক, লেখকমাত্রেরই এটা মনোগত অভিলাষ। অন্তত ভাবীকালে পড়বে এটুকু সান্ত্বনাও যদি না থাকে তবে তো সে রক্তমাংসের মানুষই নয়, সে কাঠপাথরের দেবতা। কেউ আমার লেখা কোনো কালেই পড়বে না, লেখা আমার একক তৃপ্তির জন্যেই, এই যদি হয় লেখকের ধারণা তা হলে তার লেখা একদিন পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছবে। সেও দিন দিন দায়িত্বহীন হয়ে মদ গাঁজা হাশিশ ধরবে।

অপরপক্ষে সমাজের কাছ থেকে বিনিময় আদায় করে নেবার জন্যে আদা নুন খেয়ে লাগা কিংবা যে ধরণের লেখার বাজার দর আছে সেই ধরণের লেখা জোগানো, এতে হয়তো সংসার চালানোর রসদ জুটবে, কিন্তু এ তো সে কাজ নয় যে কাজ আমি ভালোবাসি করতে। এও তো দরকারী কাজের মতো দায় সারার কাজ। এতে আমার অন্তরাত্মার তৃপ্তি নেই। এটা আমার প্রতিভার অপব্যবহার বা অব্যবহার। এর চেয়ে সরকারী কাজ বা দরকারী

কাজ ভালো। তাতে জীবনের অভিজ্ঞতার বিচিত্র সুযোগ। এতে তেমন কোনো সুযোগ নেই। এতে হয়তো লেখার অভ্যাস বজায় থাকে। লিখতে লিখতে লেখার ভাষা মসৃণ হয়, শৈলী পরিপাটি হয়। কিন্তু সার কোথায়? শাঁস কোথায়?

লেখকের পন্থা হচ্ছে ক্ষুরধার পন্থা। টাকা না পেলে লিখব না এটা যেমন ভুল, তেমনি ভুল, টাকা পাচ্ছি বলেই লিখছি। লিখে আপনাকে সৃষ্টির দায় থেকে মুক্ত করা এর চেয়ে উচ্চতর মার্গের কথা। না লিখে আমি পারিনে, কে যেন আমাকে জোর করে লিখিয়ে নিচ্ছে, বাইরে থেকে নয় ভিতর থেকে, এটাও উচ্চতর মার্গের উপলব্ধি। সত্যিকার সাধনলব্ধ সত্যের বা রসের বা রূপের মূল্য কে কবে পেয়েছে বা পেতে পারে! দেবেই বা কোন্ রাজা বা রাষ্ট্র বা সমাজ বা পাঠকসাধারণ! শেষ বিশ্লেষণে কবি বা রূপকার হচ্ছে দাতা। পাঠক বা দর্শক হচ্ছে গ্রহীতা। বিনিময়ের প্রশ্ন যদি ওঠে তো সেটা নিঃস্বার্থ ও নিশর্ত ভালবাসার। আমি ভালোবাসি দিতে, তুমি ভালোবাস নিতে। আমি ভালোবাসি রাঁধতে, তুমি ভালোবাস খেতে। বিনিময় বলতে এই বোঝায়। এই নিয়ে সন্তুষ্ট যারা তারাই সুখী।

কোনো কোনো লেখকের হাতে লেখনী হতে পারে তরবারির চেয়ে জোরালো। তাঁর এক একটা শব্দ মন্ত্রের মতো কাজ করে। তার থেকে ঘটতে পারে বিপ্লব বা যুদ্ধ। কে না জানে যে ফরাসী বিপ্লবের জন্যে ঐতিহাসিকরা দায়ী করেন রুশো ভলতেয়ার ও এনসাইক্লোপীডিয়া রচনানিরত গোষ্ঠীকে? তেমনি প্রথম মহাযুদ্ধের জন্যে নীটশেকে আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইহুদী উৎসাদনের জন্যে ভাগনারের জামাতা জার্মান বনে যাওয়া ইংরেজ বংশীয় হাউসটন চেম্বারলেনকে? লেখনী দিয়ে মানুষকে বাঁচানো যায়, মারানো যায়, মোহিত করা যায়, সম্মোহিত করা যায়, বীরত্বে উদ্বোধিত করা যায়, কাপুরুষ করে রাখা যায়, আকাশে তুলে দেওয়া যায়, পাতালে নামিয়ে দেওয়া যায়। মিথ্যা ইতিহাস, মিথ্যা জীবনী, মিথ্যা কাহিনী মানুষের কম অনিষ্ট করেনি। লেখকমাত্রেই সত্যনিষ্ঠ বা নীতিবিদ্ বা রুচিমান বা রূপস্রষ্টা বা রসজ্ঞ নন। লেখার প্রকাশ নিষিদ্ধ করার বা লেখককে নীরব করার পক্ষেও যুক্তি আছে। কিন্তু এর ফলে ইতিহাসের এক একটা যুগ অন্ধকার যুগে পরিণত হয়েছে। কারণ লেখকরাই সভ্যতার আলো।

আলো নিবিয়ে দেওয়া যত সহজ আলো জ্বালিয়ে তোলা তত সহজ নয়। এই ঝড় ঝাপটার যুগে কে কেমন করে আলো জ্বালিয়ে রাখবে এটা কি তার একার দুর্ভাবনা? না সমাজেরও এ বিষয়ে কিছু করবার আছে?

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের ভাবনা

নারায়ণ চৌধুরী

বর্তমান বৎসর (১৯৭৫) আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ রূপে চিহ্নিত হয়েছে ও তার সেইভাবে উদ্‌যাপন চলছে। এই উপলক্ষ্যে পৃথিবীর দেশে দেশে নারীর মর্যাদা ও গৌরবের দিকটি তুলে ধরে নানাবিধ উৎসব-অনুষ্ঠান, আলোচনা-চক্র, ভাষণ, লিখন ইত্যাদির জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদপত্রে এই সমস্ত বিবিধ ক্রিয়াকলাপের বিবরণ পাঠ করতে করতে হঠাৎ মনে হলো এই জোয়ারে সামান্য এই লেখক আমিও কেননা একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ যোগ করার চেষ্টা করি। সেই চিন্তা থেকেই বর্তমান প্রবন্ধের সূত্রপাত।

অবশ্য গোড়াতেই বলে নিই, আমি অতিরেকের ধার দিয়ে যাব না। নারীকে স্বর্গের দেবী বানাবার ইচ্ছাও আমার নেই, আবার মনু প্রমুখ এদেশের শাস্ত্রীয় বিধানদাতাদের মত নারীকে নরকের দ্বার রূপে অভিহিত করবার প্রভুত্বব্যঞ্জক আত্মগর্বী মনোভাবও আমার নেই। পাশ্চাত্যের নারীবিদ্বেষী লেখকেরা, যেমন শোপেনহুর, নারীর গুণাবলীর প্রতি বিমুখ হয়ে কেবলমাত্র তার দোষের দিকগুলিকেই লোকচক্ষে প্রকটিত করে তোলবার চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরই ধারা বেয়ে তাঁরই দেশের আর একজন মানুষ পরবর্তীকালে নারীকে রন্ধন ও সন্তানপালনের যন্ত্র ভিন্ন আর কোন ভূমিকায় অধিষ্ঠিতা দেখতে চাননি। আমি জার্মান ফুয়েরার হিটলারের কথা বলছি। আবার এর বিপরীত দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। নারীকে সৌন্দর্য, মাধুর্য, লজ্জা, কমনীয়তা, স্নেহশীলতা, সেবা, মমতা ইত্যাদি বিচিত্র সদ্‌গুণের আধার কল্পনা করে তাকে জীবনের মর্মমূলে নিহিত হ্লাদিনী শক্তিরূপে স্তুতি করা হয়েছে। শুধু মোহিনী নয়, কামিনী নয়, তাকে স্বর্গের কল্যাণলক্ষ্মী রূপে বন্দনা করে তার পায়ে পূজার সর্ববিধ উপচার সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। নারী দেবীরূপে চর্চিতা হয়েছেন। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মনোভাব ছিল অদ্ভুত। তাঁরা একই সঙ্গে নারীকে শক্তির শ্রেষ্ঠ আধার ও কোপের সহচরী রূপে কল্পনা করেছেন। যিনি সকল কাজের প্রেরণাদাত্রী ও সংগ্রাম জয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহায়, তিনিই আবার সেবাদাসী! জায়া প্রিয়া মাতা দেবী ও দাসী সব ভূমিকা একটি সত্তায় আরোপ করতে নারীকে এদেশে সনাতনকাল থেকে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী স্নায়ুর জগড়ভ্রংশ পুঁটলীতে পরিণত করে

তোলা হয়েছে। পুরাতন সংস্কৃত শ্লোকগুলির পরস্পরবিরুদ্ধতায় এক বক্তব্য অন্য বক্তব্যে খণ্ডিত হয়ে গেছে।

নারী দেবীও নয়, দাসীও নয়। মনে হয় তার অবস্থান এই দুই বিপরীত প্রান্তের মধ্যবর্তী কোনও এক জায়গায়। সেটা কোথায় আধুনিককালীন চিন্তাধারার আলোকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। নারীর স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের সর্বপ্রথমে নিরূপণ করা দরকার। আধুনিক মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান এ কাজে আমাদের সহায় হতে পারে। অবশ্য নারীর স্বভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। পুরুষ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থার যুগযুগব্যাপী অত্যাচার ও অবিচারের ফলে নারীর মনের গড়ন এমন একটা বিশেষ ছাঁচে তৈরি হয়ে গেছে যে তার অভ্যাসই প্রায় তার স্বভাবের স্থান গ্রহণ করেছে। অভ্যাসকে দ্বিতীয় স্বভাব বলা হয়। সেটা অকারণ বলা হয় না। বিশেষ করে নারীজাতির বেলায় এ কথার যাথার্থ্য বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। দুষ্টচক্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য-পুষ্ট পুরুষজাতির অন্যায় শাসন নারীর স্বভাবকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে এবং সেই পশ্চাদ্‌পদ নারীস্বভাব আবার নিজের অনুচিত প্রভাব খাটিয়ে সমাজকে পিছনে টেনে রেখেছে! এই হলো আমাদের সমাজের চিত্র, বস্তুতঃ সব সমাজেরই চিত্র। কম-বেশি এ কথা সকল দেশ সম্পর্কেই সমান খাটে।

নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের তত্ত্ব আজ একটি বাঞ্ছনীয় আদর্শরূপে সবদেশেই স্বীকৃত। এ যুগের প্রবহমান সুস্থ সাম্যের নীতির সঙ্গে এই তত্ত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই এ তত্ত্বের সমর্থনে সম্যকদর্শী ব্যক্তি মাত্রকেই এগিয়ে আসতে দেখা যায়। কিন্তু একই সঙ্গে কৌতুক ও পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, এই তত্ত্বকে কাজে খাটাবার পথে নারীই নারীর সবচেয়ে বড় বাধা। যখনই নারীপুরুষের সমানাধিকারের নীতিকে বাস্তবে রূপদান করবার জন্য প্রকল্প, প্রস্তাব, কার্যক্রম, আইন ইত্যাদি প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়, নারীর কাছ থেকে তার বিরুদ্ধতা আসে অভাবনীয় রূপে। কখনও কখনও নারীর উন্নতির চেষ্টায় নারীই সবচেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কেন এমনটা হয় সেটা আপাতদৃষ্টিতে একটা ধাঁধার মত মনে হতে পারে কিন্তু পূর্বের অনুচ্ছেদে নারীস্বভাবের বিশেষ ছাঁচের বিষয়ে যে কথা বলেছি সে-কথা মনে রাখলে একে আর ধাঁধা বলে মনে হবে না। নারীস্বভাবেই নারীর অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় নিহিত।

দুই-চারটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হতে পারে। ইংলণ্ডে যখন গত শতকের শেষের দিকে এবং এ শতকের গোড়ায় পার্লামেন্টের নির্বাচনে মেয়েদের ভোটদান ও আসনলাভের অধিকারের দাবিতে ইংলণ্ডের তদানীন্তন আলোকপ্রাপ্তা নারীকুল লেডী প্যাঙ্কহর্স্টের নেতৃত্বে সাফ্রাজিস্ট আন্দোলন করেন, সে দেশে একটা তুমুল গোলমাল পড়ে গিয়েছিল। রক্ষণশীল দলের সদস্যদের বাধা দেবার কথা, তাঁরা বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, রক্ষণশীল সদস্যদের ঘরণীরাও সব দল বেঁধে সাফ্রাজিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধতায় নেমেছিলেন। নারীই নারীর উন্নয়নচেষ্টার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সাফ্রাজিস্টরা দমবার পাত্রী ছিলেন না। তাঁরা পথাবরোধ করে, পার্লামেন্ট হাউসের দরজা জানলার শার্সি আর কাঁচ ভেঙে তাঁদের দাবি আদায়ের অনুকূলে জনমত প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের দাবির কাছে পার্লামেন্টকে নতি স্বীকার করতে হলো ইংলণ্ডের নারীকুল ভোটাধিকার পেল। কিন্তু তার ফল কী দাঁড়িয়েছিল ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত সকলেই সে কথা জানেন। ভোটাধিকারপ্রাপ্তা সাবালিকা ইংরেজললনার দল বেছে বেছে সেই সব পুরুষ প্রার্থীকে ভোট দিয়ে পার্লামেন্টে পাঠাতে লাগলেন যাঁদের গুণপনা ছিল সামান্যই কিন্তু সকলেই যারা সুরূপ ছিলেন। বার্নার্ড শ' এ ব্যাপারে ঠাট্টা করে লিখেছেন, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র না হলেও নারীজাতির মধ্যে অবশ্যই। নির্বাচনপ্রার্থীদের সুন্দর মুখ সদ্য ভোটাধিকার অর্জনকারিণীদের বিচার ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে দিয়েছিল। নারীর রূপের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভরে উঠেছিল।

আমাদের দেশের সাম্প্রতিক হিন্দু কোড বিলে পুরুষদের একবিবাহ, বিবাহিতা নারীর ডিভোর্সের অধিকার এবং পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের সহিত কন্যাসন্তানেরও সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছে। এ সবই অত্যন্ত প্রগতিশীল ব্যবস্থা এবং যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত। বিশেষতঃ এই বিলের অর্থনৈতিক বিধানটির তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। নারীর অনুন্নত অবস্থার একটা প্রধান কারণ তার অর্থনৈতিক পরাধীনতা। এই অর্থনৈতিক পরাধীনতার কারণেই ভারতীয় হিন্দু নারীর পায়ে যুগ যুগ ধরে অধীনতার শৃঙ্খল পরানো। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী যদি কিয়ৎপরিমাণেও আত্মনির্ভর হতে পারতো তো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরুষের পক্ষে তাকে

এমন নিরঙ্কুশ কাজে শাসন ও পীড়ন করা সম্ভব হতো না। হিন্দু কোড বিলে পুত্রের সঙ্গে কন্যাসন্তানকে পিতৃসম্পত্তিতে সমানাধিকার দানের প্রস্তাবে নারীকে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতার ক্ষেত্রে বেশি দূর না হলেও কিছু পরিমাণ অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্র-সীমিত সুতরাং স্বভাবতঃই এর দ্বারা সমস্যার সামান্য মাত্র অংশই প্রতিকার্য। কিন্তু তাজ্জবের ব্যাপার এই যে, এই বিল যখন পর্বে পর্বে আলোচনার মধ্য দিয়ে লোকসভায় আইনরূপে বিধিবদ্ধ হতে যাচ্ছিল তখন কিন্তু সচ্ছল ও অভিজাত হিন্দু সমাজের একাধিক প্রভাবশালী মহিলা এই বিলের বিরুদ্ধাচরণ করবার উদ্দেশ্যে আন্দোলনে নেমেছিলেন। খুব সম্ভব তাঁরা তাঁদের পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্রের মন্ত্রণাতেই এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁদের এই কাজের মূলে যাঁরই প্ররোচনা থাকুক, তাঁরা যে তাঁদের নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারতে উদ্যত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

দীর্ঘদিনের অত্যাচার-প্রপীড়নের ফলে নারী আপন স্বার্থ সম্পর্কে আদৌ অবহিত নয়। সহস্র বৎসরের অভ্যাসে পুরুষের আনুগত্য তার দ্বিতীয় স্বভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে পতিব্রতা নারীর সব সহা ধরিত্রীর অনুরূপ যে অসামান্য সহনশীলতা ও ক্ষমার চিত্র দেখতে পাই (শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এ কথার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়, দৃষ্টান্ত শুভদা উপন্যাসের শুভদা চরিত্র, বিরাজ বৌ উপন্যাসের বিরাজবৌ চরিত্র, শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের অন্নদা দিদি প্রভৃতি) তা কখনোই সম্ভব হতে পারতো না, নারীর মধ্যে দাসীত্বের সংস্কার যদি বদ্ধমূল না হতো। আমেরিকার নিগ্রো-মুক্তির প্রথম পর্বে এবং রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের আমলে যখন সার্ফদের দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় তখন অনেক নিগ্রো আর সার্ফই স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করতে চায়নি। দীর্ঘদিনের দাসত্বের অভ্যাসে প্রভুভক্তি তাদের কাছে অস্তিত্বের সার্থকতার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল—যদিও সেই অস্তিত্ব ছিল অত্যাচারে ও নিষ্পেষণে পদে পদে যন্ত্রণাজর্জর। ভারতীয় নারীরও এই মুক্তিপূর্ব নিগ্রো আর সার্ফদের মতই অবস্থা। শৃঙ্খলমোচনে তাদের বড়ই আপত্তি।

তৃতীয়তঃ নারীর মধ্যে সংরক্ষণকামিতা বড্ড বেশি। অধিকারের বৃত্ত তার খুবই সংকীর্ণ, কিন্তু যেটুকু আছে তাকে সে প্রাণপণ বলে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় আর তার থেকে মাঝে মাঝে ঘটে নানারকমের বিপত্তি। কিন্তু

ও ঐশ্বর্যের সম্পদহীনতাকে সে প্রায়শঃ স্বামী নামক সম্পত্তির উপর পুরাপুরি অধিকার কায়েম করে পুরণ করতে চায়। স্বামী পুত্রসংসার এই নিয়ে তার যে ছোট্ট গণ্ডীবদ্ধ জগৎ, সেই জগতে তার অধিকার পাকা করবার জন্য তার প্রযত্নের অন্ত নেই তার নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা বড়ই তীক্ষ্ণ। এই বোধের পরিতৃপ্তির জন্য সে সবলে তার স্বামীপুত্রকে আঁকড়ে ধরে এবং স্বামীপুত্রের সহায় দুর্ভাগ্যক্রমে অপগত হলে তার ভরণপোষণের উপায় রূপে গয়নার পাঁটরা (মধ্যবিত্ত ঘরের ঘরণী হলে) কিংবা শ্রমক্ষমতা (শ্রমিক পরিবারের নারী হলে)-কে বিশেষভাবে আশ্রয় করে। মোট কথা স্বামী বর্তমানেই হোক আর স্বামী বিহনেই হোক নিরাপত্তাবোধের তার বড়ই প্রয়োজন। না হলে অস্তিত্ব তার পদে পদে বিপন্ন হয়। আসলে স্বামীপ্রেম, পতিভক্তি, সতীত্ব প্রভৃতি যে সব বড় বড় আদর্শের কথা বলা হয়, সেগুলি আর কিছু নয়, খতিয়ে দেখলে তা নারীর নিরাপত্তার মহামূল্য মাশুল স্বরূপ। নারী সতীত্বের মূল্যে তার জীবনব্যাপী আশ্রয়দাতার ঋণ শোধ করে।

এই পর্যন্ত নারীর সংরক্ষণকামিতা বা স্বামীসংসারের দ্বারা বৃহত্তর সম্পদের অভাববোধের নিবৃত্তির অভ্যাস খুবই সুন্দর ও সুসঙ্গত। কিন্তু এই সীমা ছাড়ালেই মুশকিল। নারী যদি একবার বৃহত্তর সম্পদ বা ক্ষমতার স্বাদ পায় তা হলে বাঘের প্রথম মনুষ্যরক্তের স্বাদের মত তার সেই স্বাদের স্পৃহা ক্রমেই দুর্নিবার আর দুর্জয় হয়ে ওঠে। ক্ষমতা পেয়ে ক্ষমতা সে ছাড়তে তো চায়ই না, বরং উত্তরোত্তর আরও বেশি ক্ষমতা করায়ত্ত করার জর্ক মত্ত হয়ে ওঠে। তখন ক্ষমতা দখল করা আর একবার ক্ষমতা পেলে যেনতেন-প্রকারেণ সেই ক্ষমতা রক্ষা করাই তার একমাত্র ব্যসনে পরিণত হয়। এদেশে নারী কর্তৃক জমিদারী কিংবা অনুরূপ সম্পত্তি গ্রহণের যতগুলি দৃষ্টান্ত দেখা যায় তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমিতর নজির চোখে পড়ে। অত্যাচারী প্রজা-পীড়ক রূপে তারা দুর্নাম কেনে। শুধু তাই নয়, বিপক্ষের প্রতি শত্রুতাচরণে আর ক্ষমাহীনতায়ও তাদের জুড়ি দেখা যায় না। ছলবল কৌশল সবই তখন তাদের হাতের তেলোয় আমলকী ফলটির মত হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং পুরুষ আর নারীর সমানাধিকারের আদর্শ তত্ত্বগতভাবে শুনতে যতই সুশ্রাব্য শোনাক, কোথাও কোথাও তাতে সীমারেখা টানা দরকার। নারী আর পুরুষ শারীরিক মনস্তাত্ত্বিক কারণেই পুরাপুরি সমান হতে পারে না। তাদের দুইয়ের বিবরণের ক্ষেত্র আলাদা এবং সে ক্ষেত্র আলাদা থাকাই ভাল।

এই যৌলিক ভেদ রেখাটি মেনে নিয়ে তারপর পুরুষ আর সমানত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন বাধা দেখি না। নারীকে শিক্ষায় দীক্ষায় স্বাস্থ্যে ও ব্যক্তিত্বে, শক্তি ও প্রতিভায় যত বেশি উজ্জ্বল করে তোলা যায় ততই সমাজের কল্যাণ। তা ব'লে তাল ঠুকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীকে পাল্লা 'দতেই হবে এ কথা মেনে নেবারও কোন যৌক্তিকতা নেই। অবশ্য আমরা যখন নারীর চলাচলের বৃত্তের স্বাতন্ত্র্যের কথা বলছি, তার দ্বারা এ কথা বোঝাচ্ছি না যে, নারীকে পুনরায় রন্ধনশালার খাঁচায় পুরে দিতে হবে কিংবা সন্তান গর্ভে ধারণ ও সন্তান পালন ছাড়া তার অন্য কোন করণীয় নেই। মোটেই নয়। নারীর প্রসুপ্ত শক্তিকে সব দিক থেকেই বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার জন্য শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত শিক্ষা সমাজসেবা রাজনীতি প্রশাসন প্রভৃতি কর্মতৎপরতার কোনটিই তার পক্ষে অনাচরণীয় রাখলে চলবে না। রাখতে চাইলেও সে কথা কেউ শুনবে না। যুগের প্রয়োজনেই নারী ঘরের বার হয়েছে, বৃহত্তর কর্মজগতে পুরুষের শরিক হয়েছে, তাকে আর ঘরের কোণায় আবদ্ধ রাখা যাবে না।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে, পুরুষ আর নারীর অনুভবের ক্ষেত্রকে একাকার করে তুলতে হবে, দুইয়ের মধ্যবর্তী সব বেড়া ঘুচিয়ে দিতে হবে। শারীরিক আর জৈব কারণেই এই ধরণের একীকরণ সম্ভব নয়। পুরুষ আর নারীর আচরণের সমস্ত স্তরে জোর করে একীকরণ করতে গেলে হিতের চেয়ে আহত হবার সম্ভাবনাই বেশি।

জোর করে একীকরণের চেষ্টা করতে গেলে কী রকম ফল দাঁড়ায় তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের দেশে মেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ নাকি লজ্জা, তাদের প্রায়শঃ লজ্জানতা লতিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়। কবিদের কাব্যে ক্রীড়াশীলা নতমুখী সতত লজ্জাকম্প্র ষোড়শীর বা যুবতীর যে-বর্ণনা পাই তার রূপ মধুর। মেয়েদের সম্ভ্রম এতই স্বতঃসিদ্ধ যে, সেই সম্ভ্রমের পানটি থেকে চুনটি পর্যন্ত খসবার উপায় নেই। খসলে তজ্জন্য দুইপক্ষে মারামারি বেধে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। এমন কি কখনও কখনও অতীতে এইজন্য 'রায়ট' হতেও দেখা গেছে। কিন্তু পথেঘাটে আজকাল শিক্ষিতা আধুনিকা তরুণীদের যে বেশে সজ্জিতা দেখতে পাই তা কি কবিপ্রোক্ত ও প্রবাদবিদিত নারীর লজ্জাশীলতার ধারণাকে পরিপুষ্ট করে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে? গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমেও এই অনাবরণ চেষ্টায় গূঢ় অভিপ্রায় আমরা

অনুমান করবার চেষ্টা করব না, তবে ঐতিহ্যের দ্বারা মহিমান্বিত ভারতীয় নারীর সহজাত লজ্জার ধারণার সঙ্গে যে এ জিনিস একেবারেই মেলেই না সে কথাটি বলা দরকার। আধুনিকা তরুণী একই সঙ্গে লজ্জাশীলতার খ্যাতির সুবিধা আহরণ করতে চাইবে আবার পোশাকে-আষাকে লজ্জার ধার দিয়েও যাবে না—এ হয় না। দুইয়ের ভিতর একটিকে তাদের বেছে নিতে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে 'পথের দাবী'র ভূমিকা

কল্পতরু সেনগুপ্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ও সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সের যৌথ উদ্যোগে বাংলা সাহিত্যের পাঠকমহলে সম্প্রতি এক সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এই সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাস পাঠকদের কাছে এখনো শরৎচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পাঠকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি, তাঁর সৃষ্ট নায়ক নায়িকারা খুবই জনপ্রিয়।

শরৎচন্দ্রসৃষ্ট নায়কদের মধ্যে একজন শ্রীকান্ত, তার দরদীমন ও মানবিক গুণের জন্য পাঠকদের কাছে অবিস্মরণীয়। এই চরিত্রটির মধ্যে সুস্থ মনের বাঙালিরা তাঁদের জীবনের কোন না কোন সময়ের প্রতিচ্ছবি দেখেন। চরিত্রটি বহু পরিবেশের সাক্ষী অথচ সংযত, এবং সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আশাবাদী। বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষ এবং নারীদের প্রতি কর্তব্য বোধ সম্পন্ন। এ চরিত্র জীবনকে ভালবাসতে প্রেরণা দেয়।

আর একটি বিস্ময়কর চরিত্র 'পথের দাবী'র সব্যসাচী। যিনি বহুনামে, নানাবেশে পাঠকদের সামনে উপস্থিত হয়ে অভিভূত করেন। যে মানুষটি দেশের মুক্তিসাধনায় উৎসর্গীকৃত-জীবন। কোন মোহ নেই, লোভ নেই, আত্মগরিমা নেই, সাধারণ এক মানুষ। একটি আদর্শ বিপ্লবী চরিত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। সে সময়ে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। লাহোর থেকে বার্মা পর্যন্ত সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবের প্রচার চলছিল, যাতে ভারতীয় সৈন্যরা এই অভ্যুত্থানে যোগ দেয়। এই বিপ্লব

প্রচেষ্টার নায়ক ছিলেন বাঙালি রাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্রনাথ রায়, বিপিন গাঙ্গুলী, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং আরো অনেকে ; মারাঠি পিংলে, পাঞ্জাবী কর্তার সিং, সর্দার গুরুদিৎ সিং প্রমুখ আরো অনেকে। যাঁরা অতি গোপনে এই বিপ্লব প্রচেষ্টার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন 'পথের দাবী'র সব্যসাচী এঁদের সবাকার মিলিত একটি প্রাতিনিধি চরিত্র।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'পথের দাবী'র একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ফৌজী শক্তিকে সহযোগী করে বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সাময়িক দিশেহারা ও হতাশার অবস্থা দেখা দিয়েছিল। আবার পুর্নোদ্যমে বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সংগঠনের কাজ শুরু হয়। এই নব উদ্যোগের দিনে 'পথের দাবী' প্রকৃতপক্ষে সংগঠনের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯২২ সালের দিকে 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় 'পথের দাবী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের দিন থেকে বিপ্লবী যুবসমাজের দৃষ্টি এই লেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁরা 'পথের দাবী'র কাহিনী ও চরিত্রগুলির মধ্যে নিজেদের জীবন ও স্বপ্নের প্রতিফলিত রূপ দেখতে পান এবং সংলাপ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ১৯২৬ সালের আগষ্ট মাসে 'পথের দাবী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের কয়েকমাস পরে ১৯২৭ সালের জানুয়ারির ১২ তারিখ ইংরেজ সরকার বইটিকে বাজেয়াপ্ত করে। বাজেয়াপ্ত করার পরে বইটির চাহিদা আরো বেড়ে যায় ; এক কপি বই একশ টাকায় পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। অসাধু লোকেরা প্রকাশকের অজ্ঞাতে গোপনে বইটি ছাপিয়ে ব্যবসা করেছে বলেও তখন শোনা যেত।

'পথের দাবী'র প্রকাশ প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা বলা দরকার। 'পথের দাবী'র মত বই ইংরেজ আমলে কখনই প্রকাশিত হতে পারত না—যদি স্যার আশুতোষ মুখার্জির মত লোকের এতে আগ্রহ না থাকতো। রমাপ্রসাদ মুখার্জি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ তাঁর পুত্ররা উৎসাহী হওয়ায় 'পথের দাবী' ছাপা হয়ে পাঠকদের হাতে আসতে পেরেছে। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকাটি স্যার আশুতোষের বাড়ি থেকে তাঁদের পরিবারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হতো। সম্প্রতি স্যার আশুতোষপুত্র শ্রীউমাপ্রসাদ মুখার্জি মহাশয় এক প্রবন্ধে 'পথেরদাবী' প্রকাশের ঘটনাবলী সবিস্তারে প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মূল্যবান তথ্য সংযোজন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন বিপ্লবীদের গোপন সংগঠন ও কাজকর্মের কায়দায় ছাপানো, বাঁধানো ও

বিক্রির ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন। পাছে পুলিশ বইটি প্রকাশের কথা জানতে পারে তাই 'বঙ্গবাণী'র মার্চ সংখ্যায় উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘোষণা না করে ক্রমশঃ কথাটা ছাপা হয়েছিল। তারপরে আগস্ট মাসে স্যার আশুতোষ পরিবারের টাকায় বইটি প্রকাশ হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, 'পথের দাবী'র প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল হ্যারিসন রোডের (মহাত্মা গান্ধী রোড) এস, কে, লাহিড়ীর কটন প্রেসে এবং বইটি বাঁধাই করেছিলেন বৈঠকখানা রাস্তায় মুহম্মদ ইসমাইল দপ্তরী। 'পথের দাবী' আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, সেই সঙ্গে প্রকাশক, মুদ্রণালয় ও বাঁধাইকারীর নামও সগৌরবে যুক্ত হয়ে আছে।

বিশদশকের শেষ ভাগে দেশের মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার মত এত বইপত্র ছিল না। যে কয়টি বই পড়া হতো তার মধ্যে আনন্দমঠ, স্বামী বিবেকানন্দের রচনা, গ্যারিবল্ডির জীবনী, আয়ার বিদ্রোহের কথা ইত্যাদির মধ্যে 'পথের দাবী' ছিল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। অতি গোপনে বইটি রাখা হতো, রাত জেগে পড়া হতো, বইটি নিয়ে আলাপ আলোচনা ছিল শিক্ষার অংশ। বিপ্লবী দলের নেতারা চিঠিপত্রে 'পথের দাবী'র চরিত্রগুলি থেকে দৃষ্টান্ত টেনে বক্তব্য প্রকাশ করতে। এভাবে ১৯২২ সাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাথমিক কাল পর্যন্ত একজন ফেরারী বিপ্লবীর মত 'পথের দাবী' স্বদেশমুক্তির প্রেরণা জুগিয়েছে, সংগঠন গড়েছে। কত যুবক যুবতী এই নিষিদ্ধ বইটি রাখার দায়ে পুলিসের অত্যাচার সয়েছেন, জেল খেটেছেন।

কিন্তু গণ-আন্দোলনের তরঙ্গের পর তরঙ্গে এক সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসিত বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী এ, কে, ফজলুল হক সাহেব 'পথের দাবী'র ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। ব্রিটিশশাসিত অবিভক্ত বাংলাদেশে ফজলুল হক সাহেব কৃষিজীবি ও গ্রামের গরিবদের জন্য কিছু ভাল কাজ করে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে সাহিত্যের স্বাধীনতায় তাঁর একাজটিও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকা থাকে। আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর বিশেষ ভূমিকা আছে, পরের পর্যায়ে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' এক গৌরবময় স্থান গ্রহণ করে। এসময়ে 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' প্রভৃতি

রবীন্দ্র উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে স্বদেশচেতনা ও প্রগতিশীল মনোজগতের চিন্তা ও দ্বন্দ্ব। স্বাধীনতা সংগ্রামে যখন থেকে সুগঠিত শ্রমিকশ্রেণী উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করল তারই সঙ্গে এল ম্যাক্সিম গর্কীর 'মা'। স্বদেশচেতনাকে পরিপুষ্ট করল 'মা' শ্রেণীচেতনা দিয়ে। 'মা' রুশ সাহিত্যের একটি চিরায়ত সৃষ্টি। নভেম্বর বিপ্লবে সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করে এ বই সারা জগতের শোষিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের সাথি হয়েছে। দেশকালের সীমা পার হয়ে এই বই আমাদেরও মুক্তি সংগ্রামের সাথি।

আজ সারাদেশে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। নতুন করে শরৎরচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর রচিত উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয় হচ্ছে, বক্তারা ভাষণ দিচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ছে শরৎচন্দ্র সমাজবিচ্ছিন্ন সাহিত্যিক ছিলেন না। সমাজের ভালমন্দ আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন না বলেই প্রবলপ্রতাপ বিদেশী শাসনকালে বিপ্লবী যুব সমাজের উদ্দেশে তরুণের বিদ্রোহ' অভিভাষণ দিতে পেরেছিলেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে চলার মত সাহস ও বলিষ্ঠ মন ছিল বলেই তাঁর পক্ষে 'পথের দাবী' রচনা করা সম্ভব হয়েছে। মানুষের অন্তরের সংগে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং তা প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে স সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে রমা, পিয়ারী-বাঈজী, অন্নদাদিদিদের চরিত্র উপস্থিত করতে পেরেছেন বিরাট এক জিজ্ঞাসার মত সমাজে নারীর স্থান কোথায়? তিনিই প্রথম গফুরকে বাংলাসাহিত্যের পাড়ায় এনেছেন। শরৎচন্দ্রের জন্মের শতবর্ষ পরে আজো রয়েছে তাঁর দেখা গ্রাম, সেই সমাজ। হয়তো কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সেই পানাপুকুর, ভাঙারাস্তা, রোগ, বুভুক্ষের দীর্ঘশ্বাস আর শক্তিমানের পীড়ন আজো আছে। রমা রমেশ, সতীশ কিরণময়ী, অপূর্ব ভারতীদের কথা এখনো শোনা যায়।

শরৎচন্দ্র আজো জনপ্রিয়তার শীর্ষে, আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সমীক্ষায় একথা প্রমাণিত হওয়ায় অনেকের ভুল ধারণা ভেঙে গেছে যাঁরা মনে করতেন শরৎ সাহিত্যের চাহিদা কমে গেছে। এই জনপ্রিয়তায় একথা আবার প্রতিপন্ন হল যে সাহিত্যিকরা প্রেরণা লাভ করেন জনজীবন ও মানুষের সংগ্রাম থেকে। যে সাহিত্যিক সংগ্রামের কাছাকাছি থাকতে পারেন তাঁর সাহিত্য বলিষ্ঠ হবার মত উপাদান লাভ করে। সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ। মানুষের অপরাজেয় শক্তির প্রকাশ, মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এবং আশাবাদে উজ্জ্বল সত্যিকার সাহিত্য।

উপকথার নায়ক

ডঃ সুধীরকুমার করণ

মানুষ যখন পশু ছিল তখন থেকেই সে অন্য পশুদের স্বভাব লক্ষ্য করতে করতে নিজের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। এবং মানুষ যে পশু নয় একথা বারবার ঘোষণা করে পশুর সঙ্গে তার আত্মীয়তা-সূত্র ছিন্ন করার বাসনায় বিবর্তিত হয়েছে। অথচ মানুষ ভালভাবেই জানে যে রূপে পৃথক হ'লেও স্বভাবে সে পশুর আত্মীয়। তবুও রূপগত পার্থক্য থাকার জন্য সেই আদিম কাল থেকে, অরণ্যে পর্বতে, সমুদ্রে তটিনীতে অন্তর্মিধি প্রাণীপুঞ্জের দিকে, সে ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিপাত করে এসেছে। জৈব কারণেই, স্থলচর-জলচর-নভশ্চর প্রাণী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করেছে এবং এইভাবেই কোন্ প্রাণী হিংস্র, কে দুর্বল, কে বুদ্ধিমান, কে ভীরু—কে ভক্ষ্য, কে অভক্ষ্য, কে কি, সবকিছু ধারণাই ক্রমশঃ মানুষের নখদর্পণে এসে পড়েছিল। এই সব প্রাণীদের কিছু কিছু আবার অন্যভাবেও মানুষের অন্তরঙ্গ হয়েছিল। মূলতঃ তার আদিম ধর্মবিশ্বাসের ও যাদুবিশ্বাসের মাধ্যমে নাচে-গানে পর্ব-পার্বণেও বিভিন্ন প্রাণী অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এইভাবে মানুষের ভয়ে বিশ্বাসে, শ্রদ্ধায়, জীবিত প্রাণী কোন কোন সময়ে অলৌকিকরূপেও প্রতিভাত হয়েছে এবং আত্মসম্পর্কিত আদিম বিশ্বাসের ফলে মৃত পশুও তাদের কাছে পূজ্য হয়ে উঠেছিল। টোটেম-হিসাবে বিভিন্ন প্রাণীর পূজাপ্রাপ্তি আজও পৃথিবীর বহু আদিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান, এমন কি সভ্য সমাজেও অধুনাতন লোক বিশ্বাস থেকে এই আদিম-ভাবপ্রবাহ এখনও পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় নি।

লোকবিশ্বাস যে স্তরে যত প্রাচীন, পশু সম্পর্কিত নানা অলৌকিক বিশ্বাসও সেই স্তরে তত দৃঢ়। লোকবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত কাহিনীতে, পশু মানুষের মতই বাক্যবাগীশ, মানুষের চেয়েও ক্ষমতাবান, এবং প্রায়ই অলৌকিক শক্তির অধিকারী। এই লোকবিশ্বাস থেকেই উপকথার উদ্ভব।

উপকথাকে যদি অলিখিত আদি সাহিত্যের মর্যাদা দান করা যায় ত হ'লে সম্ভবতঃ শৃগালই হবে সেই আদি সাহিত্যের বিশিষ্ট নায়ক। শৃগালকাহিনী পুরাণে প্রতিষ্ঠা লাভ না করলেও ভারতীয় পুরাণে শৃগাল একেবারে অবহেলিত নয়। ধর্মবিশ্বাসের সংগেও তার সম্পর্ক আছে। কিন্তু মূলতঃ লোককথাতেই

শৃগালের স্থান একান্তভাবেই বিশিষ্ট এবং এ কথা সহজেই বলা চলে মানুষের কল্পজগতে শৃগালের প্রতি পক্ষপাতই বেশি।

উপকথায় বিভিন্ন পশুচরিত্র অনেকসময় কিছু কিছু দোষ বা গুণের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। সাহসিকতা, ভীরুতা, ধূর্ততা, হিংস্রতা, মূর্খতা প্রভৃতি দোষ এবং গুণ মানুষের উপর যখন আরোপিত হয়, তখন বিভিন্ন পশুর সঙ্গে তা' তুলনাবাচক হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যই সিংহ আমাদের কাছে শৌর্যের প্রতীক, শৃগাল ধূর্ততার, মেষ ভীরুতার এবং ব্যাঘ্র হিংস্রতার।

শৃগাল সাধারণতঃ ধূর্ততার প্রতীক। তবে ভীরুতার প্রতীক হিসাবেও সে চিহ্নিত। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ এবং জাতকগ্রন্থে শৃগালচরিত্রের বিশদ ব্যাখ্যান বর্তমান।

প্রসঙ্গক্রমে জাতক কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। সিগালজাতক দদ্দুর জাতক, জম্বুখাদকজাতক, সব্বদাঢজাতক, পুতিমাংসজাতক এবং আরো কয়েকটি জাতক কাহিনীতে বিশিষ্ট নায়ক জামঘোষ শৃগাল। কয়েকটি জাতকে তার ধূর্ততার কাহিনী আছে, কয়েকটি মূর্খতার কাহিনী।

সিগালজাতকে লোভী শিয়ালের দুরবস্থার চিত্র খুব হাস্যকররূপেই চিত্রিত। একদা বোধিসত্ত্ব শৃগালজন্ম পরিগ্রহ ক'রে, নদীর ধারে এক অরণ্যের মধ্যে বাস করতো। একদিন নদীর ধারে এক বৃদ্ধ হস্তীকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে শৃগালটি খুব খুশি,—বেশ কিছুদিন বিনা পরিশ্রমেই প্রচুর আহারের আয়োজন তার সামনে। সে প্রথমে হাতির দাঁত কামড়ে খাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হোলো। তারপর কখনো কান, কখনো লেজ কখনও পা ধরে টানাটানি। কিন্তু তেমন জুৎসই মনে হোলো না এসব। শেষপর্যন্ত পেটের মধ্যে ফুটো করে সে একেবারে হাতীর উদরস্থ হ'য়ে মনের আনন্দে ফুসফুস, হৃদপিণ্ড ইত্যাদি খেয়ে ভাবলো—যাক্ আহার আর বাসস্থান একসঙ্গেই পাওয়া গেল—বারবার বের হ'বার প্রয়োজনই বা কি? কাজেই সেখানে সে থেকে গেল। দেখতে দেখতে বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর যখন রৌদ্রতাপে মরা হাতি শুকিয়ে যেতে লাগলো তখন শেয়াল আর কিছুতেই সেখান থেকে বেরুতে পারে না। হাতির চামড়া যত সংকুচিত হতে থাকে শেয়াল ততই ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। কিন্তু পালাবার পথ বন্ধ। মৃত্যু নিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত কোনক্রমে একটু পথ করে সে বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু তার মূল্য হিসেবে দিতে হল তার নিজের চামড়া। কলাগাছের মত মসৃণ,

চর্মহীন একটি দেহ দেখে শেয়াল বললো,—এই হচ্ছে আমার লোভের শাস্তি। অতিলোভ বর্জনীয়।

বিরোচন জাতকে আছে শৃগালের হস্তিশিকার কাহিনী। সিংহের মত বিক্রম প্রদর্শন করতে গিয়ে হাতির পায়ে পিষ্ট হ'য়ে মরতে হ'য়েছিল তাকে। অর্থাৎ যার কর্ম তারে সাজে।

আর এক সিগাল-জাতকে ধূর্ত শেয়ালের কাহিনী আছে, যার সঙ্গে বাঙলা উপকথায় শেয়াল পণ্ডিত ও কুমীর কাহিনীর সম্পর্ক আছে। শেয়াল মারতে গিয়ে এক মাতাল লাঠিটা হাতের মুঠোয় চেপে মরার মত শুয়েছিল এক ঝোপের ধারে। শেয়াল এসে সেই লাঠিটা ধরে একটু টান দিল, সঙ্গে সঙ্গে মাতালও লাঠিটাকে আরো জোরে চেপে ধরলো। শেয়াল দূরে সরে গিয়ে বললো :– এমন মড়া তো দেখিনি মশায়, যে মরে ও লাঠি চেপে ধরে।

হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রেও শৃগালসম্পর্কিত অনেক কাহিনী বর্তমান। এইসব কারণে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে ভারতবর্ষই পশু পাখি-সংক্রান্ত উপকথার আদিভূমি।

প্রসঙ্গত: ঈশপের কথা মনে পড়তে পারে। ঈশপের গল্পগুলির সৃষ্টিকর্তা ঈশপ নন বলেই অনেকের অভিমত, সেগুলির সংকলয়িতা ব্যাসদেব। তবুও হেরোডোটাস, সক্রেটিস, প্ল্যাটো সকলেই ঈশপকে প্রশংসা করেছেন।

ঈশপের বেশ কয়েকটি গল্পই ভারতবর্ষ থেকে সংগৃহীত। জাতক থেকেই অন্ততঃপক্ষে তেরখানি কাহিনী সেখানে আছে। দাঁড়কাক ও শৃগাল স্বর্ণডিম্ব প্রসূ হংসী, সিংহচর্মাবৃত গর্দভ, নেকড়ে ও মেষশাবক প্রভৃতি বহু পরিচিত কাহিনীগুলি মূলতঃ জাতক কাহিনী। মহাভারতের নিকটেও ঈশপের গল্প ঋণী।

অগৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে শেয়ালই মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি; পল্লীর কোল ঘেঁসেই তার আস্তানা। ইঁটের পাঁজায়, নদীনালার ধারে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিনের বেলায় তা'র বিশ্রাম। রাত পোহালেই গৃহস্থের হাঁস-মুরগী-পায়রার সন্ধানে লোকালয়ে তার সংগুপ্ত ভ্রমণ। মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি বলেই, মানুষের কৌতূহল তার সম্পর্কে বেশি। সে যদি কুকুর বেড়াল গোরু ছাগলের মত গৃহপোষ্য হ'ত তা'হলে বোধহয় সে এতখানি কৌতূহলের বিষয় হ'ত না। এই একই কারণে কাক এবং হনুমানও 'কাকচরিত্রের' বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

সাধারণ লোকবিশ্বাসের মধ্যে শেয়াল সর্বত্রই বিশিষ্ট। ভারতীয় পুরাণে,

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-পর্বের কাহিনীতে শেয়ালের অলৌকি ক্ষমতার কথা ঘোষিত হয়েছে। যমুনানদীর উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে সে বাসুদেবকে পথ দেখিয়ে যমুনাপারে নিয়ে যায়। দেবী কালিকার পার্শ্বচর রূপেও সে পূজাপ্রাপ্তির মর্যাদা লাভ করেছে। দেবভোগের মত শিবাভোগও পৌরাণিকতার মধ্যে স্বীকৃত।

জাপানেও এক শৃগাল-দেবতার নাম ইনারি সামা। এই দেবতার মন্দির আছে। ইনরি সামা সম্পর্কে যে কাহিনী আছে তাতে জানা যায়—এক সওদাগর দম্পতি একদল বালকের হাত থেকে একটি শৃগালশাবককে মুক্ত করে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেয়। এই ঘটনার দশ বছর পরে সওদাগর পুত্রের কঠিন ব্যাধি হয়, ব্যাধিমুক্ত হ'তে হলে জীবিত শৃগালের যকৃৎ সেবন করতে হবে। এক পর্বতবাসীকে তিনি নিযুক্ত করলেন শৃগালের যকৃৎ নিয়ে আসার জন্য। পরের দিন পর্বতবাসী যকৃৎ দিয়ে গেল। কিন্তু আসল পর্বত-বাসী এসে বললো যে যকৃৎ পাওয়া যায় নি। সওদাগর ব্যাপার না বুঝতে পেরে অবাক। রাতে স্বপ্ন দেখলেন এক মহিলা বলছে,—'আপনি যে শৃগাল শাবকের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন, আমি তার মা। আপনার বিপদের দিনে আমি তাকে হত্যা করে আপনার কাছে যকৃৎ পাঠিয়েছি। যিনি দিয়ে গেছেন তিনি আমার স্বামী। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সওদাগর শৃগাল পুজার জন্য মন্দির তৈরি করলেন।

পৌরাণিক কথা বাদ দিলেও লক্ষ্য করা যায় যে, শৃগাল-দর্শনে মঙ্গল অমঙ্গলের সূচনা সম্পর্কে, প্রাচীন কাল থেকেই জনবিশ্বাস প্রবাহিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা যায় সীতাহরণের সময় রামচন্দ্র তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে শৃগাল দেখে শংকিত হয়েছিলেন, অমঙ্গল আশংকায়। 'বামে সর্প হেরিলেন, শৃগাল দক্ষিণে। তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে॥' বিপরীত দর্শনে মঙ্গলের আভাস। গ্রামাঞ্চলের 'বাম-শেয়ালী' একটি প্রতিষ্ঠিত প্রবাদ। বাঁ দিকে শৃগাল দেখলে মঙ্গল। এই অভিমতকে দক্ষিণপন্থী করার চেষ্টার বোধহয় খনার বচনে বলা হয়েছে—বাম থেকে ডাইনে ভালো, যদি ফিরে চায়।' শিবারব আবার ঘোরতর অমঙ্গলের বাহক।

বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে শৃঙ্গধারী শৃগাল সম্পর্কে অলৌকিক লোকবিশ্বাস বর্তমান। কোন কোন বিশেষ তিথিতে গভীর রাত্রে কোন বিশেষ শৃগালের মাথায় শিং গজায়; তখন সে এক অপরিচিত কণ্ঠে ডাকতে

থাকে। যদি ঠিক সেইসময় কেউ কোন কাজে হাত দেয়, তা'হলে তার সাফল্য অনিবার্য।

প্রসঙ্গতঃ এই বিশ্বাস-মূলক ঘটনার উদাহরণ হিসাবে একটি লোকশ্রুতির উল্লেখ করছি। 'শীতকাল। গভীর রাত্রি। ঘুমন্ত গ্রাম। এক জায়গায় গ্রাম-প্রান্তে আখ মাড়াই হচ্ছিল, অতএব সেইখানেই কয়েকজন কৃষক জাগ্রত। একদিকে গরু দিয়ে আখমাড়াই কল ঘোরানো হচ্ছে, অন্যদিকে এক বিরাট 'ডেগ'-এ (বিরাট কড়াই) আখের রস ফুটে ফুটে গুড় হতে যাচ্ছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলো ওরা যে কড়াই যেন গুড়ে উপচে পড়তে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এক অদ্ভুত শিবাধ্বনিও এসে পৌছুলো। সবাই হরিধ্বনি দিয়ে উঠলো, আর জালা জালা গুড় তুলতে লাগলো।' এ অবস্থা খুব বেশি সময় ধরে থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত থাকে ততক্ষণ নাকি গুড় তুলে শেষ করা যায় না। শেয়ালের শিং-ও তা'র মাথায় বেশিক্ষণ থাকে না

জনশ্রুতি, অনেকে নাকি মাঠে মাঠে শেয়ালের শিং কুড়িয়ে পায়। যে পায় তার সৌভাগ্যের অন্ত থাকে না।

তা ছাড়া খেঁক-শিয়ালের বিবাহ সংক্রান্ত প্রবাদ এবং ছড়ার সঙ্গে তো প্রায় সকলেই পরিচিত।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে, লোককথার মধ্যে শেয়ালের স্থান যে গৌণ নয়, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ইউরোপে রেইনার্ড দি ফক্স এর উপকথা অবলম্বনে একাদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বহু গল্প-কবিতা ও রচিত হয়েছে এবং রেইনার্ড দি ফক্স এর মূলেও সেই আদিকালের লোককথা।

শেয়ালের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়দেশেই লোকবিশ্বাস বর্তমান। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—তার রূপ পরিবর্তনের ক্ষমতা সম্পর্কিত বিশ্বাস। চীনদেশে এবং জাপানে বিশ্বাস করা হয় যে, শেয়াল ইচ্ছামতো মানবীয় রূপ ধারণ করতে পারে। শুধু তাই নয়,—শেয়াল নাকি যথার্থই পণ্ডিত পুরাণ এবং ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করে সে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়।

বলা হয়—পুরাণ এবং ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ ক'রে মানুষও অসীম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। কিন্তু,—শৃগালের মত তাদের একনিষ্ঠতা ধৈর্য এবং বিশ্বাস নেই বলে মানুষ তেমন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। চীনদেশে শৃগাল সংক্রান্ত যে সমস্ত লোকবিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই

রতি আশ্রিত। এই ধরণের একটি লোককথায় বলা হয়েছে এক হতভাগ্য ছাত্রের পরিণামের কথা। এক ছাত্র, নির্জনে অধ্যয়ন করার জন্য গ্রামের সীমানায় অবস্থিত এক ভগ্নমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে তার ধ্যানভঙ্গ করার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাব ঘটতো। বলাবাহুল্য, ছাত্রটির পাঠচর্চায় বিঘ্ন ঘটে গেল এবং সেই তরুণীর সঙ্গে অত্যধিক কামচর্চার ফলে, রাজরোগে তার মৃত্যু ঘটলো। এ কাহিনীর মধ্যে উপদেশাত্মক কিছু পাওয়া গেলেও,—কাহিনীটি কিন্তু একান্তভাবে লোকবিশ্বাসেরই অন্তর্গত। শেয়াল নাকি এইভাবেই মানুষের প্রাণসত্তা অপহরণ করে। যতদিন পর্যন্ত সে মানুষের প্রাণসত্তাকে অপহরণ করতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত সে লীলা বিলাসে অতুলনীয়া নারীরূপেই ছলনা করতে আসে। প্রাণসত্তা অপহরণ ক'রে সে নাকি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়।

এ জাতীয় লোকবিশ্বাস পৃথিবীর সর্বত্রই নানাভাবে বর্তমান। সাধারণতঃ চীনা উপকথায় শৃগালকে ধূর্ত লম্পট এবং প্রতিহিংসাপরায়ণরূপে উপস্থাপিত করা হয়। নারীরূপেই তাদের আগমন ঘটে বেশি, তবে, পুরুষরূপী শৃগালের কাহিনীও শোনা যায়।

উত্তর আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এবং গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমোদের মধ্যেও সংখ্যাহীন শৃগালকাহিনী বর্তমান। ভারতীয় উপকথায় শৃগালের রূপান্তরণের কাহিনী অবশ্য শোনা যায় না, কিন্তু ভারতীয় উপকথায় শৃগাল যে অন্যতম বিশিষ্ট নায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; অ-গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে তার স্থানই সবার আগে।

ত্রিপুরার আঞ্চলিক বাংলা-কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য

ডঃ শিশিরকুমার সিংহ : অধ্যাপক জগদীশ গণচৌধুরী

ইংরেজশাসিত পরাধীন ভারতে একমাত্র ত্রিপুরারাজ্যেরই রাজভাষা ছিল বাংলা। গত দু'শ বছর ধরে এই রাজ্যে সমস্ত কাজকর্মে বাংলাভাষার ব্যবহার কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। ত্রিপুরারাজরা বাংলাভাষাতে সমস্ত কাজকর্ম চালানোর জন্য পরিভাষারও সৃষ্টি করেছিলেন। এমন কি রাজাদের মোহরেও উৎকীর্ণ

ছিল বাংলা ভাষা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠতার কথা আজ আর কারও অজানা নেই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন রচিত বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি—ত্রিপুরার রাজাদের অর্থানুকুল্যেই প্রকাশিত হয়। অথচ ত্রিপুরার রাজারা কিন্তু বাঙালি নন। তাঁদের মাতৃভাষা ত্রিপুরী—'ককবরক'। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ত্রিপুরার রাজাদের প্রধান ভাষা হল বাংলাভাষা। তাঁরা বাংলাভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টিও করেছেন। রাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যর এবং রাজকুমারী অনঙ্গমোহনী রচিত গানগুলো খুবই উৎকৃষ্ট—একথা সঙ্গীতবিশারদরাও স্বীকার করেছেন। এ রাজ্যের মোট ১৬লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৫লক্ষ আদি অধিবাসী (উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত),—ত্রিপুরী।[১] এই ত্রিপুরীরা বাংলাভাষা জানেন। যাঁরা লেখাপড়া শেখেন তাঁরা বাংলাভাষার মাধ্যমেই লেখাপড়া শেখেন। বাংলা-ভাষা তাঁদের মাতৃভাষা না হলেও এটিই তাঁদের প্রধান ভাষা। যেসব আদিবাসী শহরে বাস করেন তাঁরা তো বাংলা জানেনই (অনেকে আবার কেবলমাত্র বাংলাই জানেন—ককবরক জানেন না), এমন কি যাঁরা সুদূর গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন তাঁরাও বাংলা জানেন—বলতে পারেন অথবা কমপক্ষে বুঝতে পারেন।

বর্তমান ত্রিপুরাসরকারও বাংলাভাষাকে রাজ্যের সরকারীভাষারূপে স্বীকৃতি দান করেছেন। সুতরাং বাংলাভাষা চর্চার ইতিহাসে ত্রিপুরার ঐতিহ্য অনস্বীকার্য। এই রাজ্যে ব্যবহৃত বাংলাভাষার কথ্যরূপ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগা খুবই স্বাভাবিক। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাই ত্রিপুরার আঞ্চলিক কথ্য বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ত্রিপুরার অঞ্চলভেদে কথ্যভাষার প্রভেদ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দক্ষিণ ত্রিপুরা (বিলোনিয়া, অমরপুর ইঃ) অঞ্চলের কথ্যভাষা-বাংলাদেশের নোয়াখালি অঞ্চলের ভাষা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। আবার পশ্চিম ত্রিপুরা অঞ্চলের যার প্রধান কেন্দ্রস্থল আগরতলা শহর, রাজ্যের রাজধানী,—কথ্যভাষায় পূর্ব-বঙ্গের (বাংলাদেশের) সিলেট (শ্রীহট্ট) ও কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব

---

১ ত্রিপুরার উনিশটি উপজাতির (ত্রিপুরী, রিয়াং, চাকমা, জমাতিয়া, লুসাই, নোয়াতিয়া ইত্যাদি) মধ্যে ত্রিপুরী একটি। কিন্তু আমরা এখানে ত্রিপুরার আদি অধিবাসীদেরকে বোঝাতেই 'ত্রিপুরী' কথাটা ব্যবহার করেছি।

খুব বেশি। এ ছাড়া নোয়াখালি ও চট্টগ্রামী ভাষার প্রভাবও কিছু পরিমাণে বিদ্যমান। তবে রাজধানী আগরতলার কথ্যভাষা পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার প্রভাবে (Standard dialect এর প্রভাবে) ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আর তার ফলে এই অঞ্চলের কথ্যভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলোও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরার আঞ্চলিক কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করলে কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে ধ্বনি পরিবর্তনের কিছু সূত্রও বের করা সম্ভব হবে।

এখন ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে কিভাবে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে সে সম্বন্ধে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করা যেতে পারে :

১ নোয়াখালি অঞ্চলের ভাষা দ্বারা প্রভাবিত দক্ষিণ ত্রিপুরা অঞ্চলে আঞ্চলিক কথ্যভাষায় 'সন্ধ্যা'কে 'হইন্দা', 'সে' কে 'হে', 'শ্বশুর'কে 'হউড়', 'শুন'-কে 'হুন' বলা হয়ে থাকে। এর থেকে আমরা ধ্বনি পরিবর্তনের যে সূত্রটি পাচ্ছি সেটি হল এ অঞ্চলের কথ্যভাষায়—শ, স > হ-তে পরিণত হয় এবং র > ড়-তে (কখনো কখনো)।

২) আবার কোথাও কোথাও দেখি 'পিসি'কে 'হিসি'র মত উচ্চারণ করতে এবং 'পড়'কে 'হড়'-এর মত। যেমন : পান খাবেন—ফান খাইবান নি)। 'প' প্রথমে মহাপ্রাণিত হয়ে 'ফ' হয় এবং মহাপ্রাণবর্ণ ফ > হ এ পরিবর্তিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার (রাঢ়ীর) মধ্যেও আমরা মহাপ্রাণবর্ণের 'হ'-এ পরিবর্তন (এবং লোপ) দেখতে পাই। যেমন : বধূ > বহু > বউ, মধু > মহু > মৌ ইত্যাদি।

৩) পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষায় (রাঢ়ীতে) দেখি শব্দ মধ্যবর্তী 'ই' ও 'উ' প্রথমে অপিনিহিত হয় ও পরে অভিশ্রুতির ফলে বিকৃত হয়ে যায় এবং তখন 'উ', 'ই' পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে নতুন রূপ লাভ করে। যেমন : করিয়া > *কইরিয়া > কইর‍্যা > করে। কিন্তু আলোচ্য অঞ্চলের কথ্যভাষার মধ্যে দেখা যায় যে, অপিনিহিত 'ই' বজায় থাকে এবং 'র' ইত্যাদি মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লোপ পেয়ে যায়—

করিয়াছে (= করিয়া + আছে — √ আছ্) *কইরিয়াছে > কইর‍্যাছে (বঙ্গালীতে এই রূপটি পাওয়া যায়) > কইছে।

এছাড়া কইরা (< করিয়া), বইল্যা (< বলিয়া) ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

৪) ধ্য > ঝ-এর (ধ্য > জ্‌ঝ > ঝ) উদাহরণ (মধ্য > মজ্‌ঝ > মাঝ) রাঢ়ীতে পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য অঞ্চলের কথ্যভাষায় ধ্য > ঝ-তো হয়ই অধিকন্তু 'ই'-র (অপিনিহিতির প্রভাবজাত) আগম হয়। যেমন :

মধ্যে > মাইঝে।

৫) বিশেষভাবে দক্ষিণ ও উত্তর ত্রিপুরা অঞ্চলের কথ্যভাষায় অঘোষ মূর্ধণ্যবর্ণ ঘোষ মূর্ধন্যবর্ণে পরিণত হয়। যেমন : মাটি > মাডি (ট > ড); খাঁটি > খাডি (আনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু লোপ পায়), একটা > একডা ইত্যাদি।

৬) রাঢ়ীর অন্তর্গত বীরভূম-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কথ্যভাষার মত এই অঞ্চলের (ত্রিপুরার সর্বত্র) কথ্যভাষাতেও 'ন' > ল-এ পরিবর্তিত হয়।

নাম বা নাব > লাম—রিক্সা থেকে নাম > ·· লাম ইত্যাদি।

নড়া > লড়া ; নগর > লগর।

৭। মহাপ্রাণ বর্ণ কখনো কখনো (বিশেষভাবে দক্ষিণ ত্রিপুরা অঞ্চলে) আবার অল্পপ্রাণ বর্ণেও পরিবর্তিত হয় : –ঝাক > জাক—ঝ > জ।

৮) এখানে যাচ্ছি (> যাইতেছি) বলতে বলা হয়— 'যাইগিয়া'। স্থানীয় লোকমুখে উচ্চারিত হয় 'যাইগ্যা' (= মজাইগ্যার মত), খাইগ্যা ইত্যাদি। পশ্চিম ও উত্তর ত্রিপুরাঞ্চলেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট অঞ্চলের প্রভাব। উপরোক্ত ক্রিয়াগুলির ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

৯) দন্ত্যবর্ণের মূর্ধন্যীভবন এ অঞ্চলের কথ্যভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য : দণ্ড > ডণ্ড ; দংশন > ডংশন, দীঘি > ডীঘি।

পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা—রাঢ়ীতেও উপরোক্ত ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে থাকে।

দংশ > ডংশ > ডাঁশ ; দণ্ডবৎ > ডণ্ডবৎ (বিশেষ করে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়)। দালান (ফারসী) বাড়ি > ডালান বাড়ি।

১০) রাঢ়ীর মত 'ম' এর 'ন'-এ পরিবর্তন ও দেখা যায় (বিশেষ করে পশ্চিম ত্রিপুরায়)। যেমন : মাপ > নাপ।

১১) শব্দান্তের 'ক' প্রায়ই 'হ' তে পরিবর্তিত হয় (২নং সূত্রের মত)। এটি এই অঞ্চলের কথ্যভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য : কাকা > কাহা (= ক > খ), টাকা > টাহা বা টিহা বা ট্যাহ্‌।

ওপরে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও আরও অনেক ধ্বনিতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলের কথ্যভাষায় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু স্বল্পপরিসরে সেসব আলোচনা করা সম্ভব নয় বলে কেবলমাত্র প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোই আলোচনা করা হল।

DAVID McCUTCHION প্রসঙ্গ

পুলকেন্দু সিংহ*

ডেভিড জে. ম্যাককাচ্চন এর নামের বানানটা তাঁরই হাতে লেখা আমার পুরনো ডায়েরিতে আছে। নামের বানানটি রীতিমত রপ্ত করেছিলাম সেই তখন—১৯৬৫র জানুয়ারিতে। ভারতপথিক ম্যাককাচ্চন সাহেব গুটি কয় প্রাতঃস্মরণীয় বিদেশীদের অন্যতম যাঁরা হৃদয়-মন ও আত্মার সঙ্গে ভারতাত্মার মিলন ঘটিয়েছেন—যেমন দীনবন্ধু এনড্রুজ, ভগিনী নিবেদিতা বা শ্রীমা'র কথা মনে পড়ছে। তাঁদের পেছনে ছিল রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণা। ডেভিড সাহেবের পেছনে ছিল বোধহয় অন্তঃপ্রেরণা।

DAVID J. McCUTCHION সাহেবের জন্ম ইংলণ্ডের কেভেনট্রিতে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। ১৯৪৮-এ স্কুলের শিক্ষা শেষ কেভেনট্রিতেই। তারপর ঐদেশের নিয়ম মত একবৎসরের জন্য সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করেন। তারপর কেম্ব্রিজের জীসাস কলেজ থেকে ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি এই তিন বিষয়ে আধুনিক ভাষা সাহিত্যের স্নাতক হন ১৯৫৩-তে। এর চার বছর পর স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ। ফরাসি দেশে দু'বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৭তে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন ইংরেজি ভাষার অধ্যাপকরূপে। ১৯৬০ সালে আসেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে। চারবছরের মধ্যে সেখানকার রিডার পদে উন্নীত হন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার থাকার সময়ে তিনি আমার ঠিকানা সংগ্রহ করেন ও পাঁচথুপী এসে আমার খোঁজ করে সাক্ষাৎ করেন। সেটা ছিল ১৯৬৫-র জানুয়ারি। সেই দিনটি আমার কাছে নিশ্চয় অবিস্মরণীয়! আমি তখন বিভাগীয় ট্রেনিঙে চুঁচড়োতে ছিলাম। ছুটিতে এসেছিলাম বাড়ি।

আমাদের দেশের কোন প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত গবেষক নিজে এসে আমার মত এক অখ্যাত ও অতি সাধারণ তরুণের সঙ্গে দেখা করবেন এটা ভাবা যায় না। এরকম দুর্ঘটনা অন্ততঃ আমার চোখে এখনো দ্বিতীয়টি পড়েনি। উচ্চ ডিগ্রির আভিজাত্য থেকে পাণ্ডিত্যের উচ্চাসন থেকে নেমে এসে গ্রামের ধুলিমাখা পথে ঘাড়ে ক্যামেরা নিয়ে একহাঁটু ধুলো মেখে না খেয়ে না ঘুমিয়ে মন্দিরের টেরাকোটার বিলুপ্তপ্রায় সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যকে লোক-সমক্ষে তুলে ধরবেন - কে এমন 'বাতুল' আছেন আমাদের দেশে! সেয়ানার দেশে এক মহৎপ্রাণ

মন্দিরপ্রেমিক বাউলকে বুক ভরে দেখবার, তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ গ্রাম্য সংস্কৃতি ও মন্দির শিল্প নিয়ে আলোচনার দুর্লভ সুযোগ হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে পায়ে হেঁটে, সাইকেলে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে গ্রাম্য সংস্কৃতির তথ্য সংগ্রহ করতে হাতে নাতে শিক্ষালাভ করার দুর্লভ সৌভাগ্য পেয়েছি। দেশী পণ্ডিতেরা কেউ এত আবেগ আর ভালবাসা নিয়ে কাউকে কিছু শেখাবেন না। তিনি চেয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে আরো ঘুরবেন আমার সঙ্গে। প্রাচীন মন্দির মসজিদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ক'রে গ্রন্থ রচনা করবেন।

মুর্শিদাবাদের কান্দি অঞ্চলের মন্দিরগুলির প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তিনি পাঁচথুপী এসেছিলেন আমার কাছে। সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্ত হীরেন রঞ্জন সান্যাল। সান্যাল মশায় প্রথম দিন (১লা জানুয়ারী '৬৫) DAVID সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। বহরমপুরে ও পরে কান্দিতে DAVID সাহেবের বিশেষ পরিচিত বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সাংবাদিক মেজর সচ্চিদানন্দ ঘোষ এর কাছ থেকে আমার খোঁজ খবর নিয়ে এসেছেন তাঁরা। বিশেষ কাজে সান্যাল মশায় কলকাতা ফিরে যাবেন। আগামীকাল DAVID সাহেব পুনরায় আসবেন ও তাঁর সঙ্গে আমাকে যেতে হবে গ্রামে গ্রামান্তরে। কোথায় যেতে হবে সেটা নির্বাচনের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাল। তাঁর মত পণ্ডিতের সাহচর্য পাওয়া নিশ্চয় সৌভাগ্যের বিষয়। সুতরাং আমিও খুবই উৎসাহ আর প্রেরণা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। ভয় হচ্ছিল-- তিনি সাহেব বাংলা জানেন না, আমি জানিনা ইংরেজি—তার ওপরে অতবড় পণ্ডিত। কি করে যে কথাবার্তা বলব কি যে বলব সারারাত জেগে ভেবে ভেবে রাত কাবার হয়ে গেল। পরদিন সকালেই তিনি নির্দিষ্ট সময়ে বহরমপুর থেকে এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে দুটো দামী ক্যামেরা। তাঁকে নিয়ে পাঁচথুপী গ্রামে নবরত্ন মন্দিরে গেলাম। তিনি পাশের চৌধুরী বাড়িতে গিয়ে তেতুলা ছাদ থেকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি ছবি তুলবেন। মন্দিরগুলির ইতিহাস ও গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তাঁকে সাহায্য করা অপেক্ষা তাঁর কাছ থেকেই অনেক তথ্য জানা হয়ে যাচ্ছিল। তিনি মন্দিরের সামনের দিকের পোড়া মাটির কাজের বিষয়বৈচিত্র্য সম্পর্কে বুঝিয়ে দিলেন। মন্দিরের সামনের দিকে রামরাবণের যুদ্ধদৃশ্য। অন্যান্য অনেক মন্দিরেই এই রকম পোড়ামাটির কাজ দেখতে পাওয়া যায়। পোড়া মাটির কাজের নমুনা দেখে তিনি মন্দিরের নির্মাণসময় অনুমান করে নিতে পারছিলেন। আমাকে

টুকিটাকি প্রশ্ন করছিলেন। আমি তাঁকে ভূগোলিক প্রশ্ন করে অনেককিছুই জানতে পেরেছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থান ও মুর্শিদাবাদের বড়নগর প্রভৃতি স্থান ঘুরে এসেছিলেন। তাঁকে নবরত্ন মন্দিরটি ঘুরে ঘুরে দেখালাম। পরে পুরাতত্ত্ব বিভাগের (পঃ বঙ্গ সরকার) শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী মশাই এসে মন্দিরটি দেখে এটিকে জৈন প্রভাবযুক্ত পঞ্চায়তন মন্দির হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মন্দিরটি প্রায় দু'শো বছরের প্রাচীন। পৌরাণিক ইটের উপর নানারূপ দেবদেবীর মূর্তি মন্দিরের গায়ে মূর্ত। এখানে মোট নটি শিবলিঙ্গ আছে। যার জন্য মন্দিরটিকে নবরত্ন মন্দির বলা হয়ে থাকে। ৯টির মধ্যে ৪টি শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত। মন্দিরের মধ্যস্থলে ৫টি শিবলিঙ্গ ও মন্দিরের বহির্দেশসংলগ্ন স্থানে ৪টি শিবলিঙ্গ। বর্তমান মন্দিরটি সংস্কারের অভাবে জীর্ণ। আমি পরবর্তী সময়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগে আবেদন করি ও তার ফলে বর্তমানে এটি পুরাতত্ত্ব বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মনোনীত হয়েছে।

নবরত্ন মন্দিরের পরে গেলাম দক্ষিণপাড়ার প্রাচীন মসজিদে। এটি বোধহয় হুসেন সাহের আমলের তৈরি। অনেকে মনে করেন এটি মহম্মদ বিন্ তোগলকের আমলে তৈরি। কিংবদন্তি বলে ঔরঙ্গজেবের গৃহশিক্ষক মৌলানা গোলাম হজরতের কথামত ঔরঙ্গজেবই এই মন্দির নির্মাণ করেন। পাঁচথুপি সংলগ্ন 'বারহকোনা'র বৃদ্ধ বিহার ভেঙে তারই মাল মশলা দিয়ে এই মসজিদ নির্মিত হয়। এই মন্দিরসংলগ্ন একটি মাদ্রাসা ছিল। এই মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহ করা হোত মোগল দরবার থেকে। আতো বিবি নামক জনৈকা মহিলা মৌলানা হজরত বংশের শেষ নারী যার আমল পর্যন্ত এই মসজিদের মাদ্রাসায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলত। দূর দূরান্তরের অনেক ছাত্র এখানে আসত। এই মসজিদের কয়েকটি ছবি তুললেন তিনি।

এরপর আমরা পাঁচথুপি থেকে প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে বুগড়া গ্রামে গেলাম। দুজনে দুটো সাইকেলে। গ্রামের প্রাচীনেরা ইতিহাসের বড় ধার ধারেন না। তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ কোন সাহায্যই পাওয়া গেল না। এখানে প্রাক্তন জমিদারদের একজন কফি, কলা, মিষ্টি দিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করলেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। ক্লান্তিহীন এক বিমুগ্ধ মন্দিরতাপস দিনভোর ছবি তুললেন আর তথ্য সংগ্রহ করলেন। ফটো নিলেন পুরোহিত মশায়ের পূজারত অবস্থায়। মন্দিরের অনেকগুলিই আজ ভেঙে গিয়েছে। এখানে অনেকগুলি শিবমন্দির আছে। তার মধ্যে যোগেশ্বর

শিব-এর মন্দিরটি বেশ উঁচু। যার নামে গ্রামের নাম সুগন্ধা। খড়্গ্রাম থানার এড়োয়ালী গ্রামের রাজা রামজীবন এই মন্দিরগুলি বহুকাল আগে নির্মাণ করেন। এখানেও মন্দিরের সামনের পোড়া মাটির কাজ অনবদ্য। এখানেও মন্দিরের সামনে পোড়া মাটির ইঁটে সেই একই রাম রাবণের যুদ্ধ দৃশ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সুগন্ধার মন্দিরগুলির একটি পরে পুরাতত্ত্ব বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সংস্কার করা হয়েছে। যাই হোক আমরা উভয়েই কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাঁর প্যান্ট, জামা, মাথায় ধুলো। কারণ বসে, শুয়ে তিনি ফটো তুলেছেন তারই চিহ্ন। ফেরার নির্দিষ্ট সময় কাবার হয়ে গিয়েছে। ফেরার পথে সাইকেলের টিউব গলে। আমি বল্লাম 'আপনি চলে যান আমি হেঁটে যাচ্ছি।' তিনি রাজি হলেন না। বল্লেন—দুজনে হেঁটে হেঁটেই ফিরি, ভালই লাগবে। ফিরতে ফিরতে দেশের কথা, গ্রামের কথা, মন্দিরের কথা, লোকজীবন ও সংস্কৃতির কথাও উঠল। খাদ্য সমস্যা ও দারিদ্র্যের কথাও বাদ গেল না। আমি বল্লাম – দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসনে থেকে দেশটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে স্বাধীনোত্তর কালে গ্রামোন্নয়ন সুরু হয়েছে—কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। ইংরেজদের প্রতি আমার অনুযোগ বিনীতভাবে স্বীকার করে নিলেন। অত্যন্ত সারল্য ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলেন তিনি। কোথাও পাণ্ডিত্যের অহংকার নাই। পাছে আমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা চালানো অসুবিধে হয় সেজন্য অত্যন্ত আস্তে আস্তে সরল ইংরেজিতে স্পষ্ট উচ্চারণে কথাবার্তা বলছিলেন। আমার বুঝতে তত কষ্ট হল না। আমাকে ইংরেজিতেই কথাবার্তা বলতে হোল। তাঁর ব্যবহারে আমি বিশেষভাবে বিমুগ্ধ হলাম। তাঁর উদার প্রসন্ন সাহচর্যে গ্রাম্য এলাকায় ভ্রমণ ও তথ্যাদি সংগ্রহের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি সম্পর্কে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম পরবর্তীকালে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা আমার বেশ কাজে লেগেছিল। তিনি তাঁর ঠিকানা দিলেন আমাকে। আমারটাও নিলেন। নিজে ডাকবাংলোয় বাসে ঝুলতে ঝুলতে সন্ধ্যার আঁধারে ফিরে গেলেন। কোথাও পরিশ্রমের ক্লান্তি নাই। চোখে মুখে এক উদার ও ভাবুক হৃদয়ের পরম ঔৎসুক্যসমৃদ্ধ প্রজ্ঞার প্রশান্তি।

কয়েকমাস পরে চুঁচুড়া ট্রেনিং সেণ্টার থেকে Study tour-এ আমি একটি দলের সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গেলাম। তিনি তখন তাঁর class

নিচ্ছিলেন। তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে অপেক্ষা করলাম। তিনি class করে নিজের ঘরে ফিরে আমাকে চিনতে পেরেই মাথা নুয়ে নমস্কার করলেন। ইচ্ছে ছিল তাঁকে প্রণাম করি কিন্তু তার আগেই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার গোটা নামটা তাঁর মনে পড়ছিল না। তবে সিনহা ও 'পাকুড়পুপী' মনে ছিল। আমার গোটা নামটা বলে তাঁকে সাহায্য করলাম। আমাকে জলযোগে আপ্যায়িত করলেন। উৎসাহের সঙ্গে কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখালেন। আমাদের ট্রেনিং সেণ্টারের নির্দিষ্ট গাড়িতে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ও সহকর্মিবৃন্দ অপেক্ষা করছিলেন। তিনি নিজে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন কয়েকদিন পরে ব্রিটিশ কাউন্সিলে তাঁর গৃহীত মন্দিরের ফটো রঙিন স্লাইড পর্দায় প্রতিফলিত করে তাঁর বক্তৃতা দেবার কথা আছে। বিশিষ্ট আমন্ত্রিতদের সামনে তিনি তাঁর গবেষণার বিষয় চিত্র ও তথ্য সহযোগে ব্যাখ্যা করবেন। সেইসঙ্গে আমার সঙ্গে তোলা তাঁর অনেক ছবি দেখাবেন বললেন ও আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমি সেদিন অসুস্থ হয়ে পড়াতে সে-অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ও সম্পর্ক অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তাঁর অকৃত্রিম আন্তরিকতায় আমি বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। আমি বহরমপুর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'পরিক্রমা' কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। প্রবন্ধটির নাম 'পণ্ডিত গবেষক DAVID McCUTCHION'।

আমার প্রবন্ধটিই বোধহয় ম্যাক্‌কাচ্চন সাহেব সম্পর্কে প্রথম প্রকাশিত আলোচনা। উক্ত আলোচনা পাঠ করে কান্দির ডাঃ সচ্চিদানন্দ ঘোষ মহাশয় উক্ত 'পরিক্রমা' পত্রিকার অক্টোবর ৩, ১৯৬৭তে একটি পত্র লেখেন। ঐ পত্রে তিনি লেখেন—"গত ৬।৯।৬৭ তারিখের পরিক্রমায় শ্রীপুলকেন্দু সিংহ লিখিত "পণ্ডিত গবেষক DAVID McCUTCHION" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়া আনন্দ পাইলাম। ডেভিড সাহেব এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই আছেন। তাঁহার বন্ধু ও সহকর্মী বাঙ্গালী গবেষকের নাম শ্রীহিতেশ রঞ্জন সান্যাল। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী এবং ইনিও মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির অলংকরণের কাজ লইয়া গবেষণা করেন। এই বৎসরের গোড়ার দিকেও আলাদা আলাদা ভাবে শ্রীযুক্ত সান্যাল ও শ্রীযুক্ত ডেভিড কান্দী মহকুমাতে

তাঁহাদের গবেষণার কার্য উপলক্ষ্যে আসিয়াছিলেন। কান্দি মহকুমাতে বাবড়াঙ্গা, রূপপুর, দোহালিয়া, পাঁচথুপী, যুগশ্বরা, সাহোরা, গোবরহাটি, গোকর্ণ প্রভৃতি অঞ্চলের মন্দিরগুলি পরিদর্শন করেন। ৭।৯।৬৭ তারিখের ব্যক্তিগত চিঠিতে ডেভিড আমাকে জানাইয়াছেন যে এই বৎসর নভেম্বর থেকে বাংলাদেশের মন্দির সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য এবং এই সম্পর্কিত পুস্তক লিখিবার জন্য তিনি একবৎসরের ছুটি লওয়ার পরিকল্পনা করিয়াছেন। ত্রৈমাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকায় বীরভূম জেলার মন্দির সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সংশ্লিষ্ট পরিক্রমাটি অবগতির জন্য শ্রীডেভিডকে পাঠাইলাম।"

১৯৭০ এর শেষ দিকে কিছুদিনের জন্য ম্যাক্‌কাচ্চন্ সাহেব দেশে যান। তিনি শুধু বাংলা দেশ নয়—বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশেও ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন। তার জন্য তাঁর যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ ও আর্থিক অনটন সহ্য করতে হয়েছিল। নিজের খাড় বন্ধক দিয়ে যাতায়াত খরচ সংগ্রহ করতে হয়েছিল তাঁকে। কোন প্রতিষ্ঠান বা সরকার একাজে তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রণী হননি। তাঁর মত লোকও এই বিরাট গবেষণার কাজে সহায়তা পাননি, এর চেয়ে দুঃখের আর কি থাকতে পারে। তিনি বিপুল পরিশ্রমে তাঁর সংগৃহীত অজস্র তথ্যের কতকাংশ নিয়ে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন—"লেইট মিডিঈভ্যাল টেম্পলস্ অব্ বেঙ্গল।" তাঁর জীবিতকালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে পারেনি।

অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য বোধহয় ভেঙ্গে যায়। ১১ই জানুয়ারি ১৯৭২ কলকাতায় হঠাৎ তিনি পোলিও রোগে আক্রান্ত হন। শরীর অবশ হয়ে যায়। ১১ই জানুয়ারি সকালে উড্‌ল্যাণ্ড নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত হন কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর ব্যবস্থানুযায়ী। ১২ই জানুয়ারি রাত্রি ১১টায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে দেশে তাঁর বৃদ্ধ পিতা মাতা জীবিত ছিলেন। ১৩ই জানুয়ারী ১৯৭২ কলকাতার ভবানীপুর সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। কলকাতায় তাঁর গুণমুগ্ধ জ্ঞানিগুণিবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, পরলোকগত কবি বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট গবেষক ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'দেখা হয় নাই' গ্রন্থে ডেভিড সাহেব এর উপর একটি দরদী আলোচনা করেন। ঐ গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়গৃহীত একটি আলোক-

চিত্রে গ্রামে তথ্য সংগ্রহের ফাঁকে বিশ্রামের কালে খোলা গরুর গাড়িতে শোয়া তাঁর কর্মজীবনের একটি মুহূর্ত মুর্ত হ'য়ে আছে।

তাঁর মৃত্যুর পরে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে "লেইট মিডিঈভ্যাল টেম্পলস্ অব বেঙ্গল" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এবং ঐ গ্রন্থ রচনার জন্য পঃ বঙ্গ সরকার তাঁকে মরণোত্তর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দান করে তাঁর মহৎ কীর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

1961-র Census ভিত্তিক পরবর্তীকালে প্রকাশিত DISTRICT CENSUS HANDBOOK—MURSHIDABAD এ DAVID McCUTCTION (ঐ বানানে মুদ্রিত হয়েছে) রচিত মুর্শিদাবাদ জেলার মন্দিরগুলি নিয়ে তাঁর রচিত সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান আলোচনা "Notes on Some Old Temples and a Mosque in Murshidabad District" প্রকাশিত হয়েছে। জেলার কয়েকটি বিশিষ্ট মন্দির ও মসজিদ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। বলাবাহুল্য উক্ত স্থানগুলি তিনি পরিভ্রমণ করেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। জিয়াগঞ্জ থানার—'বড়নগর', ভট্টমাটি, কিরিটেশ্বরী, কান্দি থানার গোকর্ণের নরসিংহদেবের মন্দির, গোবরহাটী গ্রামের পঞ্চরত্ন মন্দির, রূপপুর (কান্দি) এর রুদ্রদেব ও বাঘডাঙ্গা গ্রামের সূর্যেশ্বর শিবমন্দির, বড়ঞা থানার—পাঁচথুপীর নবরত্ন মন্দির, এবং জোরবাংলা' গঠনের লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দির, ফুলস্বরা গ্রামের চারচালা শিবমন্দির, সাদপুরের চারচালা মন্দির, সাগরদিঘী থানার খেরুর গ্রামের ১৪৯৪ খৃঃ-এ প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন মসজিদ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

কিছুদিন আগে আমি কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর গ্রন্থটি দেখবার সুযোগ পেয়েছি। কলকাতার গুরুসদয় মিউজিয়ম দেখার সময় অষ্টাদশ শতাব্দীতে অংকিত মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন 'জড়ান পট' সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান অভিমতটি দেখে আনন্দ হল। তিনি রাজস্থানী অঙ্কন কৌশল ও আঙ্গিকের ছাপ পড়েছে মুর্শিদাবাদের ঐ পটে এই রকম অভিমত দিয়েছেন। পটটি দেখে আমারও তাই ধারণা হল। ডেভিড সাহেব তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপক আবার স্থাপত্যকলার ও একজন যোদ্ধা—কিন্তু মন্দির যেন তাঁর প্রাণের আরাম, মনের শান্তি।

গ্রাম বাংলার অখ্যাত অবহেলিত ভগ্নপ্রায় মন্দির মসজিদকে তাঁর মত আর কে ভাল বেসেছেন জানা নাই। এই মন্দির প্রেমিককে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

[বংশপরম্পরায় নবাব পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় এক সময় মুর্শিদাবাদ শহর সংগীত শিল্পচর্চার পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ায়। মাত্র অল্প কয়েক দশক আগেও তার জের ছিল। অথচ এতো স্বল্পকালের মধ্যে তা নির্জীব ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। বিস্মৃতির পাতাল থেকে কয়েকটি উজ্জ্বল অধ্যায়কে উদঘাটিত করবার চেষ্টা করা হবে 'চেতনিক'-এ আগামী কয়েক কিস্তিতে। একজন জীবিত শিল্পীকে নিয়ে শুরু করা গেল 'চেনা গোলাপ' এই শিরোনাম দিয়ে এই পর্বের আবরণ-উন্মোচন। সম্পাদক/চেতনিক]

চেনা গোলাপ

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন রেডিওতে ঘোষিত হল বিখ্যাত ঠুংরি ও খেয়াল গায়ক তারাপদ চক্রবর্তী মশায়ের মৃত্যু সংবাদ। সংগে সংগে মনে পড়লো আরেকটি নাম, যে নাম ঠুংরি জগতে একটি প্রতিষ্ঠানের সমান। মাঞ্জু সাহেব। আর ঠিক এরই পিছু পিছু এসে হাজির হ'ল তেইশ-চব্বিশ বছর আগের এক জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যার অবিস্মরণীয় দৃশ্য। মুর্শিদাবাদের কেল্লার এক ঘাটের নিচ থেকে উঠে আসা সিঁড়ির মাথায় ব'সে গল্প করছি লক্ষ্নৌ থেকে সদ্য আগত এক বন্ধুর সংগে। হঠাৎ তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে মুগ্ধ চিত্তে ব'লে উঠলেন, 'আহাঃ আহাঃ!' চিত্রার্পিতের মতো ব'সে রইলাম দু'জনে স্থানকালপাত্র ভুলে। বর্ষার দুকূলপ্লাবী ভাগিরথীর বুকে তর্‌তর্ ক'রে ভেসে আসছে বকের পালকের মতো পাল তুলে এক নৌকো। তার ভেতর থেকে উচ্ছ্রিত হচ্ছে সুরে সুরধুনী ডি, পালুশকারের 'চল মন গংগা যমুনা তীর।' গুরুনিতম্বভারবিভ্রান্তানবীন ললনার মতো বর্ষার ভারি বাতাস সেই সুরের গমকে গমকে আরো স্ফীত স্খলিত বিলম্বিত। অচিরে সেই নৌকা এসে ভিড়লো আমাদের অদূরে। নৌকো থেকে নেমে এলো কয়েকজন, হাতে হারমোনিয়াম আর তবলা। পিছু পিছু দেওদারের মতো উন্নত একটি দেহ। বন্ধুকে পরিচয় দিলাম: এঁর নাম সৈয়দ আলি মির্জা। বন্ধু স্বীকার করলেন লক্ষ্নৌতেও এতো সুরেলা উচ্চনাদী ভরাট গলা খুব কম শুনেছেন।

ফস্‌করাসের জীবন্ত ভেবজচিত্র দীর্ঘকায় অপ্রশস্তবক্ষ মির্জা সাহেবের জন্ম মুর্শিদাবাদ শহরের কেল্লার নিজামত পরিবারে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর। পিতা আসমা কাদার সৈয়দ আসাদ আলি মির্জা ছিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ নবাব নাজিম ফিরাইদুন ঝার তৃতীয় পুত্র। প্রসংগত, নবাব নাজিমের

প্রথম পুত্র ছিলেন নবাব হাসান আলি মির্জা যাঁর পুত্র হিজ হাইনিস্ নবাব স্যার ওয়াশিক আলি মির্জা। স্যার ওয়াশিক্ ছিলেন অক্সফোর্ডে সম্রাট পঞ্চম জর্জের সতীর্থ। যাই হোক, আলি মির্জা সাহেবের মা মেহেদি খানুম কিন্তু ছিলেন একজন সাধারণ দর্জির মেয়ে। কিন্তু নবাবী হারেমে যখন ঠাঁই পেয়েছিলেন তখন অনুমান করা যেতে পারে তিনি অসুন্দরী ছিলেন না।

মির্জা সাহেব মুর্শিদাবাদের সম্পূর্ণ অবৈতনিক বিদ্যালয় নবাব বাহাদুরস্ ইন্সটিটিউশন্-এ দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। সেই সময় থেকেই তিনি সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। তখন থেকে যখনই যেখানে সংগীতের টিমটিমে আসর কি জমজমাট জলসা বা মাইফেলের খবর পেতেন ছুটে যেতেন তিনি সেখানে, অধীর আগ্রহে শুনতেন বড়বড় সংগীতসাধকের সমাহিত কণ্ঠনিবেদন। মির্জা সাহেব তাঁর খুল্লতাতপুত্র অগ্রজ মঞ্জু সাহেবের কাছে সংগীতে তালিম নিতে শুরু করেন ছাত্রাবস্থাতেই। আপাতত বলে রাখি মঞ্জু সাহেবের আসল নাম আনওয়ার আলি মির্জা। পিতা নবাব নাজিমের কনিষ্ঠপুত্র বাকের আলি। মাঞ্জু সাহেব সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় দিলীপ রায় তাঁর ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রের ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থে এক স্থানে উল্লেখ করেছেন তদানীন্তন বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়ক ব'লে। মাঞ্জু সাহেব খেয়াল গাজাল ঠুংরি ও দাদরায় সুদক্ষ শিল্পী ও সুযোগ্য শিক্ষক হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। ঠুংরি ও গাজালে তিনি কি ক'রে ভারতবিখ্যাত শিল্পী হ'য়ে উঠেছিলেন সে সম্পর্কে পরে ভিন্ন এক প্রবন্ধে আলোচনা করা যাবে।

যা বলছিলেম। আলি মির্জা সর্বপ্রথম তাঁর প্রায় বিশ বছরের বড় উক্ত মাঞ্জু সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি এই বিখ্যাত গায়কের কণ্ঠে যে সব ঠুংরি গাজাল প্রভৃতি শুনতেন, একবার শুনেই শ্রুতিধরের মতো সেগুলি নিজকণ্ঠে নিখুঁতভাবে তুলে নিতেন। এরপর তিনি মুর্শিদাবাদ নিবাসী বিখ্যাত ওস্তাদ কাদের বক্স সাহেবের কাছে নাড়া বাঁধেন। ওস্তাদজী ১৯৬৮ সালে প্রায় ৯২-৯৩ বছর বয়েসে পরলোক গমন করেন। এঁর কাছে মির্জা সাহেব খেয়াল শেখেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি ওস্তাদজী এঁকে খুব ভালবাসতেন। তিনি এঁকে তাঁর সংগৃহীত রাগরাগিনীর অমেয় ভাণ্ডার উজার করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মির্জা সাহেব অধ্যাবসায়োচিত ধৈর্যের অভাবে তা গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তাঁর নিজের জবানিতেই বলি: ওস্তাদজী আমাকে ঢেলে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি নিইনি। কারণ

আমি ওস্তাদ হ'তে চাইনি। ভাল গাইয়ে হওয়াই ছিল আমার লক্ষ্য। আমি দেখেছিলাম ওস্তাদজী সংগীতশাস্ত্রে এতো বড়ো পণ্ডিত হওয়া সত্বেও ভাল গাইয়ে ছিলেন না বলে গুণী সমাজের বাইরে তাঁকে আর কেউ চিনতেই পারে নি। তাই আমি তাঁকে ব'লেছিলাম, ওস্তাদজী, আপনি আমাকে এতো বেশি দিতে চাইলে কি হবে? আমি নিতে পারবো না। দশ পনেরো বিশ যা নিতে পারবো তাই ভাঙিয়ে তামাম্ জিন্দোগ চলে যাবে আমার। আমাকে ওস্তাদ হ'তে বলবেন না। আমি শুধু গায়ক হ'তে পারলেই খুশি হব।

তা গায়ক তিনি হয়েছেন। কতো বড় গায়ক তার একটু নমুনা তুলে ধরা যাক। ১৯৬৩ সাল। জুন মাস। স্থান ৮৫ নং পার্ক স্ট্রিটে মুর্শিদাবাদ নবাবের কলকাতার বাসভবনের বিশাল হলঘর। নবাব বাহাদুরের আহ্বানে সোজখানির প্রতিযোগিতা চলছে। বিচারক হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি, ওস্তাদ মুনাব্বার খাঁ, ওস্তাদ দবির খাঁ, ওস্তাদ আমির খাঁ। দু'তিন হাজার শ্রোতার সামনে বহু গুণী প্রতিযোগী খালি গলায় অর্থাৎ কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর মাধ্যমে কারবালা প্রান্তরে অনুষ্ঠিত সেই প্রাচীন বিষাদময় ঘটনার করুণ কাহিনী ধীরে ধীরে পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে বিকশিত করে চলেছেন। এক সময় এলো মির্জা সাহেবের পালা। তিনি যেই শুরু করলেন প্রকৃতিদত্ত সুরেলা কণ্ঠে তাঁর আবৃত্তি সংগে সংগে সমগ্র হল বিপুল প্রত্যাশায় টান টান হয়ে উঠলো। শুধু সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসাই নয়, ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত তারিফ উচ্চারিত হতে লাগলে এমন কি প্রাজ্ঞ বিচারকবর্গের কণ্ঠ থেকেও। বড়ে গোলাম আলি বললেন, মির্জা সাহেব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সোজ্‌খান। দবির খাঁ বললেন, সোজখানিতে তামাম ভারতে আপনার দোসর পাওয়া যাবে না। একই কথা কিন্তু ভিন্ন ভংগিতে. বললেন ওস্তাদ মুনাব্বার খাঁ আর আমির খাঁও। ডঃ দাবর খাঁ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন: '............He is a very good classical singer. As far as my experience goes he hasn't got equal in Sozekhani......' আর বড়ে গোলাম আলি লিখেছেন: Nawab Syed Ali Meerza...is...a...sousin of the late Nawab Syed Anwar Ali Meerza alias Munjhoo Sahab who was famous for Thumri and Khayal. I have often come in close contact with the said Ali Meerza in several musical soirees

and found him well versds in classical songs. At present he seems to me as one of the best Sozekhans in Bharat…'

ঠুঙ্রি দাদ্রা গাজাল ও ভজন মির্জা সাহেবের কণ্ঠে যাঁরা শুনেছেন তাঁদেরই স্মৃতিতে জেগে উঠেছে তাঁর চাচাতো ভাই ও গুরু মান্নু সাহেবের অপার্থিব কণ্ঠের জাদুকরী দক্ষতার কথা। ঠুঙ্রির এমন উপযুক্ত স্বাভাবিক কণ্ঠ বাংলায় আর কতো জনের আছে জানি না। দুবেলা পেটপুরে খেতে না পাওয়া বাষট্টি বছরের এই নিঃসংগ সংগীতশিল্পী ঠুঙ্রি গেয়ে এখনো ভেল্‌কি দেখাতে পারেন। ভৈরবী ঠুঙ্রিতে যখন তিনি গেয়ে উঠেন:

ক্যায়সি বাজাইরে শ্যাম
বন্সি বাজাইরে শ্যাম ॥

কিংবা ইমন কল্যাণ রাগে:

রাজা তোরা পানিয়া মোসে না ভারো যায় রে
উচিলে যাঁয়ে ঘাড়া নাহি ডুবে
পাতলি কামারা বাল খায় খায় যায়রে ॥

[অর্থাৎ রাজা তোমার জন্যে জল ভ'রে নিয়ে আসা আমার দ্বারা হ'ল না। ঘড়া খালি উঠে উঠে আসে, কিছুতেই ডোবে না। আমার কটি ক্ষীণ; 'বাল' (কোমড়ের 'গাত') বার বার ঘুরে যাচ্ছে।]

কিংবা নাটমল্লার রাগে দাদরা:

মোরে নায়না লাগি গুঁইয়া
জিয়া চাহে সো করে ॥

কিংবা ইমন কল্যাণ জাতীয় রাগে গাজাল:

শুন্ এরি সাখি মোরা শ্যাম পিয়া
নাহি স্বাপ্নেমে দরোশা দেখাবাতা হায়
উনে ঢুন্ডানাকো যোগানিয়া বানু
এহি মোরে মনমে সামাবাতা হায় ॥

[অর্থাৎ শোন্ ওরে সখি, আমার প্রিয়তম শ্যাম আর স্বপ্নেও দেখা দেয় না। তাই তাকে খুঁজে আনতে আমি যোগিনী হয়ে যাবো, আমার মনে এই এক চিন্তা ঢুকে গেছে।]

কিংবা যখন শুনবেন তাঁর নিজেরই দেওয়া সুরে মল্লার জাতীয় ভজন:

বাদাল রে তু জল ভর লে আয়ো

ছোটি ছোটি বুঁদন বারাবাণ লাগি

কোয়েলা শাবাদা শোনা আয়ো ॥

তখন সুরবিস্তারের স্বকীয় বলিষ্ঠতায়, মুর্ছনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজে, স্বর-ক্ষেপের অভিনব কৌশল প্রয়োগে মুগ্ধ চিত্তে মুক্ত কণ্ঠে আপনার পক্ষে স্বীকার না করা সম্ভব হবে না – এমন সুরেলা দরদী দরাজ গলা 'লাখে না মিলে এক'।

এ-হেন মনমাতালকরা শিল্পীর ঘরোয়া জীবনের পরিচয় জানতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের দুটো লাইন মনে পড়ে কি আপনাদের? আমার তো হামেশায় মনে পড়ে যায়:

ইঁটের পরে ইঁট

মাঝে মানুষ-কীট

যখন দেখি মির্জা সাহেবকে জীর্ণ বিশাল নবাবী ইমারতের একটা স্যাঁত-সেঁতে প্রকোষ্ঠে জীর্ণ পোষাকে শীর্ণ দেহটা ঢেকে অতিথিঅভ্যাগতকে সাদর আহ্বান জানাতে। কিংবা কীট হয়তো আমরাই। কারণ আমাদের এতো কাছে অনাঘ্রাত কুসুমসম এক মহৎ শিল্পী বাবট্টি বছর ধ'রে যেমন অকাতরে এই এই পৃথিবীর আলো বাতাস গ্রহণ করছেন তেমনি প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতায় পৃথিবীর মানুষকে তাঁর মধুনিষ্যন্দী সুরেলা কণ্ঠের দ্রাক্ষারসে পরিষিক্ত করে আমাদের মনকে মাতিয়ে তাতিয়ে তুলতে সদা-উদ্গ্রীব থাকা সত্ত্বেও আমরা কীটদষ্ট ফলের মতো কিংবা হয়তো কীটের মতোই খলস্বভাবে তাঁর অশেষ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল অস্তিত্বকে বাসি বাসনের মতো ম্লান করে রেখেছি অমার্জনীয় উপেক্ষায়, অনাদরে, অশ্রদ্ধায়। মাঝে মধ্যে কখনো আনন্দবাজার কখনো যুগান্তর কখনো বা বসুমতীর প্রতিনিধি আসেন তাঁকে নিয়ে স্বস্ব পত্রিকা পৃষ্ঠায় নির্মম রম্যরচনা লেখার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত রসদ সংগ্রহ করতে। নিজের দারিদ্র্যে সদাম্রিয়মাণ এই গুণী শিল্পী তাঁর জীবনে অকৃত ভুল (অর্থাৎ বাংলা ভাষা না শেখা ও রক্ষণ-শীলতার গণ্ডি ত্যাগ না করার) নীতি ও পথ সম্পর্কে যে আক্ষেপোক্তি করেন, অনূঢ়া কন্যাচতুষ্টয়ীর জন্যে অসহায় বেদনার্ত পিতৃ হৃদয়ের যে আফশোস ব্যক্ত করেন তা ফলাও ক'রে নিখুঁত শিল্প নৈপুণ্যে বর্ণনা করে তাঁরা অচেতন পাঠকের প্রশংসা অর্জন করে থাকেন। কিন্তু সরকারকে, জনসাধারণকে শিল্পীর প্রতি তাঁদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ক'রে দেবার জন্যে একটা লাইনও লেখেন না। কেউ কেউ এতোদূর দায়িত্ববোধহীন যে ভুল তথ্য দিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই প্রতিনিধিত্রয়ের একজন মির্জা সাহেবের সংগে সরাসরি মুলাকাত

করে গিয়েও তাঁদের পত্রিকার ২০ শে জ্যানিউয়ারি (১৯৭০ সালের) সংখ্যায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় তাঁর পরিচয় দেন 'বড়ে গোলাম আলির ছাত্র' বলে। কিন্তু বড়ে গোলাম আলি সাহেবের নিজের লেখা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি একটু আগে তার থেকেই সুধী পাঠক সহজেই প্রমাণ পাবেন যে মির্জা সাহেব তাঁর ছাত্র নন : I have often come in close contact with the said Syed Ali Meerza in several musical soirees . ? বরং দুজনে এক-ই মঞ্চ থেকে বেশ কয়েক বার সংগীত পরিবেশন করেন।

যাই হোক, এই শিল্পী সম্পর্কে শুনলাম মুর্শিদাবাদ জেলা সমাজ শিক্ষা-নিকাধিক মশায় ১৯. ৬. ৭৫ তারিখে তাঁর এক প্রতিবেদনে (দ্রঃ তার মেমো নং ৪৯০) শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিবের কাছে মির্জা সাহেবের অনুকূলে শিক্ষামূলক পেনসন মঞ্জুরীর সুপারিশ করেছেন। কিন্তু আজও তার কোনো ফলাফল জানা যায়নি। আমি জানি পরম শ্রদ্ধেয় কাদের বক্স সাহেব দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করার পর যখন এই শিক্ষামূলক পেন্সন পেলেন তখন এতো দেরি হয়ে গেছিল যে তিনি মৃত্যুর পূর্বে মাত্র দু তিন বছর তা ভোগ করার সুযোগ পান রোগশয্যা থেকে। আমরা আশা করবো তাঁর ছাত্র আলি মির্জা সাহেবের ক্ষেত্রে এই দুঃখজনক পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হবে না।

নেপথ্যের অন্ধকার

রচনা/যশপাল   অনুবাদ/রোমানা বিশ্বনাথম্

চৌধুরী পীরবক্সের ঠাকুর্দা দারোগা ছিলেন। রোজগার করতেন ভালই। চাকরি জীবনেই ছোট্ট একটা পাকাবাড়ি তৈরি করে নেন। দুটি ছেলেকেই ম্যাট্রিক পাশ করিয়ে একজনকে রেলে, অন্যকে ডাকঘরের কাজ পাইয়ে দিলেন। ছেলেদের বিয়ে থা হল, নাতিপুতির মুখ দেখার সৌভাগ্যও না হয়ে যায়নি। কিন্তু চাকরিতে ছেলেরা তেমন সুবিধা করতে পারলো না। ভবিষ্যতের আশা নিয়েই তাঁকে চোখ বুজতে হলো। বাড়িটা ছোট্ট হলেও বংশমর্যাদার সঙ্গে তাল রেখে চৌধুরী ওটাকেই "বড়বাড়ি" আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে মেয়েরা থাকতো বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে। পুরুষেরা গুলতানি করতো রাস্তার ধারের বৈঠকখানায়। নামকরণ গালভরা হলেও

বেকস্থল বৈঠকীতেই দিন গুজরান হত তাদের। কাজেই চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর ক্রমবর্ধমান সংসারের স্থান সংকুলানের জন্য সদর দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে বৈঠকখানাটাকেও অন্দরের সামিল করে নিতে হলো। বৈঠকখানা না থাকলেও ঠাট বজায় রাখার দারুণ প্রয়াস।

বিয়ের পর স্থানাভাব আরও প্রকট হয়ে দেখা দিল। সুতরাং সুবিধেমত এদিক ওদিক ছড়িয়ে না পড়ে আর উপায় রইলো না। চৌধুরী সাহেবের ছোট ছেলে ইলাহীবক্সের চারটি ছেলের মধ্যে তিনটি মোটামুটি লেখাপড়া শিখে নিজেদের পছন্দসই কাজকর্ম জুটিয়ে নিলো। ছোট ছেলে পীরবক্স কিন্তু প্রাইমারীর ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারলো না।

তাহলেও ইতিমধ্যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো এবং শিগগিরই মা ষষ্ঠীর কৃপায় বা আল্লার দোয়ায় অনেকগুলি রেজগীতে ঘর ভরে উঠলো। বংশমর্যাদার উপযুক্ত উপার্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতে হল। মর্যাদামাফিক কাজ যখন জুটলো না তখন অগত্যা একটি তেল কলের চাকরিতেই যোগ দিতে হলো। একাজের উপযুক্ত সে ছিল না তবু বংশমর্যাদার তকমাটার জোর ছিল —মজুরীগিরির বদলে কলম পেষার কাজই জুটলো। মুন্সিগিরি। মাইনে মাসে বারো টাকা।

আয়ের দিকে তাকিয়ে শেষপর্যন্ত একটা স্যাঁতসেঁতে বস্তিতেই তাকে ঘর নিতে হল; ভাড়া মাসে দুটাকা। আশে পাশে মুচি, মেথর, কুলি প্রভৃতি সমাজের নোংরাঘাঁটা লোকেদের বাস। সামনেই রমজানী দোপানী। ভাঁটি খানার ধোঁয়ায় জায়গাটা অন্ধকার করে থাকে। সোডার গন্ধে ঘরে টেকা দায়। গলিটার মুখেই জলের কল থেকে চুঁইয়ে পড়া জলধারা কাঁচা গলিটার ঠিক মাঝখান দিয়ে বরাবর কালো হয়ে সর্বক্ষণ বয়ে যায়। তারই দুপাশ দিয়ে ঘাস গজিয়ে উঠেছে পুরু হয়ে। রাজ্যের মশা মাছির ভণভণ আওয়াজ সর্বক্ষণ আলো বাতাসহীন গলিটার মিশকালো অন্ধকারকে জড়িয়ে ধরে থাকে।

এই বস্তিতে পীরবক্সের মত লোকেরও লেখাপড়া জানা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি ছিল। আর তার আভার অবশ্য ছিল দরজায় ঝোলানো দামী পর্দাটা। বাড়ির ভেতরে যাই ঘটুক না কেন, শতে আলপনা দেওয়া দামী পর্দা যেমনকার তেমনি ঝুলতো। বস্তির লোকদের কাছে পীরবক্স তাই ছিল চৌধুরী সাহেব বা মুন্সিজী। তার বাড়ির মেয়েরা ছিল অসূর্যম্পশ্যা—কেউ কোনদিন তাদের বাড়ির বার হতে দেখেনি।

দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু সময়ের গুণে দেউড়ির নড়বড়ে দরজাটা খসতে খসতে একদিন রাত্রে একেবারে ভেঙে পড়ে গেল। পীরবক্স নিজেই সে রাত্রে কোনক্রমে ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু সারা রাত্রি ভয়ে ভয়ে কাটলো—কি জানি যদি চোর আসে। কিন্তু চোর এলোনা। বাইরে অবস্থাপন্ন জানলেও চোরের নেবার মত কিছুই পীরবক্সের ঘরে ছিল না।

অবশ্য চোরের চেয়ে পর্দার সমস্যাটাই ছিল বেশি। কারণ দরজা না থাকলে পর্দা টাঙানো ছাড়া অন্য পথ নেই। কিন্তু পুরানো জীর্ণ পর্দাটা এক-দিন ঝড়ের রাত্রে এমনি ফালা ফালা হয়ে গেল যে খাটাবার আর উপায় রইলো না। বাধ্য হয়ে ঘরের শেষ সম্বল দামী সতরঞ্চটাই টাঙিয়ে দিতে হল।

পাড়ার লোকে দেখে বলল: চৌধুরী সাহেব এমন দামী জিনিস আজ কালের দিনে কেউ নষ্ট করে, সস্তা চাদর ঝুলিয়ে দিন না! পীরবক্সের জানা ছিল আট আনার কমে দুগজ কাপড় পাওয়া শক্ত। হেসে বল্লে, তাতে আর হয়েছে কি? আমাদের বড় বাড়িতেও তো এই ধরণের পর্দাই বরাবর খাটানো হয়।

পনেরো বছরে পীরবক্সের মাইনে বার থেকে বেড়ে হল আঠেরো টাকা। কিন্তু আল্লার কৃপায় ছেলে মেয়ে মিলিয়ে সন্তান হল আধডজন। তার উপর পিতার মৃত্যুর পর ভাইরা কেউ দায়িত্ব না নেওয়ায় মা তারই কাছে পড়ে রইলেন।

সংসারে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এবং অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে। বাড়ির পাঁচ-জন মেয়েমানুষের কাপড় জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে গা থেকে খসে খসে পড়ে, পীরবক্সের নিজের পায়জামা আর পাঞ্জাবিও শালীনতা রক্ষা করে চলার অনুপ-যুক্ত। কিন্তু কোনক্রমেই কোন কিনারা সে করে উঠতে পারলো না। চারি-দিকে অকুল পাথার। কারখানা থেকে সাত তারিখের আগে বেতন মিলবে না। এডভান্স মালিক দিতে নারাজ। জিনিস বন্ধক দিয়ে টাকায় বার আনা সুদে ধার কখনও কখনও সে নিয়েছে। কিন্তু তারও উপায় ছিল না। এ অবস্থায় কাবুলীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া পথই বা কি! দুএক ক্ষেত্রে সে নিয়েছেও! কাজেই শেষ পর্যন্ত তারই কাছে ধর্ণা দিতে হল। মাসিক টাকায় চার আনা সুদে চার টাকা ধার নিলে। আট মাসে ঋণ পরিশোধ করার চুক্তি হল।

খাঁয়ের কিস্তি মেটাতে না পারলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা চিন্তা করে পীরবক্সের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তাই সাতটা মাস যার বাঁচি করে সে

কিস্তি শোধ করলে। কিন্তু শ্রাবণের ভরা বর্ষায় গম'ত দূরের কথা বাজরাও যখন টাকায় তিন সের হল তখন আর ধার না করে পেরে উঠলো না। খাঁ সাহেবের হাতেপায়ে ধরে, দেড়া সুদ দিতে রাজি হয়ে আরো একমাস সময় নিলো। কিন্তু ক্রমশঃ অবস্থা আরো সঙিন হয়ে উঠলো। মাগগি ভাতা নিয়ে বিশ টাকা বেতনের মধ্যে অগ্রিম নেওয়ার দরুণ মাত্র চারটি টাকা তার হাতে এলো! এদিকে স্ত্রীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে, তার পথ্য পর্যন্তও জুটছে না; ছেলে মেয়েগুলো সারা সপ্তাহটা প্রায় উপোস দিয়েই কাটিয়েছে। কোনদিন দু'চার পয়সার সস্তা খাবার নয়তো একবাটি করে বাজরা সেদ্ধ খেয়ে গুষ্টি শুদ্ধ কাটাতে হয়েছে। এত কষ্ট করে টাকা থেকে দেড় টাকা কেটে বাবর খাঁয়ের হাতে তুলে দেওয়া পীরবক্সের পক্ষে সম্ভব হল না।

কাজেই পীরবক্সের কাছে বাবর খাঁ একটা মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে রইলো। ওর কথা মনে হলেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।............

'চৌধুরী'! তড়িৎ স্পৃষ্টের মত চমকে উঠলো পীরবক্স; শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল গলাটা। হাত পা গুলো এলিয়ে পড়লো। কিন্তু গলা চড়িয়ে চৌদ্দ পুরুষের নাম ধরে যখন গালাগালি করতে করতে পর্দা ঠেলাঠেলি সুরু করলো বাবর খাঁ নিজীবকা সত্ত্বেও তখন বেড়িয়ে এসে সে তার মুখোমুখি দাঁড়ালো। মুহূর্তের জন্য তার অভিজাত রক্ত গরম হয়ে উঠে তখনই আবার শান্ত হয়ে গেল! খাঁয়ের পা ধরে সেদিনকার মত মাপ চাইলো।

ক্রুদ্ধ বাবর খাঁ তখন অগ্নিশর্মা। তার চিৎকারে চৌধুরীর দরজার সামনে বস্তির যত মুচি আর মজুরদের ভীড় জমে গেল উত্তেজিতভাবে লাঠি ঠুকে বাবর চিৎকার করে বললে—টাকা দিতে পারবিনা তো কেন নিয়েছিলি বদমাস, তোর মাইনের টাকা কি করেছিস্? বদমস্, আমার পয়সা মারবি...আজ তোর চামড়া না ছাড়িয়ে নিয়েছি তো......পয়সা নেই, আবার পর্দা, নবাবী চাল মারিস! দে, তোর বউয়ের গয়না খুলে দে, নিয়ে আয় ঘরের বাসন যা আছে, নিয়ে আয়, আমি তাই নিয়ে যাবো। শুধু হাতে আজ কিছুতেই ফিরবো না।

নিরুপায় এবং হতবুদ্ধি পীরবক্স দুহাত তুলে বাবর খাঁয়ের কল্যাণ কামনা করে বললো, 'শপথ করছি, বিশ্বাস কর ঘরে একটা কানা কড়িও নেই, বাসনপত্র, কাপড়চোপড় কিছু নেই। এর পরেও যদি কিছু চাও আমার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে বাজারে বিক্রি করগে।

বাবর খাঁ জ্বলে উঠলো। 'রেখে দে তোর শপথ, ওতে আমার কাজ নেই; আর তোর চামড়াই বা আমার কি কাজে লাগবে, ওতে তো জুতোও বানানো যাবে না? তোর চামড়ার চেয়ে এই পর্দাটারও ত দাম বেশি, বলতে বলতেই টাঙনো পর্দাটা বাবর খাঁ এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলো।' দরজার সামনে থেকে পর্দাটা ছিঁড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরীর জীবনশিকড়ও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাটা গাছের মত সংজ্ঞাহীন হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

পর্দাহীন দরজার মধ্য দিয়ে তাকাবার মত মনোবল চৌধুরীর ছিল না। পর্দার এপাশে সংঘটিত ঘটনার উত্তেজনা ও আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পর্দার অন্তরালে থাকা মেয়েরা উঠোনের মাঝখানে জড়ো হয়ে বলির পাঁঠার মত থরথর করে কাঁপছিল। সহসা পর্দাটা ছিঁড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তারা এমনি স কুঁচিত হয়ে উঠলো যে দরজার মুখে ভীড় করে দাঁড়ানো জনতার মনে হল তাদের পরনের শাড়ি কাপড়গুলো কে যেন অকস্মাৎ তাদের গা থেকে একটানে ছিনিয়ে নিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে পর্দাটাই ছিল বাড়ির সমস্ত মেয়েদের আবরু। পর্দা না থাকলে তারা প্রায় বিবস্ত্র ও উলঙ্গ।

জটলা পাকিয়ে থাকা আশে পাশের মুচি, মেথর, ধোপা কুলি প্রভৃতি সমাজের নোংরা ঘাটা লেখা পড়া না জানা লোকগুলো ঘৃণা আর লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিলো। হঠাৎ এই নগ্ন চেহারাগুলো যেন বাবর খাঁয়ের কঠোরতায় পর্যন্ত চাবুক মারলো। ব্যর্থতার গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে থুথু করে পর্দাটা উঠোনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে একটি দুর্বোধ্য শপথ উচ্চারণ করলো সে। তারপর নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে ভীড়ের সামনে থেকে আড়ালে মেয়েদের ছুটে পালাতে দেখে লজ্জা আর কেমন যেন এক অব্যক্ত করুণায় জনতা ছড়িয়ে ছিটকে পড়লো। চৌধুরী বেহুস হয়ে পড়েই রইলো। যেন ঘুমুচ্ছে, যখন হুঁস হল দেখলে পর্দাটা তারই সামনে উঠোনের উপর গুটিয়ে জড়পিণ্ডের মত রয়েছে। কিন্তু উঠে টাঙিয়ে দেবার মত উদ্যম তার শরীরে ছিল না। তার প্রয়োজনও আর ছিল না। যে ভুয়া আভিজাত্যকে আড়াল করে বাঁচিয়ে রেখে ছিল ঐ পর্দা, তার মৃত্যু ঘটেছে।

চারিদিকে সংগ্রাম

মাণিক রায়

সত্যব্রত খালাসিটোলার শুঁড়িখানার বাইরে এসে দাঁড়ালো ; সন্ধ্যা তখন নেমে এসেছে, বৃষ্টি পড়ছে সামান্য একটু একটু ঘাম দেখা দিয়েছে চোখেমুখে, চুলগুলি সাদা, চোখে চশমা, বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, চোখে মুখে দীপ্ত, একটা দৃঢ়তা। একটা বিড়ি ধরালো দেশলাই জ্বালিয়ে, দেশলাইটা পকেটে রাখলো, জামাটা খদ্দরের, কিন্তু প্রচণ্ড মোটা, বৃষ্টির দু'একটা ফোঁটা মাথায় এসে পড়ছে, বেশ লাগছে, যদিও একটু ঠাণ্ডার আমেজ। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই দেখে একটা বুড়ো গোছের লোক বসে ঝিমোচ্ছে, আর তার পাশে একটি মেয়েছেলে কয়েকটি বাচ্চাকে নিয়ে ছেঁড়া চটের ওপর বসে আছে ; বাচ্চাগুলি কুকুরের মতো চিৎকার করছে, আর মেয়েছেলেটা চিৎকার করে কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না। এ পাশে শুঁড়িখানার সিঁড়ির নীচে বুড়োটা ঝিমোচ্ছে, সত্যব্রতের মনে হলো হয়তো না খেতে পেয়ে ভিক্ষের আশায় ক্লান্ত হয়ে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে বুড়োটা এমন করছে। সামনে নেমে এলো, মনে হলো একটা সিকি দেয়, তার পরেই মনে হলো না, পয়সা দিয়ে এদের মুক্তি আনা যায় না—কিন্তু কি যেন কৌতুক বোধ হলো, কাছে এসে বললো : এই, ঝিমোচ্ছো কেন, বাপধন, একটু চোখ খোল, ঘুমিয়ে আর কতোকাল কাটাবে। একটু চোখ মেলে তাকাও, চাইবার হলে তাকিয়ে চাও, এতো চোখ বুজে থেকো না। বুড়ো বিড়বিড় করে কি বললো একবার চোখ খুলে আবার চোখ বন্ধ করলো, ঘাড়টা ঝুইয়ে পড়লো ডান দিকে, দেয়ালে মাথাটা ঠক করে ধাক্কা খেলো একবার, ও পাশে মেয়েছেলেটা তখনো চিৎকার করছে, বাচ্চাগুলো চেঁচাচ্ছে জোর, একটু নত হয়ে সত্যব্রত বুড়োর কাছে ঝুঁকে পড়লো, না, তন্দ্রা ত নয় নেশা, নেশায় চোখ বুজে এসেছে ওর। শুঁড়িখানার কালীমার্কা কোনো রকমে খেয়েছে, হয়তো ভিক্ষে করা পয়সা দিয়েই মদ কিনে খেয়েছে, বাইরের কোনো চিৎকার, জগৎ, ছবি ওকে বিভ্রান্ত করতে পারছে না। সত্যব্রত মনে মনে হাসলো, না, তার তেমন নেশা হয় না, সে মদ খেলেও চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে পারে, জগৎ তার কাছে লুপ্ত হয়ে যায় না। সত্যব্রতের মনের কোণে একপ্রকার

ঘৃণা জাগলো, সারাজীবন সে এদের চোখ খুলতে চেয়েছে, কিন্তু পারে নি, বরং বুজে এসেছে। কিন্তু সে নিজে তাকিয়ে থাকলেও কি দেখতে পাচ্ছে। একটা কালো পর্দা চারিদিকে ঢেকে ফেলেছে, এবার জোরে বৃষ্টি এলো, ভাবলো এই বৃষ্টিতে চলে যাবে, কিন্তু পারলো না, আর একটা বিড়ি ধরালো, সেটাও শেষ হয়ে গেল, বুড়োটা ভিজছে, মেয়েছেলেটা বাচ্চাগুলোকে কুকুরের ছানার মতো, দুই বগলে হাতে নিয়ে শুঁড়িখানার শেডের তলায় এলো। সত্যব্রত আবার ভেতরে গেল, একটা কোণের টেবিলে বসলো অন্ধকার জায়গাটা এখান থেকে ঘরের সব জায়গা দেখতে পাওয়া যায়, ঘরটা মাতালের চিৎকার ভরে গেছে, মাগী, প্রেম, টাকা, জুয়া, দেহ। না, তার আর গ্লাস পাবার ইচ্ছে হলো না। একটা মিটিং ছিল কিন্তু এ বৃষ্টিতে যাবে কি করে। ঘরের ছবিটা বাইরের ছবির সঙ্গে এক হয়ে গেল। বাইরে এসে তাকালো আবার, বুড়োটা একেবারে শুয়ে পড়েছে, বৃষ্টি একটু ধরেছে এবার। তাড়াতাড়ি দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো, কাদা গিদগিদ করছে, প্যাচ প্যাচে রাস্তার চাপ সারা বুকে উঠে এলো, রাস্তায় হাঁটা যায় না এতো লোক, গায়ে গা ঘেঁসে যায়, কোনো রকমে ছোঁয়া বাঁচিয়ে মোড়ে এসে দাঁড়ালো সত্যব্রত। কিন্তু আবার আর এক দৃশ্য, এই দৃশ্য সে আজকাল রোজই দেখে। হ্যাঁ, এই মেয়েছেলেটিকেই তো, সে দেখেছে কালকেই এই পথে একটু দূরে। একটি সাতাশ আটাশ বছরের মেয়েছেলে, পরনে একটা ন্যাতা জড়ানো, বুক খোলা, একটু ফর্সা রং, ধুলোর পলেস্তরা পড়েছে, দুটো স্তন এখনো নেতিয়ে পড়ে নি, স্নায়ুগুলোর জোরগুলোর জোর আছে, দুটি বাচ্চা দু'পাশে, আর একটি পেটের কাছে, মেয়েছেলেটা চোখ বুজে আছে, মনে হচ্ছে মূর্ছায় ঘুমিয়ে আছে, বাচ্চা দুটোও স্তনের কাছে মুখ রেখে নীরবে নিঃশব্দে পড়ে আছে, কোনোটা এক বছরের কোনোটা তার ওপরে, রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছে তারা দেখছে একবার, থামছে, তারপর হাঁটছে, কেউ পয়সা দিচ্ছে, পয়সা বেশ পড়েছে, প্রায় ডুগজ ফুটপাথ বিকেলের শাদায় চমকে উঠেছে যেন। কেউ পয়সা তুলে নিচ্ছে না। কে জানে, সত্যব্রত ভাবলো, কখন মেয়েছেলেটা কপট নিদ্রা ভেঙে উঠে বসে, নতুবা যারা তাকে এইভাবে রেখে যায়, তারাই হয়তো নিতে আসে; কিন্তু অদ্ভুত ক্ষমতা অর্জন করেছে মেয়েছেলেটি, মড়ার মতো নিস্তেজ পড়ে থাকে, ভ্রূক্ষেপ নেই, বাচ্চাগুলিও তাই, হয়তো কোনো ওষুধ খাইয়ে রাখে, ভিক্ষে করবার অদ্ভুত কৌশল, তার পাশ দিয়ে কাম ক্রোধ লোভ বিলাস আভিজাত্য-

গর্ব হেঁটে চলে যায়, কিন্তু তাকে নাড়াতে পারে না, বরং সকলের ওপর তার খোলা বুকের শক্ত ময়লা স্তন জুটো বাচ্চা সমেত বড়ো হয়ে সারা চৌরঙ্গি পাড়ার আকাশে আলোর কুয়াশায় ছড়িয়ে পড়ে। ভিখিরিরও এক নিজস্ব রীতি ও আভিজাত্য আছে, বুড়ো নেশায় বুঁদ হয়ে চোখ বুজে আছে, আর এও চোখ বুজে আছে আর এক নেশার আদিমতায়, নারীর বুকের গোপন মোহের নেশায় উদ্দামতায় ঘুমিয়ে আছে সে, কারণ ঘুম পাড়িয়ে দেবে সকলকে। সত্যব্রত বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না, ঘেন্না হলো, কারণ তারও চোখ বুজে আসছে, নেশাটা কি উঠছে? না, তার নেশা তেমন চড়ে না, হলে তো ভালোই হতো। মিটিং করে কোনো ফল নেই, দায়িত্ববোধ ওদের বোঝানো যাবে না, হাসি পায়, যেন ওর নিজের দায়িত্ববোধ আছে, পাটকলের শ্রমিকের কথা শুনবে না, পাট হয়েছে কি হয় নি, তারা জানে না, তাদের বোনাস দিতে হবে শতকরা কুড়ি ভাগ, কোম্পানি দিতে চাইছে না। বলছে লোকসান হয় নি, কিন্তু লাভ হচ্ছে না, সুতরাং শতকরা পাঁচভাগের বেশি কিছুতেই বোনাস দেবে না।

অনেকদিন কৃষ্ণের বাড়ি যাওয়া হয় নি, একদিন ঘুরতে ঘুরতে তার বাড়িতে এলো সন্ধ্যা বেলা, দুজনের মধ্যে কথা হয় না, কিন্তু তবু সত্যব্রত পুরনো বন্ধুত্বের তাগিদে আসে। কৃষ্ণ চুপ করে থাকে, কথা বলে কম, কথা বললে স্পষ্ট ও কেটে কথা বলে, আদ্য অক্ষরের ওপরে ঝোঁক দেয়, একদিন কৃষ্ণও জনগণের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিয়েছে, পথে পথে রাস্তায় রাস্তায় দিনরাত্রি ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু কবে কোনদিন সে ইনটেলেকচুয়াল হয়ে গেল, জগতের সঙ্গে তার আর প্রত্যক্ষ যোগ নেই, বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো অভিজ্ঞতা ঘটছে না, সংবেদনা নেই, অতীতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় গৌরবের মুখ দেখে, এবং ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শন করে। চা খেলো ওরা নীরবে, সত্যব্রত কথা ওঠাতে চাইলো, বিশ্বজোড়া মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে দেশের অবস্থা কি, ভ্রু কুঁচকে বললো, ডুববে আর কি। সত্য আর কথা এগিয়ে নিতে পারলো। কিন্তু এর ইম্‌প্যাক্ট সারা পৃথিবীতে পড়বে। সত্যব্রত বললো, কিন্তু আমাদের দেশের কি হবে। কৃষ্ণ মুখ ঘোরালো মনে হলো এই জঘন্য তুচ্ছ দেশের জন্যে কৃষ্ণের কোনো দায় নেই। এই সময় আরেকজন প্রবেশ করলো, চোখে মদিরতা, চুলে উদাসীন মুক্তি, পোশাকে বিষণ্ণতা। ঢুকেই বললো, এই যে কৃষ্ণ তোমার কাছে বাখের গান শুনতে এলুম। বাখের সঙ্গে আমাদের

দেশজ সংস্কৃতির কেমন একটা মিল আছে। রাঁকুড়ার মানুষেরা যেন কথা বলে। সত্য ওদের দিকে একটু তাকালো। একটা সিগার ধরালো মুখে. কোনো কথা বললো না বিদায় নিয়ে পরে চলে এলো। আসবার সময় নতুন ভদ্রলোক, কবি বললো, মিছিল কেমন চলছে, য়ুনিয়ন করেও তাহলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।

কাপড়ের মিলে এলো দুপুরে সত্যব্রত একদিন। কয়েকজনকে চার্জশীট করেছে কোম্পানি. কিন্তু কোনো কারণ দেখায় নি। মজদুররা ধর্মঘট করেছে। কোম্পানির বক্তব্য যারা ধর্মঘট করেছে, যাদের চার্জশিট করা হয়েছে, তারা মিলের ক্ষতি করেছে। ধর্মঘট আজ প্রায় পনেরো দিন হলো, কিন্তু সমাধানের কোনো লক্ষণ নেই। কর্তৃপক্ষ বলছে, মিল চলবে না এও ভালো. কিন্তু কোম্পানি এইসব মজদুরদের নেবে না। এমনকি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও একমাসের মাইনে দিতে রাজি কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকেরা লেবর কমিশনের কাছে আবেদন করেছে, আজকে সেখানেই মিটিং। অন্যপক্ষের ট্রেড য়ুনিয়নের নেতারা ধর্মঘট বেআইনী বলছে। কিন্তু এরা মরিয়া। গাড়ি করেই সত্যব্রত পৌছল নিউ সেক্রেটারিয়েটে, জয়েন্ট লেবর কমিশনারের ঘরে মিটিং। সত্যব্রত বললো আপনি কি রিপোর্ট দেবেন। কমিশনার বললো, আমি যা শুনেছি, দেখেছি, তার ওপরই যা বলবার বলবো। আর ধর্মঘট তো পুরো হচ্ছে না। সত্যব্রত বললো, কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকতা করছে বলেই ধর্মঘট হচ্ছে না এ কথা বলা যায় না। নিয়মের ব্যতিক্রমই বলে নিয়ম আছে। কমিশনার বললো; আপনাদের পক্ষে তো কোনো জোরদার প্রমাণ নেই। বেঁটেখাটো ভদ্রলোক, হাসিখুশি, সপ্রতিভ, আইনের প্যাঁচ জানে এবং ধারাও বোঝে। হেসে হেসেই কথা হচ্ছিল, আরো কিছু কথা হলো. কিন্তু তার মত পাল্টানো যাবে বলে মনে হলো না। শেষ চেষ্টা করলো সত্যব্রত. বললো. দেখবেন যারা ধর্মঘট করেছে তারা যেন 'ভিকটিমাইজড' না হয়। অন্যপক্ষের নেতা বললো কোম্পানি এই ক্ষতি সইবে কেন? সত্যব্রত একথার কোনো উত্তর দিলো না। সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বাইরে তখন অন্ধকার পড়বে পড়বে করছে, আকাশের নিচে পাখিরা চেঁচাচ্ছে জোরে। গাছে বসতে পারছে না. গাড়ি করে না গিয়ে আপন মনে গঙ্গার ধারে পায়চারি করলো, ইডেনের ধার দিয়ে এগোতে লাগলো, পাশেই কতকগুলো মেষ কালো মোটা চেহারা. ল্যাজ নাড়াচ্ছে, একটা মাটির কিছুটা অংশ কাদা

করে দিয়েছে, জল প্যাঁচ প্যাঁচ করছে চারিদিকে, ল্যাজের ঝাপটে কাদা উঠছে, মোষগুলি চোখ বুজে আছে, কিন্তু মুখে চিবোচ্ছে অনবরত, উঠবার শক্তি নেই, চলবার ক্ষমতা নেই একেবারে।

ঘুরতে ঘুরতে অনিমাদের বাড়ি এলো সে তাদেরই পার্টির মেয়ে, বয়েস প্রায় চল্লিশেরই কাছাকাছি, দেহে যৌবনের আভা এখনো মেলায় নি, মাঝে মাঝে সত্যব্রত এদের বাড়ি থাকে, অনিমা একটা মেয়ে স্কুলে পড়ায়. ওর আরো ভাই বোন আছে সঙ্গে, বিয়ে করেনি, সত্যব্রত আসতেই অনিমা বললো, কি ব্যাপার, এই অসময়ে? সত্যব্রত হাসলো, দশটা টাকা দিয়ে বললো, কিছু আনো, খিদে পেয়েছে। অনিমা বললো মনে হচ্ছে ব্যবসায় হেরে গেছো। সত্য বললো, না, হারা জেতার কোনো প্রশ্ন নেই, সব সমস্যা মেটানো যায় না। অনিমা বললো, তোমার বেশ প্রতিপত্তি আছে। অথচ কোনো কাজ করতে হয় না। সত্যব্রত বললো, জীবননাশেরও প্রশ্ন আছে হারা জেতায়। অনিমা বললো, তাতেই তো জীবনের চরম আনন্দ, রোম্যান্স। হেসে বললো সত্যব্রত, সেই রোম্যান্সের জন্যেই তো তোমার কাছে আসি। রাত্রি তখন গভীর হয়ে এসেছে গাছের নীচে পাতার বুকের আদিমতার মতো। সত্যব্রত সেদিন বাড়ি ফেরে নি।

সত্যব্রতের মেয়ে ইস্কুলে যাবার আগে বললো, তোমাকে কিন্তু ড্যাডি রাজি হতেই হবে, আমাদের সিস্টার তোমার কথা বলে দিয়েছি। মিটিংএ তোমাকে আসতেই হবে, ফাদারও বলে দিয়েছে। সত্যব্রত কোনো কথা বললো না, সত্যব্রতের স্ত্রী মণি বললো, কেন, তুমি কথা বলছো না কেন। মেয়ের একটা প্রেস্টিজ আছে। ওরা এতো করে বলে দিয়েছে। মেয়েকে লরেটোতে পড়াতে পারো অথচ তাদের স্কুলে যেতে তোমায় এতো সঙ্কোচ! গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ো না, আজকে আমি নিউ মার্কেটে মার্কেটিং করতে বেরুবো একটু। বব্ করা চুলে গন্ধের ঢেউ তুলে মণি ঘরে চলে গেল। ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে সত্যব্রত বাইরে বেরিয়ে এলো, ব্র্যাবোর্ন রোডে ভিসা আপিসে একবার যেতে হবে, প্লেনে তাকে বাইরে যেতে হবে পরের মাসে। আরো কয়েকজন যাচ্ছে তার সঙ্গে।

কাজ সেরে বেরিয়ে আসতেই অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, বললো, কি হে সত্য য়ুনিয়ন কেমন চলছে, সত্য কোনো কথা বললো না; বন্ধুটি বললো, চলো, গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে, একটু ভিজিয়ে নিই। সত্যব্রত কোনো

কথা বললো না। বন্ধুটি আপন মনে বলে চললো, এ দেশে কিছু হবে না, কিছু বোঝেই না, মিছিল করলে হাসে, লাইনে দাঁড়াতে বললে পালিয়ে যায়, স্লোগান দিতে বললে বলে গলা ব্যথা করছে, মিছিল করবার জন্যও পয়সা দিতে হয়, সব কাজ যেন ওদের হয়ে আমাকেই করে দিতে হবে, শুধু ফলটি টুপ করে খাবে। সত্যব্রত কোনো কথা বললো না, হাসলো শুধু, বললো আমার অন্য কাজ আছে, চ'ল। অন্য ট্রেড য়ুনিয়নের নেতা বন্ধুটি, কিন্তু মজদুরদের মধ্যে সংশয় দেখা দিতে পারে ওর সঙ্গে মিশলে, তাই সত্যব্রত এড়িয়ে গেল।

ডালহৌসি দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো, পার্টি আপিসে যেতে হবে, এই সময় একটা গাড়ি ওর পাশে এসে দাঁড়ালো, গাড়ির দিকে বিরক্তিতে চোখ তুলে তাকাতেই দেখলো জুট মিলের ম্যানেজার, হেসে মুখ বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে বললো, আসুন। আপনাকে নামিয়ে দিই। সত্যব্রত প্রথমে না না করলো, পরে পীড়াপীড়িতে উঠতে বাধ্য হলো গাড়ি এসে থামলো গ্র্যাণ্ডের কাছে, ম্যানেজার একরকম জোর করে তাকে হোটেলের ভেতর নিয়ে এলো, সত্যব্রত কোনো কথা বলতে পারলো না, শুধু বলতে চেষ্টা করলো এ আমার ধাতে সয় না। আর আমার কাজ আছে। ম্যানেজার বললো, কাজ তো আছেই। আপনি যে দশ পার্সেণ্ট বোনাসের কথা বলেছেন, তাতেই শেষ পর্যন্ত সকলে রাজি হয়েছে, মালিক চায় কি, পরে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। বেশ ভারি বোঝাই করেই ওরা লাঞ্চ খেল ড্রিঙ্কের সঙ্গে গুড়াক। নাচের ব্যবস্থা ছিল তবে ইচ্ছে হলো না, শুঁড়িখানায় কাণ্ডবাদি, এখানে উল্লাস মদে। খেয়ে বেরুতেই কুকুরের মতো ভিখিরিরা ভিক্ষের জন্য ঘিরে দাঁড়ালো, সত্যব্রতের ঘেন্না হলো, মনে হলো বমি উগড়ে আসবে; এতো দামী খাবারের পর ময়লাজমা বস্তার মতো গন্ধ-ওঠা ভিখিরিদের চেহারা বড়ো বিসদৃশ। তাড়াতাড়ি ওরা গাড়িতে উঠলো, গাড়ি চলতে শুরু করলো, স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়েই অ্যাটাচি খুললো, ম্যানেজার বললো, কোম্পানির তরফ থেকে আপনাকে সামান্য উপহার দিচ্ছি, একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলো সত্যব্রতের দিকে। গাড়িটা সর্বতলা রোড দিয়ে এগোচ্ছে, একটা মস্ত গির্জা, পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে, বৃষ্টির পরে জলে ধোওয়া দেওয়াল পবিত্র হয়ে উঠেছে, ক্রশটা অপূর্ব শোভা পাচ্ছে শাদা মেঘের নিচে. চত্বর বারান্দা নির্জনতায় ভরা, গাছের ছায়ায় নীরব, বাইরে ফুটপাথে ভিখিরিরা

রান্না করছে, মলমূত্র ত্যাগ করছে ওদের বাচ্চারা, কেউ ন্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে, যেতে যেতে দুর্গন্ধে ওরা রুমাল চাপা দিলো। যিশুর ক্রুশ ওপরে ভাসছে ওদের মাথায়।

সুতো কলে পা দিতেই মজুরেরা চিৎকার করতে লাগলো, তাদের কথার মধ্য দিয়ে কি কথা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না, আর একটু এগোল, দেখলো একটি লোক চিৎকার করে বলছে, ভাড়াটে গুণ্ডার মতো ট্রেড য়ুনিয়নের ভাড়াটে প্রেসিডেণ্ট আমরা চাইনা। আমাদের সমস্যা আমরা বুঝবো। সত্যব্রত হাসলো, এই চেতনা এলে তো ভালোই, কিন্তু তারপর রাগ হলো. এদের জন্যে সব করছে অথচ ওরা সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু সব ব্যাপারে মাথা কি ঢোকাতে পারবে ওরা, বুদ্ধি কতটুকু, আর চাকরি করবে, না—ট্রেড য়ুনিয়ন করবে, মালিক ছাড়বে কেন, তবু আনন্দ হলো, কিন্তু ভয়ও হলো, ঘোষের ছবি মনে ভেসে এলো তৎক্ষণাৎ। সত্যব্রতকে দেখতে পেয়ে ওর পার্টির লোকেরা এগিয়ে এলো, একজন হাত নেড়ে বললো, কমরেড, সামনের সপ্তাহেই আমাদের ধর্মঘট, কিন্তু কোনো আয়োজন নেই। কর্তৃপক্ষ বলেছে আমরা যা মজুরি চাই, তা কখনোই দিতে পারবে না। সত্যব্রত বললো বেশতো। মিছিলের ব্যবস্থা করেছেন? লোকটি বললো, করেছি। সত্যব্রত জিজ্ঞেস করলো, অন্যপক্ষের রি-অ্যাক্‌শন্ কি? লোকটি উত্তর দিলো, ওরাও মজুরি বাড়াতে চায়; তবে ধর্মঘট করে নয়, টেবিলে বসে। সত্যব্রত বললো, কর্তৃপক্ষ তো রাজি নয় বাড়াতে, তবে টেবিলে বসবে কি করে? উৎপাদনের সব হিসেব পত্র, আয় ব্যয়ের সব খাতাপত্র ঠিক রেখেছেন? লোকটি জানালো, সব ঠিক আছে। সত্যব্রত বললো, ধর্মঘট ও মিছিল একই সঙ্গে বার করতে হবে। লোকটি বললো, দরকার হলে আমরা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করবো। মজুরি না বাড়ালে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো না। খেটে যদি খাবার পয়সা না জোটে, তাহলে খাটবার কোনো মানে হয় না। সত্যব্রত বললো, বেশ তো। ওদের সকলের সঙ্গেই কথা বললো সে, সকলেই ধর্মঘটে উৎসাহী কিন্তু সে জানে ধর্মঘট হলে সকলেই তাকে গালাগাল দেবে। মিছিল বার করলে হয়তো সকলে আসবে, রাস্তায় সকলে বেরুবে না, বেরুলেও লাইনে ঠিক থাকবে না এবং চরম ঔদাসীন্যে রাস্তা হাঁটবে, জল খাবে, পান চিবোবে গলা দিয়ে স্বর বেরুবে না। না, তবু আন্দোলন করতে হলে এগুলি চাই, সন্ন্যাসী হতে গেলে যেমন ভেক চাই, তা না হলে শিষ্যদের মন ভোলানো

যায় না। মুশকিল হচ্ছে কোনো কোম্পানিতেই একটি কোনো ট্রেড য়ুনিয়ন নেই, তিন চারটি, এমন কি পাঁচটি পর্যন্ত। সকলেরই দাবি মাইনে বাড়ানো কিন্তু স্লোগান আলাদা, পথ ভিন্ন, এবং বিরোধিতা না করলে দলের স্বার্থ থাকে না। সত্যব্রত চেষ্টা করলো অন্য ট্রেড য়ুনিয়নের নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে; একজন ছাড়া কাউকে পেল না. চায়ের দোকানে ঢুকে সত্যব্রত বললো, আমাদের দাবি যখন, আসুন আমরা যুক্ত ইস্তাহার দিই। অন্য নেতা বললো, আমি এখুনি বলতে পারছি না। অন্য সকলের সঙ্গে কথা বলি। এবং আরো একজন আছে, তার কি মত আমাদের জানতে হবে। সত্যব্রত বোঝাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু অন্য নেতা রাজি হলো না বুঝতে। বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ শুনতে পেল, তোদের সত্যব্রত মাইরি পাগা ছ্যাচড়া। বোনাসের ব্যাপারটা মাইরি কেমন ধ্বসিয়ে দিয়েছে। অন্য একটি লোক বললো, মারবো পোঁদে এক লাথি, কোন অবস্থায় কি করেছে জানিস? সব লে অফ করলে ভালো হতো, না। অন্যপক্ষের নেতা বললো সত্যব্রতকে, কেসটা ট্রাইব্যুনালে উঠুক, তারপর দেখা যাবে আমরা কি করতে পারি। সত্যব্রত বেরিয়ে এসে আরো লোকের সঙ্গে কথা বললো, য়ুনিয়নের ফাণ্ডের খোঁজ নিল, কাজ কেমন এগোচ্ছে তা জানতে চেষ্টা করলো।

বিকেলে একটা পার্টির মিটিং ছিল. সামনে ইলেকশন, কি পথ নিতে হবে, তারি জন্যে পলিসি তৈরি, ইলেকশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, না করবে না, গণতন্ত্রে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা মানায় না, এবং ওপরে উঠতে গেলে এ একটা সিঁড়ি, একে বাতিল করা যায় না কিছুতেই। পার্টির ইচ্ছে সত্যব্রত কনটেস্ট করে, সত্যব্রতও তাই চায়। কিছু লোক বলছিল মফস্বল থেকে দাঁড়াতে, না, সে কখনোই হতে পারে না, শহরের মজুরেরা ক্যালাস ঠিকই, কিন্তু ক্ষেত মজুরেরা ঘুমিয়ে আছে একেবারে, ধাক্কা দিলেও ওঠে না, আর শহর থেকে এই চেতনা নিয়ে যেতে হবে, তাদের ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে ধীরে ধীরে, মাঠের আলের পথ দিয়ে পাকা সড়কে গাড়ি চললেই মনের গাড়ি চলবে; কিন্তু শহরের কয়েক লক্ষ মজুর নিয়ে দেশের কাজ হয় না, কে বলে হয় না, সে একা যদি পাঁচ হাজার লোককে চালাতে পারে, তাহলে এই নীতিতেই চলবে, আর তার পক্ষে গ্রামে যাওয়া সম্ভব নয়, এ জীবনের মোহের পাকে পাকে বাঁধা পড়ে আছে সে, কিন্তু শহরের ভোটে কি দাঁড়ানো যাবে, তাদের কি এমন ফাণ্ড আছে যা দিয়ে তাকে তাদের দলকে দাঁড় করাতে

পারে ? কি জানি, সত্যব্রতের মনে হলো সে স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্নের ঘটনা ঘটছে তার মনে, আসল স্বপ্ন দেখছে না। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে উঠে বসেছে সে, একটা মজুরের বাচ্চা একটা খেলনা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে জোরে; ঘূর্ণমান টিনের চারপাশে একটা ছোট্ট ছেঁড়া কাগজ ঘোরার বেগে ঘুরছে বেগে, কখনোই পড়ছে না। সত্যব্রত দেখছিল, দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলো, সেকেণ্ড ক্লাসে ভিড় বেশি, হিন্দুস্থানি বাঙালি ওড়িশার লোক, ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে, ঘামের গন্ধ, পান চিবোচ্ছে, কেউ ঝিমোচ্ছে, কেউ খৈনি দাঁত ও ঠোঁটের ফাঁকে রেখে জানালা দিয়ে পিচ ফেলছে, ঘন ঘন, কেউ মদ খেয়েছে চুর হয়ে আছে নেশায়। গাড়িটা চলছে ময়দানের পাশ দিয়ে; সবুজ ঘাসগুলির মাথা পিষে পিষে যাচ্ছে সোজা, শব্দ হচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সহসা, মাথার ওপরে ক্রেন কাঁপছে, ছিঁড়ে যেতেও পারে, না, তবু যাবে না, ওপরে তার ধরে নীচে ইস্পাতের লাইন ধরে এগোবে, নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবে। সত্যব্রত ভালোই আছে, দেহের ক্ষুধা তাকে পেয়ে বসে, ক্ষুধা সর্বত্র, মজুরদের দেহের ক্ষুধা ও চাহিদা বাড়িয়েই ও জিইয়ে রেখেই সে বেঁচে আছে, ওদের চাহিদার সঙ্গে, দাবির সঙ্গে সত্যব্রতের চাহিদা এক হয়ে গেছে, সেই বাঁধা লাইনেই এগোচ্ছে, এই চাইবার ক্যাপিটালকে জীইয়ে রাখতেই তার কৌশল, যে মুহূর্তে কর্তব্যের কথা বলবে, সে মুহূর্তে তার জায়গায় অন্যকে প্রেসিডেন্ট করবে; মালিকের পক্ষের লোককে তারা নেতা করতে পারে না, দাবিটাকে টাটার বাড়ির মাথায় চাপিয়ে এগোতে হবে, ওই বিজ্ঞাপনের ছবিটার মতো, কুড়িতলার বাড়ির ছাদে পা ঝুলিয়ে মাথা উঁচিয়ে এক যুবক আকাশ মাথায় করে উন্নত মস্তকে বসে আছে কুড়িতলা বাড়ি ছাড়িয়ে সে উঠছে পোষাকের জোরে, এই পোশাকটা চাই, পোশাকের জন্যেই লড়াই এখানে, সত্যব্রত জানে, সে উৎপাদন করছে না, তার মূলধন নেই, শ্রমও দিচ্ছে না, তবু চাহিদা ও দাবিকে চাগিয়ে রেখেই তার জীবনের চাহিদাকে বাড়িয়ে তুলছে। জীবনটা যখন দাঁড়িয়ে আছে শূন্যে, মাঝখানে, আকাশ ও মাটির মাঝখানে, সেখানেকৌশলকে আঁকড়ে ধরতেই হয় বেশি করে। এই কৌশলের ওপর ভর করেই বিরাট গর্জন করে পৃথিবীর তেজী পেট্রল পুড়িয়ে উপাদান শেষ করে বিমান উড়ে চলে। সত্যব্রতের মাঝে মাঝে চিন্তা হয় একদিন শ্রমিকেরা জেগে উঠলে তার মতো ট্রেড য়ুনিয়নের নেতাদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু ট্রামের লোকদের দেখলে কি মনে হয়, গন্ধের নেশায়, মদের নেশায় আবেশে ঘুম জড়িয়ে আছে।

না, বড় ক্লান্তি লাগছে। সামনেই একটা মদের দোকান দেখে নেমে পড়লো সে। ট্রামে সেই বাচ্চাটা তখনো খেলনাটা ঘোরাচ্ছে বোঁ বোঁ ক'রে। অমংলগ্ন কাগজটা বেগে তারি সঙ্গে ঘুরছে, পড়ছে না। রাস্তায় নেমে হাঁটতে লাগলো। লাইন ও তার ধরে ট্রামটা এঁকে বেঁকে ঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সত্যব্রতের মনে হলো, তার বড়ো ঘুম পাচ্ছে, চোখ জড়িয়ে আসছে, একটু বিশ্রাম চাই।

বৃষ্টিতে একদিন/ দিবেশচন্দ্র লাহিড়ী

অফিস থেকে বেরিয়ে বাসায় পৌঁছবার আগেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। ক'দিন থেকেই যা গুমট গরম চলছিল তাতে কোন কিছুই সুস্থিরভাবে করা যাচ্ছিল না। সর্বদাই অস্বস্তি আর ক্লান্তি। ক্লান্তি আর ঘুম ঘুম ভাব। সুতরাং অসুবিধা সৃষ্টি করলেও আপাততঃ এই বৃষ্টিকে মনে মনে স্বাগত জানাল অঞ্জন। —বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তেই 'কোথায় দাঁড়ানো যায়' এ কথা ভাববার কোন রকম সুযোগ না পেয়ে একটু ছুটে ডানদিকের একটা দোকানের বারান্দায় এসে আশ্রয় নিল সে। সেখানে আগে থেকেই বেশ ক'জন দাঁড়িয়ে। দোকানের ভেতরেও কয়েকটি যুবকের জমজমাট আড্ডা।

আনমনে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুখ ঘাড় ও হাত মুছল অঞ্জন। তারপর ভাবল, বহুদিন বৃষ্টিতে ভেজা হয়নি। বৃষ্টির জলে স্নান করা হয়নি। এখন এই জলে একদম জবজবে ভিজে বাড়ি ফিরলে কেমন হয়! গায়ের সঙ্গে জামা প্যান্ট গেঞ্জি কেমন লেপটে থাকবে। গা শিরশির করবে, দু'একটা হাঁচি পড়বে কিন্তু শরীর জুড়োবে।

মুষল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যেই ড্রেন উপচিয়ে রাস্তায় জল দাঁড়াতে শুরু করেছে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন। দূরের গাছ-পালা ঘর-বাড়ি গাড়ি-মানুষ সবই ঝাপসা। অনেকটা বাস-রিলীফ কাটোর মত। রাস্তার ওপাশে এক সারি টিনের চালা। নানা ধরণের দোকান। প্রতিটি দোকানেই দু'পাঁচজন করে আটকা-পড়া মানুষ। বৃষ্টির ছাট থেকে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে কি?

অঞ্জন তাকিয়ে দেখল তার পায়ের দিকটা অনেকখানি ভিজে গেছে। চশমার কাঁচ দু'টোয় ক্রমেই জল-কণা জমছে। এবং একটা লোক প্রায় তার গায়ে গা সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে।

একপাশে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে। যে সে লোক গায়ে গা ঘেঁসে দাঁড়াবে এটা কোনকালেই তার পছন্দ নয়। সে বরদাস্তও করে না। সেই ছোটবেলা থেকেই এ ধরণের খুঁতখুঁতোনি তার। এবং এজন্যেই পারতপক্ষে সে বাসে চড়ে না। ভীড় এড়িয়ে চলে। লাইনে দাঁড়িয়ে কোন কিছু করতে হলেই মেজাজ বিগড়ে যায়। বাজারে যাবার কথা শুনলেই গা ঘিনঘিন করে।

পরিষ্কার ছিপ-ছাপ স্বতন্ত্র থাকতেই ভালবাসে অঞ্জন। এটা নিতান্তই অভ্যাস কিংবা রুচির ব্যাপার। কিন্তু সব সময়েই নিজের রুচি বা ইচ্ছানুযায়ী সব কিছু ঘটে না। হয় না। আর তখনই মনের মধ্যে একটা ছোট্ট অস্বস্তির কাঁটা বিঁধে থাকে। যেমন সেবার নৈনিতাল যাবার সময় কাঠ গুদামে ট্যাক্সিতে ট্রেনের সহযাত্রী সেই স্মার্ট চেহারার ভদ্রলোককে নেওয়া হয়েছিল। অঞ্জনের ইচ্ছে ছিল সে আর রাধা শুধু দু'জনে মিলেই ট্যাক্সিতে যায়। কিন্তু রাধা আপত্তি করেছিল। —অনেক ভাড়া লাগবে।

—তা লাগুক। কিন্তু পাহাড় প্রকৃতি আকাশকে তো সম্পূর্ণ উপভোগ করতে করতে যাওয়া যাবে!

—এখনও এসব ভাল লাগে?

—কেন লাগবে না শুনি? দশ বছর হল বিয়ে হয়েছে বলে? না কি অন্য কিছু? তুমি তো জান আমি নির্জনতা পছন্দ করি। হৈ হট্টগোল ভাল লাগে না বলেই অত খরচ করে আমি নদীর ধারে ফাঁকার ওপরে বাড়ি বানিয়েছি। গাড়ি কিনব বলে কোম্পানির কাছে লোন চেয়েছি।

—ভাল কথা, কিন্তু ও ভদ্রলোককে ট্যাক্সিতে নিতে তোমার এত আপত্তি কিসের?

—ঐ তো বললাম।

—গত চব্বিশ ঘণ্টার ওপর ট্রেনে পাশাপাশি সীটে বসে আড্ডা মেরে কাটালে, তাতে অসুবিধা হল না?

—সেটা ট্রেন তো

—বাঃ সুন্দর যুক্তি। আসলে বল তোমার নেচারটাই—

— আনপোক্সান, কতকটা তাই বটে। তা তোমার যদি ভদ্রলোককে খুব পছন্দ হয়েই থাকে—

—আহা, এটা আমার কোন ব্যাপারই নয়।

অঞ্জনই ভদ্রলোককে ট্যাক্সিতে পাশে বসিয়েছিল। প্রথমে দু'একটি কথাও বলেছিল। কিন্তু তারপরেই চুপ। কেন—তা সে নিজেও জানে না। যেন চোখে বালি পড়ায় সারা রাস্তার পাহাড় ঝর্ণা নদী গাছ দেখতেও তার অসুবিধা হয়েছিল।

সহযাত্রী সেই ভদ্রলোকের মুখটাকে মনে করবার চেষ্টা করল অঞ্জন। কিন্তু পারল না।

জানলা-দরজা বন্ধ করে হর্ণ দিতে দিতে একটা ট্যাক্সি দ্রুত রাস্তার জল কেটে বেরিয়ে গেল। সে শব্দে সচকিত হয়ে অঞ্জন দেখল এই বারান্দায় লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। সামনের দিক থেকে খুবই বৃষ্টির ছাঁট আসছে। সুতরাং এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া আর উপায় কি?

রাস্তায় জল থৈ থৈ। নোংরা আবর্জনা ভেসে যাচ্ছে। সামনের দোকানগুলোর নিচে গুটি-সুটি লোকগুলো দাঁড়িয়ে। কারো মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দু'চারটি কথাবার্তা ভেসে আসছে। ঐ চালাটার পাশে বড় গাছটার ডালে দু'টো কাক চুপচাপ বসে ভিজছে আর কখনও-সখনও এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। টেলিফোনের তারে অজস্র জলের ফোঁটা ছুটতে ছুটতে এসে পড়ে যাচ্ছে। একটা কুকুরকে ধাওয়া করে দুটো স্যাংটো ছেলে হি-হি করে হাসতে হাসতে ছুটে গেল। এক ভদ্রলোক বর্ষাতি চাপিয়ে টুপিতে চোখ ঢেকে সাইকেলে চড়ে চিৎকার করে কি বলতে বলতে যেন দূরে মিলিয়ে গেল। —এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরাবার চেষ্টা করল অঞ্জন। পারল না। দেশলাইটা কেমন স্যাঁতসেঁতে। কাঠি মারতেই বারুদ খসে যাচ্ছে। তাহলে কি করা যায়? কার কাছে আগুন পাওয়া যায়?

এতক্ষণ পরে এই বারান্দার নিচে প্রতিটি মানুষের দিকে সোজাসুজি তাকাল অঞ্জন। —নাহ্, ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায় তা প্রায় নেই বললেই চলে। দু'একজন হতে পারে। বাদ-বাকি সবই মনে হচ্ছে পথ-চলতি বাজারে মানুষ। দোকানের ভেতরের যুবক কয়টি কিন্তু রীতিমত ধোদুরস্ত এবং শিক্ষিত।

অঞ্জন প্রতিটি মুখকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল। প্রথমে দোকানের ভেতরে। একটা রাবণজুলপি, ঝোলাগোঁফ, বাদশা-বাদশাবাবড়ি ও ছাগল-দাড়ি গল্পে মত্ত

রাবণজুলপি বলছে,—গদ্দার দেখলাম, দারুণ। একেবারে হলিউডি কায়দা।

ঝোলাগোঁফ,—মোহনবাগানের পাঁচগোল খাওয়ার একমাত্র কারণ প্লেয়াররা খেলতে নামার আগে হরলিকস খেতে ভুলে গেছে।

বাদশাবাবড়ি,—শরৎ চাটুজ্জে অনেক হিন্দী ফিল্মের কাহিনী লিখেছে কিন্তু। খুশবুটাও চাটুজ্জে মশাইএর লেখা।

ছাগলদাড়ি, রেখে দে তোর খুশবু, হেমামালিনীর বেডরুমের দাম কত জানিস ?

ঝোলাগোঁফ,—পুরনো খবর আর কপচাস না।

রাবণজুলপি,—তার চাইতে বল দেখি কিশোরকুমারের চারনম্বর বউ কে ?

বাদশাবাবড়ি,—এটা একটা কোশ্চেন বটে !

ওরা সবাই হাসতে লাগল।

ওদের হাসিতে অঞ্জন মনে মনে রেগে গেল ! ছেলে ক'টি অভদ্র বটে। কি আক্কেল ওদের। আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি আর ওরা আড্ডা মারছে। ভেতরে একবার বসতেও বলছে না। আমি হয়ত বসতাম না। কিন্তু ওরা তো বলতে পারত ! ল্যাক অফ কালচার। কতক্ষণ থেকে একটা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আর সেদিকে ওদের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই ! এসব ছেলেদের কিস্যু হবে না। আড্ডা মেরেই জীবন কাটবে। না - সিগারেট ধরাবার জন্যে ওদের কারো কাছে আগুন চাওয়া চলবে না।

এবারে বারান্দার লোক ক'টিকে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করল অঞ্জন। সামনে দু'টো লোক ঝোলা হাতে দাঁড়িয়ে সুযোগ খুঁজছে—বৃষ্টিটা কমলে একটু ফুরসৎ পেলেই তারা পালাবে। মাঝে মাঝে চাপা স্বরে কথা বলছে। ওদের দু'জনের কাছে কি আগুন আছে ? দেশলাই কি পাওয়া যাবে ? কিন্তু চেহারা দেখেই যে দেশলাই চাইতে ইচ্ছে করছে না। তার পাশে একটা চথরা বথরা হাওয়াই শার্ট গায়ে দেওয়া তরুণ গুণগুণ করে গান গাইছে,— খুল্লমখুল্লম প্যার করেগা হাম দোনো।......

এঃ—এপাশের লোকটা একদম গায়ের ওপর এসে পড়েছে। কে বাপু

তুমি ? একটু সরে দাঁড়াও না কেন ? তোমার পিঠে যে রকম দাগড়া-দাগড়া দাগ দেখছি তাতে তোমার যে কোন নিষিদ্ধ রোগ নেই সে কথাটা বলবে কে ? তোমার কাছে আগুন থাকলেও তো নেব না।

অঞ্জন আবার কাঠি জ্বালবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। মাথা ঘুরিয়ে আবার সবার দিকে তাকাল। দেয়াল সেঁটে একটা লোক চোখ বুঁজে একমনে বিড়ি টানছে। ওর কাছ থেকে আগুনটা নিলে কেমন হয় ? —নাহ্, বিড়ি থেকে সিগারেট ধরানো ঠিক নয়। যদি কেউ দেখে ফেলে ! তখন ? রাধা যদি এখন এখানে থাকত এবং এ দৃশ্য দেখত তাহলে নিশ্চয়ই ও মুখ টিপে হাসত। কিংবা হয়ত বলত—দেখে করুণা হচ্ছে।

—আহ্ ধাক্কা দিচ্ছেন কেন মশাই ?

—বৃষ্টির ছাট আসছে যে !

—তা বলে আমাকে ছেঁটে দেবেন নাকি ?

—এবারে পুজো আর ঈদ একই সঙ্গে।

—লোহার দাম অনেক কম। একশ' আশি টাকা কুইন্টাল।

—খুল্লম খুল্লম প্যার করেগা হাম দোনো……

আবার সব চুপ-চাপ। অঞ্জন ডান দিকে একটু সরে দাঁড়াল। কি বোটকা গন্ধ রে বাবা। এ জায়গাটায় দাঁড়িয়ে খুব ভুল হয়েছে। অস্বস্তি।

সিগারেটটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অঞ্জন। একটা হাই তুলে ভাবল—আজ ক্লাবে বিলিয়ার্ডের আসর মোটেই জমবে না।

হঠাৎ বৃষ্টিটা একটু ধরে এল।

আর কয়েকজন সেই সুযোগে রাস্তায় নেমে পড়ল।

অঞ্জন ইতস্ততঃ করল। কেননা এ বৃষ্টিতে রওনা হলে একেবারেই ভিজে যেতে হবে।

এমন সময় পাশ থেকে একজন একটা দেশলাই বাড়িয়ে ধরে বলল,—বাবু আগুন।

অঞ্জন সিগারেট ধরিয়ে লোকটার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল ! —ঘরের আড্ডায় হঠাৎই হাসির হররা ছুটল।

কালো কুচকুচে একটা লোক। মাথার চুল ছোট ছোট। খালি পায়ে একরাশ কাদা। হাঁটুর ওপর ময়লা নোংরা ধুতি। গায়ে একটা হাওয়াই শার্ট। আর সেই শার্টটা—

অঞ্জন ভীষণ অবাক হল! তার গায়ে যে কাপড়ের যে প্রিন্টের হাওয়াই শার্ট—ঐ লোকটাও হুবহু সেই শার্ট পরে। এটা কি করে সম্ভব? ঐ লোকটার গায়ে এরকম দামী কাপড়ের শার্ট এল কোথা থেকে? —না, কোন ভুল নেই। একই কাপড়ের শার্ট। কিন্তু ও লোকটা এখানে এল কেন? ও তো অন্য কোথাও গিয়ে দাঁড়াতে পারত। অন্য জামা পরে থাকতে পারত। ঐ জামাটা প'রে এখানে আসার কি দরকার ছিল?

অঞ্জন অস্বস্তি অনুভব করল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি না। বোধহয় ভেতরের যুবক ক'টি আড্ডা থামিয়ে তাকে এবং লোকটিকে দেখছে। ফিসফিস করে যেন কি বলাবলি করছে। তবে কি ওরা এই জামার প্রসঙ্গেই কথা বলছে?

ঠিক এই মুহূর্তে রাধার ওপর ভীষণ রাগ হল তার। কেননা ক'মাস আগে রাধাই এ কাপড়টা বাজার খুঁজে তার জন্যে নিয়ে এসেছিল। এক গাল হেসে বলেছিল, রেয়ার প্রিন্ট। কারো গায়ে দেখতে পাবে না। কি চমৎকার বল তো!

চমৎকার না ছাই। একেবারে যাচ্ছেতাই। কিন্তু ও লোকটা এখনও নড়ছে না কেন? যাচ্ছে না কেন? বৃষ্টি তো কমেই এসেছে, তবুও দাঁড়িয়ে আছে কেন? ইডিয়ট ননসেন্স ওয়ার্থলেস।

অস্বস্তি আর বিরক্তিতে ভুরু দু'টো আপনা-আপনিই কুঁচকে উঠল। সোজাসুজি তাকাতে পারল না অঞ্জন। লোকটার নড়বার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। অন্ততঃ হাবভাব দেখে তাই মনে হচ্ছে। সুতরাং এখানে আর মোটেই অপেক্ষা করা চলে না। ঘরের যুবক ক'টি এখন আর কোন কথা-বার্তাই বলছে না। কেন বলছে না? তবে কি ওরা শুধু তাদের দু'জনকেই লক্ষ্য করছে? কেন করছে? একরকম জামা যদি হয়েই থাকে তাতে ওদের কি? এটা তো স্বাভাবিকই—কাপড়ের কল তো আর শুধু তার জন্যেই বানায় নি। যে কেউ পরতে পারে। তুমিও পর না কে তোমাকে বারণ করেছে? লোকটা পরেছে বেশ করেছে। —না করে নি। এ জামা পরার কোন অধিকার ওর নেই।

থাকলেও এখানে দাঁড়াবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ও ভুল করেছে। অন্যায় করেছে। এক্ষুণি ওর চলে যাওয়া উচিত। এক্ষুণি এই মুহূর্তেই।

কিন্তু ও যাচ্ছে না কেন?

অঞ্জন অধীর হয়ে উঠল। মাথার মধ্যে কেমন টনটন করতে লাগল। মনে হল সারা শরীরে দ্রুত রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু কেন?

সেই লোকটা হঠাৎ একটু হেসে বলল,—বাবু আপনার সিগারেট নিভে গেছে। আগুন দেব?

—না—না—। যেন চিৎকার করে উঠল অঞ্জন।

সিগারেটটাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল সে। —না, আর এখানে নয়। এক মিনিটও নয়। লোকটা একটি শয়তান। ওর ছায়া মাড়ানও পাপ।

বৃষ্টির মধ্যেই দ্রুত হাঁটতে লাগল অঞ্জন। জামা-প্যান্ট সব ভিজে গেল। সে ভ্রূক্ষেপ করল না। অনেক দূর এসে একবার পিছে তাকাল।

আর তাকিয়েই আবার কেঁপে গেল।

সেই লোকটা গুটি গুটি পেছনে আসছে।

একটা গলির মধ্যে ঢুকে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হল অঞ্জন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মগজের মধ্যে একটা ভাবনা উঁকি দিল—লোকটা যদি একই জামাপরা দলবল নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করে—তাহলে?

কাল থেকে রাস্তায় শুধু যদি জামাপরা লোকই ঘুরে বেড়ায়—তাহলে?

শেষ চিঠি[১] / স্বর্গত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

C/O SUPERINTENDENT, CENTRAL JAIL
SRINAGAR, 6th JUNE, 1953

ভাই বৌদি ঃ

সে দিন তোমাকে চিঠি লিখে রাখার পর ডাকের চিঠি এল। এক সংগে তোমার আগের লেখা বাংলায় তিনখানা চিঠি পেয়ে খুব সুখী হলাম। এই সব চিঠি আমাকে দেওয়া হয়নি হয়ত যিনি বাংলায় লেখা চিঠি পড়ে 'পাস' করতেন তিনি ছিলেন না। আমার সব চিঠি পেয়েছ আশা করি। আমি মোটের ওপর ভালই ছিলাম—কিন্তু আবার দু'দিন ডান পায়ে ব্যথা বেড়েছে—কেন এমন হয় জানি না। ডাক্তার কাল এসে ওষুধ দিয়ে গেছেন। সারাদিন যেন না দাঁড়াই এই বলেন, এমনি তো বেড়াবার উপায় নেই—বাগানের মধ্যে ছাড়া—তাতে কোন রকম খিদে হয় না তার উপর যদি একেবারে শুয়ে বা বসে থাকতে হয় তাহলে আরো মুশকিল। ক'দিন আবার সন্ধ্যার পর জ্বর হচ্ছে—বেশি নয়, ৯৯°। চোখমুখ জ্বালা করে। ওষুধ খাচ্ছি। খাওয়া ত খুব সাবধানে খাই। সিদ্ধ খাওয়া—তরকারি। মাছ পাওয়া যায় না। দুদিন এনেছিল। ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। তবে সাড়ে পাঁচটার আগে উঠি না। মুখ ধুয়ে একটু বাগানে ঘুরি ঘরে বসি সে সময়টা খুব সুন্দর থাকে—চণ্ডীপাঠ করি। ৭টায় এক কাপ চা। তারপর বসে পড়া ও কিছু লেখা। সাড়ে আটটায় বাগানে গিয়ে বসি রোদ আসে সেখানে তখন। মুখ পুড়ে কালি হয়েছে—তাই মুখটা গাছের ছায়ায় রাখি ও তার জন্য চেয়ার সরাতে সরাতে চলতে হয়। তখন খাবার আনে। তখন ক্রীম ক্রেকার বিস্কুট—হাসুত পাঠিয়েছে—একটু মাখন দিয়ে আধসিদ্ধ ডিম একটা ও এক কাপ দুধ কফি। তারপর সেখানেই বসে থাকি—বা একটু ঘুরি। বই আর বই এই চলে—বারোটা অবধি। তখন স্নান করি—ও প্রায়ই বাগানে গাছতলায় খাই।

একঘণ্টা বিশ্রাম হয় - চিঠি লিখি বা পড়ি। সাড়ে তিনটায় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসেন—খবরের কাগজ বা ডাক নিয়ে। খালি চা—লেবু দিয়ে—ও ফল (যদি থাকে) খাই। সাড়ে সাতটা থেকে আটটা সন্ধ্যা পর্যন্ত আলো থাকে। তারপর ঘরে এসে বসি। বই, কবিতা, গীতা—এইসব চলে তখন - পৌনে ন'টা পর্যন্ত। তখন বারান্দায় খাওয়া হয়। দুবেলার খাওয়া একই। একখানা রুটি খাই। সিদ্ধ তরকারি কোনদিন মাংস—দই দুবেলাই খাই। মিষ্টি দু-একদিন এনেছিল। রাত দশটা পর্যন্ত জেগে থাকি। তারপর আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুম প্রথম রাত ভাল হয় না। তারপর এক ঘুমে ভোর হয়। হাতে অগাধ সময়—ভাবতে আরম্ভ করলে তার সীমা পাওয়া যায় না। শুধু যে দিন বছর পার হয়ে গেছে তার কথা ভাবি না—তার ভিতরেও অনেক জিনিস আছে যা দুঃখ ও সুখ মেশান, কাজেই তাদের ভুলব কেমন ক'রে তাই ভাবি সেই সব কথা। তার সংগে বর্তমান সময়ের কথা ভাবি মানুষ ও ঘটনা—ছবির মত মনে আসে—কে কোথায় আছে কি করছে, কোন্ ঘটনা কেমন ঘটছে—নানাভাবে এইসব মনে আসে। আবার যখন ভাবি অনিশ্চিত দূর ভবিষ্যতের কথা—তখন আর একরকম ভাবে সব ভাবনা জেগে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখি - পরাজয়ের মধ্যে বিজয় দেখি—সবার ভাল দেখি। বেশি দেখেছি এই ক'দিনে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ অথচ কত গর্বিত ও মদমত্ত আমরা—অথচ তা জানি না। বুঝি না যে যন্ত্র-চালিত হয়ে চলেছে এ জগৎ ও যাঁর কৃপায় এই সৃষ্টির জন্ম বৃদ্ধি ও নাশ হচ্ছে তাঁর কথা ভাবি না। জীবনের প্রায় সময় কেটে এল—কি করলাম এর ভিতর জানিনা। কত ছোট ও কত বাজে কথায় ও কাজে সময় কেটে গেছে - ভুল ও অন্যায় কত করেছি তাই ভাবি। বই পড়তে খুব ভাল লাগে, তুমি জান। বই পড়ছি নানা বিষয়ের ওপর—নতুন ও পুরাতন—আর শিখছি কত নতুন করে। লিখতে খুব ইচ্ছা করে কিন্তু ঠিক সম্ভব হচ্ছে না বাবার[8] জীবনী একটা লেখা হল না—এই ত্রিশ বৎসর—এর জন্য দুঃখ হয়। এখনো চেষ্টা করলে তাঁর সময়ের অনেক কথা লেখা ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া যায় ক'দিন ধরে আমারই ইচ্ছা করছে এই সব লিখতে। নিজের জীবনেও কম অভিজ্ঞতা হয়নি—তাও লিখতে মন চায়। ভাবি তোমাদের কথা ছেলেমেয়েদের কথা, নাতিনাতনীর কথা - আর যে হাজার হাজার ছেলেরা আজ বন্ধ জেলে রয়েছে তাদের কথা। কতদিন এভাবে থাকব জানি না। ভবিষ্যতে কাজ কি করব

তাও জানি না। তবে মনে কোন দুঃখ বা দুশ্চিন্তা নেই। বরং আগে যে অফুরন্ত বিশ্বাস নিজের ওপর রাখতাম, তা এ কদিন রাখতে পেরেছি—সে অজানা পরম শক্তির উপর যাঁর নির্দেশ বিনা আমরা চলতে বা বাঁচতে পারি না। এতে আনন্দ হয়, মনে জোর হয়। সবাই ভাল থাক ও সুখী হও। আজ এই থাক। চিঠি দিও।

তোমার মেজ ঠাকুরপো

১। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই পত্রটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রকাশিত হল। পত্রটি ডঃ মুখোপাধ্যায়ের অনাশঙ্কিত আকস্মিক মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পূর্বে শ্রীনগর বন্দীশালা থেকে অগ্রজজায়াকে লিখিত।

২। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা তারা দেবী।

৩। মধ্যম কন্যা শ্রীমতী হাসি ভট্টাচার্য। ইনি এখন ইঞ্জিনীয়ার স্বামীর চাকুরিস্থল আমেরিকায় বাস করেন।

৪। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

টেলিগ্রাম

মূল গল্প লেখক : রদিয়ন রেবান

(জন্ম সাইবেরিয়া : ১৯৩৮)

অনুবাদক : মনীষিমোহন রায়

বাতাসের জোড়ে দরজাটা খুলে গেলে ঘরের কাঠের মেঝেতে একটা কাঁ্যাচকুঁচ শব্দ উঠলো। নাস্ত্যা জেগে উঠে বিছানায় বসলো। ঘড়িতে তখন ভোর পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

তাড়াহুড়ি করে ধড়মড়িয়ে লাফিয়ে উঠে সে বাড়ির বাইরে এলো। তারপর ঠিকঠাক ভাবে চেপেচুপে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে তার আর বুকের ভেতরটা কেমন বেদনায় টিপ টিপ করছে। কানখাড়া করে শুধু একবার সে পরখ করে নিল এবং বুঝলো, ছোট্ট ভিমকা

তখনো ঘুমে অচেতন। আলুক্ষেতের পাশ দিয়ে নাস্ত্যা তখন আরিশার বাড়ির দিকে ছুটে গেল। বাতাসে এঁদো জমি থেকে ভেসে আসছে শুকনো ঘাসের সোঁদাগন্ধ।

গ্রাম্যপথের আশেপাশের ঝাউগাছগুলো এলোমেলো বাতাসে দুলে দুলে যেন শিস্ দিচ্ছে আর নাস্ত্যার শরীর-মুখ আলতোভাবে স্পর্শ করছে।

ছোট্ট পাহাড়ের ঢালে আরিশার বাড়ি, যার একটা অংশ উঁচু জায়গার ওপর বড় বড় খুঁটির ওপর স্থাপিত। ভোরের কোমল আলো তখনো পুরো-পুরি ছড়িয়ে পড়েনি চারিদিকে। বাড়ি এবং তার বড় বড় কয়লাকালো খুঁটিগুলোর মাঝখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের আকাশ, যার মুখে তখনো লেগে আছে অন্ধকার। নাস্ত্যার চোখ বাড়িটা অনুসরণ করলো। গ্রামের শেষ বাড়িটার উঠোন অব্দি হাল্কা কাপড়ের একটানা একটা শিথিল রেখার মতো হাওয়া বইছিল—যেন, একঝাঁক সাদা হাঁস আকাশে ডানা মেলেছে।

নাস্ত্যা আরিশার জানালায় এসে টোকা মারলো। একটা ছায়া কাছে সরে এলো এবং আরিশার কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হল, 'কে ওখানে?'

—'আমি······তাড়াতাড়ি শোনো, আরিশা!'

জানালাটা খুলে গেল। দীর্ঘকেশী আরিশা এলোচুলে কাছে এসে ভয়-চকিত গলায় শুধোলো, 'কী ব্যাপার?'

নাস্ত্যা প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে কেমন ঘোরলাগা গলায় বললো, 'তিমোফি আমায় ডাকছে, আমার মনে হয় তার ট্রেনটা স্টেশনে পৌঁছে গেছে। আরিশা, আমি না-ফেরা পর্যন্ত ডিমকার ওপর তুমি একটু নজর রেখো।'

—দাঁড়াও, তুমি ঠিকঠাক পোষাক পরো আগে! গায়ে তোমার কোনো কোট নেই যে!' ····· আরিশা ছুটে গিয়ে আলনা থেকে একটা জ্যাকেট আনতে গেল, কিন্তু ততক্ষণে সে খুব দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। দূরের বাতাসে ওই পোষাকের শেষ অংশটুকু কোথায় ভূতের মত মিলিয়ে গেলো।

ডিমকা ঘুমিয়ে ছিল। তখনো বেশ জোরে বাতাস বইছে। আরিশা দরজাটা বন্ধ করে দিল, ঘরের বাতিটা জ্বালাল এবং তন্ন তন্ন করে একটা টেলিগ্রাম খুঁজতে লাগলো। কিন্তু পেলো না। আরিশা ভাবলো, নাস্ত্যা নিশ্চয়ই সেটা সঙ্গে নিয়ে গেছে এবং পরক্ষণেই মনে পড়লো, কোনো টেলিগ্রাম তো আসে নি! ডাকপিয়ন কাল রাতে তো এসেছিল! কিন্তু তার কাছে

তো নাস্ত্যার জন্য টেলিগ্রাম ছিল না! তখন রাত প্রায় দশটা। তারপর তো সে আর ফিরে আসে নি!

ক্লান্তিতে আরিশার হাঁটু ভেঙে যাচ্ছিলো। একটা অসহ্য বেদনার পূর্বাভাসে যেন তার শিরদাঁড়া বেঁকে যাচ্ছে। সে ভিমকার খুব কাছাকাছি সরে বসলো এবং ঘুমন্ত শিশুটার দিকে সজল চোখে করুণভাবে তাকিয়ে রইলো।

নাস্ত্যা নদীর দিকে দৌড়চ্ছিল। আকাশের মুখে তখনো অন্ধকার, বাতাসও বইছে প্রচণ্ড বেগে। দিগ্বিদিকহীন ছুটে চলেছে নাস্ত্যা অবলীলায় দৌড়ে পার হয়ে গেল সে অগভীর নদী। তার গলা শুকিয়ে আসে। জিভ দিয়ে ঘন ঘন ঠোঁট চাটছে সে। তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু নাস্ত্যা চলেছে কোথায়? স্টেশনে তো টেলিগ্রাম নেই তবু ওর বিশ্বাস ওখানে হেডকোয়ার্টার থেকে ট্রেন আসছে। তার স্বামী, তার প্রিয়তম তোমেফি আছে তার ভেতরে - যে ট্রেনটা একটুবাদেই যুদ্ধফ্রন্টের দিকে যাত্রা করবে।

ভোরবেলায় এই সময়ই সাধারণতঃ ভিমকা জেগে উঠে কান্নাকাটি করে। নাস্ত্যাকেও তাই উঠে পড়তে হয় এবং দুধ খাওয়াতে হয়। কিন্তু আজ সে যখন জেগে ওঠে তখন নাস্ত্যা খুব স্পষ্টভাবেই তার প্রিয়তমের ডাক শুনতে পেয়েছিল। অথবা এমনো হতে পারে, সেটা হয়তো ছিল তার স্বপ্নের প্রতিধ্বনি। নাস্ত্যার হৃদয় বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

নাস্ত্যা ছুটে চলেছে—ক্ষণে ক্ষণে তার গতি বিঘ্নিত হচ্ছে পায়ের ব্যথায় এতক্ষণে আকাশ থেকে ক্রমে একটা নরম গোলাপী আলো সমস্ত চরাচরে সাবলীল ভাবে বিস্তার পাচ্ছে। ফলে চোখের নজরে এখন চারপাশের সবকিছু খুটিনাটিই খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সূর্য জাগছে - দিকে দিকে বুঝিবা ঐ ফুটে উঠলো আশার আলো।

এখন তুষারপাত হতে পারে, নাস্ত্যা মনে মনে ভাবলো। হয়তো তুষারপাত হবে আর সমস্ত চরাচর তুষারে ঢেকে যাবে এবং অনেক কিছুই তখন মুছে যাবে চিরতরে। আমি এখানে কেন! সে মুহূর্তের জন্য একথা চিন্তা করলো। যদি তার অনুমান সত্যি না হয়? যে পথ সে অতিক্রম করছিল তা অতিশয় দীর্ঘ মনে হল তার। নিঃসঙ্গ একাকিনী সে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললো ক্ষণিকের জন্য। তারপর চকিতে একটি ট্রেনের হুইসিলে

নাস্ত্যা সম্বিত ফিরে পেলো। তার সব সন্দেহই দূরে সরে গেল সে সর্বশক্তি দিয়ে আবার দৌড়তে থাকলো!

নাস্ত্যা প্লাটফর্মে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা ছেড়ে দিল। যেন ছুরিকাঘাতের মতো গাড়ির বগিগুলো একে একে তাকে অতিক্রম করে চলে গেল। পুরানো কাঠের প্লাটফর্ম জুড়ে সেনাবাহিনী লোকলস্কর গিজ গজ করছিল। সমস্ত কিছুই নাস্ত্যার চোখে তখন অবিশ্বাস্য রকমের অর্থহীন সেই প্লাটফর্ম, লম্বা লম্বা শেকলের শৃঙ্খলে আঁটা মালগাড়ির বাগগুলো, সৈনিকদের পোষাকপরিচ্ছদ আর তাদের ভাবলেশহীন মুখগুলি ...সব। আহা! যদি একবার সে নাস্ত্যার নাম ধরে ডেকে উঠতো! সে তো এখনোই খুব কাছে কোথাও আছে—কিন্তু কোথায়? কোথায় আমার প্রিয়?......

একটুপরেই সেনাবাহিনীকে নিয়ে ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

তি—মো—ফি! —কে বুঝি ওই ডেকে উঠলো। নাঃ, কেউ না—এ ডাক যে তার বুকের পাঁজর থেকেই বেরিয়ে আসছে! ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে—ক্রমে গতিশীল হচ্ছে ট্রেনখানা। কম্পার্টমেন্টগুলি আরো দ্রুত একে একে ঝলকে উঠছে তার চোখের সামনে।

হঠাৎ এমন সময় নাস্ত্যা তাকে দেখতে পেলো। 'তিমোফি' গাড়ির শেষ কম্পার্টমেন্টের মেঝের ওপর তার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। না, বসে নয়, নতজানু হয়ে তার লংকোটটা বিছিয়ে শোবার আয়োজন করছিল খুব—একাগ্রচিত্তে। ওই-ই তো তিমোফি, হ্যাঁ, ওই ই তো তিমোফি! হায় ভগবান! আমি কেন সজোরে তখন চিৎকার করে তাকে ডাকতে পারলাম না। নাস্ত্যার চোখে তখন দুনিয়া অন্ধকার। ট্রেনটা তিমোফিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, পেছনে ফেলে গেলো দুঃসহ স্তব্ধতার অন্তহীন অন্ধকার। এবং অনুভব করলো, তার পায়ের নিচে মাটি নেই। 'প্রিয় তিমোফি আমার!' বুকফাটা আবেগচাপা গলায় কঁকিয়ে উঠলো সে। তার মনে ক্ষণিকের জন্য প্রশ্ন এলো, 'কিসের এই পৃথিবী, সে কেন এই নোংরা কাঠের প্লাটফর্মে? কিন্তু পরক্ষণেই 'প্রিয় আমার, প্রিয় তিমোফি আমার!' বলে আবার কঁকিয়ে ওঠে বেদনায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে মাটিতে বসে পড়লো।

বৃদ্ধ স্টেশনমাস্টার নাস্ত্যার দিকে তাকিয়ে রইল স্তম্ভিত, বাকাহারা হয়ে। বেদনাদীর্ণ হৃদয়ে তিনি নাস্ত্যাকে কি বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না।

একটি ছোট কুকুর প্লাটফর্মের ওপর বসে ছিল নাস্ত্যার দিকে করুণ চোখে কিছু খাবারের আশায় উন্মুখ হয়ে। কিছু একটা পাবার আশায় খুব উৎসুক-ভাবে সে তার লেজ নাড়ছিল।

একমাস পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নাস্ত্যা তার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেলো। ডাকপিয়ন টেলিগ্রামটা নিয়ে খুব ইতস্তত করলো, তার হাতটা হয়তো কেঁপে উঠলো। ডেলিভারি দিয়ে সে খুব নিঃশব্দে ফিরে গেল।

স্তব্ধ নিষ্প্রাণ বাড়ি। ডাকপিয়ন জানলার বাইরে থেকে শুধু শুনতে পেলো একটা আলার্মঘড়ির টিক টিক শব্দ এবং কি যেন ভেবে সে আবার দরজার কাছে ফিরে এলো।

—আরো কিছু ? —খুব শান্তগলায় নাস্ত্যা জিজ্ঞেস করলো।

—না, না .... আমি ভেবেছিলাম আপনি আমায় ডেকেছেন।

- 'না, না তো'

তখন সে চলে গেলো খুব নিঃশব্দে, নতমুখে।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব—কোন পথে ?

"নমুনা প্রশ্নাবলী" (ইংরাজী)

সত্যেন সাহা

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একাদশশ্রেণীপাঠক্রমের অবসান ঘটানো হয়েছে। আর তার স্থলে পুনর্প্রচলন করা হল দশ-শ্রেণীর পাঠক্রম। একে বলা হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক রূপান্তর। নতুনত্ব নিশ্চয়ই আছে। মাধ্যমিক স্তরে মৌখিক পরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই একটা নতুন সংযোজনা। পাঠক্রমরচনাকারীদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কর্মশিক্ষা প্রচলন। শিক্ষা যদি সমগ্র সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টার অবিচ্ছিন্ন স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তবে তা নিশ্চয়ই আদর্শস্থানীয় নয়। গত শতকের সমাজতান্ত্রিক চিন্তানায়করা শিক্ষাকে উৎপাদন মুখী করবার দাবী উত্থাপন করেন। শিক্ষা দার্শনিকেরা এই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং শিক্ষা-প্রশাসকবৃন্দ এই দাবীকে

আজকাল করে তুলেছেন একটা ফ্যাশন।* তার বড় দৃষ্টান্ত হল পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তিত মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামোয় কর্মশিক্ষাকে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করা। মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষার কি হাল হবে বা কর্মশিক্ষার পরীক্ষা কি রূপ নেবে সে সম্পর্কে এখনই আমরা কিছু বলতে পারছি নে। আশান্বিত হবার খুব কারণ নেই। আশঙ্কিত হবার যথেষ্ট সঙ্গত ভিত্তি আছে।

কিন্তু এখনই যে বিষয়ে আমরা চমকে গেছি তা হল পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদের পত্রিকা 'পর্ষদবার্তার' গত কয়েকসংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আদর্শ প্রশ্নাবলী (Model Enestions)। বিপ্লব যা কিছু ঘটতে যাচ্ছে তা হল প্রশ্নজগতে। এ প্রসঙ্গে কিছু বলবার আগে জানিয়ে রাখা ভাল যে ১৯৭৪ সালে যে পাঠক্রম প্রচালত হয়েছে সেই পাঠক্রমের উপর আদর্শ প্রশ্নাবলী বিদ্যালয়গুলোতে এল ১৯৭৫ এর জুন, জুলাই, অগাষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে। অর্থাৎ আগামী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যবিষয়ে পঠন পাঠনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে নতুন ধরণের প্রশ্নপত্রগুলো প্রথম চোখে দেখতে পেল। এই সব প্রশ্নসম্পর্কে শিক্ষক মশায়রা সম্প্রতি আলোচনা সুরু করেছেন। পত্রপত্রিকাতে কিছু সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছে এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সাধারণভাবে আদর্শ প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে কোন কিছু বলা সম্ভব নয়। বর্তমান লেখকের সেটা উদ্দেশ্যও নয়। ইংরাজীর আদর্শ প্রশ্ন সম্বন্ধে দু'একটা বিষয়ের কেবল অবতারণা করা হবে।

প্রথমেই স্মরণ রাখা ভাল নতুন শিক্ষা কাঠামোয় ইংরাজী তার কৌলীন্য হারিয়েছে। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরাজী হবে ১০০ নম্বরের একটি মাত্র পত্র। একাদশ শ্রেণী পাঠক্রমে ইংরাজী ছিল ২০০ নম্বরের দুটি পত্র। পূর্বেকার স্কুল ফাইন্যালেও ছিল দু'টি পত্র। তার পূর্ববর্তী অধ্যায়ে অবশ্য ইংরাজী ছিল ২৫০ নম্বরের ৩টি পত্র। সুতরাং ইংরাজীকে যখন ১০০ নম্বরের ১টি মাত্র পত্রে নামিয়ে নিয়ে আসা হল তখনই সে হল জাতচ্যুত। নিঃসন্দেহে এটা একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এই বৈপ্লবিক উত্তেজনায় উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসকবর্গ যখন ঘোষণা করলেন যে এই পর্যায়ে ইংরাজী হবে একটা ঐচ্ছিক বিষয় তখন আমাদের বুঝতে একটুও কষ্ট হল না যে আমরা এক নতুন শিক্ষা-জগতের সিংহদুয়ার এসে উপস্থিত হয়েছি। পর্ষদ নির্দেশ দিয়েছে যে, ইংরাজীর সমগ্র পাঠক্রম শেষ করবার পক্ষে সপ্তাহে ৪টে পিরিয়ডই যথেষ্ট। সুতরাং নতুন পাঠক্রম কার্যকরী করবার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক মশায়রা

ভেবেছিলেন ইংরাজীর প্রশ্নের মান নিশ্চয়ই খুব উঁচু হবে না।

'পর্ষদবার্তার' এ বছরের জুলাই মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হল ইংরাজীর আদর্শ প্রশ্নাবলী। সবাই তাজ্জব। একি ব্যাপার! প্রথমেই তাঁরা হতভম্ব হলেন প্রশ্নের বহর দেখে। পত্রের পাঁচটা 'বিষয় অঞ্চল' (Content area) গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণ, অনুবাদ, রচনা ও বোধগম্যতার পরীক্ষা। সম্পূর্ণ প্রশ্ন-পত্রখানা একবার পড়া শেষ করতেই একটা সাধারণ স্তরের ছেলের যথেষ্ট সময় লাগবে। তারপরে তো তার উত্তর লেখা। কমবেশী ১২০ শব্দের একটা অনুচ্ছেদ লিখতে হবে, ৬০-৭০ শব্দের মধ্যে একখানা চিঠি লিখতে হবে। অজানা একটা রচনার সারাংশ লিখতে হবে আর একটা রচনাংশের ওপর ছোট ছোট কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। দুটো নাতিদীর্ঘ অনুচ্ছেদের অনুবাদ করতে হবে ইংরাজীতে। এর পরে আসছে প্রশ্নপত্রের ব্যাকরণের দীর্ঘ অংশ। শূন্যস্থান পূরণ আছে, ছেদচিহ্ন নির্দেশ করতে হবে, বাক্যের বিচিত্র রূপান্তর সাধন আছে, উক্তিপরিবর্তন আছে, আর আছে ইংরাজীর বিশিষ্টাত্মক বাগ্‌ধারার ব্যবহার। আদর্শ প্রশ্নাবলীর ব্যাকরণ বিভাগের প্রশ্নগুলো যে দুরূহ এমন কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু তার বহরটা অস্বাভাবিক। সবচেয়ে তাক লাগাবার প্রশ্নগুলো আছে পাঠ্যপুস্তকের বিষয় এলাকায়। প্রশ্নগুলোকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে—সহজ মাঝারি কঠিন। শুভ পদক্ষেপ। প্রবর্তন করা হয়েছে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলীর। একাদশ-শ্রেণীর পাঠক্রমের সূচনায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলীর একটা ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তা বর্জন করা হয়েছিল। কেন বর্জন করা হয়েছিল সে কথা বর্তমানের শিক্ষা-প্রশাসকবর্গের বিস্মৃত হবার কথা নয়। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্না-বলীতে সম্ভাব্য অশুভ দিকটার বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করবেন কি? অন্ততঃ এখন পর্যন্ত তার কোন আভাস আমরা পাইনি। আদর্শ প্রশ্নাবলীর প্রথম প্রশ্নে নির্দিষ্ট শব্দের বিপরীতার্থক বা সমার্থক শব্দ নির্বাচন করতে বলা হচ্ছে কয়েকটা শব্দের মধ্য থেকে। নির্দিষ্ট শব্দগুলো পাঠ্যবিষয়ভুক্ত। সুতরাং সেগুলো পরীক্ষার্থীর জ্ঞাত শব্দকোষভুক্ত। কিন্তু যে শব্দগুলো থেকে সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ নির্বাচন করতে বলা হচ্ছে সেগুলো সাধারণভাবে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত। সুতরাং এই শব্দগুলো পরীক্ষার্থীর অজ্ঞাত। যে শব্দপুঞ্জ থেকে নির্বাচন করতে হবে সে শব্দগুলোর অর্থও প্রায় সমধর্মী। সুতরাং উল্লেখ্য শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনটা নির্ভুলভাবে সমার্থক বা

বিপরীতার্থক তা স্থির করার যোগ্যতা পরীক্ষার্থীর কাছে আশা করা অসঙ্গত। প্রশ্নকর্তারা অনুমান করছেন পাঠ্যবিষয়ের প্রতিটি শব্দের সার্বিক ব্যবহার পঠনপাঠনস্তরে সমাপন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল ইংরাজীর জন্য নির্দিষ্ট সাপ্তাহিক পিরিয়ড হল চারটি। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় উপরোক্ত অর্থে পঠনপাঠন সমাপ্ত হয়েছে তবুও শব্দপঞ্জী পরীক্ষার্থীর কাছে অজ্ঞাত থেকে যেতে পারে, যেহেতু একটা শব্দের সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ অনেকগুলো হতে পারে। সুতরাং অজ্ঞাত শব্দসমূহের মধ্যে নির্বাচন অনেকটা Cross Word puzzle-এর মত। একটা নমুনা দেখুন, পর্ষদবার্তায় প্রকাশিত ইংরাজী আদর্শ প্রশ্নাবলীর ১নং প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশে আছে :

"He then highly praised the wisdom and ingenuity of the young counsellor."

"Which of the words—knowledge, presence of mind and cleverness—is nearest in meaning to 'ingenuity' ?"

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর কাছে আমরা যে exastitude দাবী করছি তার যথার্থতা বিচার করতে হবে ইংরাজী পঠনের ঘোষিত উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে। প্রথম উদ্দেশ্য হল ছাত্রকে কাজ চালাবার গোছের ইংরাজী জ্ঞান দান। কিন্তু তার স্তর যে কি সে কথা উদ্দেশ্য-প্রণয়নকারীরা নিজেরাই ব্যাখ্যা করতে অপারগ। সুতরাং কাজ চালাবার মত জ্ঞান থেকে গেল অস্পষ্ট। অতিরিক্ত আর যেটুকু তাঁরা বলেছেন তার শেষ কথা হল ছাত্রকে ইংরাজী পড়তে শিখতে হবে, ইংরাজী বললে বুঝতে হবে, ইংরাজী বলতে হবে আর ইংরাজী লিখতে হবে। অর্থাৎ ইংরাজী হল একটা Skill Subject। ইংরাজীকে শেখাতে হবে সাহিত্য হিসেবে নয়, ভাষা হিসেবে। সুতরাং অনুধাবন পর্যায়ে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে আর পাঠ্য পুস্তক পর্যায়ে সহজ ও মাঝারি স্তরে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সেইগুলোই সঙ্গত ঘোষিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে। আভিধানিক সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ নির্বাচন আর কঠিন পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত প্রশ্ন উক্ত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

উদ্দেশ্যকে সাধারণ স্তরে সীমিত রেখে পরীক্ষার প্রশ্ন এমন অসাধারণ স্তরে কেন উন্নীত করা হচ্ছে? এই অসঙ্গতি কিসের ফলশ্রুতি? উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর হল শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজীর ভূমিকা সম্পর্কে প্রশাসকবর্গের

অনাবশ্যচিন্ততা এবং এর মূলে আছে ইংরাজী সম্পর্কে দেশে বিভিন্নশক্তির মধ্যে তীব্র অন্তর্বিরোধ। ইংরাজ শাসনকালে আমরা কয়েকপুরুষ ইংরাজী শিখেছি। তার পরিণাম বিষময় হয়েছে এমন কথা উগ্র কোন ইংরাজী-বিদ্বেষীও আজ বলছেন না। কিন্তু ইংরাজ শাসনের অবসানে দেশে দেখা দিল এক ভয়ঙ্কর ভাষাবিরোধ। উত্তর ভারত থেকে রণহুঙ্কার শোনা গেল 'অংরেজী হটাও'। ইংরাজী-বিরোধী এই সংগ্রামে সামিল হলেন ছোট বড় অনেক বাম-ডান মার্কা নেতা। অংরেজী অপসারিত হলে সেই শূন্যস্থান যে পূর্ণ করবে হিন্দী এটা হিন্দীপ্রেমিক ও হিন্দীবিরোধী উভয়গোষ্ঠিই বেশ ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং হিন্দী প্রেমিকরা চান ইংরাজীকে নির্বাসিত করতে, আর তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে হিন্দীবিরোধীরা চাইলেন ইংরাজীর অব্যাহত উপস্থিতি দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায়। শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজীর স্থান কি হবে সেটা হয়ে উঠল স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন। এমতাবস্থায় উত্তাপহীন বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা এই ব্যাপারে তাই অতীব দুর্লভ।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে যে প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হচ্ছে তা কখনও স্পষ্ট ও বিতর্কাতীত হতে পারে না। এইজন্যই চলছে ইংরাজীকে নিয়ে একটা অশোভন ছিনিমিনি খেলা। এমন অস্থির পরিবেশে লাভবান হন একশ্রেণীর নীতিহীন মানুষ যাদেরকে আমরা বলি শিক্ষাব্যবসায়ী। এঁদের মধ্যে একদল প্রকাশক তো রয়েইছেন, তাঁদের সঙ্গে আছেন প্রশাসনের উচ্চস্তরের কিছু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি। শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের দেশে কয়েকটা গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রগুলোতে পণ্ডিতব্যক্তি অনেকেই আছেন। কিন্তু পাণ্ডিত্য এক জিনিষ আর পণ্ডিতম্মন্যতা আর এক জিনিষ। গবেষকদের অনেকেই থাকেন গজদন্তমিনারে, মাটির সঙ্গে তাঁদের কোন যোগই থাকে না। অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে আদর্শ প্রশ্নাবলী এই সমস্ত গবেষণা-কেন্দ্রে রচিত হয়েছে। বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে গবেষণাকেন্দ্রের গবেষক ও পরিচালকবর্গের অনেকের কাছে কেন্দ্রগুলো তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির একটা সোপানমাত্র। বাস্তবতাবোধশূন্য উচ্চাভিলাষী পণ্ডিত মহল যা রচনা করবেন তা কখনও দেশের প্রকৃত প্রয়োজন মেটাতে পারে না।

'চেতনিকের' ২য় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে সম্পাদক মশায় শিক্ষাক্ষেত্রে চিন্তাশূন্যকৃত ব্যবস্থা পরিবর্তনের কি ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে সে সম্পর্কে কতকগুলো মূল্যবান উক্তি করেছেন। জিজ্ঞাসু পাঠক উক্ত সম্পাদকীয় পাঠ

পাঠ করলে অবশ্যই উপকৃত হবেন। পরিবর্তন জীবনের ধর্ম। সুতরাং দেশের বৈষয়িক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কখনও অকাম্য হতে পারে না। কিন্তু পরিবর্তন যদি কর্তাব্যক্তিদের খেয়ালখুশী চরিতার্থ করবার বা সংকীর্ণ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের তাগিদে করা হয় তা'হলে মহা সর্বনাশ হবেই। এক্ষেত্রে তাই হতে চলেছে। সেইটেই দুশ্চিন্তার কারণ। আদর্শ প্রশ্নাবলীর মৌলিক সংশোধন অপরিহার্য। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা'হল দেশের শিক্ষাকাঠামোয় ইংরাজীর স্থান কি হবে সে সম্পর্কে শিক্ষানুরাগী প্রশাসকবর্গের সুস্পষ্ট ধারণা। এই ধারণা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট হলে পাঠ্যপুস্তক কি হবে আর পরীক্ষার প্রশ্ন কি রকম হবে সে সম্পর্কে বাস্তবধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কোন অসুবিধেই হবে না।

জনতার আদালতে

মূল গল্প লেখক : লেনার্ড মেরিক

অনুবাদক : অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণীয়—সালের (তারিখে কিছু এসে যায় না) গ্রীষ্মকালে রবিকন্ আর কুইনকুয়ার্ত্ দুজনেই শ্রীমতী ক্রয়েৎ-এর কাছে বে'র প্রস্তাব পাড়লে। শ্রীমতী ক্রয়েৎ ছিলো চারুদর্শনা অভিনেত্রী। রবিকন্ আর কুইনকুয়ার্ত্ হাস্যরসাত্মক ভূমিকার সেরা রস রসিক এবং এরা তিনজনেই থিয়েটার সুপ্রীম-এর সদস্য।

রবিকন্ জনসাধারণের কাছে এত আদরণীয় যে স্বীয় ভূমিকার আদি শব্দ উচ্চারণ করার পূর্বেই তারা উঠতো হেসে আর কুইনকুয়ার্ত্-এর জনপ্রিয়তা এত বেশি যে তার নীরবতায় শ্রোতৃবর্গ উৎকট হাসিতে পড়তো গড়িয়ে।

পেশাদারী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বাদ দিলে এদু'জন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যদিও অবিশ্যি একই মহিলার পাণিপ্রার্থী এরা। আর তার কারণটাও নিশ্চয় এই যে অমিতৌজা: রবিকনের প্রতি মহিলাটির যে প্রসন্নতা কৃশকায় কুইনকুয়ার্ত্-এর চাইতে তা এতোটুকুও বেশি নয়। দুজনের সঙ্গেই সে সমান ফষ্টিনষ্টি করতো। আর পছন্দও করতো দুজনকে সমান। অবশেষে যখন সহ্যের অতিরিক্ত বিরক্ত

করতে লাগল এরা তখন একটু কষ্ট ভাবেই সে অঙ্গীকার করলে উভয়ের মধ্যে যে সেরা অভিনেতা তাকেই সে বে' করবে।

কাণ্ডখানা দেখ : মঞ্চের কোনো নটী কি কাগজের কোনো সমালোচকই কে যে সেরা অভিনেতা—সে সম্পর্কে মনস্থির করতে পারতো না। এমন উদ্ভট বিড়ম্বনার কথা এক সুসান ক্রয়েৎ ই পারতো বলতে।

কিন্তু সুসান ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে কী করে? —আমতা আমতা আমতা করে বললে রবিকন্ হতাশভাবে।—কার সিদ্ধান্ত তুমি স্বীকার নেবে?

এ সমস্যার মীমাংসা হবে কী ক'রে? -বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞেস করলে কুইনকুয়ার্ত্। —কে হবে এর বিচারক?

বিচারক হবে পাব্লী, সুসান জানাল। জনসাধারণের সেবক আমরা। জনসাধারণের কথাই নেবো আমি মেনে।

সে ছিলো ছবির মতোই সুন্দর, নইলে আর এমন আদিখ্যেতাটা করতে পারতো না।

বেচারা কুইনকুয়ার্ত্ বিদায় নিলে গভীর চিন্তায় ডুব দিয়ে। রবিকনেরও ঐ একই দশা। কুইনকুয়ার্ত্ ভাবলে, শ্রীমতী রসিকতা করছে তাদের সঙ্গে। রবিকনেরও সেই একই মত। সর্বসাধারণ দুজনেরই স্তুতিতে মুখর। দাক্ষিণ্যও যা দেখিয়েছে কারো চেয়ে কাউকে কম নয়। পাব্লীর সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করা ব্যাপারটাকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে মুলতুবি রাখারই সামিল। কুইনকুয়ার্ত্ কোন পথ দেখতে পেলে না। রবিকনও পারলে না কোন কিনারা করতে।

সম্বাৎসরিক অবকাশের দুয়েক দিন আগে এরা বসেছিলো এদের প্রিয় কাফের চাতালে। রবিকন্ বল্লে : দোস্ত্, ব্যাপারটা নিয়ে আপোষে আলোচনা করা যাক। একটা সিগারেট নাও। তুমি একজন অভিনেতা, কাজেই তুমি নিজেকে আমার চাইতে বেশি ক্ষমতাবান্ বলে মনে কর। আমিও একজন অভিনেতা। সুতরাং তোমায় আমি আমার চাইতে ঢের কম কুশলী মনে করি। শিল্পী হিসেবে পরস্পরের চোখে এই তো দাঁড়াচ্ছে অবস্থাটা। কিন্তু আমরাও তো পৃথিবীর মানুষ। আমাদের বুঝতে হবে যে ভাঁড়ামীর চূড়ান্ত করে মৃত্যু শয্যায় পৌঁছলেও আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা যাবে না। ব্যাস্, এখন একমাত্র ভরসা আমাদের বিভিন্নমুখী প্রতিভায়। বিজেতাকে কোন গম্ভীর ভূমিকায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে হবে। —প্রসন্নভাবে চাইলে সে কুইকুয়ার্ত্-এর পানে। কারণ প্রকৃতির অভিসন্ধিতে কদাকার

কুইনকুয়ার্ড্ বিদূষক হয়েই জন্মেছে।

ঠিক ঠিক ব'লে কুইনকুয়ার্ড্ তৃপ্তির সঙ্গে চাইলে সহকর্মীর দিকে। কারণ বপুসর্বস্ব রবিকন্‌কে বিষাদাত্মক ভূমিকায় কল্পনা করা অসম্ভব।

একটা বিষয়ের কিন্তু গোল থেকে যাচ্ছে : — রবিকন্ ব'লে চলে — কর্তৃপক্ষ কিছুতেই আমাদের সুযোগ দিতে রাজি হবে না। রঙ্গালয়ে সবসময় এরকমটাই হয় না কি? কেউ একবার কোন এক বিশেষ ভূমিকায় কৃতিত্ব দেখাক—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে সেই ধরণের ভূমিকাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যদি আমার প্রথমতম কৃতিত্ব হতো কোনো উত্তেজনাপূর্ণ নাটকে দুরাত্মার ভূমিকায় তাহলে সকলের ধারণা হতো এমনি দুরাত্মার ভূমিকাতেই আমার যোগ্যতা সীমাবদ্ধ। দৈবাৎ বিদূষক হিসেবেই আমি কৃতিত্ব দেখিয়ে ফেলেছিলেম, আর সেই জন্যেই কেউ বিশ্বাস করবে না ভাঁড়ামি ছাড়া অন্যকিছুতেও আমার যোগ্যতা রয়েছে।

ঠিক তাই- কুইনকুয়ার্ড্-ও একমত। আচ্ছা, তাহলে তুমি কি মতলব ঠাউরেছো?

রবিকন্ একটু ভেবে নিলে। — মঞ্চে যখন আমরা আমাদের ক্ষমতা জাহির করার সুযোগ পাচ্ছিনে তখন বাইরেই কোথাও সুবিধে দেখতে হবে।

ঘরোয়া অভিনয়ে? তা বেশ! কিন্তু স্বতন্ত্র প্রদর্শনী-ই হলো যদি তাহলে পারী কি করে বিচারক হচ্ছে?

ধোৎ—গজগজিয়ে বললে রবিকন্,— এ এক মোক্ষম গেরো।

বিষণ্ণভাবে মদের পেয়ালায় চুমুক দিলে তারা। অনেকগুলো মাথা ওদের ছোট্ট টেবিলটার দিকে ঘুরলো। ঐ যে কুইনকুয়ার্ড্ আর রবিকন্। আচ্ছা রগুড়ে কিন্তু ওরা সবসময়, পথচারীরা বলছিলো। রসস্রষ্টা দুজনের অন্তরের উদ্বেগ ওরা ধারণাই করতে পারে না।

কিং কর্তব্যম্? — একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে শেষে কুইনকুয়ার্ড্ ভুরু কুঁচকে, বিশাল স্কন্ধে শ্রাগ্ করলে একটা রবিকন্।

এমন চিন্তামগ্ন ছিলো এরা যে একটা বিষয় এদের নজর এড়িয়ে গেল। একজন পথচারী এদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। তখনো সে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে চেয়ে দেখছে। বেশ লম্বা চওড়া, ময়লা ছেঁড়া পোষাক। পরক্ষণে একটু সাহস সঞ্চয় করে সে এগিয়ে এসে বললে :

—মশাইরা, আমার বেয়াদবি মাপ করবেন। প্রবৃত্তির তাড়নায় আমি

আপনাদের পেশাদারী পরামর্শ চাইছি। মোটামুটি দক্ষিণা দেবার সামর্থ্য আমার রয়েছে। আমার বক্তব্য নিবেদন করতে অনুমতি দেবেন কি?

মশাই — উত্তর করলে রবিকন্, — আমাদের অধুনাতন ভূমিকার বিষয়ে নিবিষ্টভাবে চিন্তায় মগ্ন আমরা। অন্য কোন সময় সানন্দে আমরা আপনার বক্তব্য শুনবো।

আহাঃ নবাগন্তুক নাছোড়বান্দা—সময় বড় অল্প আমার হাতে। আমিও যে ভাবছি আমার সাম্প্রতিক ভূমিকার কথা। আর এটাই হবে আমার জীবনের একমাত্র সবাক ভূমিকা, যদিও আজ বিশ বছর ধরে আমি মঞ্চে আবির্ভূত হচ্ছি।

কী? আপনি বিশবছর ধরে তুচ্ছ তুচ্ছ ভূমিকায় নাবছেন? মুখভংগি করে বললে কুইনকুয়াইং।

না, মশাই—কঠিন স্বরে জবাব দিলে আগন্তুক। আমি সরকারী জল্লাদ, চাকরিতে আমি ইস্তফা দিচ্ছি, এই পদের অব্যবহার্যতার বিষয়ে আমি বক্তৃতা করবো।

বিদূষক তুচ্ছন তার পানে হাঁ করে চেয়ে রইলো। রৌদ্রোজ্জ্বল সেই চাতালের 'পরে মনে হ'লো যেন গিলোটিনের কৃষ্ণচ্ছায়া এসে পড়েছে।

জাক্স ক আমার নাম লোকটা বলে চল্লো। আগামী হপ্তায় আপেভিলা-র বোয়ার মঞ্চে আমি এ বিষয়ে আন্দোলন করে দেখবো। আপনারা যাকে বলেন মঞ্চাতঙ্ক তাই হয়েছে আমার সেই আমার যে স্নায়ুপীড়া কি জিনিস আগে কখনো জানতো না। অবাক ঠেকছে না? যখনই আমি মঞ্চের দিকে অগ্রসর হওয়ার মহড়া দি' তখনি হাতপাগুলো খুব বেশি করে অনুভব করি—বুঝতে পারিনে এদের নিয়ে কি করবো। আগেতো নিজের হাতপার কথা কিছুই মনে হতো না। আবশ্যি তখন আমার মনোযোগ নিবদ্ধ থাকতো অন্য লোকের মাথা'র 'পরে। তো' আমার মনে হ'লো আচরণ সম্পর্কে দুয়েকটি নির্দেশ দিতে হয়তো রাজি হতে পারেন আপনারা। সম্ভবত একটিও যথেষ্ট হবে।

বলুন বলুন রবিকন্ বললে। চাকরিতে আপনি ইস্তফা দিলেন কেন?

—কারণ সত্য সম্পর্কে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল, ক জবাব করলে। মৃত্যুদণ্ডে আমার আর অনুমোদন নেই। এ পাপ প্রথা তুলে দেওয়া উচিত।

—বিবেকদংশন বলুন, নয় কি ?

—ঠিক।

তোফা, রবিকন্ বল্লে, কী সব নাটকীয় উক্তি ই না দেয়া যেতে পারে এই ভাষণে ! তা কি কি থাকছে এতে ?

—এতে থাকবে আমার জীবনেতিহাস আমার যৌবন, আমার দারিদ্র্য, জল্লাদ হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা আর আমার পশ্চাত্তাপ।

মাশাল্লা ! রবিকন বল্লে। – আপনার বলির প্রেতাত্মারা মঞ্চ পর্যন্ত অনুসরণ করছে আপনাকে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। চোখদুটো আতঙ্কে ঠেলে বেরুচ্ছে কপাল থেকে। হাঁফাতে হাঁফাতে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। —কল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছে গাঢ় শোণিতে আপনার প্রসারিত হাত দুটোকে। শ্রোতৃমণ্ডলী উঠছে শিউরে, মূর্ছা যাচ্ছে মহিলারা। সমস্ত লোক যারা তারা উদ্বেগে রুদ্ধশ্বাস,—অকস্মাৎ সে তার বিরাট মুষ্টি দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত করলে টেবিলে। গর্বাক্রান্ত কুইনকুয়াট্ চেয়ার থেকে প্রায় স্থানভ্রষ্ট হয়েছিল আর কি ! কারণ সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি আন্দাজ করতে পারলে। —শুনুন ! —রবিকন্ চিৎকার করে উঠলো, আপনি কি আপেতিকা-স্থ-বোয়া-তে পরিচিত ?

—আমার নাম ওখানে জানে।

—দোৎ ! আমি বলছি আপনি কি সেখানে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ?

—ন্ নাঃ। কিন্তু ব্যাপার কী ?

—আপনাকে সনাক্ত করতে পারে এমন কেউ নেই সেখানে ?

—এরকম জায়গায় না থাকাই সম্ভব।

—আপনি কত মুনাফা পাবেন আশা করেন ?

—হলটা তো খুব ছোট্ট। প্রবেশমূল্যও সামান্য। হয়তো শো আড়াই ফ্রাঁ হবে।

আর আপনি ভীত হয়ে পড়েছেন। অভিনয়ে আপনার এই হাতেখড়ির পালা থেকে নিস্তার পেতে চান ?

—এতে আর লুকানোর কি থাকতে পারে ? আমি রাজি আছি। কিন্তু তা—এ কথা উঠছে কেন ?

—কারণটা বলছি—আপনাকে পাঁচশো ফ্রাঁ দিচ্ছি আমি। পরিবর্তে আপনার কাজটি আমায় করতে দিতে হবে। —মশাই, শর্তটা কি হলেও

মতো হয়েছে আপনার ?

— আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

— আমার খেয়াল হয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নাবতে। পরের দিন আপনি বলবেন ট্রেইন্ মিস্ করেছিলেন— কি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এমন কতো গণ্ডা গণ্ডা কৈফিয়ৎ দিতে পারবেন ; কেবল আমি যে আপনার ছদ্মবেশে অভিনয় করেছি তা আপনার জানার কথা নয়, তার জন্যে যা দায়িত্ব সে আমার— । কি বলেন ?

—এর জন্যে দ্বিগুণ পাওয়া উচিত। —আপাত ভুললে লোকটা।

আদৌ না! সমস্ত সংবাদপত্র আমার এই তামাসার কাহিনীপ্রচারে মুখর হয়ে উঠবে। আমি, এই রবিকন্, জ্যাক্স রুর পরিচয়ে বক্তৃতা ক'রে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর রক্ত হিম করে দিচ্চি— একথা যখন প্রকাশ পাবে, সমগ্র প্যারী স্তব্ধ হয়ে যাবে। লাখ্ লাখ্ লোক আপনার অভিপ্রেত বক্তৃতা সম্পর্কে আলোচনা করবে যারা অন্যথায় কস্মিনকালেও এ কথা জানতে পারতো না। এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর বিজ্ঞাপন আর হতে পারে না আপনার। তাছাড়া এ বাবদ মূল্য-ও ধরে দিচ্চি। আর সেই সঙ্গে নিখরচায় মঞ্চচার সম্পর্কেও তালিম দিয়ে দেবে। রাজি আছেন ?

—হাঁ মশাই, রাজি আমি। বাল্লক।

ওঃ, কুইনকুয়াৎ এর কী উদ্বেগ! রবিকনকে হারায় কার সাধ্য, যদি অভিনয় তার আশানুরূপ হয় ? বোলগে সেই সন্ধ্যায় বিমর্ষ মনে কুইন্-কুয়াৎ্ রুসানকে অনুগমন করে মঞ্চসন্নিহিত ঘরে এসে পৌছুলো। পরিধানে তার ভাড়ের পোসাক, কিন্তু নিজেকে ভাবছিল সে বোমিও বলে। জনতা তার ছাগলুতোর ভূয়সী প্রশংসা ক'রলে বটে কিন্তু ম্যাজেন্টা রঙের পরচুলার আড়ালে তার মনে যে রসময় বিচিত্র সব অভিলাষ জাগছিলো সে-সম্পর্কে তারা একটুও সন্দেহ করতে পারলে না, জীবনে এই প্রথম কৃতজ্ঞ বোধ করলে নাট্যকারের কাছে সে, যেহেতু এর চাইতে বেশি কিছু করার ভার দেয়া হয়নি তাকে।

আর রবিকনের কী উত্তেজনা! তার সমগ্র শক্তির প্রচণ্ড পরীক্ষা। আর সে যা আশা করেছে ফলাফল যদি সেই রকম হয় তাহলে কুইনকুয়াৎ্-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা করার কিছুই রইবে না রুসানকে যখন সে গর্বিত ভাবে তার অভিপ্রায়ের কথা জানালে, তখন সে মজাটা দেখতে হচ্ছে বলে ইচ্ছে প্রকাশ ক'রলে কুইনকুয়াৎ্-ও সেখানে উপস্থিত থাকবে কথা দিলে।

রবিকন্ গোটা রাত্তিরটা জেগে কাটিয়ে দিলে বক্তৃতা প্রস্তুত করতে।

আপনারা যদি জানতে চান রবিকনের জয়ের আশায় সুসান উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলো কি না, ইতিহাস সে বিষয়ে নিঃসংশয় নয়। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন কুইন্‌কুয়ার্ট্ অত্যন্ত মুষড়ে পড়ায় এ সময়টা তার দিকেই একটু বেশি চাপে পড়েছিলো সে।

এখন তারা তিনজনেই গেল আপেভিলা সু-বোয়া-তে।

ঘাতকটার চেহারার সঙ্গে যদিও শহরের কারোও পরিচয় ছিল না। তবু মনে রাখতে হবে অভিনেতাকে চেনবার লোকের অভাব ছিলো না সেখানে। রবিকন্ যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে ক-র ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলো। সেই অজ্ঞাতগোত্র হলে পৌঁছুলে ইজারাদার তাকে অভ্যর্থনা করলে! শুনলে এক ভালো শ্রোতৃগোষ্ঠী আশা করা যাচ্ছে শ্রোতারা এসে উপস্থিত হতে নিতে সে বিশ্রামকক্ষে বসে একটা সিগারেট খেলে।

আটটার সময় ইজারাদার আবার দেখা দিলে।

—সব প্রস্তুত, মঁসিয়ে ক।

রবিকন্ উঠে দাঁড়ালো।

সুসান্ আর কুইন্‌কুয়ার্ট্‌কে সে দেখলে তৃতীয় সারিতে।

তাদের দিকে একবার চোখ মারার লোভ হচ্ছিল তার।

—ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ –

সুরু করতেই হাজার হাজার চোখ তার ওপর নিবদ্ধ হ'লো ; ঘাতকের কণ্ঠস্বরও জনতার 'পরে এক অস্বস্তিকর জাদুপ্রভাব বিস্তার করলে। পুরুষেরা সপ্রশংসভাবে কনুই-এর ঠেলা মারতে লাগলো পাশের লোককে, মেয়েরা— অর্ধভীতা অর্ধমুগ্ধা একদৃষ্টে চেয়ে রইলে তার পানে।

অভিভাষণের গৌরচন্দ্রিকাটি বেশ প্রশংস্য, বিনম্র আর যেখানে সে তার বাল্যের কাল্পনিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলো সেখানে আবার একটা হাস্যরসাত্মক উপাদানও ছিলো। সকলে মুখ চেপে হাসতে লাগলো। তারপর অপ্রতিভ হয়ে পরস্পরের মুখের পানে চাইতে লাগলো, যেন তাদের আমোদ দিতে এমন এক পিশাচের এই স্পর্ধায় তারা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সুসান ফিস্ ফিস্ করে বল্লে কুইন্‌কুয়ার্ট্‌কে, বড় কাহিল দেখছি ; সুরটা মোটেই তুলতে পারেনি ও। বিরস কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে জবাব দিলে কুইন্‌কুয়ার্ট্ : বোসো , ও হয়তো বিষম রস (Contrast)-সৃষ্টির ফন্দি আঁটচে।

কুইন্‌কুয়ার্ত-এর ধারণাই যথার্থ। বক্তার কণ্ঠস্বরে হর্ষের ভাবটা ক্রমশঃ অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। সেই সকল ঘটনাগুলি শুনিয়ে গেল। ভয়ঙ্কর, কুৎসিৎ হয়ে উঠলো উপাখ্যান। শিউরে উঠলো সারা হল, বিলম্বিত হ'লো অসংখ্য গ্রীবা। নির্বাক শুভ্র মুখমণ্ডলে পেশীগুলো সঙ্কুচিত হয়ে রইলো। সে দ'ণ্ডীদের যন্ত্রণার বিষয়ে বল্‌লে। অপকর্মের বিস্তৃত বিবরণ দিলে। গিলোটিনের খড়্গ-পতনের পূর্বক্ষণ শেষ মুহূর্তগুলি প্রতিফলিত করে তুললে। অনুতাপানলে হৃদয়বিদারী মনস্তাপে সে চিৎকার করে উঠলো—আমি নরহন্তা, আমি খুনী। ফোঁপাতে লাগল সে। আর হলের মধ্যে তখন সূচীপাতের শব্দও শোনা যেতো।

শেষ যখন হ'লো প্রশংসার কোনো বাণী উচ্চারিত হ'লো না এ তার সাফল্যেরই নিশ্চিত লক্ষণ। জমাট স্তব্ধতার মধ্যে নত মস্তকে অপসৃত হয়ে গেল সে। তবু কেউ একটু নড়লে না। শেষে প্রেস প্রতিনিধিরা জ্যাকস্ রুর অতুলনীয় সাফল্যের বিষয় ঘোষণা করতে ছুটোপুটি করে এসে জুটলো।

রবিকনের জয় জয়কার! কুইন্‌কুয়ার্ত-এর অভিনন্দন কী আন্তরিক, কী সুমিষ্ট তারিফ সপ্রশংসা সুধীজনের! এ ছাড়া আরো একটা সৌভাগ্য অপেক্ষা করছিল তার জন্যে—যে-সে কথা নয়; মার্কুইস দ্য থেবেনিনের কাছ হতে একটি কার্ড। তাতে তাঁর বাড়িতে রবিকনের দর্শন কামনা করা হয়েছে।

বা বা, উল্লাসে রবিকন্ চিৎকার করে উঠ্‌লো একজন রাজা রাজড়ার নেমন্তন্ন। বোঝা যাচ্ছে কী কাণ্ডটাই করেছি, তাই না?

—কে হে লোকটা? জিজ্ঞেস্ করলে কুইন্‌কুয়ার্ত্,—মার্কুইস্ দ্য থেবেনিনের কথাতো শুনিনি কখনো!

তোমার শোনা-না-শোনায় কিছু এসে যায় না, রবিকন্ উত্তর করলে। —ইনি একজন মার্কুইস্। আমার সঙ্গে কথা বলতে চান! এই গৌরব সর্বথা গ্রাহ্য। আমি নিশ্চয়ই যাবো।

একটু ফোতোবাবু ধরণের সে, তাই হৃষ্টচিত্তে একটা কেরাচি গাড়ি নিলে সংগে।

পথ অল্পই। গাড়ি যখন এসে থামলো, জমিদার গৃহের সাদা সিধে আকার দেখে বিস্মিত হল সে। একটা সাধারণ বাসগৃহের অতিরিক্ত কিছুই নয়। একটা চাষাড়ে লোক ভেতরে একঘরে নিয়ে গেল ওকে। সে ঘরে

অতিথি-আপ্যায়নের জন্যে একজোড়া কুর্সি আর একটি পানপাত্র ব্যতীত আর কিছুই নেই। বাতিদানিটি কিন্তু বেশ ভারি আর কৌলুসবিশিষ্ট। তাকে জানানো হ'লো মঁসিয়ে দ্য মার্কুইস্ চিকিৎসককে আহ্বান করতে বাধ্য হয়েছেন। আর সে জন্যে কয়েক মিনিটের মতো মঁসিয়ে ক-র ধৈর্য ভিক্ষা করেছেন।

রবিকন্ বাতিদানটির আন্তরিক প্রশংসা করলে। তবু ভাবতে লাগলো শ্মশানের সঙ্গে নৈশ ভোজের যোগ দেয়াটা আরো আরামের হ'তো।

অনেকক্ষণ পর দরজা খুলে গেল। মার্কুইস্ দ্য সেবেনির একজন স্থবির —এতো স্থবির যে যখন তিনি টলতে টলতে এগিয়ে আসছিলেন মনে হচ্ছিলো বুঝি মাটিতে পড়ে গুঁড়িয়ে যাবেন। গাত্রচর্ম হরিদ্রাবর্ণ, লোল। মুখ গেছে বসে। মস্তক ধূসর। বিরলকেশ। আর এই আজব মুখ থেকে উঁকি মারছে দুটো চোখ। যেন উন্মাদের চোখ।

মঁসিয়ে, আমার বিলম্বের জন্যে বারবার ক্ষমা চাইছি। —নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। —আজ সন্ধ্যায় যে উত্তেজনা হয়েছিল অনভ্যাসের দরুণ তাতে বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছি। হল থেকে ফিরে চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন মনে হ'লো। চমৎকার হয়েছিলো আপনার বক্তৃতা, মঁসিয়ে ক—অতীব হৃদয়গ্রাহী এবং জ্ঞানপ্রদ; কখনো বিস্মৃত হব না আমি।

রবিকন্ মাথা নত করে এ-সম্মান গ্রহণ করলে। – বসুন মঁসিয়ে ক, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন! একটু মদ দিই আপনাকে। আমার মদ্যস্পর্শ নিষিদ্ধ। আমি হতভাগ্য অতিথিসেবক। কিন্তু বয়েসের কথা বিবেচনা ক'রে ক্ষমা করতে হচ্ছে আমায়।

মঁসিয়ে দ্য মার্কুইস্ এর অতিথি,—অস্ফুটস্বরে বললে রবিকন্, হ'তো বড়ো সৌভাগ্য, কতো বড়ো সম্মান যা - মানে—। আহ্ - করে একটা নিশ্বাস ফেললেন মার্কুইস্। অতি শীঘ্রই আমি সেই রাজ্যে যাচ্ছি, যেখানে সমস্ত জীবই যথার্থ সমমর্যাদাসম্পন্ন, ক্রিমিকীটেরাই যেখানে একমাত্র মাংসভুক। আপনাকে এখানে আহ্বান করেছি আপনার দুর্ভাগ্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা—বিশেষতঃ সেই একটি অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করতে। আপনি বক্তৃতায় ভিক্টর লেস্থুয়ে বলে একজনের প্রাণদণ্ডের বিষয় উত্থাপন করেছিলেন। সে প্রাণপণে লড়াই ক'রে মরেছিলো, তাই না?

—এমন সাহসী প্রাণ যমের দোরে আর কখনো পাঠাইনি আমি!—

তাকিয়ে তাকিয়ে বাগীতির আবাদ নিতে নিতে বললো রবিকন্।

—হা! এতোটুকু চঞ্চল হয়নি? মানুষের মতোই এগিয়ে গেছিল সে গিলোটিনের দিকে—?

—বীরের মতো বলুন! —রবিকন্ ব'লে ফেললে, কিছু না জেনেই।

—এইতো চাই—মার্কুইস্ বললেন, 'যা হওয়া উচিত তা'ই হয়েছে! আর কোনো বন্দীকে এমন বীরত্বের সঙ্গে মরতে দেখেননি? —কণ্ঠস্বরে তাঁর সুস্পষ্ট গর্বের পরিচয় ছিলো।

তার বীরত্বের কথা আমি সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবো,—বললে রবিকন্। ব্যাপারটা তার কাছে হেঁয়ালি ঠেকলো।

—সে সময় আপনি এর সম্মান দিয়েছিলেন?

—বুঝলেম না, মঁসিয়ে দ্য মার্কুইস্?

—আমি জানতে চাই আপনি সে-সময় এই শৌর্যের যোগ্য সম্মান দিয়েছিলেন কিনা, আপনি কি তাকে সকল প্রকার অযথা যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন?

—যন্ত্রণাতো কিছু নেই,—বললে রবিকন্। —খাঁড়াটা এতো ক্ষিপ্রগতিতে পড়ে যায় যে,—আমতুক একটা অসহিষ্ণুতার ভংগি প্রকাশ করলেন। আমি বলচি মানসিক যন্ত্রণার কথা। আপনি কি বোঝেন না ঘৃণিত অথচ মৃত্যুর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত একজন নির্দোষ লোকের মনের অবস্থা?

—নির্দোষ! তা যদি বললেন, ও রকম ওরা সবাই বলে।

—সন্দেহ করাচনে। তিরুর কিন্তু সত্যই বলেছিলো। আমি জানি। আমার ছেলে সে।

—আপনার ছেলে? থতমত খেলে রবিকন্, ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লো।

—আমার একমাত্র পুত্র ঐ একমাত্র জীবন পৃথিবীতে যাকে আমি ভালো বাসতেম, হা সে নির্দোষ-ই বটে।

—মঁসিয়ে দ, আর আপনি তাকে হত্যা করেচেন, আপনারই হাতে প্রাণ হারিয়েচে সে।

আমি—আমি আইনের গোলাম মাত্র, রবিকন্ তোতলাতে লাগলো।—আমি নিজে দায়ী নই তার দুর্ভাগ্যের জন্যে।

আপনি সুদক্ষতার সংগে চমৎকার-এক বক্তৃতা করেচেন, মঁসিয়ে দ,— চিন্তামগ্ন হয়ে বললেন মার্কুইস্,—আপনি যা যা বলচেন সব আমি বিশ্বাস

করি -'আপনিই তার হন্তা।' আশা করি, মদটা আপনার রুচিসম্মত, খুঁজিয়ে ক ? ওটা অবহেলা করবেন না!

—মৃমদ ? —অভিনেতা হাঁফাতে লাগলো। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো। বুঝেছে সে।

—ওতে বিষ মেশানো আছে,—নির্বিকার ভাবে বললে বৃদ্ধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আপনার ইহলীলা খতম্।

—হা ভগবান! রবিকন্ কেঁদে ফেল্লে। আগেই সে কেমন কেমন বোধ করছিলো। রক্ত হিম হয়ে গেছে। সমস্ত অবয়ব ভারি হয়ে এসেচে, চোখের সামনে সে প্রেতচ্ছায়া দেখতে লাগলো।

—হাঁ, আপনাকে ভয় করার কিছু নেই। — বলে চললেন তিনি, —আমি দুর্বল, ক্ষীণজীবী, আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা নেই আমার; কিন্তু বল প্রকাশে কিছুই ফল হবে না আপনার। যুদ্ধই করুন আর মূর্চ্ছাই যান, যা' খুশি করুন, কাল আপনার ঘনিয়ে এসেচে।

কয়েক মুহূর্ত তারা বিমূঢ়ের মতো চেয়ে রইলো পরস্পরের পানে -অভিনেতা ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আমন্ত্রকের ওষ্ঠে উন্মাদের হাসি। তারপর সেই উন্মাদ দাঁত থেকে ধীরে ধীরে মলমলিপ্ত পটির আবরণ উন্মোচিত করলে, তারপর ফেলে দিলে মুখের আবরণ আর মাথা থেকে তুলে নিলে পরচুলাটা।

যখন গোটা কাহিনীটি প্রকাশ পেলো, উৎফুল্ল পান্নী অভিনন্দিত হয়ে হয়ে কুইন্‌কুয়ার্ত্‌কে দান করলে বিজয়চিহ্ন, কারণ রবিকন্ যেমন শ্রোতৃমণ্ডলীকে বোকা বানিয়েছে, কুইন্‌কুয়ার্ত্ ধোকা দিয়েছে স্বয়ং রবিকন্‌কেই।

রবিকন্ রৌপ্যনির্মিত সেই দীপধারাটি কিনে আনলে যা সেদিনের ঘটনার জন্যে ভাড়া নেয়া হয়েছিলো—এবং কুইন্‌কুয়ার্ত আর সুশানকে তাদের বে'র দিন সেটি উপঢৌকন দিলে।

একটি সর্বজনীন উৎসব/সাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দুধর্মের মূলে আছে বিভিন্ন প্রকারের আনন্দ, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে। এই ধর্মের মূল এবং একমাত্র উপাদানও আনন্দই। হিন্দুমাত্রেই জানে তার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আনন্দেই। 'আনন্দাৎ' সে জাত, আনন্দেই সে জীবিত, আবার আনন্দেই তার লয়। আনন্দই তার অন্তরের অনুভূতি। তার অনুষ্ঠান-

কালটুকু ও সেকাটাতে চায় বিভিন্নপ্রকার আনন্দের মধ্যে দিয়ে। আর আনন্দ এমনই এক জিনিস যা একা উপভোগ করা যায় না। বিভাজনেই হয় তার প্রকৃত উপলব্ধি। ব্যক্তির থেকে সামাজিক আনন্দ তাই মানুষকে তৃপ্তি দেয় বেশি। আমাদের বিভিন্ন প্রকার উৎসব এই আনন্দেরই প্রতীক।

পারিবারিক আনন্দ আরও তৃপ্তিকর হয় সর্বজনীন আনন্দে তা বিস্তৃত হ'লে। তাই যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে সর্বজনীন উৎসব চলে আসছে। আমরা দেখি শুধু ভারতবর্ষ বা নেপালের হিন্দুদের মধ্যেই নয় সুদূর অতীতে একদিন যেখানে যেখানে হিন্দুধর্ম প্রচার লাভ করেছিল, বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়, যেমন দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও ইন্দোনেশিয়ায়, কালের এবং ধর্মের পরিবর্তন হলেও আজও পরিবর্তন হয় নি সামাজিক সর্বজনীন উৎসবের। কঠোর ইসলামধর্মী বা বৌদ্ধ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে রামলীলা উৎসবই আজও সবচেয়ে বড় উৎসব।

শুধু বাংলা দেশেই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে আজও ছড়িয়ে আছে বার মাসে তের পার্বণ। প্রদেশ বা তিথি অনুযায়ী হয়ত একই ধর্মীয় উৎসবে সময় ভেদ হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে, কিন্তু নীতিগত পার্থক্য কোথাও দেখা যায়নি। শুধু একটি উৎসব সমস্ত ভারতবর্ষে একই দিনে আজও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে এবং তা হল 'বিজয়াদশমী' বা 'দশেরা'। বাংলাদেশের 'দশহরা' নয়, তা গঙ্গাপুজো। দেবী দুর্গার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। উভয় বাংলার বিজয়াদশমী মূলতঃ বিসর্জনের উৎসব। কিন্তু ধ্বংসের মাঝেই তো সৃষ্টির বীজ নিহিত। তাই আমাদের বিজয়াদশমী বিসর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে উদযাপিত হ'লেও তারই মধ্যে রয়ে গেছে মিলনের সূত্র।

সত্যই এতবড় সামাজিক মিলনোৎসব বাংলাদেশে আর নেই। কি শত্রু কি মিত্র পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে যেন উপনিষদের শাশ্বত বাণী—সর্বং-খল্বিদং ব্রহ্ম—প্রমাণ করে এ-উৎসব। অবশ্য খড়্গপুরে রাবণবধের উৎসব বা পূর্ববাংলার 'বাইচ' প্রতিযোগিতা কিছুটা বীরত্ব প্রকাশেরও আভাস দেয়।

খড়্গপুরের রাবণপুজোয় অবশ্য অন্য প্রদেশের ভাবধারার সংস্পর্শও আছে। স্বাভাবিক ও, কারণ খড়্গপুরে বাঙালির থেকে অবাঙালিদের সংখ্যাধিক্য। শুধু তাইই নয়, বাংলার বাইরে যেখানেই রয়ে গেছে বাঙালি সম্প্রদায় সেখানেই বিজয়াদশমীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'বিজয়া সম্মিলন' উৎসব। মূল উৎসব রয়ে গেছে গৌণ হিসাবেই।

'উৎসব প্রিয়াহি মনুষ্যাঃ'। মানুষ মাত্রেই উৎসব ভালবাসে। দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতা থেকে উদ্ধার পেতে মানুষ উৎসবের আয়োজন করে। কিন্তু ভারতের কৃষ্টিই হ'ল 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।' অর্থাৎ এক সঙ্কর সভ্যতাই ভারতের সভ্যতা। তাই প্রদেশভেদে একই উৎসবে, এমন কি এই বিজয়া দশমীরও বহু রূপভেদ দেখা গেছে। স্থান, কাল পাত্র এবং আঞ্চলিক কৃষ্টির উপর নির্ভর করে।

উত্তর ভারতে এইদিন খড়্গপুরের মতই রামের হাতে রাবণের মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে হয় রাবণবধ উৎসব। দক্ষিণ কেরালায় হয় দুর্গার নয় সরস্বতীর পূজো। আর তামিলনাড়ুতে মুরুগানের বা মুরগের বা কার্তিকের পূজো। প্রথম ও তৃতীয় ক্ষেত্রের মূলে আছে শান্তি নয় যুদ্ধের প্রেরণা। স্বাভাবিক ও। মূলতঃ রামায়ণ মহাকাব্যের ভিত্তি ও আর্য ও অনার্যের সংঘাত। এখানে অনার্য কথাটার অর্থ এই নয় যে তাঁরা আর্যদের থেকে কোন অংশে হীন ছিলেন, কথাটার অর্থ হল যাঁরা আর্য নন। উত্তর প্রদেশ ছিল আর্যদের বাসস্থান আর তামিলনাড়ু দ্রাবিড়দের। সেই অতীত যুদ্ধকে স্মরণ করেই আজও তাঁরা উৎসব করে চলেছেন।

রামায়ণ রচনাকারী মহর্ষি বাল্মীকি ছিলেন আর্য বংশোদ্ভব। তাই দ্রাবিড়দের তিনি সুনজরে দেখেন নি, যেমন, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং প্রাগ-জ্যোতিষপুরের মানুষদের। বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারদের মত তাঁদের চিত্রিত করেছেন আর্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে। আজ এতদিন পর হয়তো তারই প্রত্যুত্তরে তামিনাড়ুতে ঠিক এইদিনে রাবণবধের পরিবর্তে রামবধের উৎসব শুরু হয়েছে। ভিতরের নীতি বা উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, উৎসব কিন্তু ঠিক সমান ভাবেই চলে আসছে।

এই উৎসবের সমারোহ সবচেয়ে বেশি হয় উত্তর প্রদেশ। নেতৃত্ব অবশ্য করেন নারীরাই বেশি। মন্দিরাভিমুখে যে শোভাযাত্রা যায় তারও পুরোভাগে থাকে নারীরাই। তারা মাথায় জল ভরতি কলসি ও কিছু যবের শিষ্ কে নিয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে মন্দিরের দিকে, পেছনে থাকে পুরুষের দল। মন্দিরে ঠিক ঢোকবার আগেই পুরুষেরা নিজেদের ক্ষত বিক্ষত করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া লোহার শেকল দিয়ে। এ অনেকটা আমাদের শিবের গাজনের মত। এ দিনের শেষের অনুষ্ঠান আমরা দেখতে পাই মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম উড়িষ্যাতেও।

অযোধ্যা কাশী ও কানপুরে এই উৎসবের সমারোহ হয় সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হয় রাবণবধও। বুন্দেলখণ্ড ও মহাকোশলে আয়ারের যুদ্ধের অনুকরণে নিষ্ঠুর যুদ্ধেরও অবতারণা করা হয়। এমন কি বিশকুট ত্রিশূল-ও ব্যবহার করা হয় ওঠভেদের জন্য। এই দিনই ওখানে গরুর গোপণ উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যপ্রদেশের বহু অঞ্চলে এই বিজয়া দশমীর দিনে ময়ূর দেখবার জন্য ঠেলাঠেলি প'ড়ে যায়। ওখানকার লোকেদের ধারণা এদিন ময়ূর দেখলে নাকি সারাবছরটাই ভাল চলে।

মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডরা (Gonds) সীতাকে দুর্গা বাঘেশ্বরাই হিসেবে গণ্য করে। তাদের মতে রাম সীতাকে ত্যাগ করেন দুর্মুখের কথা শুনে নয় রামচন্দ্রের বোন শান্তার জন্যে। শান্তা নাকি একদিন সীতাকে বার বার অনুরোধ করে রাবণ কেমন তা ছবিতে এঁকে দেখাতে। প্রথমে সীতা রাজি হননি। কিন্তু বার বার বলাতে গোবর দিয়ে রাবণের ছবি আঁকা শুরু করেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই রাম সেখানে এসে পৌঁছোন। সীতা আপ্রাণ চেষ্টা করেন তাকে ঢাকতে কিন্তু পারেন না। এবং তাও শান্তার জন্যেই। রুষ্ট রাম সীতাকে সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাসনে পাঠাবার আজ্ঞা দেন লক্ষ্মণকে।

গভীর অরণ্যে অবসন্ন গর্ভবতী সীতার যখন নিদ্রাভঙ্গ হয় তখন দেখেন তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট বাঘ। হঠাৎ ভয় পেয়ে যাবার ফলে জন্ম হয় লব আর কুশের। এমনি সময় দুজন গোণ্ড সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরাই সীতা এবং ল'কুশকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেন। সীতার অনুরোধেই লবকুশের জন্ম, রামকে জানান হয় না।

অনেক গোণ্ড আবার রাবণকে ঘৃণা করা তো দূরের কথা পুজো করে। তাদের ধারণা, তাদের আদিপুরুষ রাবণ। মান্দালা আর বালাঘাট অঞ্চলে এমনি অনেক গোণ্ড দেখা যায়, যেমন দেখা যায় অন্য অঞ্চলে অনেক গোণ্ড, যারা রামকে মহাদেব বা অবতার হিসেবে পুজো করে। দু'রকম গোণ্ডই কিন্তু এইদিনে সীতার পুজো করে দেবী দুর্গা হিসেবে।

রাজস্থানের অধিবাসীরা বিশেষ করে ভীলরা বিজয়া দশমীর দিনে আহেরিয়া উৎসব পালন করে। অথচ অন্যান্য জায়গার আদিবাসীরা ঠিক এই পুজোই করে মকর সংক্রান্তির দিনে। এই আহেরিয়া উৎসবের প্রধান অংশ হল মৃগয়া। তাদের ধারণা শিকার ব্যর্থ হলে সমস্ত বছরটাই ব্যর্থ হবে। কিছু সংখ্যক মোষকে সারা বছর ধরে জিলাপি ও দুধ খাইয়ে তাদের বলিষ্ঠ করে

তোলা হয়। তারপর তাদের দিয়ে লড়াই করার রাজপুত আর ভীলরা। মেয়েরা সমস্ত দিন উপবাস করে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি তৈরী করে এবং সন্ধ্যের সময় এই সমস্ত মূর্তির পুজো করে।

মহারাষ্ট্রে এই দিনের উৎসবের নাম 'সিলংনগণ' বা 'সিমোলঙ্ঘন্'। এ উৎসবের বিশেষত্ব হল জোর করে অন্যের জমি দখল করা। বলি দেওয়া হয় মোষ ও ছাগল, আর নিহত পশুর দেহ দিয়েই প্রস্তুত হয় সীমানা রেখা। রাজস্থানেও, কোথাও কোথাও এ উৎসব হয়। রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা এইদিন শমীবৃক্ষের পুজো করে। তবে শুধু শমী নয় থাকে টিলি, জোয়ার আর মান্দারের পাতা। সেই পাতাতেই আবার প্রস্তুত হয় মালাও, আর সেই মালা দিয়েই পুজো হয় গণপতির। তারপর দুর্গার।

দক্ষিণের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবই হল এইদিন। সেখানের উৎসবের নাম 'দুসেরা'। যুগ যুগ ধরে এর সমারোহেরও শেষ নেই। কিছুদিন আগেও স্বয়ং মহীশূর অধিপতি রাজহস্তীতে চড়ে বিশাল শোভাযাত্রা পরিচালনা করতেন। শোভাযাত্রা মন্দিরে পৌঁছুলে প্রথম পুজোও দিতেন তিনি। শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে চলতো দুর্গালীলাও। পৃথিবীর বহু জায়গা থেকেই অপূর্ব শোভাযাত্রা দেখবার জন্য অসম্ভব রকমের ভীড় হতো।

এমন কি মুসলিম যুগেও। অর্থাৎ হায়দার আলীর সময়ও এই উৎসব ঠিক এমনি সমারোহেই হতো। স্বয়ং হায়দার আলী নিজেই পরিচালনা করতেন শোভাযাত্রা এবং মন্দিরে পৌঁছে দেবী মূর্তির কাছে প্রার্থনা করতেন নিজের এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে। বিভিন্ন স্থান থেকে আসতো বিভিন্ন মল্লবীররা তাদের নৈপুণ্য দেখাতে। পারিতোষিকও দেওয়া হতো মুক্ত হস্তে।

বাস্তারে এইদিন পুজো হয় দণ্ডেশ্বরী দেবীর; এখানে প্রবাদ আছে যে একদিন ওয়ারাঙ্গেলের রাজার ছোট ভাই অনামদেবের সঙ্গে রাজার ঝগড়া হয়। অনামদেবের কাছে নাকি ছিল একটা পরশপাথর বড়রাজাই তারজন্যে অনামদেবকে হত্যা করতে চেষ্টা করেন। তিনি ঠিক করেন বাস্তারে চলে যাবেন। আসার পথে, ভয় পেয়ে গোদাবরী ও ইন্দ্রবতী নদীর সঙ্গমস্থলে পরশমণিকে ফেলে দেন। সঙ্গে সঙ্গেই নাকি দেবী দন্তেশ্বরীর আবির্ভাব হয়। তিনি অনামদেবকে বলেন এগিয়ে যেতে এবং নিষেধ করেন পিছনে তাকাতে। এও জানান তিনি অনামদেবের পেছনে পেছনে যাবেন।

অনামদেব ঠিকই চলতে থাকেন। বরাবরই শুনতেও পান পিছনে এক

নদীর চলার শব্দ। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য বাকনী ও শাকনী নদীর মোহনা পার হওয়ার সময় হঠাৎ সে শব্দ থেমে যায়। বাধ্য হয়েই তিনি পেছনে তাকান কি কারণ দেখবার জন্যে। দেবী তখন অনামদেবকে জানান যে তিনি সেইখানেই থাকবেন। তবে দশহরা নবমীতে রাজা বা তাঁর বংশধররা যেন তাঁকে মন্দিরে নিয়ে যান। আজও তাই এখানে পূজা হওয়ার পর দন্তেশ্বরীর মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয় রাজপ্রাসাদের মন্দিরে। তারপর মহাসমারোহে দশেরা উৎসব পালিত হয় বাস্তার রাজপ্রাসাদে।

মাদ্রাজেও এইদিন মহাসমারোহে পুজো হয় প্রভু মুরুগানের বা মুরুগের। তাঁর অস্ত্র হল তীর ধনুক এবং বাহন ময়ূর, অনেকটা আমাদের কার্তিকের মত। তাঁকে খুশি করবার জন্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও রূপোর তীর দিয়ে ওষ্ঠ ভেদ করে নাচতে নাচতে মন্দিরে যায় পুজো দিতে।

এইদিনেই আবার অনুষ্ঠিত হয় শবরোৎসব। শবর ও অন্যান্য অনার্য যথা দস্যু, কিন্নর, বর্বর ইত্যাদির পুজো। এ পুজোর অবশ্যকরণীয় অঙ্গ হল অন্যকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করা। এ পুজোর বৈশিষ্ট্য হল গায়ে কাদা মাখা এবং পাতার দেহাবরণ ব্যবহার করা। এ অঙ্গগুলি নিশ্চয়ই আর্যরুচির পরিচয় নয়।

যাই হোক এককথায় আসমুদ্র হিমাচলে একই দিনে এবং একই তিথিতে এইরকম সর্বজনীন অনুষ্ঠান অতীতের বিভেদের মধ্যে ঐক্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ঠিক এইরকম অনুষ্ঠান আর নেই। ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান পালিত হলেও সময় এবং তিথির এই অপূর্ব সামঞ্জস্য অন্য হিন্দু পূজাপার্বণের মধ্যে কোথাও দেখা যায় না।

অসুরের মুখোস

(Bertolt Brecht-এর The Mask of Evil-এর অনুবাদ)

অনুবাদক : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমার দেয়ালে ঝুলছে
জাপান দেশের সোনার জলে
খোদাই করা
এক অসুরের মুখোস।
আমি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে
লক্ষ্য করি
তার কপালের ফুলে ওঠা শিরা-উপশিরাগুলিকে,
যা স্পষ্টই জানিয়ে দেয়
খাঁটি অসুর হ'তে হ'লে কী পরিমাণ স্নায়ুর চাপ
একজনকে সহ্য করতে হয়।

দু'টি অলিখিত গান

(ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জ – মাইক্রোনেশিয়ার আদিম লোক সংগীত)

সংগ্রহ ও অনুবাদ : লখাই কিস্কু

১। বন্ধু আমার ঘুম দিও না ভেঙে
ঘুমের নেশায় বুঁদ হয়েছি, দেখ।
রূপবতী সাগর থেকে আমি
এসেছিলাম ; এই মিনতি তবু—
লক্ষ্মী আমার এখন ফিরে যাও ;
শুনবো ভোরে পাখ-পাখালির গান।

২। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সেই সে জোয়ান ছেলে,
আমাদেরই জাতের।
তার কাছেই লুটিয়ে দিলাম
আমার ভালোবাসা ;
মন যে আমার ওকেই বাসে ভালো।
যে দিন ওকে প্রথম আমি দেখি—

সে দিন দারুণ বুকে আমার ব্যথা।
এখন শুধু ইচ্ছে জাগে মনে—
চাঁদের মত মুখ থেকে তার—
জল করে নিই পান—
কিন্তু, না গো না—
কিছু এখন দেখতে পাচ্ছি না।
কারণ, আমার দুটি চোখের জল
যাচ্ছে মিশে সমুদ্দুরের তল।

শব্দের জটিল অন্ধকারে

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

এক একটা শব্দের মধ্যে খুঁজে পাই নিজের সত্তাকে
আবার নূতন ক'রে, যেমন 'নির্জন' এই কথা
নিয়ে যায় দিগন্তকে অতিক্রান্ত পেরিয়ে আমাকে
কী এক শূন্যের মধ্যে যেখানে শুধুই নীরবতা।
হৃদয়ের উপকূলে তখনি 'সৈকত' এই ধ্বনি
আমাকে ফিরিয়ে আনে মৌনের অতলস্পর্শ থেকে
উর্মিল সমুদ্রবুকে কোলাহল ওঠে অনুরণি
ময়ূরপঙ্খী ভাসে, বলে আয় যাবি তোরা কে কে।
সহসা 'নাবিক' এসে মাঝপথে বলে, দেখ চেয়ে
দুর্যোগ ছেয়েছে দিগ্‌দিগন্তের সৈকত নির্জন,
তোমার ময়ূরপঙ্খী ঝঞ্ঝায় ফেলেছে দেখ ছেয়ে,
বল যদি ফিরে যাই যেখানে তোমার অঙ্গন।
আমার নিজের সৃষ্টি শব্দের জটিল অন্ধকারে
চেনা অচেনার দ্বন্দ্বে চলি আর থামি বারে বারে॥

অনাশ্রিত

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পুরাণো চিঠি ছিঁড়তে গিয়ে কান্না বাজে,
অথচ ঘর ক্রমেই স্তূপাকার,
শেষে একটা ভালোবাসার চিঠি হঠাৎ
ঈষৎ পায়ে লাথি মেরে ঘরের বাইরে আমায়
ছুঁড়ে দিল। আমি আবার ঘরের মধ্যে যাবার
সুযোগ খুঁজছি। যাকে আমি ভালোবাসি না তাকে একলাইন
ভালোবাসার চিঠি লিখলে আবার আমি ঘরের কাছে
গৃহীত হবো? একটি চিঠি আছে আমার বুকের জামায়॥

মানুষ এখনো বেঁচে আছে

বলরাম রায়চৌধুরী

পৃথিবীতে মানুষের অগণিত রক্তাক্ত আঁচর
তবুও পৃথিবী আজো প্রত্যয়ের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর,—
তবুও পৃথিবী অমলিন
এখনও ভূমিষ্ঠ হয় এইখানে মানুষের আশ্চর্য সুদিন।

যন্ত্রণার হ্রদ ছেড়ে উঠে আসি সেই এক আলোকিত সুন্দর সকালে,
পাখিদের গান শুনি, ফুলফোটা দেখি চেয়ে
আন্দোলিত সব ডালে ডালে,
চোখ মেলে চেয়ে দেখি সব,
ঘাসের নরম বুকে আবর্তিত পৃথিবীর ক্লান্তিহীন ঋতুর উৎসব,
চলে যাই পায়ে পায়ে মানুষের অবিশ্রান্ত কাছে
মনে হয় পৃথিবীতে মানুষ এখনো বেঁচে আছে।

কারা আসে যুগে যুগে পুরাতন এই পৃথিবীতে
মানুষের যন্ত্রণার সব রক্তস্রোত মুছে দিতে,
জেলে রেখে যায় কারা বিশ্বাসের অনির্বাণ আলো অন্ধকারে
বিপর্যস্ত মানুষের পথের দু'ধারে

মানুষ

কবিরুল ইসলাম

মানুষ অজানা থাকে ঘরে পরে দূরতর প্রবাসে
মানুষ অচেনা থাকে গাছতলার বিকল্প বাতাসে :
এই ব্যবধান শুধু স্নিগ্ধ হয় জ্যোৎস্নার আবেগে
স্নিগ্ধতা অথবা তার শান্তশ্রীর স্তিমনয়নে জেগে।

ঘরে পরে গাছতলার ভূয়োদর্শনে
মানুষে মানুষে চেনা বয়স্ক বয়নে॥

ফুলের দৌরাত্ম্যে ভরে দেয় রাতের প্রহর

ব্রজগোপাল রায়

কিছু কিছু শব্দ আছে কখনো কখনো যা ধ্বনিময়
কিছু কিছু স্মৃতি   হ'য়ে যায় ইতিহাস
সময় সময়।
কিছু কিছু মুহূর্ত আসে
কখনো কখনো হঠাৎ…হঠাৎ—
এক অর্বাচীন প্রতিযোগী দৌড়ে হাঁপিয়ে
অথচ সীমার পর্যাপ্তিশেষে
সমান্তরাল দূরত্ব থেকে যায় এগিয়ে পিছিয়ে,
অবলীলাক্রমে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে
হোঁচট লাগে মনের বুড়ো আঙুলে
বুকের অর্গল খুলে হুড়মুড় খ'সে পড়ে
আকাশ।   …স্বপ্নালু জোছনায় নড়ে চড়ে
শেষ রাতের একাকিনী চাঁদ।
এবং অকস্মাৎ
চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘণ্টা বেজে ওঠে   প্রার্থনায়
ঘর্মাক্ত শিথিল হাতের জেটো মুদ্রিত মুদ্রায়,
একদিন কিন্তু সে-ই অক্লান্ত সিঁড়ি বেয়ে

সবুজ শীষের নেপথ্য সংকেত
আর নদীর অদ্ভুত মধ্যাহ্ন-ঢেউয়ের রঙে
পদযাত্রা তার
এবং কিছু কিছু ঘটনার সশব্দ উচ্চারণ   শেষে
অসম্পূর্ণ স্বাদ আর গন্ধ বিবর্ণ হ'য়ে এলে
প্রবীণ সময়
সূর্যের রাখালিয়া হাতে শব্দেরা নিঃশব্দ হ'লে
শব্দময় প্রতিধ্বনির মত
উদাস-শূন্যতা   দীর্ঘতর হয়… ।
তবু, কিছু কিছু শব্দ…স্মৃতি‥ ইতিহাস
আর সময়ের হঠাৎ মুহূর্তগুলি বুকের মেঝেতে
চিৎ হ'য়ে যখন ঘুমায় —
ফুলের দোরাত্ম্য এসে ভরে দেয় রাতের প্রহর ।

পুরোনো অসুখ

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

খুট্ ক'রে শব্দ হয়
        খুলে যায় মাথার ভেতর
সঙ্কীর্ণ ঘুলঘুলি—
অন্ধকারে অশ্লীল ওরাংএর মুখ ।

দিনে দিনে ঘুণ ধরে
উঠোনের
        নোংরা দুয়োর পচে যায়

দোতলার ঘরে
একা একা বেড়ে ওঠে পুরোনো অসুখ ।

মাছ : পাখা : বিভক্তে

সনাতন মিত্র

এমন অনেক মানুষ যাঁরা বোলে আছেন অম্বলেও
বইছে হাওয়া যখন যেমন বলেন কথা সেই মত
রাতারাতি দশের প্রতি অনুরাগের কম হলেও
গাল ফুলিয়ে মধুর বাণী ঝেড়েই যাবেন দশ শত।
ভাবখানা ঠিক এমনিধারা আগুন যদি লাগে চালেও
নিজের গায়ে আঁচ না লেগে ছড়ায় যদি ছড়াক তো
প্রতিবেশীর ঘরের চালে ঐ শিখা লকলকালেও
ভাবনা কিসের নিজের গায়ে ছড়াচ্ছে না তার ক্ষত।

প্রতিবেশীর আত্মীয়তা ভুলেই যে যান একবারে
ওনারই ঘর দাঁড়িয়ে আছে প্রতিবেশীর ছায়ায় যে
খোকাখুকু দুই উঠোনে ঘুরে বেড়ায় আহ্লাদে
সত্যি যদি লাগে আগুন ঐ বাড়ি দুইদিন বাদে
বাঁচবে কি তার বাড়ি, খোকা? আগুন ছোটে হাওয়ায় যে
আগুনটাকে রুখতে হ'লে সহযোগেই বল বাড়ে।

একটি তুর্কী কবিতা

আমাদের কচিকাচাদের প্রতি

মূল কবি : নাজিম হিকমেত্
(জন্ম তুরস্কে ১৯০২ : মৃত্যু মস্কোতে ১৯৬৩)
অনুবাদক : দীপক চট্টোপাধ্যায়

পাজি হও, খুব ভালো সেটা।
খাড়া পাঁচিল বেয়ে উঠে যাও,
          উঠে যাও ইয়া বড়া গাছগুলো বেয়ে
বাহু কাপ্তানের মতো হাতদুটো তোমার
বেঁধে দি'ক তোমার বাইসিক্লের গতিপথ ;

আর মোল্লাসাহেবের কার্টুন-আঁকা পেন্সিলটা দিয়ে

খসিয়ে দাও কোরাণের পাতাগুলো

তোমাকে রপ্ত করতেই হবে এই কালো মাটিকে

তোমার নিজের বেহেস্ত বানানোর কায়দাটা

তোমার ভূবিদ্যার কেতাব দিয়ে তোমাকে থামিয়ে দিতেই হবে

সেই লোকটাকে যে তোমাকে তালিম দেয় :

          সৃষ্টির মূক আদমকে দিয়ে ।

তোমাকে স্বীকার করতেই হবে

          পৃথিবীটা খুবই জরুরি

তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে

          পৃথিবীটা অক্ষয় অমর

তোমার জনয়িত্রী আর জননী পৃথিবীর মধ্যে

পার্থক্য করো না

তোমাকে ভালোবাসতেই হবে তাঁকে

যতোটা বাসো তোমার মাকে ।

একটি নিগ্রো কবিতা

আমার জাতি গোষ্ঠী

মূল কবি : ল্যাংস্টন হিউজ (১৯০২—'৬৭)

অনুবাদক : ডাবলু মুখোপাধ্যায়

রাত্রি সুন্দর

তেমনি সুন্দর আমার জাতিগোষ্ঠীর মুখগুলি ।

সুন্দর নক্ষত্রেরা

তেমনি সুন্দর আমার জাতিগোষ্ঠীর চোখগুলি ।

সূর্যও সুন্দর

সুন্দর আমার জাতিগোষ্ঠীর আত্মাগুলিও ।

সকাল
রামপ্রসাদ মল্লিক

ব্যস্ত হবার সময় এটা

অফিসের নিত্যযাত্রী কেরানি দেবেন বাবু
কাকচান, দু'চারটে নাকেমুখে গোঁজা
এবং তারপরই ন'নম্বর বাসে
পাদানিতে একচটি স্থান
কোনোক্রমে দখল পেলেই ইহকাল ধন্য হয়
তেমন আরেকটা সকাল এসে দাঁড়ালো দেবেনবাবুর সামনে।

একটা তরুণ কাক
সুপ্রভাত জানিয়ে উড়ে গেল
ঘাড়ে ঠোঁট ডুবিয়ে ঠায় ব'সে আছে
একটা শালিখ বিষন্ন পাঁচিলে
কার্নিসে লেগেছে রোদ
পুঁইলতা আশ্চর্য সোহাগিনী
অপ্রতিভ দেবেনবাবু
অ-চিনি চায়ের পাত্র
শশব্যস্তে তুলে নেন হাতে
ঘড়ির শব্দ ম্লান
রান্নাঘরে টুং টাং শব্দ
শহর মুখর হতে থাকে।

মানুষের অবিচ্ছিন্ন বুকের শিকড়ে
চন্দ্রশেখর ঘোষ

মরে যাবো একদিন, তবু
এ বিশ্বাস সাথে নিয়ে যাবো :
যতোদিন বেঁচে গেছি, বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে

পরম যত্ন আর ভালোবাসা নিয়ে
একটি শিশু গাছ বাঁচাতে চেয়েছি।
শুকিয়ে গেলেও সে-গাছ ক্ষতি নেই
বাঁচাবার বাসনাটা আজও বেঁচে আছে।
তাই আজও পথ হাঁটি আমি
শান্ত হয়ে তোমাদের অশান্ত হলুদ মাঠ চিরে ;
ধীরে ধীরে পার হই সন্দেহ ও বিশ্বাসের চড়াই উতরাই

জানি আমি সব বাধা ছত্রখান ক'রে
বিশুদ্ধ ফুলের মতো বেঁচে থাকবে অমল হৃদয়
মানুষেরই অবিশুদ্ধ বুকের শিকড়ে॥

খুব কাছে থেকে
অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

খুব কাছে থেকে দেখাটা দেখা নয়
শুধু চোখ রাখা
চোখের মুখের কিংবা বুকের ওপর
ওপর থেকে দেখা যায় শুধু জলাশয়
আর তরংগের অস্থির ললাটরেখা
কিন্তু সেই ললাটপটেরও ওপারে আছে অতিশয়
নিতল তল
আর সেখানে আছে এক বিশাল চিতল

বিধস্ত হইলে একশো গজ শক্ত সুতোর
নিঃশেষ ধৈর্য্য
একটি নিঃশব্দ চাতাল
একটি বিশুদ্ধ মাতাল মনের বঁড়শি॥

সরকারী বিজ্ঞাপন লাভের 'গুণগত' যোগ্যতা সম্ভবত চেতনিক-এর নেই। বেসরকারী বিজ্ঞাপনদাতাদের দাক্ষিণ্যেও প্রায় বঞ্চিত আমরা। এমন অকুলীন পত্রিকাকে যিনি থোকে একশো টাকা দিয়ে পুজোর সাজে সাজতে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন সেই অসাধারণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিটি হলেন অরংগাবাদের শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী। আমরা তাঁকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। আর অন্য সমর্থ সহৃদয় ব্যক্তিদের অনুরোধ জানাই তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে যে কোনো সৎ প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে। —স, চে.

চেতনিক-এর পরবর্তী ৩য় বর্ষ ৩য় (জানিউয়ারি) সংখ্যায় লিখছেন

প্রবন্ধ : অন্নদাশংকর রায়/নারায়ণ চৌধুরী/ডঃ সুধীর নন্দী ডঃ সুধীর করণ/ ডঃ শিশির সিংহ প্রভৃতি

গল্প : বোম্মানা বিশ্বনাথম্/মাণিক রায়

কবিতা : হীরালাল দাশগুপ্ত/বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/লখাই কিস্কু/কবিরুল ইসলাম প্রভৃতি।

● 'চেতনিক' বের হয় বছরে মোট চারবার বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা দশ টাকা। ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র। বার্ষিক গ্রাহকেরা একটি মাত্র পুজো সংখ্যাসহ মোট চারটি পৃথক সংখ্যা পাবার অধিকারী। জুলাই-এ বর্ষারম্ভ। যে কোনো সংখ্যা থেকে বার্ষিক গ্রাহক হওয়া যায়। সাধারণ সংখ্যার দাম দুটাকা পঁচিশ পয়সা। পুজা সংখ্যা চার টাকা।

* রিভিউ-এর জন্যে দু' কপি বই বা পত্রিকা পাঠাবেন।
* আমন্ত্রিত রচনাগুলি যথাসম্ভব দু' মাস পূর্বে এলে ভাল হয় অন্যথায় পত্রিকা প্রকাশ বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
* উপযুক্ত কমিশনে এজেন্টরা যোগাযোগ করতে পারেন।

অধ্যাপক ডঃ সুধীর করণ : 'চেতনিক' দু'টি (২য় বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ) সংখ্যাই পেয়েছি। ....আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন। আপনার সম্পাদকীয় আলেখ্যকে পড়িয়েছি।

মণি বাগচি : সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রকাশ করার একশো বছর পর সেই এক-ই বহরমপুর শহর থেকে 'চেতনিক' নামের নূতন ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির আবির্ভাব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এর আবির্ভাব ঘটেছে। ......আজ উন্মার্গগামী সাহিত্যিক ও কবিদের স্বধর্মে ও স্বচেতনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এই 'চেতনিক'। সম্পাদকের এই সংগ্রাম, তাঁর নিজের কথায়, 'অপসংস্কৃতিরূপ হিরণ্যকশিপুর দাপাদাপির বিরুদ্ধে একটা কিছু করা'—সার্থক হোক।

ডঃ সরোজমোহন মিত্র : 'শারদীয় চেতনিক' (১৩৮১) পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। সূচিপত্রের ওপর একবার দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় আপনাদের এই সংখ্যাটি কতো সুন্দর এবং মনোজ্ঞ হয়েছে।

ডঃ সুশীল রায় : (শারদীয় চেতনিক সম্পর্কে ১৩৮০) 'মফঃস্বলে বসে এ ধরণের পত্রিকা বের করা সামান্য কথা নয়।'

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র : 'দেশ পত্রিকার বাইরে এমনি একটি নির্ভীক পত্রিকার অভাব বোধ করছিলাম আমরা অনেকদিন থেকে।'

ডঃ সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিক সরকার : মফঃস্বল শহরে এতো উচ্চাংগের পত্রিকা অভাবনীয়!'

অধ্যাপক মৃন্ময় পাল : আজকাল সাহিত্যটা মুখ্যত কলকাতাকেন্দ্রিক। যাঁরা তা করেন তাঁদের যদিও অনেকেই পল্লীর, তবু তাঁরা প্রায়ই এই উন্মাদিক চিন্তায় ভোগেন যে কলকাতা ছাড়া বাংলায় আর কোনো চিন্তনকেন্দ্র নেই, কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও ভাবুক মানুষ নেই। আপনার পত্রিকা পড়লে এই উন্মাদিকেরা দ্বিতীয় চিন্তায় নিতে হবেন। 'চেতনিক' আপনার প্রচেষ্টায় পল্লীবাংলার চিন্তন আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ......'চেতনিক' ক্রমশঃই আমাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে চলেছে।'

কবিরুল ইসলাম : আপনার পত্রিকা আমি প্রথম মলাট থেকে আরম্ভ ক'রে চতুর্থ মলাট পর্যন্ত পড়ে থাকি। আমি জানি আরো অনেকেই তা-ই করে থাকেন। আপনার সম্পাদকীয়গুলি অভিনব, সাহসী এবং অসাধারণ হচ্ছে।

ডঃ অমলেন্দু মিত্র (শারদীয় ১৩৮১ সম্পর্কে) : 'চমৎকার! মফঃস্বল থেকে এমন চেহারা, গাত্রবর্ণ ও সৌরভ আশা করা যায় না।'

বার্ণিক রায় : 'চেতনিক' দিন দিনই ভাল হচ্ছে।

ডঃ শিশিরকুমার সিংহ : আমাদের পত্রিকার খুব সুনাম হয়েছে, শুনতে পাচ্ছি বিভিন্ন মহল থেকে।

মুর্শিদাবাদের খবর (বহরমপুর) : ..... মফস্বল বাংলার এই বলিষ্ঠ পত্রিকাটি সমগ্র বাংলা জেলে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম।'

Regd. No. RN 24668/73
CHETANIK (Progressive Lit. Qty.) SARDIYA 1382 (Year 3 Nos 1 and 2)
Edited & Published by ATUL CHANDRA BANERJEE from P. O. & DIST. MURSHIDABAD, WEST BENGAL & Printed by him from Cygnus printing Co-operative Society Ltd. Berhampore, West Bengal.

'চেতনিক' সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য ও আন্তরিক প্রত্যাশা :

দেশিকোত্তম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন)

'………এরকম ক্ষীণকায় পত্রপত্রিকা মাঝে মাঝে পাই। তাই একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই পাতাগুলি উল্টোতে সুরু করি। কিন্তু দু'খণ্ডের (২য় বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায়) সব প্রবন্ধগুলি পড়লাম। দেখলাম মফঃস্বল থেকেও ভাবাবার মতো পত্রিকা বের হতে পারে … ।'

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : তোমার এই সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অভিযান সার্থক হয়ে উঠুক।'

ডঃ অমিয় চক্রবর্তী (পদ্মভূষণ) : 'চেতনিক' সৃষ্টিশীল প্রাগ্রসর রচনায় সমৃদ্ধ হোক।

অন্নদাশংকর রায় : 'চেতনিক' বেশ উচ্চাঙ্গের পত্রিকাই হচ্ছে। কলকাতায়ও এর মতো পত্রিকা খুব বেশি নেই। ………আপনার সম্পাদকীয় রচনাগুলি ভালোই লেগেছে। নির্ভয়ে ও অকপটে নিজের বক্তব্য ব'লে যান। মা ফলেষু কদাচন।

নারায়ণ চৌধুরী : এবারকার (২য় বর্ষ ৪র্থ) সংখ্যায় আপনার সম্পাদকীয়টি চমৎকার। ছাত্রবিশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে খুব-ই সময়োচিত স্পষ্ট কথা বলা হয়েছে লেখাটিতে। নানাবিধ সমস্যার ওপর আলোকপাতকারী এরকম সম্পাদকীয়ই কাম্য। ………ডঃ সুধীরকুমার করণের ভাষার কোষাগার একটি অনবদ্য রচনা। তাঁকে এ-জাতীয় প্রবন্ধ আরো লিখতে বলবেন।

কবি হীরালাল দাশগুপ্ত : 'এবারের (২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার) সম্পাদকীয়টি একটি প্রথমশ্রেণীর প্রবন্ধ।

স্বর্গত নরেন্দ্রনাথ মিত্র : '… …আপনি মফঃস্বল শহর থেকে একটি রুচিসম্মত পত্রিকা বের করে যাচ্ছেন………এ যে কত কঠিন কাজ তা অনুভব করতে পারি। ……'চেতনিক'-এর একটি সংখ্যা থেকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখাটি পড়লাম। ভালো লাগলো। ………আপনার পত্রিকার ভিতরের বাইরের পরিচ্ছন্নতা দেখে খুশি হয়েছি। ………যাই হোক পুজোর সময় একটি গল্প আপনাকে পাঠাবো।' আকস্মিক মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত এই স্নিগ্ধ সুভদ্র মানুষটির একটি সুনিশ্চিত গল্প থেকে চেতনিককে বঞ্চিত করলো। [শেষ কভারে দেখুন]
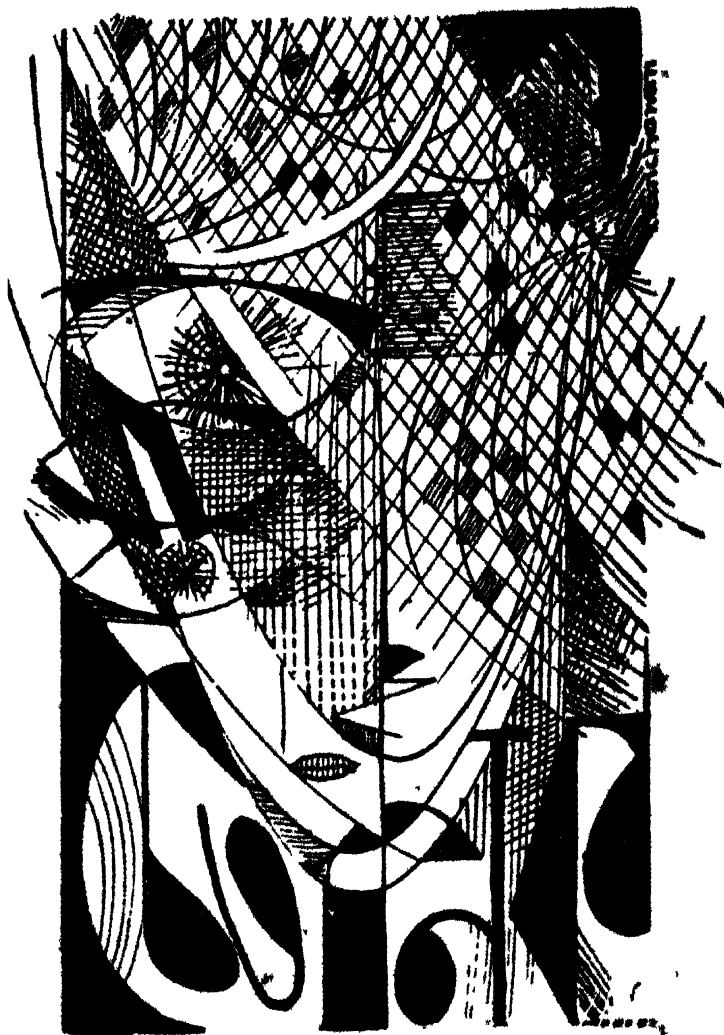
তীয় বর্ষ
তীয় সংখ্যা

চেতনিক

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

সাহিত্য শিল্প সাংস্কৃতিকেত্রে 'অবোধ-বাদী' দুর্নীতি বিকৃত রুচি ও চৌর্যকৃত দুর্বোধ্যতার বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামরত ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র।

প্রকাশকাল : জুলাই/পূজা/জানিউয়ারি/এপ্রিল।

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭৩

চেতনিক

সম্পাদক :

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পোঃ ও জেলা : মুর্শিদাবাদ/পশ্চিমবঙ্গ

'চেতনিক' ৩য় বর্ষ ৪র্থ (এপ্রিল) সংখ্যায় লিখছেন

প্রবন্ধ : নারায়ণ চৌধুরী, অধ্যাপক বিজনবিহারী পুরকায়স্থ, অধ্যাপক মৃন্ময় পাল, অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প : বোম্মানা বিশ্বনাথম্ ও মাণিক রায়

কবিতা : হীরালাল দাশগুপ্ত, পরমানন্দ সরস্বতী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সংকর্ষানন্দ মুখোপাধ্যায়, লথাট কিন্নু, কবিরুল ইসলাম প্রভৃতি।

চেতলিক

তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা (১৯৭৫-৭৬)

প্রগতিশীল ত্রৈমাসি সাহিত্যপত্র

প্রকাশকাল :

জুলাই/পুজা/জ্যানিউয়ারি/এপ্রিল

সম্পাদক :

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পোঃ ও জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

সূচি

বদ্‌রিদাস বাঘ মারেনি

সম্পাদকীয়

স্বরে অ স্বরে আ ।

অ সরে আ সরে সরে না শুধু মা ॥

না না, বদ্‌রিদাস বাঘ মারেনি। বদ্‌রিদাস বাঘ মারিতে পারে না। বদ্‌রিদাস কখনও বাঘ মারিতে পারিবে না। ইহার পূর্বে বলিতে চাহিয়াছিলাম বদ্‌রিদাস বাঘ মারিয়াছে। অনেকগুলি বাঘ মারিয়াছে। ইহাতে নগরকোটাল আমার কর্ণাকর্ষণ করিয়া কহিলেন : বেওকুফ, তুমি একি রগড় করিয়াছ? এতো বড় মিথ্যা কথা উৎকীর্ণ করিয়া আনিয়াছ কেন? তুমি কি জানো না বদ্‌রিদাস বাঘ মারেনি? সে নেহাৎই গোবেচারা দুগ্ধপোষ্য কৃষ্ণঘোটক। কোনো সাতেপাঁচে থাকে না। বাঘ মারার কথা সে ভাবিতেও পারে না।

তুমি তাহাকে দিয়া এতোগুলি বাঘ মারাইলে কেন? আমি বলিলাম, সে কি মহাশয়, তবে যে শুনিয়াছিলাম বদ্রিদাস বাঘ মারিতে পারে। এমন কি মারিয়াছেও! এবং সে খবরই শিলাফলকে উৎকীর্ণ করিতে হইবে। যে যতো সুন্দর করিয়া শিলালিপি প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসিবে তাহাকে ততো বেশি করিয়া ভালবাসা বিতরণ করা হইবে। এবং বড়োর পিরিতি যে সে ব্যাপার নহে। চাইকি একটা আস্ত পাহাড়ও দান করা হইতে পারে।

নগরকোটাল কহিলেন: হাঁ হাঁ, হুঁইতো বাত্ থা, জরুর জরুর। লেকিন উও তিন রোজ পহলে কা ফারমান থা। কালসে বিলকুল সবকুছ্ পালাট্ গিয়া। কালসে মহারাজ সুমন বাহাদুর সিকা সমাজমে আগয়া কি ব্যাঘ্রহত্যা বহোত্ খারাবি কাম্ হ্যায়। ইস্‌লিয়ে আজ সে তোমলোগোঁকো কর্তবিয়াভি পালাট্ গিয়া।

এবং সেই নয়া ইস্তাহারমোতাবেক আমি নতুন করিয়া বর্ণপরিচয় করিতেছি:

স্বরে অ স্বরে আ।

অ সরে আ সরে সরে না শুধু মা॥

অতএব পূর্বে শিলাফলকে যাহা উৎকীর্ণ করিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা। যাহা নির্জলা সত্য তাহা হইতেছে এইরূপ:

বদ্রিদাস ঘোর বৈষ্ণব। সে বৈষ্ণব। তাহার পিতা বৈষ্ণব, তাহার মাতা বৈষ্ণব। তাহার পিতামহ বৈষ্ণব, তাহার মাতামহ বৈষ্ণব। সে বরং ব্যাঘ্র ভজনা করে। দক্ষিণ রায়ের একান্ত ভক্ত সে। মাঝে মধ্যে সে সুন্দরবন ভ্রমণ করিতে আসিবে। সুন্দরবন তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে! সুন্দরবনের সুন্দর সুন্দর লোমশ অধিবাসীরাও তাহাকে বড় ভালবাসিয়াছে। ইহাতে সে বড়ই অভিভূত হইয়াছে।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বলিতেন, বড়া বড় গম্ভীর। দেখো পাতের উপর গাল ফুলাইয়া বড়া কেমন গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে। আমি বলি শুধু বড়াই নহে, বাঘও কম গম্ভীর নহে। বড়ার মতো, বড়ির মত সমস্ত সুন্দরবনও যেদিন বাচালতা বর্জন করিয়া, প্রগল্ভতা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত গম্ভীর হইয়া উঠিবে সেই বিশেষ দিনটির প্রত্যাশায় আমি উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া নূতন করিয়া নূতন যুগের উপযুক্ত বর্ণপরিচয় আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছি:

স্বরে অ স্বরে আ।

অ সরে আ সরে সরে না শুধু মা॥

কর্তা ক্রিয়া কৃত্য/হীরালাল দাশগুপ্ত

নিরাসক্ত স্বত্বহীন সত্তানমনায়
আশ্লেষে বিশ্লেষে আর দ্বন্দ্বসমন্বয়ে
শবলিত হোয়ে ওঠে দর্শকের পাণ্ডুর দৃষ্টিতে।
আষাঢ়ের মেঘ আর নির্বাসিত বিরহী হৃদয়
শুধু নয়! আকাশের চাঁদ আর পৃথিবীর সমুদ্রের মন
দুই বাঁধা এক সূত্রে রহস্যধূসর। কেনো?
কেনো এই তরঙ্গিত সত্তার কর্তাহীন ক্রিয়মানতায়
পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকে
সূর্য ওঠে তারা ফোটে ফুল ঝরে যায়!

অর্থহীন অন্ধ বেগে পৃথিবীটা ঘোরে।
সুতরাং, মানুষের মাথাটাও ঘোরে। অতএব,
প্রতিদিন প্রতিরাত প্রতিটি মুহূর্ত এই থাকা
আর থাকা, এই বিদ্যমানতাকে মনে হয় যেন
বেঁচে আছি। আমার ইচ্ছায় আমি, এই আমি
প্রতিটি মুহূর্ত বেঁচে আছি। সে কারণে,
অর্থাৎ অকারণে, প্রতি রাত্রে দরজা বন্ধ কোরে
অন্ধকারের মশারি খাটানো। তার পর,
সেই জন্ম
সেই মৃত্যু
সেই অসংবৃত্ত ক্লিন্ন অবসাদ!

আবার সূর্য ওঠে!
আবার শহর সভ্যকে ঢাকা দেয় বিচিত্র পোষাকে।
ট্রাফিকের অট্টরোল হট্টগোল শুরু হোয়ে যায়
ট্রামবাসলড়িট্রেনখড়কুটোধোঁয়াইটধুলোবালিকাদাজল

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় পায়ে পায়ে গায়ে গায়ে যত ভ্রষ্ট নীড়
বিমূঢ় অস্থির নরনারী
দলে দলে কাতারে কাতারে
কোন্ রসাতল থেকে উঠে আসে আর
ছুটে চলে কোন প্রেতলোকে
অন্ধ বেগে কবন্ধের মতো !
ট্রাফিক পুলিশ তার খবর রাখে না !

রাত্রি আসে।
পাখিরাও ক্লান্ত ডানা শ্রান্ত হতাশায়
মাটির বাসায় ফিরে আসে।
পাখির মতোন মন উড়ে যায় নক্ষত্রের নীলান্ত পেরিয়ে
সেখানে কি শূন্যে নীলে নীলে কিছু খুঁজে পায় ?
সেইতো সে ফিরে আসা ভাঙা ঘরে ছেঁড়া বিছানায়।
আকাশে বেরিয়ে এসে কাকগুলো বসে থাকে ছায়োরের পিঠে !

তথাপি হৃদয় !
শরীরের অবরুদ্ধ অন্ধকার অদৃশ্য গুহায়
নিঃসঙ্গ হৃদয় কাঁদে !
শরীরের সাথে কেনো মনের বিচ্ছেদ ?
কেনো এত কাল-শর্ত শুধু অবক্ষয় ?
হৃদয় কি কোনোদিন হৃদয় পাবে না ?
আকাশ
রাত্রি
নক্ষত্র
স্তব্ধ !
নিরুত্তর !

ছোটো ছোটো টিক্-টিক্ বড়ো বড়ো ঘণ্টা হোয়ে ঢং ঢং বাজে
নোনাধরা দেয়ালের চাপ্‌চাপ্‌ আস্তর খোসে খোসে পড়ে !

মানুষ-মারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে / একটি নবম শতাব্দীর চীনা কবিতা / অনুবাদক : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রক্তে ভাসছে দেশ, নদী, পাহাড়, চারদিকে শুধু মানুষ-মারা লড়াই !
কী ক'রে খেটে খাওয়া মানুষ কাঠ কাটতে যাবে ?
জ্বালানী কুড়িয়ে আনবে ?

গোঁসাইজী ! বড় গলায় খ্যাতি মান, সম্মানের কথা এখন থাক !
একজন যুদ্ধবাজ সেনাপতির সম্মান বাড়াতে দশহাজার সেপাই
জবাই হ'য়ে যায়, পড়ে থাকে শুধু তাদের পোকায়-খাওয়া হাড়গুলি !

TS'AO SUNG-এর 'written in the year Chi-hai (879). I কবিতার অনুসরণে।
দ্র. 'The Penguin Book of CHINESE VERSE.'

প্রমিথিউসের প্রতি/সাগর চক্রবর্তী

তুমি আগুন ছুঁয়েছিলে
তোমাকে তার মূল্য দিতে হবে !

তুমি মাথার ওপরে টেনে এনেছো
স্বর্গের রাজার অভিশাপ
তুমি নির্বাসিত হয়েছো শহর গ্রাম থেকে দূরে
পাহাড়ে, তুমি একা হয়ে গেছো……
আর মহান দেবতা
তৈরি রেখেছেন তাঁর প্রিয় শকুন
প্রতিদিন তোমার লিভার ঠুকরে ঠুকরে খাবার জন্য·
তুমি অপেক্ষা করো
একদিন হারকিউলিস এসে তোমার পায়ের শেকল

ভাঙবেন ; ধ্বংস করবেন
দেবতার আশীর্বাদপালিত শকুনকে।

তুমি মুক্ত হবে!

চারটি অলিখিত গান / লথাই কিস্‌কু

সাঁওতালী থেকে –

১। মনের ময়ূরী যেমন সাজে
তেমনি সেজেছি।
তার মধ্যে সবার সেরা
সুন্দরীকে দেখে—
বাছাই করেছ।
কিন্তু জেনো,—
বাছাই করা জোয়ান মোরা চাই,—
ধারালো আর তীক্ষ্ণ যেন
ঝক্‌ঝকে বল্লম।

২। পাকা ধানের শিস্‌ যেন
তোমার মানুষ, দিদি,—
একটুখানি ভাগ বসাতে দাও

বাসনকোসন আধেক দেব, বোন,
মনের মানুষ পাবি নাকো, শোন্‌।

৩। ও ময়ূরী—
পাহাড়-বনের কোণে
ব'সে কেন চোখের জল ফেল।

ইচ্ছে আমার, দেখবো তোমার
হাওয়ায় পেখম মেলা ;
সেই মনোরম মাটির উপর
পায়ের ছাঁদে চলা।

৪। ও ছুঁড়িরা, ছুটে পালা—
সিঁদুর নিয়ে ছোঁড়ারা ঐ আসে,
মাথায় দেবে ঘষে।

ও ছোঁড়ারা ছুটে পালা
আমার কথা শোন্।
ঝাঁটা হাতে ঐ ছুঁড়িরা আসে
পিঠে দেবে কসে।

তিনটি চিন্তা/কবিরুল ইসলাম

১॥ বয়সে পোড়ায় সূর্য আপাদমস্তক
চৈতন্য ইস্তক
যেমন গরমে গলে পীচ
রৌদ্রের কিরিচ
ঝলসে ওঠে মুরগির তন্দুরী
প্রকাশ্যে পুকুর চুরি
হয়ে গেলে কিছুই বলার আর থাকে না বরং
বেগে টং
প্রাক্তন জোতদার

হে আমার
অলীক ঈশ্বরী

এসো, যুদ্ধ করি।

২॥ বন্দুক রাইফেল

ছিনতাই হচ্ছিল রোজ। বাইজীর রাইফেল

লুট হচ্ছে রাতদুপুরে

ঘাতক ঘুঙুরে৷

৩। ইস্কুল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে

কেউ নিরাপদ নয়, ভয়ে

পরীক্ষা অর্থাৎ টুকলিফাই

কিংবা তারও বেশি হচ্ছে তাই

এসো, হাত ধরাধরি বনে চলে যাই।

এইভাবে শেকড়-বাকড় ডালপালা/বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

আমার তো যাওয়ার কথা নয় এখন!

যাওয়ার কথা নয়,

কিন্তু মন বলছে—

'যাই?'

মাথায় হাজার ভাবনার ঝুরি নামছে

আর ধাধা মাঠ জুড়ে

দেখতে দেখতে ছড়িয়ে যাচ্ছে

দু'হাতের শুকনো শেকড় বাকড়……

ডালপালা………

আমার তো যাওয়ার কথা নয় এখন!

যাওয়ার কথাই নয়

ঐ মন বলছে—

'যাই,?'

ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র ও রাসেল/অন্নদাশঙ্কর রায়

আমি একজন ব্যক্তি। ব্যক্তি হিসাবেই ভগবানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ব্যক্তি হিসাবেই পাপপুণ্য। স্বর্গনরক। জন্মান্তর। মুক্তি বা নির্বাণ। কর্ম ও কর্মফল। সুতরাং আমার ব্যক্তিসত্তাকে আমি মহামূল্য জ্ঞান করি। আমি যখন মানুষ ছিলুম না তখনও ব্যক্তি ছিলুম। যখন মানুষ থাকব না তখনও ব্যক্তি থাকব। সামাজিক মানুষ হতে গিয়ে আমি আমার ব্যক্তিসত্তাকে বিসর্জন দিতে পারিনে। একে খর্ব করতেও পারিনে। সমাজের কাছে আমি বহুভাবে ঋণী। ঋণশোধ করতে আমি ধর্মত বাধ্য। সামাজিক বাধ্যবাধকতা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমিও তো সমাজের একটি ইউনিট। আমি না থাকলে সমাজও কি থাকে? সমাজেরও কি আমার প্রতি কর্তব্য নেই? ব্যক্তির মূল্য কি সমাজ অস্বীকার করতে পারে? জোটের জোরে বা ভোটের জোরে বা গায়ের জোরে বা দানাপানি বন্ধ করে সমাজ আমাকে জব্দ করতে পারে বইকি। কিন্তু তা দিয়ে সমাজের নৈতিক অধিকার প্রমাণিত হয় না। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে ন্যায়টা ব্যক্তির দিকেই হতে পারে, অন্যায়টা সমাজের দিকেই হতে পারে। ব্যক্তিকে ক্রুশে ঝোলানো হবে, আগুনে পোড়ানো হবে, নির্বাসনে পাঠানো হবে, কিন্তু জিৎ হবে ব্যক্তিরই, যদি ন্যায় থাকে ব্যক্তির দিকে। সমাজ বা রাষ্ট্র নিয়ে আজকের দিনে যে মাতামাতিটা চলেছে আমি এর মধ্যে হারিয়ে যেতে ভয় পাই। যেসব মতবাদ সমষ্টির মঙ্গলের জন্যে ব্যষ্টির বিনষ্টি শ্রেয় মনে করে সেসব মতবাদ আমাকে ভীত করে। নির্ভয়ে আমি কিছু ভাবতে পারব না, বলতে পারব না, লিখতে পারব না, বিশ্বাস করতে পারব না, এরূপ শর্তে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে বিড়ম্বনা। ব্যক্তিকে কীটপতঙ্গের স্তরে নামিয়ে এনে সমাজের বা শ্রেণীর উন্নতি সাধন করা হয়তো মেটিরিয়াল অর্থে সম্ভব। কিন্তু স্পিরিচুয়াল অর্থে নয়। মেটিরিয়ালকে আমি খাটো করতে চাইনে। তা বলে অর্থই পরমার্থ নয়। দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচন হোক। শ্রমিক তার শ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাক। শোষণ দূর হোক। এসব আমারও কাম্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমার কাম্য যে জ্ঞানী গুণী, কবি, শিল্পী প্রভৃতির উপর যেন ফরমাস খাটানো না হয়। আমার লেখা যদি লোকের ভালো না লাগে লোকে পড়বে না। সেইভাবে আমাকে শাস্তি দেওয়া হোক: আমি রাজী। কিন্তু

পরের ইচ্ছামতো লিখতে হবে, নয়তো লিখতেই দেওয়া হবে না, এটা এক প্রকার মৃত্যুদণ্ড। এতে আমার আপত্তি। ডিকটেটরশাসিত রাষ্ট্রে আমার স্থান নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও যে আমি ইচ্ছামতো লিখতে পাব তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। মেজরিটি আমাকে থামিয়ে দিতে পারে। তা হলেও এরকম রাষ্ট্রে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। আমি প্রতিরোধ করতে পারি। ডিকটেটর তো আমাকে প্রতিরোধ করতেও দেবে না। লেখা বন্ধ করে হয়তো নিস্তার পাব, কিন্তু তা হলে আবার লেখক হিসাবে ব্যর্থ বা বন্ধ্যা হব। মার্কসবাদী রাষ্ট্র যে প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরশিপশাসিত একথা জানার পর তাকে আমি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে কেমন করে স্বীকার করব? অন্যান্য ডিকটেটরশাসনের চেয়ে সেটা হয়ত উত্তম, কিন্তু সেটাই কি সর্বোত্তম ব্যবস্থা? আমার মতে প্রাচীন অ্যাথেন্সের গণতন্ত্রই ছিল উৎকৃষ্টতর। যদিও দাসপ্রথার দরুন দূষিত।

গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্র একার্থক নয়। একদিন ধনতন্ত্রের অবসান হবে। কিন্তু তার স্থান পূরণ করবে কে? সমাজতন্ত্র না অন্য কোনো তন্ত্র? এর উত্তর এখনো আমার কাছে স্পষ্ট নয়। আমি শুধু এইটুকুই বুঝি যে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা দরকার। এর থেকে মনে হতে পারে যে আমি গণতন্ত্রের অন্ধ সমর্থক। না, আমি গণতান্ত্রিক জবরদস্তির বিপক্ষে। কোনোখানেই গণতন্ত্র সৈন্য পুলিশ কারাগার বিনা কাজ করতে পারে না। আদালতও সবত্র এমনি একটি অঙ্গ। আইনসভাও আর একটি। এইসব ক্ষমতার অস্ত্র সুপাত্রের হাতে না পড়ে অপাত্র বা কুপাত্রের হাতে পড়লে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করে। গণতন্ত্রের উপর তার অনাস্থা জন্মে যায়। অথচ সে নিজেই এদের হাতে ক্ষমতা সঁপে দেবার জন্যে দায়ী। নির্বাচনে সে নিজেই ভুল করে। নির্বাচন যাতে নিখুঁত হয় এটাও তার দায়িত্বের সামিল। নির্বাচনের পরেও তাকে সবক্ষণ সজাগ থাকতে হবে। সাধারণ নাগরিকের পক্ষে গণতন্ত্রের দৈনন্দিন পরিচালনার খোঁজখবর রাখা সহজ নয়। সে তার জীবিকার ধান্দায় ব্যস্ত। কিন্তু তার প্রতিনিধিদের এটা অবশ্যকর্তব্য। তাঁরা যদি নিজেদের কোলে ঝোল টানার তালে থাকেন তা হলে পরিণাম ভয়াবহ। প্রতিনিধিরাই গণতন্ত্রের রক্ষক। তাঁরাই যদি ভক্ষক হন তবে সাধারণ একদিন বিপ্লবের উপর বরাত দিয়ে একটা দৈব সমাধান খুঁজবে। দৈবে একটা বিপ্লব ঘটেও যেতে পারে। তার পিঠ পিঠ প্রতিবিপ্লব। কোনটা শেষপর্যন্ত জয়ী হবে তা অনিশ্চিত। যাঁরা গান্ধীজীর কাছে শিক্ষালাভ করেছেন

তাঁরা বিপ্লবের উপর বরাত না দিয়ে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হবেন। সত্যাগ্রহ ছেলেখেলা নয়। তাতে দীর্ঘ দুর্ভোগ। হয়তো মৃত্যু। আমার তো ধারণা ছিল ভারত প্রয়োজনের সময় সত্যাগ্রহের পন্থা ধরবে। কিন্তু গান্ধীভক্তরাও আজকাল মার্কসভক্ত হয়ে বিপ্লবের কথা বলছেন। আমার ধারণা ছিল যে ভারতের জনগণ গান্ধীর শিক্ষা ভুলবে না। কিন্তু কবে ভুলে বসে আছে।

গান্ধীজী যে অর্থে নৈরাজ্যবাদী আমিও সেই অর্থে নৈরাজ্যবাদী। কিন্তু হিংসা প্রতিহিংসা যেখানে প্রবল সেখানে রাষ্ট্র নামক একটা সংস্থা না থাকলে নয়। সেইটেই মন্দের ভালো। কী করা যায়! এ জগতে নির্জলা ভালো কোথায়! কিন্তু মানুষ চিরকাল নির্জলা ভালোর স্বপ্ন দেখেছে। তাকেই সে বলে ইউটোপিয়া। যেদিন সে অহিংসার মূল্য বুঝবে সেদিন নৈরাজ্যর দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেবে। নৈরাজ্য কিন্তু অরাজকতা নয়। সেটা হিংসার পথ। সে পথে গেলে রাষ্ট্র কায়েম হবে। আর রাষ্ট্র কখনো সৈন্য পুলিশ প্রভৃতি বাদ দিয়ে চলতে পারে না। গান্ধীজীর "অহিংস রাষ্ট্র" একটা সোনার পাথরবাটি। রাষ্ট্রহীন সমাজ সম্ভব। কিন্তু সৈন্য-পুলিশহীন রাষ্ট্র সম্ভব নয়। তবে সৈন্য-দলের সমান্তরাল ভাবে একদল সত্যাগ্রহী যদি থাকেন তবে তাঁদের প্রভাবেও শান্তিরক্ষা সম্ভবপর। শান্তিসেনা, শান্তি পুলিশ এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হবে। গান্ধীজী একাজ পরবর্তীদের জন্যে রেখে গেছেন। ভারতে তথা সব দেশে। দেশের অধিকাংশ লোক যদি মার্কসের শিষ্য হয় ও বিপ্লব চায় আমি বাধা দেবার কে! একটাই তো মোটে আমার ভোট। আমি নিরস্ত্র। তবে আমার লেখনী কখনো রক্তপাত সমর্থন করবে না। একাজ আমার মূলনীতিবিরুদ্ধ।

সতেরো আঠারো বছর বয়সে আমি গান্ধীজীর প্রভাবে আসি। কিন্তু মূলনীতি হিসাবে অহিংসা ও সত্য মেনে নিলেও ব্রহ্মচর্য মেনে নিতে পারিনে। মানুষকে প্রকৃতি যেমন ক্ষুধাগ্নি দিয়েছে তেমনি দিয়েছে অপর এক অগ্নি। কামাগ্নি। তাকে দমন করতে গেলে সে নানাভাবে প্রতিশোধ নেয়। কায়িক ও মানসিক বিকার ও ব্যাধি ডেকে আনে। তার সাবলিমেশন সকলের সাধ্যায়ত্ত নয়। তার তৃপ্তির জন্যে সামাজিক ও অসামাজিক উভয়বিধ আচার আবহমান কাল প্রচলিত আছে। আমি তাকে প্রেমের সঙ্গে সমন্বিত করার পক্ষপাতী। সম্ভব হলে পরিণয়ের সঙ্গেও। প্রেম, ও কাম পরিণয় ও আমার কাম্য। পরিণয় সম্ভব না হলে প্রেম ও কাম আমার কাম্য। কাম সম্ভব না হলে প্রেমই আমার কাছে

শ্রেয়। প্রেমহীন কাম ভয়াবহ। তবে দু'পক্ষের ইচ্ছা থাকলে ক্ষমাযোগ্য।

প্রায় প্রত্যেকটি পুরাতন সমাজে জাত কুল সম্পত্তি প্রভৃতি মিলে পরিণয় নিয়ন্ত্রণ করে। কাম সেখানে গৌণ। সন্তানমূল্যেই তার মূল্য। আর প্রেম সেখানে উপেক্ষিত বা অবাঞ্ছিত। প্রকৃতি এর প্রতিশোধ নেয়। হৃদয় তিলে তিলে দগ্ধ হয়। মধ্যযুগের মানুষ এর প্রতিকার খুঁজে না পেয়ে হয় বৈরাগী হয়ে যায়, নয় বেশ্যার সঙ্গে মিলিত হয়, নয় রক্ষিতা গ্রহণ করে, নয় পরকীয়ার শরণ নেয়। আধুনিক যুগের মানুষ এর নতুন একটা নিষ্পত্তি চায়। দুই তিন শতক ধরে পশ্চিমে এ নিয়ে গভীর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। এখনো তার শেষ হয়নি। কবে হবে তাও কেউ বলতে পারে না। নারীজাগরণ সমাপ্ত না হলে নারীর ইচ্ছা সমান প্রবল হবে না। অবলার উপর সবলের ইচ্ছা চাপিয়ে দিয়ে সত্যিকারের কোনো সামঞ্জস্য হতে পারে না। প্রেমকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে, যদিও সে বহুক্ষেত্রে অপাত্রে বা কুপাত্রে ন্যস্ত। কামকে তার থেকে বিযুক্ত করতে যাওয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধতা, যদিও বহুক্ষেত্রে অনিষ্টের আশঙ্কা। পরিণয় যদি ভুল জনের সঙ্গে হয়ে থাকে তবে ভুল সংশোধনের পথঘাট খোলা রাখতে হবে। যদি ঠিক জনের সঙ্গে হয়ে থাকে তা হলেও একবয়সে যে ঠিক আরেক বয়সে সে হয়তো ঠিক নয়। পরিবর্তনের প্রয়োজন বিনা দ্বন্দ্বে মেনে নিতে হবে। সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটলে সমাজ সামলে নিতে পারবে, সে শক্তি তার আছে। কিন্তু বিশৃঙ্খলার ভয়ে পরিবর্তনে বাধা দিলে শত শত নরনারীর জীবন ব্যর্থ হবে। সেই ব্যর্থতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে শৃঙ্খলা তার নির্মমতা তাদের চিরকাল সহ্য হবে না। সমাজকে পথ ছেড়ে দিতে হবেই। ধীরে ধীরে নতুন এক শৃঙ্খলার বিবর্তন হবে। প্রেম ও কামকে তাদের যথাযোগ্য স্থান দিলে পরিণয়কেই মানুষ শ্রেয় মনে করবে। বৈরাগী, বেশ্যা, রক্ষিতা, পরকীয়া প্রভৃতির প্রয়োজন ক্ষয় পাবে।

পরিণয়ের সঙ্গে প্রেম ও কামের সমন্বয় ঘটলে তার অপরিহার্য শর্ত পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। বিশ্বাসভঙ্গের পরিণাম পরিণয় ভঙ্গ। বিশ্বাসভঙ্গ কোনো যুগে কোনো দেশেই সমর্থনযোগ্য নয়। সেটা যদি অপর পক্ষের অগোচরে ঘটে থাকে বা অসংযত মুহূর্তে ঘটে থাকে তবে তার জন্যে অনুতাপ করতে হবে, ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, আত্মসংশোধন করতে হবে। নয়তো ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগবে না। সম্পর্কও ভিতরে ভিতরে কেটে যাবে। ট্র্যাজেডিও ঘটতে পারে।

স্বামীর বা স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে দ্বিচারিতা বা বহুচারিতা মানুষের বিচিত্র ইতিহাসে অজ্ঞাত নয়। মহাভারতেই এর নজির রয়েছে। পুরুষের বহুবিবাহ এই সেদিনও হিন্দুসমাজে স্বীকৃত ছিল। এখনো আইন লঙ্ঘন করে বহুক্ষেত্রে ঘটে। নারীর বহুবিবাহও ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে এখনো প্রচলিত। আধুনিক ও আধুনিকারা বলবেন, এর চেয়ে বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ ভালো। প্রাচীনপন্থীরা বলবেন যারা বিবাহবিচ্ছেদ চায় না কেন তাদের বাধা করতে যাওয়া? যাদের পুনর্বিবাহের ইচ্ছা নেই কেন তাদের প্ররোচনা দেওয়া? স্বামী স্ত্রী ও অপর একজন নারী বা পুরুষ মিলে ত্রয়ী রচনা করেছে প্যারিসের শিল্পীদের মধ্যে এর ব্যাপকতা লক্ষ করে টলস্টয় এমন আঘাত পান যে অচিরে প্যারিস ত্যাগ করেন। ফরাসীদের আইনেও সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু বিবাহের পূর্বে যুগলের একত্রবাস তেমন নিন্দনীয় নয়। এ রীতি এখন দেশে দেশে ছড়িয়ে গেছে। এ সেই গান্ধর্ব বিবাহ।

নারটা্ণ্ড রাসেল অপকটে যেসব তথ্য স্বীকার করেছেন অন্যেরা গোপন করেছেন বলেই রাসেলকে মনে হচ্ছে জ্ঞানতপস্বীদের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম। হিন্দু ও গ্রীক পুরাণে দেবতা ও মুনিঋষিদের দুর্বলতার বহু উদাহরণ আছে। প্রকৃতি সাধুসন্তদের চেয়েও বলবান। সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লবী নায়ক-নায়িকাদের ইতিহাসও আমি জানি। যেটা সর্বদেশের সর্বকালের মানবপ্রকৃতি সেটা বিপ্লব ঘটলেই বদলে যায় না। শ্রমিক হলেই কেউ অতিমানব হয় না। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গেও আমার বাল্যাবধি পরিচয়। সোভিয়েট দুটি মহৎ কর্ম করেছে। বেশ্যাবৃত্তি উচ্ছেদ করেছে। অবৈধ সন্তানদেরও সমান বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এইভাবে নারীত্ব ও মাতৃত্বকে সোভিয়েত যে মর্যাদা দিয়েছে এর জন্যে আমি তাকে প্রগতির অগ্রদূত বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন করি। শূদ্রশক্তি ও নারীশক্তি মিলে সোভিয়েটকে অজেয় করেছে তা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তা বলে পাশ্চাত্য দেশগুলিও হেয় নয়। ওরাও অজেয়। ওসব দেশেও রামশক্তি ও রামাশক্তি ক্রমবর্ধমান। বিবর্তন যদি ব্যাহত না হয় তা হলে বিবর্তনের নীট ফল ও বিপ্লবের নীট ফল একই। পশ্চিমের লোক পরিবর্তনবিরোধী নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পরিবর্তনের বেগ আরো দ্রুত। তবে বহু শতাব্দী ধরে যেসব মহামূল্য সামগ্রী তারা সঞ্চয় করেছে সেসব তারা 'অভিজাত' বা 'বুর্জোয়া' বলে হেলায় হারাবে না। রেনেসাঁস এনলাইটেনমেন্ট, লিবারলিজম, ডেমোক্রাসী, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিচারের অধিকার

প্রভৃতি শ্রমিক-কৃষক ও নরনারী নির্বিশেষে সকলের উত্তরাধিকার। তারা এসব প্রশ্নে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। ধরবে তাদেরই শ্রেণীর রাশিয়ান বা চীনাদের বিরুদ্ধে, যদি এসব প্রশ্নে বিরোধ বাধে ও স্বকীয় উত্তরাধিকার হারাবার ভয় থাকে। এমন একদিন আসবে যেদিন রুশদেশের শ্রমিকরাও তাদের শ্রেণীনিরপেক্ষ ইউরোপীয় উত্তরাধিকারের জন্যে পশ্চিমদিকে তাকাবে। আপাতত প্রতিবিপ্লবের ভয়ে তারা ওদিকে তাকাতে চায় না। বিপ্লব যখন সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠ হবে, প্রতিবিপ্লব যখন সুদূরপরাহত হবে তখন আজকের এই দেওয়াল কালকের অতীত হয়ে উঠবে। থীসিস ও অ্যান্টিথীসিস থেকে একদিন সীনথেসিস উঠে আসবে। এটা তো মার্কসেরই ভবিষ্যদ্বাণী।

হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। উর্দু বাংলার দ্বন্দ্ব পাকিস্তানকে করেছে দ্বিখণ্ডিত। এর পরে যদি শ্রেণীসংগ্রাম বাধে তবে দেশ হবে গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত ও বিদীর্ণ। একে আমি নিয়তির লিখন বলে গ্রহণ করতে পারব না। পারি তো নিবারণ করব। নয়তো আমার আপনার শিল্পকর্মের মধ্যে আপনাকে নিবদ্ধ রাখব। বিপ্লব যে ঘটবেই এমন কোনো অবশ্যম্ভাবিতা নেই। ঘটবে না যে, এমন কোনো নিশ্চয়তাও নেই। ফিফটি ফিফটি। ঘটলেও হিংসা ও রক্তপাত যেন অল্পের উপর দিয়ে যায়।

৯ নভেম্বর ১৯৭৭

১১ পৃষ্ঠায় ২৯ লাইনে পড়তে হবে :
প্রেম, কাম ও পরিণয় আমার ত্রয়ী।

মানুষের মন

নারায়ণ চৌধুরী

প্রত্যেক মানুষ তার সাফল্য বা ব্যর্থতার কারণ নিজের স্বভাবের মধ্যেই বহন করে সে নিজেই তার নিজের ভাগ্যের ভাবক। এই কথাটি অযথার্থ মনে হয় না, এবং জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং লোকসমাজের গতিপ্রবাহ লক্ষ্য করলে এটিকে একটি সারসত্যের মর্যাদা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

আমরা সাধারণতঃ ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্যোন্নতি বা ভাগ্যাবনতির জন্ত তার পারি-পার্শ্বিককে দায়ী করে থাকি, বলি যে পরিবেশের আনুকূল্যের জন্তই সে বড় হয়েছে, অথবা পরিবেশের প্রতিকূলতাব জন্তই সে বড় হতে পারেনি। অর্থাৎ কারও জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতাটা তার পারিপার্শ্বিকের ভাল-মন্দের কারণেই মূলতঃ সংঘটিত হয়ে থাকে। যে লোক ধনীর ঘরে জন্মিয়েছে সে সেই ঘটনার কারণেই অন্ত অনেক লোকের উপর দিয়ে প্রাথমিক সুবিধাটুকু বিনাক্লেশে লাভ করে। পক্ষান্তরে দরিদ্রের ঘরে যার জন্ম, তাকে একটা মৌলিক অসুবিধা নিয়েই জীবনারম্ভ করতে হয়—অনেক বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করতে করতে তাকে জীবনের পথে অগ্রসর হতে হয়। সে যদি ধনীর ঘরে জন্মাতো তো অর্থ-কৃচ্ছ্রতাজনিত নানাবিধ পরিহার্য বাধা সম্ভবতঃ তার প্রতিবন্ধকতা করতে পারতো না। সুতরাং পারিপার্শ্বিক বা প্রতিবেশের বাধা একটা মূলগত সত্য, একে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

কথাটা হয়ত ঠিক, কিন্তু আরও একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে পরি-বেশের উপর অতটা গুরুত্ব আরোপ করা বোধহয় উচিত হবে না। কেননা বহিরঙ্গ বিচারে একথা সত্য হলেও অন্তরঙ্গ বিচারে বোধকরি ততটা সত্য নয়। আজকাল বহিরঙ্গ বিচারেরই যুগ, বিশেষতঃ একালীন দ্বান্দ্বিক জড়বাদী দর্শনের ব্যাপক প্রচারের দরুন পরিবেশ বা environmentকে সর্বেসর্বা মনে করার একটা প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়েছে। পরিবেশের প্রভাব নিশ্চয়ই স্বীকার্য, তবে তার চেয়েও বড় প্রভাব বোধকরি মানুষের মন। আমাদের মনই আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু অথবা বড় শত্রু। ইচ্ছা করলে তা আমাদের চরম আনুকূল্য করতে পারে, ইচ্ছা করলে চরম শত্রুতাচরণ করতে পারে। শত্রুতাচরণের প্রসঙ্গে বলতে হয়, বাইরের বাধা অপেক্ষা বহুগুণ প্রবলতর বাধা আমাদের মনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এবং তা আমাদের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন করে থাকে। মনই সর্বশেষ বিচারে মানুষের সাফল্য বা ব্যর্থতার জন্ত মূলতঃ দায়ী—প্রতিবেশকে এজন্ত দায়ী করা বৃথা।

ধনী বা দরিদ্রের রূপকটি নেওয়া যাক। কেউ ধনীর ঘরে জন্মিয়ে হাজারো সুবিধার মধ্যে বড় হয়েও জীবনে কিছু করতে পারে না, তার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, দরিদ্রের ছেলে প্রচণ্ড বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে, কোন কিছু দ্বারাই নির্জিত না হয়ে, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই সংসারে। একজন ধাপে ধাপে নেমে গেছে, প্রাথমিক সুবিধাটা তার

কোন কাজেই লাগেনি ; আর একজন ধাপে ধাপে উঠেছে, প্রাথমিক অসুবিধা-গুলি তাকে মোটেই দমাতে পারেনি। ব্যক্তিভেদে সাফল্য বা ব্যর্থতার এই যে ছক—এটা কিসের কারণে হয় ? মনের কারণে এক এক জন মানুষের এক এক ধরণের মনের বিশেষ গড়নের কারণেই এই রকমটা হয়। অতএব বলতে হয়, চূড়ান্ত বিচারে মনই মানুষের সাফল্য বা ব্যর্থতার আসল হেতু। পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সেই হেতু সন্ধান করতে গেলে বিফল হতে হবে।

যদি বলেন মনের কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই, মন ম্যাটার বা বস্তুর রকম-ফের মাত্র, আর সেই ম্যাটার নিয়ন্ত্রিত হয় পারিপার্শ্বিক সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থার দ্বারা ; তার উত্তরে বলব, একবার যখন ম্যাটার মনে রূপান্তরিত হয় (যদি স্বীকার করেই নেওয়া যায় যে, এই রকমটাই হয়) তখন তার গোত্রবদল হয়, মন তখন তার নিজস্ব নীতি নিয়মের দ্বারা চালিত হয়; সে আর তখন পারি পার্শ্বিকের অনুগত বা বাধ্য থাকে না। মনের ধর্ম বিচার করলে দেখা যায় মনের অদ্ভুত ধারা। তার সবই কেমন যেন কিম্ভূত ও খৈয়ালির পারা। মনের কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই নির্দিষ্ট সূত্রাদির ছকে ফেলে ব্যাখ্যা করা যায় না, ব্যাখ্যা করলেও সে ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ারই কথা। অপার রহস্যের খনি এই মানুষের মন। সে যে কখন কী মুড বা মর্জির অধীন হয়ে চলবে বা কোন্ ধরণের ব্যবহার করবে তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। এমনকি সংশ্লিষ্ট মনের অধিকারী ব্যক্তিটির পক্ষেও তার ধাত বুঝে উঠা কঠিন। মন কখন কী মেজাজে থাকবে তা অনুমান করতে পারলে মানুষের এত দুর্গতি হতো না।

লোকে বলে স্ত্রীচরিত্র দুর্জ্ঞেয়, মানুষের পক্ষে তো বটেই, দেবতাদের পক্ষেও স্ত্রীচরিত্র অনুমান করা নাকি কঠিন। এটি একটি পক্ষপাতমূলক উক্তি। মেয়েদের অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য পুরুষের রচিত এই উক্তি। আসলে সব চরিত্রই সমান দুর্জ্ঞেয়, এর আর স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। স্ত্রী হোক পুরুষ হোক, সব মানুষেই মনের অধিষ্ঠান, আর এই মনই হোলো যত নষ্টের গোড়া। সে যে মানুষের জীবনের চলার পথে কত ছলনার জাল নিপুণ হাতে পেতে রেখেছে তার লেখাজোখা নেই। আর এইজন্য মানুষের দুর্ভোগেরও শেষ নেই।

অবাধ্য এক মন নিয়ে মানুষকে নিত্য চলতে হয়—এমন এক মন, যে তার মালিকের আদৌ বশে নয়, সে তার আপন খেয়াল-খুশী অনুযায়ী চলতেই সদা-

সর্বদা অজ্ঞাত, মালিককে তোয়াক্কা করার প্রয়োজন যে বিন্দুমাত্র অনুভব করে না। মনস্তাত্ত্বিকেরা split personality-র কথা বলে থাকেন শিল্পী সাহিত্যিক কবিরা এই আপনাতে-আপনি-বিভক্ত দ্বৈত ব্যক্তিত্বের নাম দিয়েছেন 'the double'. শেক্সপীয়ারের নাটকে গোটের কাব্যে, ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে এই তথাকথিত দ্বৈত ব্যক্তিত্বের চিত্রণের ছড়াছড়ি। মনই এই ব্যক্তিত্বের বিভাজনের মূলে। মানুষ করতে চায় এক, তাকে দিয়ে কে যেন আরেক কাজ করিয়ে নেয়। সে ভাবতে চায় এক ভাবনা, কে যেন অলক্ষ্যে থেকে তাকে দিয়ে জোর করে অন্য ভাবনা, এমনকি বিপরীত ভাবনা, ভাবিয়ে নেয়। সে যে-চিন্তাটাকে অবাঞ্ছনীয় জ্ঞানে মন থেকে সজোরে ঝেড়ে ফেলতে চায়, সেই চিন্তাটা সেই কারণেই যেন আরও বেশি করে তার মনের উপর জাঁকিয়ে বসে। এ মনের এক বিচিত্র স্বভাব যে, যে ভাবনাটাকে দূর করবার জন্য প্রযত্নের অন্ত নেই, সেই অবাঞ্ছিত ভাবনাটা সেই প্রযত্নের কারণেই যেন বেশি করে মনের মধ্যে আসন গেড়ে বসতে চায়। এ রকম কেন হয় বলা কঠিন কিন্তু এই রকমটাই হয়, এ-ই মানুষের পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড মনের এই অদ্ভুত ব্যবহারের একটা কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি মনের সকল প্রকার অসঙ্গতি, বৈসাদৃশ্য স্ববিরোধের কারণ শৈশবের যৌনতার সংস্কারের মধ্যে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানবীয় ব্যবহারের তাবৎ অদ্ভুতত্বেরই মীমাংসা খুঁজেছেন তিনি যৌনতার মধ্যে। ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান মনের তত্ত্ব তথা স্বপ্নতত্ত্ব এই বিচারেরই ফল। (প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, আজকাল আর এই মত পূর্বের মত নির্বিরোধে অথবা তেমন ব্যাপকভাবে গৃহীত নয়। ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানের তত্ত্বকে খণ্ডন করে দেখা দিয়েছে ওয়াটসন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের ব্যবহারবাদ এবং পাভলভ প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের Conditioned Reflex তত্ত্ব। কিন্তু এই শেষোক্ত দুই মতেরই ঝোঁক পরিবেশের প্রাধান্যের প্রতি মানুষের মনের উপর সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার প্রভাব যে অতিশয় দূরপ্রসারী ও সবিশেষ, সেই ভাবটাই এই দুই মতের ভিতর সমধিক অগ্রাধিকার লাভ করেছে।)

নির্জ্ঞানে বা স্বপ্নে মন আপনার মর্জি মাফিক চলে, তা যেন হলো, কিন্তু নির্জ্ঞানে আর স্বপ্নেই কি শুধু মনের এই অদ্ভুত ব্যবহার? সম্পূর্ণ জাগ্রৎ অবস্থায়ও কি মন মনের মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে না? হামেশাই করে থাকে। প্রত্যেকেই যে যার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এবং অন্যান্যদের

সাক্ষ্য থেকে, শিল্প-সাহিত্যের নজির থেকে, এর ভূরিভূরি প্রমাণ দাখিল করতে পারেন। মন কখনও কোন সময়েই মানুষের পূর্ণ বশ নয়—তার ভিতর মর্কট-বৃত্তি মজ্জাগত, সে সর্বদাই দোলাচল, অস্থিরস্বভাব : এক জায়গায় বেশিক্ষণ স্থির হয়ে থাকা মনের ধর্ম নয়, ছুটোছুটি করে বেড়াবেই। যোগীদের কথা অবশ্য আলাদা, মন তাঁদের পরিপূর্ণ স্ব-বশ এইরূপ শুনে থাকি ; কিন্তু সাংসারিক মানুষের মন অনুক্ষণ ছটফট করে বেড়াচ্ছে। আর শুধু ছটফট করা নয়, নিজেই নিজের বিপরীতাচরণ করছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জাগ্রত অবস্থায় মানবীয় মনের কয়েকটি অদ্ভুত ব্যবহারের নমুনা লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। নমুনাগুলি প্রণালীবদ্ধ ভাবে সাজানো নয়, এখান থেকে সেখান থেকে নেওয়া, ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত আচরণের উদাহরণ রূপে গৃহীত।

ধরুন কোন প্রেমিক তার প্রেমিকার সঙ্গে এক নিভৃত স্থানে মিলিত হয়েছে। প্রেম নিবেদনের আবেগঘন মুহূর্তে প্রেমিক প্রেমিকাকে জড়িয়ে তার ওষ্ঠে চুম্বনরেখা অঙ্কন করতে উদ্যত। প্রেমিক উত্তেজনায় কাঁপছে, প্রেমিকার দেহলতা বিস্রস্ত ও শিথিল—প্রেমিক যেমনি ভালবাসার আবেশে প্রেমিকার থরথর-করা ঠোঁটে চুমু খেতে যাবে, অমনি তার চোখে ভেসে উঠল মেয়েটির ঠোঁটের ওপরকার সুস্পষ্ট গোঁফের রেখা, আর তার আবেগ একটা মস্ত বড় ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে চাইল। প্রেমিক যতই মেয়েটির গোঁফের রেখার দিকে না তাকিয়ে ওষ্ঠ-মিলনে আপ্লুত হতে চাইলো ততই সজ্ঞান ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার চোখ বার বার সেদিকে নিবদ্ধ হয়ে তার আবেগকে মাটি করে দেবার উপক্রম করলে। ছেলেটি সেদিকে চাইবে না বলে যতই বদ্ধপরিকর হয় ততই তার দৃষ্টি সেদিকে তীরের মত ধেয়ে যেতে থাকে। ফলে মধুর অনুভবের সঙ্গে বিসদৃশ অনুভবের সংঘাতে আবেগ ফিকে হয়ে যায়, চুমু খাওয়া আর হয়ে ওঠে না, হলেও তাতে কোন রস থাকে না। রসকষহীন অবস্থায় দেহালিঙ্গন পোড়াকাঠকে জড়িয়ে ধরার অনুভব বয়ে আনে।

কিংবা ধরা যাক, মা সদ্যমৃত বালক সন্তানের শোকে উদ্‌ভ্রান্তা, বিহ্বলা—আলুথালু বেশে ধুলোয় লুটিয়ে কাঁদছে। কেউ তাকে ধরে রাখতে পারছে না, শোকের প্রবল উৎক্ষেপে বার বার তার মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হচ্ছে। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে দরদর ধারে জলের ধারা। ধুলোয় কাদায় ভেজা কাপড় আর ভেজা চুলে মিশিয়ে সে এক অপরূপ মুহ্যমানা মাতৃমূর্তি। ক্রন্দনরত

অবস্থায় ছেলের গুণ-গ্রামের ফিরিস্তি একে একে দাখিল করে চলেছে পাঁচালীর সুরে। কিন্তু হঠাৎ, কেন জানিনা কী কারণে মায়ের মনে পড়লো—আর এই মনে পড়াটাই মনের অবাধ্যতার নিদর্শন—ছেলে তার আচার খেতে খুব ভালবাসতো। আচারের জন্য মাকে কতদিন জ্বালাতন করেছে তার ইয়ত্তা নেই। মায়ের এই দ্রব্যটির প্রতি কিছু বিশেষ দুর্বলতা ছিল—সব মেয়েদেরই থাকে—, সুতরাং ছেলের ইচ্ছা আর মায়ের ইচ্ছার পূর্ণ সমীকরণে এই বিশেষ দ্রব্যটির ক্ষেত্রে ছেলের আবদার পূরণে কখনও বাধা হয়নি। কিন্তু এই গভীর শোকের মুহূর্তেও সে কথা মনে হয় কেন? আর মনে যদি হলো তো সন্তান হারানোর বেদনার অপরিসীম কারুণ্যের মধ্যেই মায়ের জিভে লালাক্ষরণ হয় কেন? শোক-ব্যাকুলতার আতিশয্যে চোখে অঝোরধারে জল ঝরাটাই নিয়ম, কিন্তু জিভে জল ঝরবে কেন? আর ঝরলোই যদি তো দুটো জল একই সঙ্গে ঝরলো কেন?

কিন্তু পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা এই যে, কখনও কখনও দুটোই এক সঙ্গে ঝরে। মনের অবাধ্যতার জন্যই এ রকমটা হয়। দুটো বিসদৃশ অবস্থার সহাবস্থানের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই—সেটা সম্পূর্ণ মনের খেয়ালের উপর নির্ভর করে। আর মনের খেয়ালিপনার যে অন্ত নেই তা আমরা নিত্যই আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করছি।

কিংবা ধরা যাক, অতি মজ্জাগত সৎ ব্যক্তির জীবনেও কখনও কখনও নিজের অজান্তে, অথবা নিজের জাগ্রত ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে, চৌর্য ভাবনা জাগে। ঠাট্টা নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তরুণ প্রজন্মের একজন খ্যাতনামা লেখক পাভলভ ইনস্টিটিউটের আয়োজিত 'বিচ্ছিন্নতা' বিষয়ক এক আলোচনা-চক্রে প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর জীবনে একবার এক বিশেষ পরিস্থিতিতে এই অনিচ্ছাকৃত চৌর্য ভাবনার উদয় হয়েছিল কিন্তু উদয় হতেই তা আবার পরক্ষণে মিলিয়ে যায়। লেখকের এই স্বীকারোক্তিতে তাঁর অকপটতাই শুধু সূচিত হয়নি তাঁর চরিত্রের বলিষ্ঠতাও সূচিত হয়েছে। তার জন্য তাঁকে আমার অভিনন্দন জানাই। এটা শুধু তাঁরই একার অভিজ্ঞতা মনে করবার কোন কারণ নেই, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন চৌর্য ভাবনা অবাধ্য মনের একটা ষড়যন্ত্রবিশেষ এবং জাগ্রত মনের সৎ ইচ্ছাকে বিফল করবার জন্য নিজ্ঞান মনের সূক্ষ্ম এক কৌশল। কিন্তু সৎ মানুষের বেলায় সেটা শুধু ভাবনাতেই পর্যবসিত, কাজে রূপান্তরিত করার কোন

প্রশ্নই ওঠে না।

আমাকে যদি কোন নাবালকের অনুকূলে অনেক টাকার অছি নিযুক্ত করা হয় আর সেই টাকার বিলি-ব্যবস্থার আমিই একমাত্র নিয়ামক হই, সেই ক্ষেত্রে আমার জাগ্রত ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে খেয়ালী মন আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে এই রকম একটা অসাধু প্রস্তাব রাখতে পারে যে টাকাটা আত্মসাৎ করলে কে আর দেখছে, সুতরাং কেনই না টাকাটা আত্মসাৎ করি। কিন্তু সত্যি সত্যি এরূপ অবস্থায় টাকাটা আপনি বা আমি আত্মসাৎ করি না, শুধু ওই চিন্তাটা ক্ষণিকের জন্য একটা 'ব্রেন-ওয়েভ' রূপে দেখা দিয়েই পরক্ষণে মিলিয়ে যায়। ভাবনা আর ভাবনার রূপায়ণের মধ্যে সহস্র যোজনের পার্থক্য। আর এই পার্থক্যের দ্বারাই সাধু আর পাপীর পার্থক্য নিরূপিত হয়। নয়তো চিন্তার জগতে সাধু আর ক্রিমিনালে কণামাত্র তফাৎ।

এই যে ব্রেন-ওয়েভের কথা বললাম এটা কি দুষ্ট মনের কারসাজি? দুর্বল মনের কুমন্ত্রণা। আমি কিন্তু এই মনের ক্রিয়াকে দুষ্টও বলব না, দুর্বলও বলব না; বলব মনের এই রকমেরই স্বভাব। দোলাচলবৃত্তি তার মজ্জায় নিহিত। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত মানুষের মন একবার ভাবনার এই প্রান্তে দোল খাচ্ছে তো পর মুহূর্তে ওই প্রান্তে দোল খাচ্ছে। স্থিরতা তার অনায়ত্ত। সামাজিক পরিবেশের জন্য মনের এই স্বভাব নয়, তবে সামাজিক পরিবেশের জন্য মানসিক অস্থিরতা বাড়ে, সে কথা স্বীকার্য। যে ব্যক্তি মনের এই স্বভাবধর্ম অবগত হয়ে তাকে বশ করতে সমর্থ হয়, সেই জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়। আর যে ব্যক্তি মনের এই খেয়ালাপনার কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে এগোবার চেষ্টা করে তার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, সে জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়। এ ক্ষেত্রে সচ্ছলতা বা দারিদ্র্যের প্রশ্ন অবান্তর। বাইরের পরিবেশের দ্বারা জয় পরাজয় নিয়ন্ত্রিত হয় না, জয়-পরাজয় মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয় স্বভাবের ভিতরের বাধা জয় করার শক্তির তারতম্যের দ্বারা। মনকে জয় করার শক্তিতেই মানুষের জয়।

এইজন্যই আমাদের দেশের ঋষিরা মনজয়ের উপর এত জোর দিয়েছেন। একালীন ঋষি শ্রীঅরবিন্দ তো মনকে সুস্থির করবার অবশ্য প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কত যে লিখেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। সর্বাবস্থায় মনকে অবিক্ষুব্ধ ও শান্ত রাখ - এই শ্রীঅরবিন্দের বাণী। আমরা একালীন মানুষেরা সামূহিক দর্শনের প্রভাবের বশে প্রায়ই সমষ্টির উন্নয়নের কথা বলি, কিন্তু তার আগে

ব্যক্তি মনের যে উন্নয়ন দরকার, শোধন দরকার—সে কথাটা তেমন জোর দিয়ে বলি না। ব্যক্তি মনকে চঞ্চল ও সদা-অশান্ত রেখে সমষ্টির কল্যাণের চেষ্টা ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার চেষ্টার মতই অকার্যকর হতে বাধ্য।

মনের দোলাচল স্বভাব নানা ছদ্মবেশ ধরে মানুষকে প্রতারিত করে থাকে। তার ছলনার অন্ত নেই। ই, এম, ফর্স্টার তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'A Passeg to India'তে দেখিয়েছেন কেমন করে মন ছলনার জাল বিস্তার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। কখনও কখনও এই ছলনাকে echo বা প্রতিধ্বনির আকার ধারণ করতে দেখা যায়। মিসেস মুর ও মিস কোয়েস্টেড (অ্যাডেলা) 'মারাবার গুহাবলী'তে বেড়াতে গিয়ে এই প্রতিধ্বনির কুহকে পড়েছিলেন। তার ফলে একজনার ঘটলো মৃত্যু, অন্যজনার চরম বিপর্যয়। আসলে এই প্রতিধ্বনি মনের বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। সেটা বইটিতে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে।

শেক্সপীয়ার বলেছেন, 'The fault is not in our stars but in ourselves' কথাটা সর্বৈব সত্য। আমরা যে আমাদের নিয়তি আমাদের নিজেদের মধ্যে বহন করি, বাইরের পারিপার্শিক বা গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগ আমাদের নিয়তির বিধায়ক নয়—এই ভাবটি সবচেয়ে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে গ্রীক 'নেমেসিস' তত্ত্বে। প্রাচীন গ্রীক নাটক প্রায়শঃ ট্রাজিডির মূলকথা হলো—নাট্যবর্ণিত নায়ক বা নায়িকা তার নিজ জীবনের ব্যর্থতার বীজ তার নিজের মধ্যেই বহন করছে। অর্থাৎ মানুষের মনই মানুষের সাফল্য বা ব্যর্থতার প্রকৃত লীলাভূমি।

গুজরাটী গল্প

আরও নেশা কর

রচনা—ইন্দ্রবসাবড়া   অনুবাদ—বোম্মানা বিশ্বনাথম্

গোধূলিবেলার লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষেতে। সেই ধরণের লাল রঙই ছিল ঘোড়ার চোখেও। মদের নেশায় মত্ত হয়ে এলোপাতাড়ি পা ফেলতে

ফেলতে চলেছে সে। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই স্ত্রীর উপর হোটপাট মেলাতে শুরু করে। 'এই শালা!'

'কি হল?' রুটি বানাতে বানাতে সে বলে।

'বলি হারামজাদি শুনতে পাচ্ছিস কি না? বলি কানে কি আজকাল তুলো গুঁজেছিস নাকি? আরে এই কালা মাগি?'

'অত চেঁচাচ্ছ কেন, বাবু শুনতে পাবে যে।'

'চুলোয় যাক তোর বাবু! তোর বাবুর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? নে বিছানাটা পাত।'

'একটু জিরিয়ে নাও না, তারপর......'

'জিরোবে তোর বাবা। তাড়াতাড়ি যা বলছি তাই কর। না হলে হাড় গুঁড়ো করে দেব।'

'কি সব যা-তা কথা বলছ।'

'যা-তা আবার কিসের রে হারামজাদী,' কথাটা শেষ না করেই মোত্যা বউকে এক লাথি মারে। ঠিক সেই ঠিক সেই মুহূর্তে মোত্যার ছেলে লাল্লী ঘরে ঢুকে চিৎকার করে বলে, 'বাবা!'

'কি?'

'বাবু ডাকছেন।'

'কোন বাবুরে?' মোত্যা মদের নেশায় বলে। 'শালা বাবাকে বুদ্ধু বানাচ্ছিস। যা যা পালা এখান থেকে।' বলে মোত্যা দু চারটে চড়-চাপড় কষিয়ে দেয় লাল্লীর গালে।

এদিকে তার বউ চিৎকার করে ডাক দিচ্ছে, 'ওগো কে আছ গো! আমার ছেলেটাকে মিনসেটা মেরে ফেলল গো!'

'শালি হারামজাদী, আবার চেল্লাচ্ছিস। চারদিক থেকে লোক ডেকে জমাতে চাস। নে ডাক এবার তোর লোকজনদের।' আরো চটে গিয়ে একের পর এক গালাগাল দিতে দিতে ভেতরে গিয়ে একটা পুরোনো তলোয়ার পেড়ে আনে। বউএর সামনে গিয়ে বলে, 'মেরে ফেলব হারামজাদীকে, হ্যাঁ! সাফ সাফ বলে দিচ্ছি!'

ঠিক সেই সময় ঘরের বাইরে থেকে ডাক আসে, 'মোত্যা, আরে ও মোত্যা!'

'আজ্ঞে বাবু' বলে মোত্যা তলোয়ার হাতে নিয়েই বাইরে আসে। কিন্তু

বাবুকে দেখে মোত্যা একেবারে থ' মেরে যায়। তার নেশা যেন উবে গেল।

'আ-জ্ঞে-বাবু' বলার সময় তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যায়।

'শালা শুয়োরের বাচ্চা মদ খেয়ে ঘরে বদমাইসী করছিস !'

তখনই মোত্যাদের জমাদার এগিয়ে এসে বলে, 'বাবু ব্যাটাকে লাগাব নাকি—দু'চার জুতো ?'

'লাগা !' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জমাদারের পায়ের জুতো মোত্যার গায়ে সমানে বর্ষিত হয়।

মোত্যা 'আজ্ঞে হুজুর' বলতে বলতে জুতো খেতে থাকে।

ভাঙাচোরা খাটিয়ার তলায় মোত্যার বউ মেথী গর্ভযন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে। মা-গো-বাবা-গো বলে সেও এক নাগাড়ে চিল্লিয়ে যাচ্ছে। বাইরে নিম গাছের ছায়ায় বসে সে বাঁশ কাটছিল। কিছুক্ষণ পরে বলে, 'শালী ঢং করছে ঢং। আরে এই, মিছি মিছি চেল্লাচ্ছিস কেন ?

এই কথায় মেথীর মনে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল না, সে কাতরাচ্ছেই।

মোত্যার মন বাঁশ কাটায় নিবিষ্ট ছিল না। সে ভাবছে মদ খায়নি কত দিন হয়ে গেল। আজ অনেকদিন ধরে দু'চার ফোঁটাও মদ মুখে পড়েনি। সেই রাতের পর থেকে ছেড়ে দিয়েছি। ... না, এখন আর না খেলে চলবে না ! মনের বিরুদ্ধে আর কতক্ষণ সংগ্রাম করা যায় ! সেদিন জমাদার মারার চোটে আধমরা করে তুলেছিল তাকে। তার ভয়েই তো মদ খাই না। কিন্তু আর থাকা যাচ্ছে না। ও রকম বোকামী আর করব না। মদ খাব তো লোকে জানবে কি করে ? দু'চার ফোঁটা মদ খাব কেউ জানতে পারবে না। আজ মাইনে পেলে কয়েক গণ্ডা পয়সার মদ তো খাবোই।

'মোত্যা' ?

'আজ্ঞে !'

'আরে বাঁশ কেটেছিস ?'

'আজ্ঞে হাঁ। বাবু।'

'কটা বাঁশ কেটেছিস ?'

'আজ্ঞে একশোটা বাবু।'

'শুধু একশোটা ! গাধা কোথাকার? তোকে দু'শোটা বাঁশ কেটে আনতে বলেছি না?'

'আ-জ্ঞে হুজুর !'

'শালা শুয়োর কোথাকার। খালি হুজুর হুজুর করবে। যা এক্ষুনি। বাকী বাঁশগুলো কেটে নিয়ে আয়। নৈলে মাইনে কানাকড়িও পাবি না।'

'আজ্ঞে এক্ষুনি যাচ্ছি হুজুর।' বলে মোত্তা ঘরের ভিতরে ঢোকে।

'আরে ঐ !' বউকে ডাক দেয়।

'মা গো !'

'গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দে তো !'

'আট গণ্ডা পয়সা ! কোথায় পাব ?

'জাহান্নাম থেকে পাবি; আমাকে কি জিজ্ঞেস করছিস। দৈ দিবি কি না?'

'ও: মা গো। অত পয়সা নিয়ে কি করবে?,

'নির্লজ্জ কোথাকার। জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছে না।'

'চাইছ দিচ্ছি। তবে দেখ দয়া করে মদ-টদ খেয়ো না।'

'ঢের হয়েছে। বুঝেছি। দে-তাড়াতাড়ি দে পয়সা।'

'ঐ কোণে একটি ছোট ভাঁড় আছে। তাতেই আছে পয়সাগুলো, নিয়ে নাও.........আর দেখ বেশি দেরি করো না........ আমার অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ।'

'অত ঢং করে আর বলতে হবে না। যাব আর আসব। হয়েছে?'

কথা শেষ করেই আধুলিটা নিয়ে মাথায় ছেঁড়া একটা পাগড়ি জড়িয়ে. গায়ে একটা তাপ্পি দেওয়া জামা পরে পেঁয়াজের পুঁটলি এবং একটা কুড়োল নিয়ে গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

নদীর ধারে ভেলু কালালের (মদ বা তাড়ি বিক্রেতার পদবী হল কালাল) দোকান ছিল। মোত্যাকে দেখেই সে ডাক দিয়ে বলে, 'নমস্কার মোত্যা ভাই, কি ব্যাপার? আরে এসোনা এদিকে একবার!'

'নমস্কার, ভালতো?'

'আরে যাচ্ছো কোথায়?'

'যাচ্ছি কোথায়? যাচ্ছি বাবুর জন্যে বাঁশ কাটতে।'

'যাচ্ছই যখন একটু মদ-টদ খেয়ে যাও।'

'না রে ভাই, মদ ছেড়ে দিয়েছি। মদ আর খাব না।'

'ওসব ঢং ছাড়। আমার দিব্যি চলে এস।'

'কিন্তু ভাই, আমার এখন পয়সা-টয়সা নেই বলে দিচ্ছি।'

'আরে তুই কি আমার পয়সা মেরে দিয়ে পালাবি।'

ভেলু একটা জংধরা মগে করে কিছুটা মদ মোত্তাকে দেয়।

মোত্তা খেয়ে নেয়।

'আরও খা মোত্তা!'

'বাঃ বেশ লাগছে তো!' মোত্তা ঠোঁট চাটতে চাটতে বলে।

'লাগবে না—এটা যে খাঁটি মদ।'

'তা দে-না এক বোতল ভরে।'

'এক বোতল কেন? বল না দু'বোতল দিচ্ছি।'

'না না দুটো নয়। একটাই থাক আপাতত।'

'নাও।'

মদের বোতল পুঁটলিতে রেখে মোত্তা গাঁ থেকে দু'মাইল দূরের এক বাঁশ ঝাড়ের দিকে এগোয়।

শীতের দিন। ঠাণ্ডা পড়ছে। সাড়ে নটা হয়ে আসছে সকাল। সোনালী আলোকচ্ছটা পড়ছে গমের শীষে। চারদিকে সবুজের মেলা দেখে মোত্তার মন আনন্দে নেচে ওঠে। পথ চলতে চলতে চিন্তা করে অতীতের একটি দিনের কথা। গ্রীষ্মের একটি জ্যোৎস্না রাত! মোত্তা পাড়ায় বসে আছে। পাড়ার লোক চন্দুর বিয়ের ধুমধামে ব্যস্ত। এক কোণে মেয়েরা নাচছে। কেউ কেউ আবার গান গাইছে, ঢোল বাজাচ্ছে। তাদের ঢাক ঢোল বাজছে আর কয়েকজন মদ খেতে খেতে মজা দেখছে।

মোত্তার দৃষ্টি পড়ে তাদের মধ্যে একটি মেয়ের উপর। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার সৌন্দর্যকে আকণ্ঠ পান করার ইচ্ছা নিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। চোখে চোখ পড়ার পর মোত্তার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নাচতে থাকে ঐ মেয়েটি। নাম মেণী।

মধ্য রাত্রে বিয়ের সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে ঠিক সেই সময় ইঙ্গিতপূর্ণ একটা দৃষ্টি হেনে একটা ছোট্ট পাথর মেণীর উপর ছোঁড়ে। মেণী বেরোয়। দু'জনে নিলে দূরে চলে যায় কিছুক্ষণের জন্য।

তারপর তাদের দুজনের মধ্যে বহুবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। অদূরে একটা বাগিচা ছিল। মোত্যা সেটা পরিষ্কার করতে গিয়েছিল। বাবু বিশেষ করে এ কাজ তার ঘাড়েই চাপিয়ে দেয়। দুপুরে কাজ শেষ করে সে ফিরছিল। সেই সময় পেছনের থেকে কে যেন এসে তার চোখ বুজিয়ে দেয়। 'কে?' বলে জিজ্ঞাসা করতে সে হেসে ফেলে। সে আর কেউ নয়, মেথী। মোত্যা তাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করেছিল 'মেথী?'

'কি?'

'আমাকে বিয়ে করবি?'

'বলব?' মেথী জিজ্ঞাসা করে।

'কি?'

'বিয়ে করতে পারি। তবে দুটো শর্তে।'

'বল।'

'পরস্ত্রীকে মায়ের সমান মনে করবি। আর মদ খাবি না।'

'বেশ, রাজি।'

তারপর তাদের বিয়ে হয়।

বিয়ের পর আট বছর পর্যন্ত সে মদের নাম করেনি। কিন্তু সেদিন নন্দু চৌধুরীর বরযাত্রীতে বন্ধু বান্ধবেরা জোর করে তাকে মদ খাইয়ে দেয়। আর সেদিন থেকেই আবার পুরোন অভ্যাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দিনের পর দিন সে মদ খেতে লাগল। দিন কয়েক মেথীকে জানতে দেয়নি। কিন্তু কত দিন আর এ সব বউয়ের কাছে লুকোন যায়। মেথী যেদিন থেকে জানতে পারে সে দিন থেকে সুখী পরিবারে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হয়। প্রত্যেকদিন প্রেম বিনিময়ের পরিবর্তে হত ঝগড়াঝাঁটি।

রাত্রে মোত্যা মদ খেয়ে ঘরে ফিরতো। প্রত্যেকদিন বউ তাকে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করত। তার শর্তের কথা স্মরণ করাত। আর প্রত্যেকদিন মোত্যা ক্ষমা চাইত। মেজাজ বিগড়ে থাকলে মারত। কিন্তু পরের দিনই আবার শুঁড়ির দোকানে ছুটে যেত। আগের রাত্রের সব কথা ভুলে যেত। সব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত।

দিন কয়েক হল ঘরেও আসছে না ঠিক মতো। অনেক রাতে টলতে টলতে আসে।

পথ চলতে চলতে এই সব দৃশ্য মোত্যার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

এখন সে বাঁশ ঝাড়ের নীচে বসে বোতলের ছিপি খুলে দু'চার ঢোঁক গিলে আবার ছিপি এঁটে রেখে বাঁশ কাটতে শুরু করে। তিন ঘণ্টা বাঁশ কাটার পর আবার পুঁটলি খুলে পিঁয়াজ বের করে খেতে খেতে বোতলের বাকি মদ শেষ করে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে আবার বাঁশ কাটতে শুরু করে। একশ'টা বাঁশ কাটা চাট্টিখানি কথা নয়। বাবুত অর্ডার দিয়েই খালাস। নিজেকে ত আর একটাও কাটতে হয় না। কাটতে হলে বুঝত কত ধানে কত চাল হয়। ব্যাস। একবার ঘরে বসে হুকুম করে দিল 'মোত্যা, একশো বাঁশ কেটে আন!' মালিক এসেছেন বাঁশ কেটে নিয়ে যেতে হবে।

বিকেল পাঁচটা বাজে। তার মাথা ঘুরতে থাকে। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। মাথায় বাঁশের বোঝা চাপিয়ে গাঁয়ের দিকে এগোয়। ভেলুর দোকানের সামনে আসতেই আবার তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাঁশের বোঝা নীচে ফেলে বিড় বিড় করে বলে, 'উঃ! দম বেরিয়ে গেছে। ব্যাটারা নিজেরা পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকে আর আমাদের জানোয়ারের মত খাটায়। হুকুম চালায় এটা কর, ...ওটা এক্ষুনি কর ....ব্যাটারা নির্বংশ হোক।'

'মোত্যা যে?'

'নমস্কার, ভেলুভাই।'

'বাঁশ কেটে এনেছ যে?'

'হ্যাঁ এনেছি।'

'চলবে নাকি কিছুটা। গায়ের ব্যথা কমে যেত।'

'আরে সেই জন্যেইতো ভগবান এই মদ সৃষ্টি করেছেন।'

'কিন্তু, মোত্যা ভাই, আগেরও কিছু পয়সা পাব। মনে আছে তো?'

'আমার বেশ মনে আছে। দেখ ভেলু, আমার নাম মোত্যা! তোর কানাকড়িও কোনদিন মারব না। মাইরি বলছি আমার মেয়ের দিব্যি। তোর সব পয়সা কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেব।'

'নে নে, ধর। এর জন্যে আবার বউয়ের নামে দিব্যি খেতে হবে না।'

'তা হলে দে ভাই। শুভ কাজে দেরি করতে নেই।'

'কতটা দেব, এখন পকেটে কিছু আছে?'

'দে না আট আনা। তুই টাকা পয়সার কথা কি জিজ্ঞেস করছিস। টাকা

পয়সার অভাব কিসের। নে ভরে দে বোতলটা।' বোতল নিয়ে মোত্তা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নেয়। বেশ রাত হয়েছে।* ঠাণ্ডাও পড়েছে।

'বাঁশ কার জন্ম নিয়ে যাচ্ছিস ?'

'আরে তুই অত বাঁশ বাঁশ করছিস ?' চড়া সুরে বলে ওঠে, 'কটা বাঁশ চাস তাই বল না। নিয়ে যা যে কটা চাস। যা নিয়ে যা।'

'কিন্তু তোর মালিক কে ?' ...

'আরে ধুৎতোর মালিকের নিকুচি করেছে। নিয়ে যা না যে কটা দরকার। যা নিয়ে যা।' বাঁশগুলোকে ঐ খানেই ফেলে দিয়ে মোত্তা বক্ বক্ করতে ঘরের দিকে এগোয়। রাত নটা বাজে। টলতে টলতে সে ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকতেই দেখে অন্ধকার। প্রদীপ তখনও ধরান হয়নি! উনোনেও আগুন নেই। মেয়ী ভাঙা খাটিয়ায় শুয়ে চেল্লাচ্ছে। নেশার ঘোরে মোত্তা মনে করে বউ নিশ্চয় ঢং করছে। মনে মনে বলে, আজ এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে ঢং ভুলে যায়।

'আরে এই !'

'মা গো।'

'আবার মাগো কিসের! দেখতে পাচ্ছিস না। এখন আর শুনতে পাবে কেন! কোই ওঠ - আমার খুব খিদে পেয়েছে।'

'খিদে আর খিদে, বলি চোখ কি তোমার আছে না গেছে। দেখতে পাচ্ছ না আমার অবস্থা ?...... আজও আবার মদ খেয়ে আসা হয়েছে, দেখছি —।'

'মদ ? হাঁ, মদ তো খেয়েছি। মদ আমি আলবৎ খেয়েছি! আরো মদ খাব। তোর যা ইচ্ছে করতে পারিস। কোথাকার কে এসেছে আমাকে উপদেশ দিতে। মদ...... হাঁ, মদ আমি নিশ্চয় খাব। তুই বাধা দেবার কে! নে ওঠ কোই উঠছিস কি না।'

'ও মাগো! আমার যে ওঠার কোন শক্তি নেই।'

'শক্তি নেই। দাঁড়াও এখন দেখাচ্ছি তোমার শক্তি আছে কি না!'

কথাটা শেষ করতে না করতেই বউয়ের খাটের কাছে গিয়ে তার চুলের ঝুঁটি ধরে টানে।

'ও মাগো—ওগো তোমার পায়ে পড়ি—।'

'কোই উঠবি কিনা শুনতে চাই ?'

'মা-গো।'

'দেখ তবে।' বলেই মোত্যা তার পেটে টেনে কয়েকটি লাথি মারে আর বলে, 'কোই উঠবি, না আর একটা লাগাতে হবে?'

লাথি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে সে তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায়।

'বাবা!' ঠিক সেই সময় তার ছেলে লাল্লী ছুটে ঘরে ঢুকে বলে, 'বাবা মার শরীর খারাপ। অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে খুঁজছি।'

'ওঃ! ব্যাটা আবার মার পক্ষে ওকালতি করতে এসেছে। হারামজাদা। বেরো এখান থেকে। বেরো আমার ঘর থেকে।' বলেই মোত্যা নিজের পুরোন তলোয়ার তুলে তাকে তাড়া করে। লাল্লী ভীষণ ভয় পেয়ে বাবারে মারে চিৎকার করে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে লোক জমা করতে।

এদিকে মোত্যা তলোয়ার উঁচিয়ে বউএর দিকে ঘুরল আর অন্যদিকে লাল্লী বাবুর কাছে গিয়ে বলে, 'বাবু বাঁচান, মরে যাব। সবাই মরে যাব। বাবা……।'

'কি হয়েছে?' বাবু জিজ্ঞাসা করেন।

'ছুটে আসুন। ছুটে আসুন বাবু। বাবা তলোয়ার দিয়ে মাকে মারছে—মাকে একেবারে শেষ করে ফেলল, বাবু।' বলে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল।

এদিকে মোত্যা তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে চারদিকে ঘুরছে আর বিড় বিড় করে বলছে, 'এক্ষুনি কেটে ফেলব হারামজাদীকে। শালী আমার সঙ্গে ঢং করছে, ঢং। বেটী জানে না আমি কে। আমাকে এখনো চিনতে পারেনি। আজ পারবে।'

ইতিমধ্যে বাবুর ডাক শুনতে পায়, 'মোত্যা, আরে এই মোত্যা।' এই ডাক তার বুকে যেন তীরের মত বিঁধলো। তলোয়ার হাতে নিয়েই সে বেরিয়ে এসে বলে, 'আজ্ঞে হুজুর…হুজুর…।'

'বদমাইশ' কথাটি বলেই তার পিঠে সমানে বেত চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বাবু ক্লান্ত হয়ে পড়লে হেঁকে বললেন, 'জমাদার, ডাক পুলিশকে। তুলে দি ব্যাটাকে পুলিশের হাতে। ব্যাটাচ্ছেলে জেলের ভাত খেয়ে আসুক একবার।'

এই নির্দেশ দিয়ে বাবু চলে গেলেন। এবং পুলিশ নাম শুনে মোত্যা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে মোত্যা ছুট দেয়।

চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মোত্তা ঘরে ঢোকে রাত্রির অন্ধকারে। নেশা অনেকক্ষণ আগেই ভেঙে গেছে। এক অন্তর্বেদনা তার মনকে পীড়িত, মথিত করছিল। কোন এক মানসিক ভয় এবং আশঙ্কায় তার মন দ্রবীভূত, আঙিনায় উঠেই সে বলে ওঠে—

'লাল্লী ও লাল্লী।'

কিন্তু কেউ জবাব দেয়নি। ভয় এবং আশঙ্কায় এদিক ওদিক তাকায়, তারপর বউকে ডাক দেয়, 'আরে ও বউ, শুনতে পাচ্ছিস কি না!' কিন্তু কোন জবাব আসেনি।

অনেক কষ্টে সে দেশলাই খুঁজে বের করে প্রদীপটা ধরায়। প্রদীপটি নিয়ে সে খাটের কাছে আসে।

একি! মেথীর কি হয়েছে! মেথীর ভয়ঙ্কর বিকৃত মুখ দেখে মোত্তা পাগল হয়ে যায়। কাতর আর্তনাদে ফেটে পড়ে।

ধপ করে তার হাত থেকে প্রদীপটা পড়ে যায়। এদিক ওদিক পাগলের মত তাকিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। পরক্ষণেই মনে পড়ে পুলিশ! হত্যা! সেইতো হত্যা করেছে! পুলিশের কথা মনে পড়তেই সে এক দৌড়ে পালিয়ে যায় সেই কালো রাত্রির বুক চিরে।

মোত্তা ছুটছে। জোরে ছুটে পালাচ্ছে। তাকে যেন কোন এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস গর্জন করতে করতে তার টুঁটি টিপে ধরার জন্য ধাওয়া করেছে। ছুটতে ছুটতে কোথায় যাচ্ছে খেয়াল নেই। পায়ের তলায় কি পড়ছে সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। ছুটছে তো ছুটছেই।

বন ঝাড় ঝোঁপ কাঁটা সব কিছুর উপর দিয়ে ছুটছে তো ছুটছেই। পায়ে কাঁটা ফুটছে। রক্ত ঝরছে কিন্তু তবু সেদিকে লক্ষ্য নেই। ঝরুক রক্ত। হোক ক্ষতবিক্ষত তার শরীর, তবু সে এ ছোটার শেষ করবে না।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়।

কে! কে সে!! রাক্ষস নয়ত!! ভয়ঙ্কর আকৃতির কি সেটা চিৎকার করে বলছে, 'আরও মদ খাও মোত্তা, আরও মদ খাও'......ধপ্ করে সে মাটিতে বসে কাঁদতে শুরু করে। মোত্তা পাগলের মত ছুটছিল। ঘামে পা ভিজে গেছে। বুক ফুলছে, হাঁপাচ্ছে। না! আর ছোটা যাবে না। কিন্তু মোত্তা কোন কিছুরই তোয়াক্কা করবে না। আর দূর নেই, শ্মশান ঘাটও কাছে এসে গেছে। পা আর টানতে পারছে না। বসে পড়ে সেই-

থাকেই। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঐ শ্মশান থেকে তার প্রত্যেক জাতভাই যেন চিৎকার করে বলছে, 'আরে ও ঘোড়া। তুই একি করলি?'

'বাবা!' লাজী ডাক দেয়।

কিন্তু ঘোড়া একটি কথাও বলেনি।

চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেটা কার।

মেথীর নয়ত?

অসমঞ্জসের ডায়েরি

বাণিক রায়

১৯৭৫, ৩০ ডিসেম্বর, সন্ধ্যা ছ'টা।

আমি দেখছি কিন্তু কিছুই দেখছি না। আমার দেখার সঙ্গে জগতের অস্তিত্ব কতোখানি সত্য আমি জানি না, জানি না বলা ঠিক নয়, আমি জানতে পারি না। আমার মতো করে বস্তু দেখি, এবং বস্তু যখন ভাবি, যখন স্বরূপ জানতে চেষ্টা করি, তখনও স্বরূপ জানি না, আমি কতগুলি গুণ দিয়ে জগৎকে বস্তুকে দেখতে চেষ্টা করি. সত্য বলি বটে, কিন্তু সত্য কি, মানুষ জানে না এই সত্যে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত, কল্পনার সত্যে আনন্দ ও সান্ত্বনা বুকে নিয়ে বেঁচে আছি। এইভাবে দেখলে জগৎকে মায়া বলা ছাড়া উপায় নেই, মায়া তৈরি করছে আমার ইন্দ্রিয়, অথচ এই ইন্দ্রিয়কে আমি ত্যাগ করতে পারি না। সুতরাং জগৎকে দেখছি আমি মায়ায়। এই মায়াময় জগতের অস্তিত্ব যে ভাবে আছে আমি সেইভাবেই দেখি। একে ত্যাগও করতে পারি না, আবার এই সত্যরূপ গ্রহণ করতেও অক্ষম। পৃথিবীর সঙ্গে তাই যোগ আমার একাত্ম নয়, যতোদিন বেঁচে আছি ততোদিন একাত্ম হতে পারবো না, মৃত্যুর পর আমার দেহ ভস্মীভূত হলে, পঞ্চভূতে মিশে গেলে এক হবে কিন্তু সেই এক হওয়ায় সঙ্গে একাত্মবোধ তো আমি পাই না, একাত্মবোধ তৈরি করে আমার চেতনা. কিন্তু চেতনাই আমার বিরোধ আনে. বিরোধ আনে বলেই একাত্ম হতে চায়, চায় বলেই পায়

না। যতোদিন মানুষ জীবিত থাকবে ততোদিন সে পৃথিবী থেকে আলাদা হয়েই বেঁচে থাকবে। অথচ পৃথিবী তাকে সংবাদ পাঠাচ্ছে, কিন্তু এই সংবাদ নিয়ে পৃথিবীর বুকের গভীরে আমি এক হয়ে বসতে পারি না। আমি ব্রহ্ম বুঝি না, জানি না। আমার কাছে পৃথিবী আছে। আমি পৃথিবীর বুকের স্তনের রস টেনে নিয়ে তার গহ্বরে শিশুর মতো বাস করতে চাই। এতেই আমার মুক্তি। কিন্তু এই মুক্তি আমি পাই না কেন!

আমি সুরে মুগ্ধ হই, কিন্তু সুর আমাকে কতোদূর নিয়ে যায়। তারপরও আরো দূর আছে, আরো দূর আছে। সেই দূরে আমি যেতে পারি না। বিশুদ্ধ আত্মার বোধ কি, দেহের মাংসের মধ্যে যে রক্ত, স্নায়ুতে যে জল, তাকে তো আমি শুকিয়ে ফেলতে পারি না; পারি না বলেই পৃথিবী থেকে নেওয়া সংবাদ আমাকে নানারকম দৃশ্য দেখায় স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায়, এই দৃশ্য কথনো বেঁকেচুরে যায় কখনো আনন্দ জাগায় কিন্তু কখনোই সত্য দেখায় না। আমি সত্য চাই।

আমি ভালোবেসে ছিলাম সেই ভালবাসা হারিয়েছি, হারিয়ে বুঝেছি, ভালোবেসেও আমার সুখ নেই, না ভালোবেসেও আমি থাকতে পারি না। যে নারীকে আমি ভালোবেসেছিলাম পৃথিবীর মতোই সেই নারীকে আমি পাইনি। বোধহয় কোনো নারীকেই কোনো পুরুষ এই পৃথিবীতে পায়নি, কল্পনা করেছে পেয়েছে, কিন্তু পায়নি। এটা তার সান্ত্বনা কিন্তু এই সান্ত্বনা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকলে কোথাও রক্তের অন্ধকার থাকেই, সেই শূন্য অন্ধকার থেকে কল্পনার কান্না নানা-ভাবে বেরিয়ে পড়ে, কখনো আনন্দে কখনো বীভৎসভাবে। না, এই কান্নায় আমি আনন্দ পাইনি, আমি চেয়েছিলাম গভীরে যেতে, আমি প্রার্থনা করেছিলাম সম্পূর্ণ করে পেতে। কিন্তু অঙ্গের মধ্যে গভীরতা ও সম্পূর্ণতা কথনো আসে না, কেউ দিতে পারে না, এটা যখন আমি বুঝলাম, বিরক্তিতে আমার মন ভরে গেল, আমি আমার নারীর কাছ থেকে সরে আসতে চাইলাম, কিন্তু চাইলেও তো পারা যায় না। বন্ধন আমাকে পীড়ন করলো গভীরভাবে। রক্তের বন্ধন মাংসের বন্ধন স্নায়ুর বন্ধন পৃথিবী থেকে পেয়েছি, সে পীড়ন করলো আমার সমগ্র সত্তাকে, সেই সত্তা কুঁকড়ে যেতে লাগলো দিনরাত্রি। মনে হলো পালিয়ে যাই। কিন্তু কোথায় পালাবো! যেখানেই যাই পৃথিবী আমাকে আঁকড়ে ধরে অথচ দেখা দেয় না। তার সত্য কি শুধু নিয়ত জিজ্ঞাসা করেছি, সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। কখনো বিকট হয়ে দাঁত দেখিয়ে পা

হারিয়েছে, আমি ভয় পেয়েছি, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, না, না চিরকালের জন্য এই পৃথিবী থেকে আমি দূরে সরে যাবো।

নদীর তীরের নৌকোয় কখনো আমার নারীকে নিয়ে ঘুরতে বেড়িয়েছি, সন্ধ্যা নেমে এসেছে অন্ধকার মাথায় করে, আলোর ফুলকি অন্ধকারের দেহ ভেদ করে, গাঢ় অন্ধকারেও নক্ষত্রের আলো ভেদ করতে পারে। শান্ত জলে ঢেউ নেই গঙ্গায়, তবুও মাঝে মাঝে পাড়ে জল দুলছে, আছড়ে পড়ছে তীরে, পাড়ের নরম মাটি ভাঙছে। যে জায়গায় জল ছুঁয়ে আছে সেই জলের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক দেখতে দেখতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমার পাশে পলি আছে, পলি আমাকে দেখছিল না, তাই মনে, সে তুলুনি অনুভব করছিল, দেখছিল তার মাথায় চুলের কালোর সঙ্গে রাত্রির কালো, কতখানি গভীর চোখ ঘুরিয়ে দেখছিল জল কতদূর ক্লান্তি ও আনন্দ আনতে পারে, বোধহয় ভাবছিল এই ক্লান্তিময় অসীম জলে সে যদি ডোবে তাহলে কেমন করে সাঁতরে পেরোবে, হাসি পাচ্ছিল কেউ কি সাঁতরে পেরুতে পারে। আমি সাঁতরাচ্ছি, পলিকে দিয়ে এবং পলির মধ্যে, তাই বিরক্তি ও ক্লান্তি আমাকে ক্ষইয়ে দিয়ে যাচ্ছে, আমার জীবনের সম্পত্তি খুইয়ে যাচ্ছে।

পাড়ের ছোঁয়া জলে মাটির স্পর্শের ঘোলাটে আবিলতা, মাটিতে জলের আলিঙ্গন, অথচ পূর্ণ জল নেই। এমনি নেই-আছে মিলিয়েই কেমন একটা মিশ্র ঘৃণা জাগছে সেখানে। আমি যখন পলির সঙ্গে মিশেছি, তখন এমনি ঘোলাটে আবিলতা আমাকে রুক্ষ করে তোলে। আমি শুদ্ধতায় গিয়ে পৌঁছুতে চেয়েছি, কিন্তু তা কি আমি পাবো। আমি মাংসের ও রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ আমার বুদ্ধিও সেখানে জড়, আমার অন্তঃকরণ, অর্থাৎ মন প্রাণ সবই অচেতন। কিন্তু যাকে চেতন বলি সে তো এইসব জড়কে বুকে নিয়েই আছে, তাকে কিভাবে বাদ দিতে পারি। জড়কে বাদ দিলে চেতনাও থাকে। বস্তু আছে বলেই বস্তুর ভেতরে অণুতম শক্তির প্রচণ্ড খেলা, যা চৈতন্যেরই নামান্তর দেখতে পাই। শক্তিকে ও বস্তুকে আলাদা করলে কি পাওয়া যায়। যৌবনের ধারণা ছিল বিশুদ্ধে পৌঁছবো, সেই খেলায় কল্পনা করেছি নিজেকে নিয়ে, কিন্তু কোথাও পাইনি।

পলি চলে যাবার পর, আমি শুধু সময় মুহূর্ত, স্থির, গতি, মাটি, জল আকাশ ও পৃথিবীর কথা ভাবছি, কিন্তু এই ভাবনায় কবি কি লাভ, আমারও লাভ নেই, তবু ভাবছি, হয়তো ভাবতে ভাবতেই মরবো, কারণ এই ভাবনাই

মানুষের, মানুষের ভাবনাই মানুষের আনন্দ ও মৃত্যুর বীজ। জল প্রাণ দেয় মৃত্যুও আনে। কিন্তু আজ আমি মৃত্যুর কাছাকাছি। সমুদ্র থেকে ঢেউ ওঠে, সেই ঢেউ সমুদ্রে মরে যায়, কিন্তু ঢেউ সমুদ্রকে পায় না। শুধু মরে যায়।

এমন কি আমি কথা বলতেই চাই না। কথা বলতেও আমার কষ্ট হয়, কথার ধ্বনির মধ্যে যে অর্থ, সেই অর্থ অপরে কেউ বোঝে না, বোঝে না এই কারণে আমার দেওয়া অর্থ সে বুঝতে পারে না। এই অর্থের সঙ্গে সে অভ্যস্ত নয়, হয়তো তার কথাও আমি বুঝতে পারি না কারণ আমার অভ্যাসে ও কল্পনার জগতে আমি বদ্ধ। আমি মনে মনে কথা দিয়ে সুর শুনে যে ভাব পরিধি তৈরি করি, সেই পরিধি থেকে বেরুতে পারি না, সেই পরিধি দিয়ে জগৎকে দেখি। আমি জানি নারীকে এইভাবে দেখতে হয়, নারীর স্তনে মধু আছে কিন্তু তার স্তন যুগলে স্নায়ুর ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নেই, তবু সেই স্নায়ুকে আমি জানি না।

আমার মাথার ওপর কালো আকাশ আরো কালো হয়ে উঠছে, সেই কৃষ্ণ অন্ধকার পেরিয়ে তারার আলো বিষাক্ত বাতাসের ছোঁয়ায় ঝাপসা ও কলুষিত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে, শকুনের পাখায় ভর করে ভীষণ কলুষ একাধিপত্য নিয়ে নামছে। আমার বুকের ভাষা এমনকি আমার বায়ু পর্যন্ত নিঃশেষিত, রুদ্ধ তারার ভ্যাপসা গরম আমার চারপাশে পাহাড় তৈরি করছে, তাই কোনো-দিকেই যেতে পারি না। এই অন্ধকারে বসে বসে আমি ধ্যান করবো, কিন্তু সে ধ্যান কিসের। পৃথিবীকে বর্জন করে, আমার রক্ত মাংসকে ভেদ করে শুধু মাত্র আত্মায় আমি প্রতিষ্ঠিত হবো, সেই আত্মা কি সব কিছু থেকে মুক্ত, নাকি কল্পনায় তাকে আমি ভরে তুলবো, এই কল্পনাও পৃথিবীর. পলি তুমি যেখানেই যাও, তুমি আছো।

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৫, রাত্রি

পলি চেয়েছিল নিজেকে, নিজের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে, নিজের সত্তা মানে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে, সেই স্বাতন্ত্র্যের কাছে আমার অস্তিত্ব গৌণ, অর্থাৎ আমাকে উপলক্ষ করে সে জয়ী হতে চেয়েছিল, যেমন পিকাসোর কাছে নারী হয়ে উঠেছিল ওঁর শিল্পের উপাদান, নারীকে ব্যবহার করেছিলেন শিল্পকে গড়ে তুলবার জন্যে। এই স্বতন্ত্র সত্তা নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল বিভিন্ন খেলায়, উৎসাহে, স্বেচ্ছাচারে. স্বাধীন জীবনযাপনে, সে স্নেহ দিত না, স্নেহ নিত।

কিন্তু আমি তার হয়ে বেঁচে থাকতে পারি না, আমার মনের মধ্যেও

গোপনে বাসনা দিল সে আমার। তবু আমি উদাসীন হয়েছিলাম বহুদিন, আর উদাসীন হয়ে থাকতে থাকতে মানুষ ক্লীব হয়ে যায় আর যদি ক্লীব না হয়, তাহলে সে ভণ্ডকতা করে। কিন্তু আমি ভণ্ডকতা ঘৃণা করি মনে প্রাণে। আমি স্বাবলম্বী হতে চাইলাম, আমার ব্যক্তিত্বে পলির সঙ্গে বিরোধ বাধলো দিনে দিনে। স্বাবলম্বী পুরুষের ব্যক্তিত্বের কাছে মন বড়ো হয়ে উঠলো ধীরে। এই মন শেষ পর্যন্ত বস্তু হারালো, এতোদিন উদাসীন হয়ে আমি ভুলে ছিলুম, সচেতন হয়ে ওর সব দোষ আমার চোখে প্রকট হতে লাগলো. আমি সরে এলুম ওঠ কাছ থেকে।

পলি নিয়তই ভালোবাসার কথা বলতো. স্বামীর ভালোবাসা অনাবিল হলে স্ত্রীর আর কোনো ভাব থাকে না। কিন্তু এই ভালোবাসা কি! ভালো-বাসা কি আত্ম সমর্পণ. যাতে নিজের কোনো বোধ থাকে না, না ভালোবাসা কি সব নিয়ে পূর্ণ। আমি জানি, আত্মসমর্পণ বা সব নিয়ে পূর্ণ কোনোটাই জীবনে সার্থক নয়, আপেক্ষিক মাত্র। আমি আত্মসমর্পণ করে দেখেছি, পলির স্বেচ্ছাচারের বিকার পাহাড়ের চূড়োয় ওঠে, পাহাড়ের চূড়ো ধপাস করে মাটিতে পড়ে, লোক মারে, চূড়ো চূর্ণ হয়, সেখানেও অবস্থার মূর্তি বিকট। আমি যে জগৎকে নিয়ে পূর্ণ থাকতে চাই, সেই পূর্ণ জগতের রূপ কি পলির মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলুম, আর পলিই কি আমার মধ্যে তার জগৎ পূর্ণ করে পেয়ে-ছিল। না, পলি কখনোই পায়নি, পায়নি বলেই তো তার বিকার এমন ফুলিয়ে ওঠে, আমি পলিকে নিয়েই শান্ত থাকতে চেয়েছিলুম, আমার জগতে নানান বস্তু আছে নানান বস্তুর মধ্যে পলিও একটি বস্তু, সেই বস্তুকে আমি মনে দেহে পেতে চেয়েছি, কিন্তু তাকে কখনোই বলতে পারি না, সে আমার জগৎ, কেননা আমার জগৎ তো নিরন্তর সরে সরে বড়ো হচ্ছে অনন্তে, সেখানে পলি আমাকে নিয়ে যেতে পারে না, আর সঙ্গে গেলে ও ভার হয়, তবু তাকে আমার দরকার, যেমন বেঁচে থাকতে গেলে শরীরের সব অঙ্গ প্রয়োজন। পলি আমাকে গ্রাস করতে চাইলো, আমার ভাই বোন আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব সকল থেকে। আমি গ্রাসিত হলাম সঙ্গে সঙ্গে পলিও মরে গেল, আমার আপন জগতে এখন পলি নাচে।

সুন্দর ও পৌরুষের মধ্যে সহধর্মিতা কতোখানি, সুন্দর নিরত পৌরুষকে এড়াতে চায়, পৌরুষ সুন্দরকে দলিত করে। পৌরুষের দাবি বেশি, অন্তত পলির কাছে ছিল, তাই পলি পৌরষের কাছে মুক্ত ছিল, কিন্তু আমার মনের

ভেতরে কোথায় একটা উদাসীন ভাবে সুন্দর লুকিয়ে থাকতে চায় এই সুন্দর রক্ষা করতে চায় তার সব পীড়ন অত্যাচার। আমাকে মনে করলো ভীরু। আমার পৌরুষ তখন ভীরু হয়ে গেল, এই ভীরুতা আমার পক্ষে অসম্ভব, ভীরুতাই আমাকে চাপিয়ে দিল, আমাকে সরিয়ে দিল ওর কাছ থেকে। আমার ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ জেগে উঠলো। মেয়েরা সুন্দর থাকতে চায় আসলে ওদের শরীরে গর্তে কালো ক্লেদের অন্ধকার ওদের সর্বত্র রূপ কালো এই কালো থেকেই পুরুষের মনে ও দেহে আনন্দ উদ্ভাবিত হয়। পীড়নে অত্যাচারে শোষণে কালো দিনরাত মথিত হয়, মথিত হয় বলেই পীড়ন করতে ভালোবাসে। এমনিভাবে ওদের দেহে মনে পীড়ন আষ্টেপৃষ্ঠে লেপ্টে আছে তাকেই ওরা প্রসারিত করতে চায়, পুরুষ যদি তাকে সহ্য করে এগোতে পারে, তাহলে সুখী। যদি না পারে তাহলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। আমি পলির কাছে হেরে গেছি হেরে গেছি বলেই আমি বহুদূরে সরে গেছি ওর কাছ থেকে। সেখানে আমিও মুক্ত, পলিও ছন্নছাড়া। আমার মনের আকাশে পাখির উড়াল, সে পাখি শুধু উধাও হতে চায় পলি মাটিতে ঘুরে বেড়াতে চায়, ঘুরতে ঘুরতে শীতের ছাই গাদায় ঘুমিয়ে পড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে, যখন ঘুম ছেড়ে ওঠে তখন সারা গায়ে ছাই, এই ছাই থেকে অদ্ভুত চূর্ণধূম ওড়ে, তারি রূপে জগৎ বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তির মধ্যেই আনন্দ! তাকে নিয়ে থাকা যায় না, বাইরে অনুভব করা যায়।

আমি সত্যি ভাবি, পুরুষ কি অমিতবীর্য হতে পারে, সৌন্দর্য কি অমিতবীর্য পুরুষের মধ্যে একই সঙ্গে থাকে নাকি অমিতবীর্য পুরুষ সৌন্দর্যকে খোঁজে নারীর মধ্যে, নারীর মধ্যে খোঁজে বলেই সে পায় না। কবিরা বলেন সৌন্দর্য প্রকৃতির মধ্যে, নারীর মধ্যে প্রেম। তাহলে তো আমার কথাই সত্যি। সৌন্দর্যকে পাওয়া যায় না নিজের মধ্যে ও নারীর মধ্যে। তাকে দূর থেকে উপলব্ধি করা যায়। নরনারীর মধ্যে যে সম্পর্ক তা বীর্যের, শক্তি ও পুরুষের। সেখানে জয়ী হতে পারে সে, যে বীর্যের সাধনা করেছে। প্রেমের মধ্যে অনন্যকে খোঁজা মানে প্রেমকে অস্বীকার করা। আসলে কালো গহ্বরের অন্ধকার মানুষকে নিয়ত মাটির নীচে খনির অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে দম আটকে মরতে পারে, মরে না বলেই খনির সম্পদ মাঝে মাঝে বাইরে আনে তার বীর্যকে বীর্যতর করবার জন্যে। কিন্তু একদিন খনির অন্ধকারে তাকে মরতেই হয়, জল উপচে পড়ে, গুড়ো কয়লা ধুলো মাটিতে অন্ধকার তার দেহকে আবৃত করে

মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। তবু পুরুষ বেঁচে আছে, এটা সমগ্র পৃথিবীর কাছে অসম্ভব ঘটনা। আমার চোখের সামনে অনিল মরে গেল, মনোতোষ মদ খাচ্ছে, আর আমি দেখছি।

আ মরি বাংলা ভাষা

ডঃ শিশিরকুমার সিংহ

কবি গেয়েছেন: 'মোদের গরব মো'দের আশা আ মরি বাংলা ভাষা!' সত্যি, আমরা আমাদের মাতৃভাষার জন্য সব করতে পারি। এমন মধুর এবং ভাব প্রকাশের এমন উপযোগী তথা শক্তিশালী ভাষা পৃথিবীতে খুব কমই আছে। সেই হাজার বছর আগের চর্যাগীতের বাংলা ভাষাকে আজকের বাংলা ভাষায় উন্নীত করার জন্য আমরা অনেকের কাছেই ঋণী। গ্রামীণ বাংলা ভাষাকে উন্নত করে যাঁরা মধ্যস্তরে নিয়ে যান তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, কৃষ্ণদাস ও ভারতচন্দ্রের কথা। আর মধ্যস্তর থেকে যাঁরা আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত করেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। পরাধীন ভারতবর্ষে বাংলার ব্যবহার শুধুমাত্র সাহিত্য-চর্চা, চিঠিপত্র ইত্যাদি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। সরকারী কাজকর্ম চলত মূলতঃ ইংরেজিতে এবং কিছু কিছু আরবি ফার্সীতে। যদিও আদালতে বাংলার জন্য পণ্ডিত নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল, তবুও তার দ্বারা যে বাংলা ভাষার বিশেষ উপকার সাধিত হত তা মনে হয়না।

বর্তমান স্বাধীন ভারতবর্ষে চৌদ্দটি ভাষা সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে। প্রত্যেক প্রদেশই তাদের নিজের নিজের প্রাদেশিকভাষাকে সরকারী কাজকর্মে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। এ প্রসঙ্গে হিন্দীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। হিন্দী কেবলমাত্র বিহার ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের সরকারী ভাষাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে বর্তমানে হিন্দী সমগ্র ভারতবর্ষের

সরকারী কাজকর্মের ভাষারূপে মর্যাদা লাভের পথে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। তবে এপথে দৃঢ় প্রতিবন্ধক হল দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলো—বিশেষ করে তামিল,—বাংলা নয়। স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, মাদ্রাজীরাই এপথের প্রতিবন্ধক,—বাঙালিরা নয়। মাদ্রাজীদের অর্থাৎ তমিলভাষীদের মাতৃভাষা-প্রীতি আজ ইতিহাসস্বীকৃত। এমনকি, বাংলাদেশের বাঙালিদের মাতৃভাষা-প্রীতির মত তারাও মাতৃভাষার জন্য যে কোন ধরণের সংগ্রামে ও ত্যাগে প্রস্তুত। আর এই কারণেই তামিলনাড়ু সরকার হিন্দীকে সমস্ত স্তর থেকে প্রায় উচ্ছেদ করে দিয়েছে (এমনকি, বর্তমানে ইস্কুলেও থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবেও পড়ানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে)। শুধু তাই নয়, তমিলভাষার জন্য রীতিমত গবেষণারও বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ইন্টারন্যাশন্যাল তমিল রিসার্চ ইন্স্টিট্যুটের কথা। এখানে রয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটারি। একসঙ্গে দশজন শিক্ষার্থী এই গবেষণাগারে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করতে পারেন। ধ্বনিবিজ্ঞানের জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য এই ল্যাবরেটরির সাহায্যগ্রহন অপরিহার্য। তাছাড়া ইতিমধ্যেই তমিল ভাষার তিন তিনবার—প্যারিস, মাদ্রাজ ও কুয়ালালামপুরে আন্তর্জাতিক সম্মিলন হয়ে গেছে। এই সম্মেলনগুলোতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত গবেষকরা যোগদান করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে হিন্দীর আন্তর্জাতিক সম্মিলনের কথা। এইতো মাত্র সেদিন হিন্দীর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মিলন হল।

তমিলভাষা ভারতের অন্যতম প্রাচীন বা প্রাচীনতম ভাষা। এই ভাষাটি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা। আনুমানিক প্রায় তিন হাজার বছর আগে এই ভাষাটি উদ্ভূত হয়। ভারতের আদি অধিবাসীদের ভাষাই হল এই ভাষা। আর এজন্যেই তমিল ভাষাভাষীরা গর্ববোধ করেন। তবে তাঁদের এই গর্ববোধ কেবল মাত্র মৌখিক নয়, আন্তরিক।

আর এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে বাংলা ভাষার কথা। আমরাও এই ভাষার জন্য গর্ববোধ করি! কিন্তু তা কতটা আন্তরিক? আমরা আমাদের ভাষার জন্য কি করেছি বা কি করছি? কেবল মাত্র সরকারী ঘোষণার ফাঁকাবুলি ছাড়া কাজকর্মে কতটুকু বাংলাভাষার ব্যবহার হচ্ছে? বাংলাভাষার জন্য কেন কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি নেই (—যা কলকাতায় আছে তাও ইংরেজির জন্য)? তমিল বা কানাড়ীর মত 'ইন্টারন্যাশন্যাল বেঙ্গলি রিসার্চ ইন্স্টিট্যুট' নেই কেন? বা কোন আন্তর্জাতিক সম্মিলন আজ পর্যন্ত

সম্ভব হল না কেন?! এর জন্য দায়ী আমরা—বাংলা ভাষাভাষীরা। আমাদের মাতৃভাষার জন্য আন্তরিক দরদ নেই। তমিলীদের মত মাতৃভাষার জন্য আমরা ক'জন আত্মত্যাগে (আত্মবলিতে বলাই উচিত) প্রস্তুত? গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসান ছাড়া আমরা আর কিছু করতে পারি কি? ওদের সব দেখেশুনে নিজেদের কথা ভেবে দুঃখ হয় আর আমাদের সমস্ত গর্ব ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে। আর মনে পড়ে যায় এক তমিল কবির মাতৃভাষাপ্রীতির একটি অপূর্ব কবিতা (বা গান), যার ভাবটি হল:

কবি তাঁর প্রিয়তমাকে বলছেন—

ওগো প্রিয়তমা!

আমি যখন হতাশায় ভেঙে পড়ি
যখন বাথায় ব্যথিত হই
যখন শোকে আভভূত হয়ে পড়ি
যখন দুঃখে আমি কাতর হয়ে পড়ি —
তখন কি তুমি আমাকে
আমার মধুর মাতৃভাষার গান গেয়ে
আমার দুঃখ দূর করবে না,
আমাকে আনন্দ দেবে না,
আমাকে উৎসাহ দেবে না!

চেনা গোলাপ

(দ্বিতীয় কিস্তি)

তান সম্রাট/মাজু সাহেব

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৩৩ সাল। কলকাতায় সেই ৮৫ নং পার্ক স্ট্রীটে মুর্শিদাবাদ নবাবের প্রাসাদ। নবাব ওয়াশিফ আলি মির্জার মেয়ে মাহ্মুদা বেগমের সঙ্গে মাজু সাহেবের ভাই ইফাসুব্ আলির বিয়ে। সেই উপলক্ষে স্যার ওয়াশিফের সামনে

এক জমাট জলসা বসেছে। উপস্থিত হয়েছেন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ বাদাল খাঁ, ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ খুরশিদ মির্জা, মাস্তু সাহেব, ইন্দুবালা প্রভৃতি। প্রথমে একখানা খেয়াল ও পরে ঠুংরি গাইলেন ফৈয়াজ খাঁ। সারেংগিতে সংগত করলেন ওস্তাদ বাদাল খাঁ। আর হারমোনিয়াম বাজালেন ভারতের শ্রেষ্ঠ হারমোনিয়াম শিল্পী ভাইয়াজির অতিপ্রিয় শিষ্য ও সংপুত্র খুরশিদ মির্জা। অবশ্য সুপরিচিত সংগীতগুরু ফৈয়াজ খাঁর কৃতিত্বের কথা আমরা এখানে আলোচনার ঊর্ধ্বে রাখতে চাই। তাঁর গান শেষ হওয়ার পর একখানা ভৈরবী ঠুংরি ধরলেন জমিরুদ্দিন খাঁ আর তাঁর শিষ্যা ইন্দুবালা। শ্রোতাদের সাগ্রহ অনুরোধ সত্ত্বেও প্রথমদিকে মাস্তু সাহেব যোগ দিলেন না ওঁদের সংগে। ওঁরা তখন গাইছেন :

লাগাতো কারাজোয়ামে চোট্
ফুলা গেঁদোয়া না মারো মাইকা
লাগাতো কারাজোয়ামে চোট্ ॥

[অর্থাৎ : আমার বুকে চোট্ লাগে। ফুলের তোড়া ছুড়ে মেরো না গো আমাকে। বুকে আমার ফুলের তোড়ার চোট্ লাগে।] আড়াই ঘণ্টা ধরে গেয়ে চলেছেন কণ্ঠশিল্পের দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ইনি ছাড়েন তো উনি ধরেন আর উনি ছাড়েন তো ধরেন ইনি। সুরলহরীর ধ্বনিময় গন্ধে ম ম করছে তখন গোটা হল টা। মাস্তু সাহেব তখনো যোগ দেননি, আগেই বলেছি। শেষে ওঁর ওয়াশিফ কয়েকবার সাগ্রহ ইশারা করতেই হঠাৎ একসময় মুখ খুলেই বিরল বিচিত্র তানেরসিঁড়ি বেয়েউঠে গেলেন তিনি তাঁর সেই বিস্ময়কর উচ্চতায় যেখানে তাঁকে দেখতে হ'লে সব সুরশিল্পীকেই হতে হ'তো অভ্রমুখী, যেখানে আর সবারই থেকে তিনি পৃথক, যেখানে শুধু মাস্তু সাহেবই পারতেন উঠতে। ওস্তাদজমিরুদ্দিন খাঁ যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। 'আহাঃ! আায়সা অওর কাভি নেহি শুনেঙ্গে।' ব'লেই দুহাতে তুলে দুম্ করে ছুঁড়ে দিয়ে ভেঙে ফেললেন তিনি তাঁর অতি প্রিয় হারমোনিয়ামটি যার দাম ছিলো তখনকার বাজারেই বারো শো টাকা। বললেন, 'আগার তোম্হারে তারে হামারা গালা হোতা তো তামাম্ হিন্দোস্তানমে মেরা কৈ বারাবার নেহি হো সাক্তা।'

'গ্রীসীয় মর্মর চিতাভস্মাধার'-শীর্ষক ওড্-এ কীট্‌সের সেই বহু-উদ্ধৃত উক্তিটি এই প্রসঙ্গে মনে প'ড়ে যায় : 'Heard melodies are sweet but those unheard are sweeter.' কিন্তু আজ যাঁর কথা আমি

আলোচনা করতে বলেছি তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত অলৌকিক সুরধারার সংগে যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল কোনোদিন তাঁরা ক্রিটিকের এই অকুণ্ঠ যথার্থ মন্তব্য সমর্থন করার আগে নিশ্চয় দুবার চিন্তা করবেন। মঞ্জু সাহেবের হাতে তৈরি সুরসাধিকা শ্রীমতী রাধারাণীর সংগে কথা হচ্ছিল গত নভেম্বর মাসে একদিন তাঁর সংগীতগুরুর সম্পর্কে। ভক্তিনম্র চিত্তে তিনি বললেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বললেন: "ওস্তাদজীর গলায় কী যে ছিলো! তিনি যখন বেহাগ বিলাওল খাম্বাজ মল্লার প্রভৃতি রাগে খেয়াল কি গাজাল কি ঠুংরি গাইতেন তখন আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো। বুকের ভেতরটা কেমন যেন ক'রে উঠতো! বড় বড় ওস্তাদ শ্রোতারাও পাগোল হয়ে উঠতেন।'

'চেনা গোলাপ'-এর প্রথম কিস্তিতে বলেছি মঞ্জু সাহেবের পোশাকী নাম ছিলো সৈয়দ আনওয়ার আলি মির্জা। জন্ম ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে নবাব পরিবারে। নবাব নাজিম ফিরাইদুন ঝার চতুর্থ পুত্র বাকার আলি মির্জা ছিলেন তাঁর বাবা আর মা ছিলেন আরেক মেহেদি খানম্। শিক্ষা নবাব বাহাদুরস্ ইন্স্টিটিউশনে। দরবারি সংগীতের দুর্লভ আবহাওয়ায় কেটেছিলো তাঁর শৈশব কৈশোর যৌবন। সেই কথাতেই আসছি।

নবাবরা নাচগানের পৃষ্ঠপোষক হলেও নাচগান সম্পর্কে তাঁদের সংস্কারগত ধারণাটা ছিলো খুবই নিচু। তাই তাঁদের বংশে কেউ গায়ক হবে এটা তাঁরা কেউ ভাবতে পারতেন না। স্বভাবতঃই মঞ্জু সাহেবের পূর্বে নিজামত পরিবারে কেউ কখনো গান শেখার সুযোগ বা উৎসাহ পাননি। এদিকে নবাব নাজিম ফিরাইদুন ঝা এবং তাঁর পুত্রেরা, বিশেষতঃ হোসেন আলি মির্জা ও বাকার আলি মির্জা এবং পৌত্র (জ্যেষ্ঠপুত্র হোসেন আলির পুত্র নবাব স্যার ওয়াসিফ আলি মির্জা গান বাজনা পছন্দ করতেন খুবই। ফলে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেরা ওস্তাদ আর বাঈজিদের সমাবেশ হতো মুর্শিদাবাদে। দিল্লি থেকে আগত তবলার যাদুকর ওস্তাদ আতা হোসেনের মতো অনেক ওস্তাদ গাইয়ে বাজিয়ে যেমন নবাবীবৃত্তি পেয়ে মুর্শিদাবাদেই থেকে যেতেন তেমনি বহু গুণী বাঈজি মিরাট লক্ষ্ণৌ, হায়দারাবাদ, দিল্লি প্রভৃতি স্থান থেকে এসে কেউ কেউ স্থায়ী আস্তানা পেতেন নবাবদের অন্দরমহলে। এমনিভাবে এসে থেকে গেছিলেন বিজ্ঞানবাঈ নবাব বাকার আলি মির্জার হারেমে। তাই সম্পর্কে মঞ্জু সাহেবের বিমাতা ছিলেন তিনি। পরিবারের কর্তৃস্থানীয় পুরুষসদস্যদের অগোচরে মঞ্জু সাহেব ধীরে ধীরে সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিমাতা বিজ্ঞানবাঈ ছিলেন কিন্নরী-

কণ্ঠের অধিকারিনী। আর ঠুংরি তো আসলে মেয়েদেরই গাইবার জিনিষ। এই বিজ্ঞানবাঈয়ের কাছ থেকে তিনি ঠুংরি আর গাজাল গাইবার মূল রহস্যটি যেমন পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত ক'রে নেন তেমনি এঁর মাতৃসুলভ সযত্ন পরিচর্যায় ও অভিভাবকত্বে তাঁর অনুশীলনও হয় অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে নিখুঁত। এর পর জাদ্দানবাঈ, কাজ্জনবাঈ, গাহারজান বাঈ, জোহরা বাঈ প্রভৃতি অন্যান্য বাঈজিদেরও সস্নেহ প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন তিনি। সবার ওপর তিনি নিজেও ছিলেন দেবদুর্লভ সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী। সুতরাং তাঁর গান শোনার সৌভাগ্য যাঁদেরই হয়েছে কোনোদিন তাঁদের মনে চিরভাস্বর হয়ে আছে সেই অপার্থিব আনন্দরূপ অমৃতস্বাদের স্মৃতি। কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভে এইসব কিন্নরকণ্ঠী বাঈজিদের সযত্ন প্রশিক্ষণে শেখেন তিনি ঠুংরি গাজাল দাদ্‌রা। এরপর বিশ-একুশ বছর বয়েসে তিনি খেয়াল শিখতে শুরু করেন কাশিমবাজার রাজ নিযুক্ত সংগীতগুরু রাধিকা গোস্বামীর কাছে। শোনা যায় গোস্বামী মশাই মাঞ্জু সাহেবের গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। তবে খেয়ালের বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃত তাত্ত্বিক শিক্ষালাভ করেন তিনি রাধিকা গোস্বামীর মৃত্যুর পর ওস্তাদ কাদের বক্সের কাছে। এরও পরে তিনি গুরু হিসেবে পান বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক ওস্তাদ খুরশিদ মির্জাকে। লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজেদ আলির পৌত্র অথবা দৌহিত্র এবং ভাইয়াজির প্রিয় শিষ্য এই 'মির্জা সাহেব'-এর কাছে মাঞ্জু সাহেব আবার তালিম নেন ঠুংরি গাজাল দাদরায়। এবং এঁরই মেয়ে আশ্‌মাত্‌ আরা বেগমের সংগে হয় তাঁর বিয়ে।

মঞ্জু সাহেবের সংগে তবলায় সংগত্‌ করতেন তাঁর গুরু ওস্তাদ কাদের বক্স, স্থানীয় অনুষ্ঠানে কখনো কখনো স্বর্গত রবীন্দ্রনাথ বর্ধন; আর হারমোনিয়ামে সংগত করতেন সুদক্ষ ন্যাটা হারমোনিয়ামবাদক ইউসুফ আলি আর কলকাতায় তাঁর শশুর 'মির্জা সাহেব'। কাদের বক্স্‌ সাহেবের মুখে একটি ঘটনার বিবরণ শুনেছিলেম অনেকদিন আগে। ঘটনাস্থল সম্ভবত উত্তর প্রদেশ বা রাজস্থানের অন্তর্গত ঝাঁউয়া (অথবা জাম্বুয়া?) নামে একটি স্টেইটের মহারাজার জলসাঘর। মহারাজার মাননীয় অতিথি হ'য়ে সেখানে গান করতে গেছেন মাঞ্জু সাহেব। সংগে গেছেন ওস্তাদজী তবলচি হিসেবে আর ইউসুফ আলি হারমোনিয়ামে সংগত করতে। জলসা বসেছে অনেক প্রাচীন দরবারি গাইয়ে বাজিয়েদের সমাবেশে। অদূরে চারদিকের চিকের আড়ালে বসেছেন রাণীসাহেবা তাঁর আত্মীয়াদের সংগে নিয়ে। খাম্বাজ রাগে ঠুংরি ধরলেন

মঞ্জু সাহেব :

মাথি বারছি চিল্‌ওয়ালেনে পালাট্‌কার
এক বারছি মোহে খিঁচ্‌কার মাথি
দুজে বারছি মোহে লাগি তিরছি ॥

[অর্থাৎ : তীরন্দাজ ঘুরে দাঁড়িয়ে তুন থেকে টেনে নিয়ে চোখের) তীর ছুড়ে মেরে দিলো একটা তীর এসে সরাসরি বিঁধলো আমাকে। দ্বিতীয় তীর এসে লাগলো আমাকে তেরছাভাবে।]

ছিপ্‌ছিপে দীর্ঘকায় মঞ্জু সাহেবের বাঁ চোখটি ছিলো সামান্য একটু ট্যারা। কিন্তু গান গাইবার সময় সেই ট্যারা চোখের অপাংগ দৃষ্টিপাত গায়কের সুদক্ষ কণ্ঠের চেয়েও যেন শতগুণ বাঙ্ময় হয়ে উঠতো। সামান্য ক'টি কথাকে মন্ত্রের মতো ব্যবহার ক'রে তিনি প্রত্যেকটি শ্রোতার হৃদয় নিয়ে অবলীলায় লোফালুফি খেলতে লাগলেন। সংগীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও নামী গাইয়ে শ্রোতারাও পাগোল হ'য়ে উঠলেন। ক্রমে মাঝরাতে সেই গানের আবেদন এমন তীব্র হ'য়ে উঠলো যে বাঈসাহেবেরা চিক্‌ ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন। ওস্তাদজীর ভাষাতেই বলি : "ক্যা বোলেঙ্গে বাবা. উন্‌কা গানেমে জাদু হ্যায়। গানেমে অ্যায়সা আশায় হুয়া কি বাঈওনে চারোতারাক্‌সে আপ্‌না চিল্‌মিল্‌ তোড়্‌ দিয়া!" এই ছিলেন আমাদের মঞ্জু সাহেব।

আরো একটা ঘটনার কথা শুনেছিলেন মঞ্জু সাহেবের বন্ধু ও প্রবীণ উকিল স্বর্গত মনোমোহন রায়ের মুখে। সেটা ১৯৩৫ কি ৩৬ সাল। কুচবিহারের মহারাজার আমন্ত্রণে গেছেন সেখানে ম'ঞ্জু সাহেব, ওস্তাদ কাদের বক্‌স্‌, চটুস্থল আলি আর রায় মশায় নিজে। একমাস সেখানে তাঁরা বাস করেছিলেন রাজ অতিথি হয়ে। জলসা বসেছে। তখন বর্ষাকাল নয়। বাইরে মেঘমুক্ত নীল আকাশ ঝল্‌মল্‌ ক'রে হাসছে? উৎসুক শ্রোতাদের ফরমায়েশে ধরলেন মঞ্জু সাহেব মল্লার রাগে একটি গান। ক্রমে ঈপ্সিত আবহাওয়া গড়ে উঠলো। প্রত্যাশা-উন্মুখ শ্রোতৃবর্গের উদ্দীপিত অনুভূতিতে ধরা দিলো নব জলধরের অস্তিত্ব। এক সময় গান শেষ হওয়ার মুখে. নেমে এলো অঝোর ধারায় বৃষ্টি। মুগ্ধ শ্রোতারা বিস্ময়ে উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন। হয়তো এই বৃষ্টির সংগে তাঁর গানের বিজ্ঞানসম্মত কোনো সম্পর্কই ছিলো না। কিন্তু একটা জিনিশ বুঝতে কষ্ট হয়নি আমার। তিনি তাঁর কণ্ঠের জাদু এমনভাবেই প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁর শ্রোতৃবর্গের মন ও বুদ্ধির ওপর যে তাঁরা বিশ্বাস করতে

বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর গানের টানেই নেমে এসেছে এই বৃষ্টি। এরপর তাঁরা যতোদিন সেখানে ছিলেন মাঞ্জু সাহেবকে পথে দেখলেই লোকে ব'লে উঠতো 'ওই যে মল্লারী।'

এরকম আরো অনেক বিস্ময়জনক ঘটনার কাহিনী শোনা যেতো মাঞ্জু সাহেবের সম্পর্কে বিশ পঁচিশ বছর আগেও। কিন্তু আজকের তরুণ মুর্শিদাবাদ তাঁর নাম ই জানে না হয়তো। অথচ ফৈয়াজ খাঁর মতো সংগীতের জাদুকরও তারিফ করেছিলেন তাঁর কণ্ঠের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারু কাজের।

রাধারাণী বলছিলেন সেদিন: 'আমার বয়েস যখন ১২ কি ১৩ তখন ১৯২৭ কি ২৮ সালে 'মুর্শিদাবাদ এসে মুগ্ধ হন কাজি নজরুল ইসলাম আর দিলীপ রায় মাঞ্জু সাহেবের গান শুনে।' এ-সম্পর্কে স্বর্গত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর নিকট-আত্মীয় প্রত্যক্ষদর্শী স্বর্গত সুধাংশু চৌধুরী মশাইকে গল্প করতে শুনতেন অনেকে। একটি আসরে গাইবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায়। এসেছেন গিরিজাবাবুও। কিন্তু মাঞ্জু সাহেব পর পর কয়েকটি গান গাইবার পর উদগ্রীব শ্রোতাদের পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও দিলীপ রায় গাইতে রাজি হলেন না কিছুতেই। বাস্তবিকই মাঞ্জু সাহেবের গানের পর একই আসরে গেয়ে শ্রোতার মনোরঞ্জন করা ছিলো প্রায় অসম্ভব। এখনো জীবিত কিছু কিছু শ্রোতার মনে গানের আসরে, বিশেষ করে বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজে, কাশিমবাজারে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী ও রাজা কমলারঞ্জনের রাজপ্রাসাদে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে, কি গোরাবাজারে ধর্মশালায় প্রতিবছর সরস্বতী পুজোয় অনুষ্ঠিত গানের জলসায় দেখা একটি দৃশ্য উজ্জ্বল হয়ে আছে। মাঞ্জু সাহেব যখন তানপুরার কান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারগুলি ঠিক করতেন তখন পাশে উপবিষ্ট প্রখ্যাত সংগীতসাধক গিরিজাবাবু সেই তানপুরার একটি কান উল্টোদিকে ঘুরিয়ে শিথিল ক'রে দিতেন একটি তার। সহাস্য মুখ তুলে চাইতেন মাঞ্জু সাহেব। চক্রবর্তী মশাই হেসে ব'লে উঠতেন: ''আরে ভাই মাঞ্জু সাহাব, তুমহারা গানাকা বাদ মেরা গানা কৌন্ শুনেগা? পহ্‌লে মুঝ্‌কো গা লেনে দো। বাদ্‌মে তুম্ গানা।''

সেবার শ্রদ্ধেয় দিলীপ রায় আর কাজি নজরুল তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন। তিনি মেগাফোন আর সেনোলা কম্পানিতে প্রশিক্ষক (ট্রেইনার) নিযুক্ত হলেন। আকাশবাণীতেও তিনি স্থায়ী ট্রেইনার এবং নিয়মিত গায়ক হিসেবে যোগ দিলেন। তিনি যে-সব ছাত্র-ছাত্রীকে গান শেখাতেন তাদের কাছ থেকে

একটি পয়সাও গ্রহণ করতেন না পারিশ্রমিক স্বরূপ। এমন কি কখনো কখনো তাদের বাড়িতেও চলে যেতেন এবং চার পাঁচ ঘণ্টা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দিয়ে অনুশীলন করাতেন। খাগড়ায় তাঁর স্নেহধন্য জগন্নাথ দাসের বাড়িতে তো তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েকদিন ক'রে থেকে যেতেন। রাধারাণী বলছিলেন সেদিন: "তখনকার দিনে রিক্সা চালু হয়নি এখানে। ঘোড়াগাড়ি আর বাস ছিলো যাতায়াতের সাধারণ উপায় ওস্তাদজি অনেকদিন বাসে করে চলে আসতেন জিয়াগঞ্জে আমাদের আগেকার বাড়ি। একনাগাড়ে চার পাঁচ ঘণ্টা তালিম দিতেন। প্রত্যেক শব্দের নির্ভুল উচ্চারণ শেখাতেন। কোনো কোনো শব্দের সঠিক উচ্চারণ শিখে নিতে অনেকটা সময় লাগতো। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে তিনি আমাকে যা শিখিয়ে ছিলেন তা অন্যত্র শিখতে অন্তত দশ বছরের কঠোর অনুশীলনের প্রয়োজন হতো। "আমাদের মনে রাখা দরকার তখন নিজামত পরিবারভুক্ত লোকেদের স্থানীয় জনসমাজে বিশেষ কদর ছিলো। এবং তাঁরা বাইরের কারো সংগে অপ্রয়োজনে বড় একটা যোগাযোগ রাখতেন না। কাজেই জনসমাজে রীতিমতো সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পাত্র মাঝু সাহেবের পক্ষে জিয়াগঞ্জ বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের অনভিজাত অতি সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের বাড়ি গিয়ে মুফতে তাদের তালিম দিয়ে আসাটা অবশ্যই বিশেষ মহত্বের পরিচায়ক। নবাবী পেনশন-ই ছিলো এতোদিন তাঁর জীবনধারণের একমাত্র উপায়। কলকাতা এসে এই প্রথম তিনি সংগীতকে উপার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করলেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে কোনো শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শেষদিন পর্যন্ত তিনি কিছু দাবি বা গ্রহণ করেননি।

তাঁর প্রিয় ঠুংরি আর গজলগুলি তাঁর দুই প্রিয় ছাত্রছাত্রী সৈয়দ আলি মির্জা মুর্শিদাবাদে আমাদের বাড়িতে আর শ্রীমতী রাধারাণী জিয়াগঞ্জে তাঁর গৃহে আমার অনুরোধে গেয়ে শোনালেন। খুব তৃপ্তির সংগে উপলব্ধি করলেম যে মঞ্জু সাহেব তাঁর যোগ্য ছাত্রছাত্রীই রেখে গেছেন। ওঁরা কিন্তু দুজনেই নিজেদের দীনতা স্বীকার করলেন। রাধারাণী বললেন: "গান গাইবার সময় ওস্তাদজীকে কোনোরকম চেষ্টা করতে হতো না। ঝর্ণার ধারার মতো সুরের ধারা যেন আপন তাগিদেই বেরিয়ে আসতো তাঁর কণ্ঠ থেকে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতেম তাঁর মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে।" আলি মির্জা সাহেব বললেন, "আমার গানা শুনে আদমিলোক তারিফ করে। আমার হাসি লাগে। এরা

তো আমার যাদু ভাইয়ার গানা শোনেনি।" প্রকৃতির অনতিক্রম্য বিধানে সেই মধুকণ্ঠের মন মাতানো অলৌকিক তানসমৃদ্ধ সুরবিহার আজ স্তব্ধ। কিন্তু তাঁর সস্নেহ প্রশিক্ষণে লালিতমণ্ডিত দুই সুযোগ্য ভাবসন্তান সৈয়দ আলি মির্জা আর শ্রীমতী রাধারাণীর সমাহিত কণ্ঠে এখনো আমরা যে গানগুলি শুনে মুগ্ধচিত্তে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পারি সেগুলির কথা এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি উৎসুক পাঠকদের উদ্দেশ্যে। রাধারাণীকে আমি সেদিন ব'লে এসেছিলেম: 'গুরুর প্রতি আপনার যে গভীর শ্রদ্ধা লক্ষ্য করলেম তারই দোহাই দিয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি আবার আপনি ঠুংরি আর গাজাল গাইতে শুরু করুন। আত্মবিস্মৃত সংগীতরসিক বাঙলার অশ্বত্থামাসমাজকে জানিয়ে দিন আপনার এই স্বচ্ছন্দসঞ্চিত কণ্ঠসম্পদ আপনি যাঁর কাছ থেকে অর্জন ক'রেছিলেন তিনি কতো উচ্চস্তরের শিল্পী ছিলেন। আর এই ভাবেই শোধ করুন যতোটা সম্ভব সেই নির্লোভ গুরুর ঋণ।"

১॥ ঠুংরি (রাগ: ভৈরবী/তাল: দাদ্‌রা)

রাস্‌কে ভারে তোরে নায়ান
সাঁবারিয়া রাস্‌কে ভারে তোরে নায়ান
আও সাঁবারিয়া গারবে লাগালুঁ
নাহি পাড়ে মোহে চায়েন্ রে সাঁবারিয়া
রাস্‌কে ভারে তোরে নায়ান ॥

[অর্থাৎ: অপরূপ রূপের রসে পূর্ণ তোমার চোখ দু'টি। ওগো প্রিয় চোখ যে তোমার অপরূপ রূপসুধায় পূর্ণ। এসো প্রিয় তোমাকে আমার কণ্ঠে চেপে আলিংগন করি। তোমার বিহনে আমার যে কিছু ভাল লাগে না। তাই এসো তোমাকে আমার কণ্ঠে চেপে ধরি। রূপসুধায় কানায় কানায় ভ'রে আছে তোমার চোখ দু'টি।]

২॥ ঠুংরি (রাগ: খাম্বাজ/তাল: দাদ্‌রা)

মারি রাহ্‌ছি চিরেওয়ালেনে পালাট্‌কার·········

(পূর্বে তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৩॥ ঠুংরি (তিলং রাগ/খাম্বাজ ঠাট/তাল: তেওড়া)

সাজানা তোমা কাহেকো নেহা লাগায়ে
এরি দেখো সাখি পিয়া রুশা রাহে
কৌ যায়ে উন্‌হে লায়ে মানায়ে ॥

[অর্থাৎ: সজনি, তুমি কেন আমাকে প্রেম করলে? আরে সখি, দেখো দেখো প্রিয় আমার মান করেছে। তোমরা কেউ যাও ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে এসো।]

৪। ঠুঙ্রি (রাগ: ভৈরবী / তাল: আটমাত্রা যত্)·········

লাগাতা কারাজোয়ারে চোট্·········

(পূর্বে চল্লিশ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

৫। গাজাল (রাগ: বিলাওল/তাল: কাওয়ালি ঠেকা)

খ্যালে জুল্‌ফে জানা কাব্‌ হামারে দিল্‌সে নিক্‌লেগা
ইয়ে কাঁটা ইয়া ইলাহি কাব্ তানে বিশ্‌মিলসে নিক্‌লেগা
না নিক্‌লা হ্যায় না নিক্‌লেগা মেরা আরমানে দিল ইয়ারাব্
যো নিক্‌লেগা তো একদিন খান্‌জারে কাতিল্‌সে নিক্‌লেগা
ইধার কাতিল্‌ভি কাম্‌সিন্ হ্যায় উধার শওক্ শাহাদাত্ হ্যায়
জামা ম্যায় হুঁ মেরা দাম্‌ভি বহত্ মুশ্‌কিল্‌সে নিক্‌লেগা।।

[অর্থাৎ: আমার হৃদয় থেকে কবে বিদায় নেবে প্রিয়ার চুলের চিন্তা? কামনার এই কাঁটা, হে ভগবান, কবে আমার আহত দেহ থেকে নির্গত হবে? হায় ভগবান, হৃদয় থেকে এই কামনার কাঁটা বের হচ্ছে না, বের হবেও না কোনোদিন। এ আকাংক্ষার শেষ হবে তখনই যখন প্রেমিকার চিন্তায় চিন্তায় একদিন সেই ঘাতিকার ছুরিতেই (খান্‌জারে) আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। একদিকে সেই নিষ্ঠুর ঘাতিকা, অন্যদিকে আরেকজন স্বেচ্ছায় চায় শহিদ হ'তে। আমার বয়স হয়েছে বেশ। তাই আমার প্রাণবায়ু অনেক কষ্টেই হবে নির্গত।]

প্রসংগক্রমে বলে রাখি নজরুলের অনেক গাজালেই মঞ্জু সাহেবের গাজালের সুরের ছাপ দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল' - এই গানটিতে তো

মাহাব্বাত বাড্ দেযাভি হ্যায় দিল্ যাব্ দিল্‌সে মিল্‌তা হ্যায়
মাগার মুশ্‌কিল তো ইয়ে হ্যায় দিল্ বাড়ে মুশকিল্‌সে মিল্‌তা হ্যায়॥

—তাঁর এই উর্দু গানটির সুরের প্রভাব অতি স্পষ্ট। শোনা যায় নজরুল ইসলামের বাংলা গাজালের অনেকগুলিতে মঞ্জু সাহেব সুর দিয়েছিলেন। নজরুলের কতকগুলি বাংলা গাজাল এবং রজনীকান্ত ও অতুল-প্রসাদেরও দুয়েকটি বাংলা গান তিনি গাইতেন। একটি গানের কথা

কয়েকদিন আগে আলি মির্জা সাহেবের সত্তর বছর বয়স্কা দিদি আদিলা বেগম সুন্দরভাবে উচ্চারণ করে বলে গেলেন যদিও তিনি বাংলা ভাষা জানেন না মোটেই। গানটির কয়েকটি লাইন যেমন তাঁর মুখ থেকে শুনেছি তেমনি লিখে দিচ্ছি :

স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি
রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া।
স্বপনে তাহারি মু'খানি নিরখি
স্বপনে কুহেলি মাখিয়া।

৬॥ দাদ্‌রা (রাগ : নাট মল্লার/তাল : দাদ্‌রা)

মোরে নায়না লাগি গুঁইয়া
জিয়া চাহে সো কারে॥

[অর্থাৎ : ওগো প্রিয়, চোখ আমার বন্দী তোমার মুখের কারাগারে। এখন তোমার যেমন খুশি তেমনি করো আমাকে নিয়ে।]

খেয়াল :

খুব আশ্চর্যের কথা মুর্শিদাবাদে যে ক'জন আজও মাঞ্জু সাহেবের নাম মনে রেখেছেন তাঁদের কয়েকজনকে বলতে শুনেছি তিনি নাকি ঠুংরি আর গাজালের মতো হাল্কা গানই গাইতেন। কি ক'রে এঁদের এই ধারণা হ'ল বলতে পারিনে। তাদের শুধু আরেকবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে স্বগৃহের চৌহদ্দির বাইরে প্রথমটায় তিনি রাধিকা গোস্বামী মশায়ের কাছে খেয়ালের অনুশীলন করেন। পরে দীর্ঘকাল তিনি ওস্তাদ কাদের বকশের কাছে বিস্তৃতভাবে খেয়ালচর্চা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যুর সতেরো বছর পর বড়ে গোলাম আলি খাঁ তাঁর প্রসংগ উল্লেখ ক'রে বলে গেছেন, Munjhu Shahab was famous for Thumri and Khyal. তাঁর গাওয়া কয়েকটি খেয়ালের উল্লেখ করছি এখানে :

১। খেয়াল (রাগ : নাট মল্লার/তাল : তেতাল)

আস্থায়ী
ধানা নানা বারাষে ঘোরা বাদারিয়া
আয়সো সামায়ে পিয়া নাহি ঘারামে

আন্তরা
চামাকে বিজুরি উঁধা লাগে
হঁতো আকেলি প্রাণা ডরোরি।।

[অর্থাৎ : অঝোরঝরণ বৃষ্টি হচ্ছে। মেঘ করেছে ঘোর হয়ে। এমন সময় প্রিয় আমার ঘরে নেই। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ভয় (উঁধা) করছে আমার। আমি একাকিনী। তাই প্রাণে আমার জাগছে ভয়।]

৮। খেয়াল (রাগ : বাগেশ্রী/তাল : দ্রুত্ একতাল
কথা ও সুর : ওস্তাদ কাদের বক্স্)

আস্থায়ী

কারেলে মানা রামানামা
নিশাদিনা ঘাড়ি পালাপালা ছানা
আন্ত্ মে এহ আয়ে কামা।

আন্ত্রা

জোয়ি জোয়ি ধাবাতা
ইচ্ছা ফালা পাবাতা
সুমারাতা নিতা কাদারা তেরো
রামানামা আষ্টা যামা
কারেলে মানা রামানামা ॥

[অর্থাৎ : মন, তুই রামনাম জপ ক'রে নে। পলে পলে সারাদিনরাত ধ'রে পালিয়ে গেলো ঘন্টাগুলো। অন্তিমে শুধু এই রামনাম-ই আসবে কাজে। যে যেমন ধ্যান করে অভীষ্ট ফল লাভ হয় সেই রকম তার। কাদের তোমার নাম জপে অনুক্ষণ। মন, তুই রামনাম জপ করে যা।]

৮। খেয়াল (রাগ : মালকোশ/তাল : দ্রুত্ একতাল
কথা ও সুর : ওস্তাদ কাদের বক্স্)

আস্থায়ী

বানশি বাজে শ্যামা কি ঘানা
এ মোরি সাজানি ও দেখো বানামে
বানশি বাজে শ্যামা কি ঘানা।

আন্ত্রা

আয়লো টোনে কিনি আজ
ছুট্ যাত ঘারাকি কাজ
কারাশানা দো বায়্জাকে রাজ
কাদারকে বিনা দাহে তানা মানা
বানশি বাজে শ্যামা কি ঘানা ॥

[অর্থাৎ : শ্যামের বাঁশি বাজছে ঘন ঘন ! হে আমার সজনি, ওই দেখো বনে বাঁশি বাজছে ঘন ঘন শ্যামের। এই বাঁশি এমনই কি জাদু করেছে আজ যাতে ঘরগেরস্থালির কাজকর্মের বন্ধন ছুটে যাচ্ছে সব! হে ব্রজরাজ, তুমি দেখা দাও। কাদের-বিরহে দেহমন জ্বলে পুড়ে গেলো।]

মাজু সাহেবের প্রায়শ গাওয়া আরো গান তুলে দেওয়া সম্ভব। তাঁর জীবনের আরো কিছু কীর্তির কথাও উল্লেখ করতে পারি। ভবিষ্যতে উপযুক্ত সুযোগ পেলে সে চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সব চাইতে যে-বিষয়টা বিস্ময়কর, দুঃখের বিষয় সেটা শুধু আমাকেই বিমূঢ় করেনি, 'চেনা গোলাপের' প্রথম কিস্তির রচনায় তাঁর প্রসংগে যেটুকু উল্লেখ করেছিলেম তার ফলে বেশ কিছু শিল্পরসিক পাঠকও ভাবিত হয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছেন : এতো বড় গায়ক যাঁকে তাঁর সময়ের বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়ক বলে ঘোষণা করেছিলেন দিলীপ রায়, যাঁর কণ্ঠকীর্তির তারিফ করেছিলেন সংগীত সম্রাট ফৈয়াজ খাঁ, যাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করতেন জাতশিল্পী বড়ে গোলাম আলি খাঁ, যাঁর মতো কণ্ঠ পেলে তামাম হিন্দুস্থান জয় ক'রে ফেলতেন ব'লেছিলেন আমিরুদ্দিন খাঁ— সেই অলোকসামান্য কণ্ঠশিল্পীর গাওয়া কোনো রেকর্ড আছে কিনা। আমি সাধ্যমতো সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছি মেগাফোন কম্পানি তাঁর গানের দুটি রেকর্ড গ্রহণ করেছিলো। তাদের একটির একপিঠে ছিলো 'কারেলে মানা রামানাম'—বাগেশ্রী রাগের এই খেয়ালটি, অন্য পিঠে ছিলো একটি গাজাল। তবে এই গাজালের 'কথা' যে কী ছিলো তা এখনো জানতে পারিনি। এই রেকর্ডটি ভাল না হওয়ায় তিনি আর দ্বিতীয় কোনো রেকর্ড করাননি। রাধারাণীকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন : 'ওস্তাদজীর কোনো রেকর্ড আছে বলে আমি জানিনে। তবে যদি আদৌ কোনো রেকর্ড করানো হয়ে থাকে আর তা যদি খারাপ হয়ে থাকে, তা হ'লে আমি নিশ্চিত যে রেকর্ডটা তাঁর প্রথম স্ট্রোক হওয়ার পর হয়েছিলো।'' কিন্তু আলি মির্জা সাহেব বললেন অন্য কথা। গ্রামোফোন যন্ত্রে সকলের গলা ভাল ধরা দেয় না। রেডিওতে মাজু ভাইয়ার গান যদিও খুব ভালো শোনাতো তবু রেকর্ডটা স্বাভাবিক কারণেই ভাল ওঠেনি। তিনি আরো বললেন প্রায় একই সময় (সেটা মহরমের সময়) মেগাফোন কম্পানি একটি সোজখানির রেকর্ডও গ্রহণ করে। তার একপিঠে গেয়েছিলেন মাজু সাহেব অন্যপিঠে তাঁর ছোট ভাই।

কলকাতার গিয়ে তিনি স্থায়ীভাবে নারকেল ডাঙায় বাসা বাঁধেন। তাঁর

দুই ছেলে নাসির আর মনসুরের মধ্যে নাসির গান বাজনা নিয়েই আছেন। এখন সম্ভবত করাচিতে থাকেন। মনসুর কলকাতায়। কলকাতা বাসের কিছুকালের মধ্যে বেগম আশ্‌মাত্‌ আরার এন্তেকাল হয়। নিঃসংগ শিল্পী কিছু কাল পর এক হিন্দু রমণীকে বাকি জীবনের সংগিনী করে নেন। এই সময় মাঝে মাঝে তিনি মুর্শিদাবাদ আসতেন লালবাগ ট্রেজারি থেকে নিজামত্‌ পেন্সন নেবার জন্যে। আগেই বলেছি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তিনি কোনো দক্ষিণা গ্রহণ করতেন না। শেষের দিকে তিনি খুব অর্থকষ্টে পড়েন। হয়তো রাধারাণীকথিত স্ট্রোকজনিত অসুস্থতা এর কারণ। রাধারাণী সম্পর্কে তাঁর মনে একটা ক্ষোভ ছিল দীর্ঘকাল ধরে। সেকথা পরবর্তী কোনো এক অধ্যায়ে আলোচনা করবো। ১৯৪৬ সালে মৃত্যুর দেড়মাস আগে তিনি তাঁর হিন্দু স্ত্রীকে সংগে নিয়ে প্রিয়াগঞ্জে রাধারাণীর সংগে দেখা করতে যান। রাধারাণী বললেন, "ওস্তাদজীকে দেখে খুব কষ্ট হল। তার আগে দ্বিতীয়বার স্ট্রোক হয়ে গেছে তাঁর। মনে পড়লো কতো যত্নের সংগে তিনি আমাকে গাইতে শিখিয়ে-ছিলেন। আজ সারা দেশে আমার যেটুকু কদর সেতো তাঁরই দান। কোনো দিন তাঁকে টাকা দিতে যাওয়ার মতো ধৃষ্টতা হয়নি আমার। কিন্তু সেদিন ওস্তাদজীর অগোচরে ওই ভদ্রমহিলার হাতে আমি সাধ্যমতো কিছু অর্থ দিয়ে ছিলাম তাঁর শুশ্রূষার জন্যে।" সে বছরের সেই কুখ্যাত সম্প্রদায়িক দাংগার মাস দুয়েক আগে এই অসম্প্রদায়িক উদারহৃদয় মহৎ শিল্পী তৃতীয়বার স্ট্রোকের ফলে কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

শুনতে পাই আজকাল নাকি একেকজন নামীদামী গায়ক একেকটা অনুষ্ঠানে দুতিনটি গান গেয়ে শোনান দু'তিন হাজার টাকা গুনে নিয়ে। তাঁদের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করতে চাইনে। কিন্তু এই সব ভাগ্যবান সংগীতগুণকেরা কি ভাবতে পারবেন তাঁদেরই সমগোত্র এক অভিজাত বংশোদ্ভব মহাপ্রাণ ব্যক্তি— যিনি গানকে নিজের প্রাণ থেকে অভিন্ন ভাবতেন, যাঁর গান শুনে এই শুদ্র-প্রকৃতি বিংশ শতাব্দীতেও আসরসুদ্ধ শ্রোতা অঝোরধারায় অশ্রুপাত করতো, কখনো উদ্দীপিত হয়ে উঠতো, কখনো বা ভাবাবেগে উন্মাদ হয়ে উঠতো— সেই পূতশিল্পহোমাগ্নিপরিশুদ্ধ নির্লোভ মধুভাষী প্রকৃত ব্রহ্মণতুল্য ব্যক্তিটি আমাদের অপরিসীম অর্থলালসাকে ব্যংগ ক'রে, যশ ও প্রতিষ্ঠালিপ্সাকে শূকরী বিষ্ঠাবৎ জ্ঞান ক'রে, বিনা চিকিৎসায় বিনা শুশ্রূষায় লোকচক্ষুর অন্তরালে জীর্ণবাসের মতো এই পার্থিব নশ্বরতনু ত্যাগ করে চলে গেছেন আজ থেকে

তিরিশ বছর আগে? তবু, ভূয়োদর্শী কবি যথার্থই ব'লে গেছেন: "এ জগতে হায় কিছুই যাবে না ফেলা, ধুলায় তাদের যতো হোক অবহেলা।" নইলে এতো বছর পর আমার মতো একজন অতি নগণ্য ব্যক্তির এতো বড়ো স্পর্ধা হয় কী ক'রে যাতে সে সব সংকোচ ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে আসতে পারে অমিত ঐশ্বর্যবান সেই মহান্ শিল্পীর স্মৃতিতর্পণ করতে!

মুর্শিদাবাদের চাঁই সম্প্রদায়

পুলকেন্দু সিংহ

চাঁই হচ্ছে বিহার ও পশ্চিম বংগে বসবাসকারী কৃষি ও মৎস্যজীবী একটি সম্প্রদায়। এরা অনার্য। এদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে।

১৯১২-এর আদমসুমারি অনুযায়ী মুর্শিদাবাদে Chain (চাঁই সম্প্রদায়ভুক্ত জনসংখ্যা হচ্ছে ২৬১৩৩। সংখ্যাটা নেহাৎ উপেক্ষণীয় নয়। এই জেলাতে বেশ কয়েকটি বড় ও মাঝারি গ্রাম আছে যেখানে শুধু চাঁই সম্প্রদায়ের লোকেরাই বসবাস করে। এখন অবশ্য সকলেই একই বৃত্তির কাজ করে না। অধিকাংশ কৃষি শ্রমিক, কৃষিজীবি, তরিতরকারির চাষী ও বিক্রেতা। এদের মেয়েরা নিকটবর্তী বাজারে তরিতরকারি বিক্রি করে। এদের বলা হচ্ছে Semi-Hinduized aboriginals এদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে—"This is probablv a lower caste and so far as Bengal is concerned is only found in any numbers in the Districts of Murshidabad and Malda. They are cultivators and labourers

এদের সকলেই যে অশিক্ষিত তা নয়। আজকাল অনেকেই শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রণী। বিশিষ্ট আলকাপওয়ালা ধনঞ্জয় মণ্ডল ওরফে ঝাকসু চাঁই সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের মধ্যে অনেকে আবার বড়জোতের মালিক ও অর্থশালীও আছেন। জোতজমি, গরু বাছুর, পাকাবাড়ি, টাকা পয়সাওয়ালা চাঁই মণ্ডলেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। জঙ্গীপুর, বহরমপুর, লালবাগ মহকুমাতে সাধারণতঃ

দিয়ার বা চর এলাকাতে বা গঙ্গাতীরবর্তী বা পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলে এরা বাস করে।

মুর্শিদাবাদে অনেক গ্রামেই চাঁইরা বাস করে। তাদের মধ্যে কয়েকটি গ্রামের নাম মনে পড়ছে, যেমন 'আলের উপর' কালীডাঙ্গা, কালীতলা, দিয়ার, মানকরা, হালালপুর, গোসাঁইডুব, নিয়াদবাগ গোবিন্দপুর, মুক্তারপুর, পাল-পাড়া, বাজারপাড়া, রাধারঘাট, রাণীনগর, সন্ন্যাসীডাঙ্গা, লালবাগ, জাফরাগঞ্জ খোসবাগ, বরানিয়া, গণেশপুর, জিয়াগঞ্জ, ঠেকুলিচর হরিনগর, পরিপাড়া, ডুবুপাড়া, খুচুপাড়া, কাতলামারী, নিস্তার, চাতড়া, পরাইপুর, জোয়কল, আসরিয়া দহ, লালগোলা, শাহচর প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামগুলিতে এরা বসবাস করে।

বহরমপুর থানার হরিদাসমাটি অঞ্চলের অন্তর্গত কলাবেরিয়া গ্রামে ১২৫ ঘর চাঁই বাস করে। এই গ্রামের একটি চাঁই পরিবারের কিছু বিবরণ দিচ্ছি। এর থেকে চাঁইদের সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারা যাবে। এই গ্রামে বেশ কয়েক ঘর চাঁই বাস করে। অধিকাংশ বাড়ি পাটকাঠির খলপা দিয়ে তৈরি, মাথায় খড়ের চাল। এদের গৃহপ্রধানের নাম তিনু মণ্ডল। চাঁইরা বলে চাঁই মণ্ডল। পিতা কাত্তিক মণ্ডল। স্ত্রী সুভদ্রা। তিন মেয়ে-মিনতি সরি, কল্পনা। চাষ আবাদ করে। মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজ করে। বাজারে তরিতরকারি বিক্রি করে। প্রতিদিন বহরমপুরে তরকারি বাজারে ছাতু, ডাল শাকসবজি, কাঠ, ঘুটে বিক্রি করে। গোত্র—কাশী। পূর্ব নিবাস—বিহারের সাহেবগঞ্জের কাছে। ভাষা—বাংলা ও দেহাতি হিন্দীর মিশ্রণে বিলম্বিত ভংগিতে উচ্চারিত এক মিশ্র বাংলা। এদের ছেলেরা জন্মে এদের বাড়িতেই। জাতাশৌচ হয়। ১১ দিন জাতাশৌচ। নামকরণ হয় শিশুকালে। পরিবারের লোকেরাই নামকরণ করে। অন্নপ্রাশনের রেওয়াজ আছে। এদের নিজস্ব পুরোহিত আছেন। নাম দেওকি পণ্ডিত। পশ্চিমী ব্রাহ্মণ। ইনি বহরমপুরে বাস করেন। সরকারী ভাবে চাঁইরা তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। বিয়ে হয় রাম মতে। পূর্বে পাত্রকে পণ দিতে হত। এখন কন্যা পক্ষকেই বরপণ দিতে হয়। এটা এদের ওপর পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাবের একটা দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য এদের অধিকাংশ খুবই দরিদ্র। জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু। এই গ্রামের অধিকাংশ কৃষি শ্রমিক। জমি ভাগে চাষ করে থাকে অনেকে। তরকারি কেনা-বেচা অনেকেরই পারিবারিক বৃত্তি। এতে স্ত্রী-

পুরুষ উভয়েই নিয়োজিত থাকেন। চাষের কাজ করে এরা কিন্তু নিজেদের জমি জায়গা নাই বল্লেই চলে। লেখাপড়া শতকরা দুজন শেখে। আচরণ সাধারণতঃ ভালই। তবে এদের দলবদ্ধ তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহাও লক্ষণীয়। এরা নেশা ভাঙ করে। তাড়ি, বিড়ি, মদ, তামাক, চা, পান, দোক্তা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে খায়। এদের মেয়েরা খুব অলঙ্কারপ্রিয়। এদের গায়ে হাল্কা বাজু পাইচি, নিকরি, চাঁদির কাঁকন, চুড়ি ও গলায় হার, নাকে নাকছাবি, পায়ে মল পায়ের আঙুলে চুট্‌কি ইত্যাদি দেখা যায়। গৃহস্থালীর তৈজসপত্র অতি সাধারণ বাসনপত্র পেতল ও অ্যালিউমিনিয়ামের তৈরি। এরা পূর্বে শাঁখা সিঁদুর পরত না, লোহা পরত না। তাই বিয়েতে সিঁদুর দানের ব্যাপারটা এখনো ততোটা আবশ্যিক নয়। তবে রীতি অনুযায়ী শাঁখা সিঁদুর অনেকেই পরছে এখন। আগে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল। এখন মেয়েদের বড় হয়ে বিয়ে হচ্ছে। পূর্বে মেয়েরা ঘাঘরা জাতীয় (ঝুলা) পোষাক প'রে থাকত। এখন শাড়িই মেয়েদের প্রধান পোষাক। এদের পাল পরবের মধ্যে ছট্ পরবই প্রধান। এছাড়া কালী, রাম প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীরও পুজো করে এরা।

বিয়েতে মেয়েরা ঢোলক সংগতের সংগে নাচগান করে। বিয়ে সাধারণতঃ হিন্দু মতে হয়ে থাকে। শব দাহ করা হয়। ১২ দিন অশৌচান্তে শ্রাদ্ধাদি হয়ে থাকে। এদের প্রধান খাদ্য ভাত, ছাতু, রুটি, মাছ, মাংস ইত্যাদি।

চাঁই সম্প্রদায়ের সংগে মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষিত সম্পন্ন সমাজের যোগাযোগ প্রতিদিনের। তাদের প্রাত্যহিক সুখী জীবনযাত্রা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে এই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সহজলভ্য শ্রম ও সেবার ওপর। আর সেই জন্যই মানুষ হিসেবে এদের মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা মোটেই সচেতন নই। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যে কিছু কিছু সরকারী সুযোগ সুবিধে প্রচলিত আছে। কিন্তু শিক্ষালোকবঞ্চিত এই সম্প্রদায়ের কাছে সেই সুযোগ সুবিধের সামান্যই গিয়ে পৌঁছুতে পারে। সমাজসেবীদের সহৃদয় দৃষ্টি এই হতভাগ্যদের ওপর পড়ুক।

এবারে কালীপুজোয় জোর ধুমধাম, দুর্গাপুজোর চেয়েও বেশি। জোর-জুলুম নেই, তবু চাঁদা উঠেছে হুরহুর করে।

জয় মা! বঙ্গসংস্কৃতির মুখরক্ষা করেছ। সর্বজনীন পুজো, পর্বনির্বিশেষে মাইকের অষ্টপ্রহর আর ড্রাম-ভগরের সঙ্গে বিসর্জনের মোচড়-মোচড় নাচ—এই নিয়েই না আমাদের বঙ্গসংস্কৃতি! আর চাঁদার রসিদ ত' তারই তাম্রপত্র!

* * * *

নর্দমা-পেন্টুল ফুলে-ফেঁপে এখন এলিফ্যান্টো। সার্টের কলার ঝুলতে ঝুলতে বিলিতি কুকুরের কান আর মাথার রুক্ষ চুল এখন কোমর ছুঁই ছুঁই।

শুনেই সম্পাদক বললেন :

"চোঙা প্যান্ট ঠোঙা হল, জুলফিতে জট,
মিনিরা ম্যাক্সি হল, খোঁপা হল মঠ।

* * * *

শুনছি এক আদর্শ কুমীর ব্যাঙ্ক খোলা হচ্ছে উড়িষ্যায়।

সাধু সাবধান! কে জানে সমাজের হরকিসিমের কুমীরকে একত্রে মার্জ করার উদ্দেশ্যেই এই আর্জ কিনা, বললেন প্রেমদাস গুঁই।

* * * *

সমস্ত জিনিষপত্রের দাম ও ওজন লিখে রাখতে হবে, দোকানে এবং প্যাকেটের গায়ে—সরকারী নির্দেশ।

তাতে কি হয়েছে? "লোক্যাল ট্যাক্সেস এক্সট্রা"—অতএব মাভৈঃ! আমরা এগিয়ে যাবই।

* * * *

নারীবর্ষ শেষ না হয়ে নাকি নারীদশকে স্ফীতিলাভ করেছে।

আহা, এই স্ফীতি শতপ্রসূ হোক—এই প্রার্থনা।

* * * *

ইনকামট্যাক্স আর এনফোর্সমেন্ট বিভাগের জয়জয়কার। কালোটাকার

স্বেচ্ছাঘোষণা. গোপন আয়-সম্পদ উদ্‌ঘাটনে আর চোরাচালান বন্ধে সাফল্যের পর সাফল্য !

আমি চিনি গো চিনি তোমারে, সফল-বাহিনী !

*　　*　　*　　*

পণ দেওয়া-নেওয়া আইনত অপরাধ ।

তাতে কি ? বরযাত্রীর রাহাখরচ আর আদর-আপ্যায়ন এবং বৌভাতের অতিথি-নিয়ন্ত্রণ (নিমন্ত্রণ নয়) — এ ত' আর পণ নয় । আর বাকি যা দেবেন তা তো আপনার মেয়েকেই দিচ্ছেন, তাই না বেই মশাই ?

*　　*　　*　　*

আবার আইন—খাদ্যে ভেজাল দিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ।

আরে ভেজালটা দিচ্ছে কে ? আমাদের সব খাঁটি । উৎকর্ষের খাতিরে কখনো-সখনো এটা-সেটা মেশাতে হয় বটে কিন্তু আসলে বদ তো আমাদের পেটটাই । হজম হয় না, তাই বলি বদ-হজম ।

*　　*　　*

এগারো-ব্যাগারো ভাগো আজি,
দশের খেলায় ধোঁকাবাজি ।
পড়ো-না-পড়ো কেয়া পরোয়া,
সাফাই শিখো কাম-খরোয়া ।
ফাট্টো-কেট্টো কোই না হোগা,
ফেল না করেগা মোটে-কি-রোগা !

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নবতম নিরীক্ষা !

—

হাসপাতালে/সুধীর নন্দী

হৃদযন্ত্রে ছন্দপতন।

মৃত্যুর প্রত্যুষ-লক্ষণ বুঝি।

ভগবান,

তুঁহু মম শ্যাম সমান,

তুমিই মৃত্যুর স্বরূপ লক্ষণ।

তবে আবার এই তটস্থ লক্ষণের

বহ্বারম্ভ কেন?

এরা তো কেউই সত্য নয় —

জলের বুদবুদের মত,

মরুভূমিতে ওয়েসিস,

রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম।

এই ছলনা কেন?

হৃদযন্ত্রের উপর তলার সঙ্গে

নীচের বাসিন্দাদের মিল হচ্ছে না :

ইসিজি দিচ্ছে খবর।

তা দিক

ওতে ভয় নেই।

ভয় তোমাকে নিয়ে।

তুমি যখন ছলনা কর,

বুঝতে পারি না তোমাকে।

দেখতে পাইনি তোমাকে,

যখন দেখি তখন আমার

তুরীয় অবস্থা : ভূমার কণ্ঠলগ্ন।

হাসিতে আমি তখন উদ্ভাসিত চৈতন্য,

ওরা কিন্তু কাঁদে।

এমনটা কেন হয় বলত?

পরশুরাম/অনীশ ঘটক

নয়নাজোড়ের বাসুমতী
আড়াই কেজি চাল
কোমরে কোঁচড়ে লুকিয়ে
দু'একবার হোমগার্ডের হাতে
বেআব্রু হয়ে
শেয়ালদার অবারিত দাক্ষিণ্যের
সামনে এসে পড়ল।
সে দাক্ষিণ্য নয়নাজোড়ে ফিরতে দিলনা
বাসুমতীকে।

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে
হারিসন শেয়ালদার মুখে
শেষরাত্রে সে সন্তানের জন্ম দিল
বাপ কে তা ঠিক খেয়াল নেই ওর
কানহা মিয়া, সনাতন ঠাকুর
না গোলাপ মাস্তান।
সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই কান্না।
উলুধ্বনি দিচ্ছিল তখন
ময়লা ফেলা গাড়ির আওয়াজ
প্রথম ট্রামের ঘড়ঘড়ি
মঙ্গল শাঁখ বাজাচ্ছিল
শেয়ালদার শান্টিং ইঞ্জিনের
আর্তনাদ।

জোৎস্না আর প্রথম পূবের
আলোর ঘোমটা পরে
বিষাদময়ী কোলকাতা
শাপমুক্তির আশায়
এতদিনের আগলে রাখা কুঠারটা
নবজাতকের হাতে দিয়ে গেল।

উত্তরাধিকার রক্তের দ্বিজত্বে/ব্রজগোপাল রায়

অথচ আমি কিছুই জানি না·········

প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে জন্মাচ্ছে সে

আমার রক্তে দ্বিজত্ব লাভ ক'রে

আমার উত্তরাধিকারে।

অথচ আমি জানলেও কিছু করার নেই।

তারা তাদের দাবির তুল্যাংশের একচুল ন্যূন

ছাড়তে চায়না ; আমার স্থাবর অস্থাবর

যা কিছু সবেরই উত্তরাধিকার

রক্তেই জন্মায় ,

উত্তরাধিকার — পূর্ব্বপুরুষে···উত্তর পুরুষেও······

অথচ আমি কিছু জানবার আগেই

আমার রক্তের রং-এ একাকার হ'য়ে গেলে

আমিই নতুন ক'রে জন্মাই······।

ওরা সব কেউ কি জাতিস্মর

অথবা—জাদুকর······!

অথবা, অনেক অন্ধকার ঘেঁটে ঘুঁটে

চোখ উল্টিয়ে পুরোনো দলিল দেখে নিয়ে

সপ্তস্তর যোনির অন্ধকার থেকে

সপাটে ছুড়ে দেয়—ছাড়পত্র

মোহরাঙ্কিত নীলখামে ;

অথচ আমি নিজেই জানি না

ওরা আমারই রক্তে জন্মায়

দ্বিজত্ব লাভ করে

আমার উত্তরাধিকারে·········।

———

Regd No. RN 24688/73
CHETANIK (Progressive Lit. Qly) Year 3 No. 3
Edited & Published by ATUL CHANDRA BANERJEE from P.O. & DIST. MURSHIDABAD, WEST BENGAL & Printed by him from Cygnus Printing Co-operative Society Ltd, Berhampore, West Bengal.

'চেতনিক' সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য :

'দেশ' : '………খ্যাত-অখ্যাত সকলের লেখায় 'চেতনিক' সাহিত্যে নিজস্ব কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে পেরেছে। খাঁটি সাহিত্যপ্রীতি না থাকলে এমন হয় না।' **'যুগান্তর' :** "'চেতনিক' একটি সত্যিকারের মননশীল পত্রিকা।…" **'সত্যযুগ'** '……এই পত্রিকায় যে-সব রচনা স্থান পেয়েছে তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। **দেশিকোত্তম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন) :** '……একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই পাতাগুলি উল্টোতে সুরু করি। কিন্তু দু'খণ্ডের সব প্রবন্ধগুলি পড়লাম। দেখলাম মফস্বল থেকেও ভাবাবার মতো পত্রিকা বের হতে পারে…।' **অন্নদাশংকর রায় :** " 'চেতনিক' বেশ উচ্চাঙ্গের পত্রিকাই হচ্ছে। কলকাতায় ও এর মতো পত্রিকা খুব বেশি নেই। ……ভাবছি এইসব পত্রিকা টিকে থাকবে কি ক'রে!" **নারায়ণ চৌধুরী :** '……আপনার এবারকার সম্পাদকীয় (শারদীয় ১৩৮২) একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। আপনার 'চেনা গোলাপ' খুব ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়লাম। ……নতুন এই সিরিজের লেখাগুলি আমি সাগ্রহে পড়বো ও আপনাকে আমার মতামত জানাবো।…'

কবি হীরালাল দাশগুপ্ত : " 'চেতনিক'-এর পর পর প্রতি সংখ্যা আরো ভালো—আরো ভালো হচ্ছে। নিঃসন্দেহে 'চেতনিক' একটি উচ্চ প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যপত্রিকা। সহৃদয় শিল্পানুরাগী পাঠক মাত্রেই 'চেনা গোলাপ' পড়ে অভিভূত হবে। 'কস্মৈ দেবায়' এবং 'অথ খ্যাসাহি প্রসঙ্গ' এই দুটি প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে আপনি যে প্রকাশরীতির প্রবর্তন করেছেন তা শুধু অভিনবই নয়—উচ্চস্তরের শিল্পকৌশলপূর্ণ এবং খুবই ফলপ্রসূ। **অধ্যক্ষ হিমাংশুবিমল মজুমদার (বিনয়ভবন, শান্তিনিকেতন) :** '…… এই প্রকার উচ্চমানের পত্রিকা সম্পাদনার কাজ দুরূহ ব্যাপার। তাই তোমাকে অভিনন্দিত করি। প্রবন্ধ দিতে অতি অবশ্য চেষ্টা করব।' **বার্ণিক রায় :** "'চেতনিক' সম্প্রতি কলকাতার যে কোনো পত্রিকার মানকে হা'র মানাতে পারে। বড় লেখকের গুণে নয়, ভাল লেখার জোরেই।" **বোম্বানা বিশ্বনাথম্ :** 'এমন সুন্দর ছিমছাম পত্রিকা মুর্শিদাবাদে বসে করা যায়! 'চেতনিক' না দেখলে না পড়লে বিশ্বাস হতো না।' **বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় :** '……প্রবন্ধটি ('চেনা গোলাপ') সত্যিই ভাল হয়েছে! শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সান্যালের 'স্মৃতির অতলে'-র পর এমন রাইকিলি মেজাজ বিশেষ মনে পড়ে না।……'

কল্পতরু সেনগুপ্ত : " 'চেতনিক' নিঃসন্দেহে উঁচু দরের কাগজ হয়েছে।"

চেতনিক

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতিক্ষেত্রে 'অঘোর-পন্থী' দুর্নীতি বিকৃত রুচি ও চেষ্টাকৃত দুর্বোধ্যতার বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামরত ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র।
প্রকাশকাল : জুলাই/পুজা/জ্যানিউয়ারী/এপ্রিল।
প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭৩

চেতনিক

সম্পাদক :
অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পোঃ ও জেলা : মুর্শিদাবাদ/পশ্চিমবঙ্গ

চেতনিক

তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা (১৯৭৫-৭৬)

প্রগতিশীল ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র

প্রকাশকাল :
জুলাই/পুজো/জানুয়ারি/এপ্রিল

সম্পাদক :
অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পোঃ ও জেলা : মুর্শিদাবাদ/পশ্চিমবঙ্গ

সূচী

ভুষিভিত্তিক

সম্পাদকীয়

তীব্র আর্জ আর তজ্জাত আর্জেন্সি নিয়ে বঙ্গভূমি থেকে উমার্জ করেছিলো যে ক্লিন কেলেঙ্কারিটা, কালক্রমে তা মেয়েদের ইতুপুজোর উপকরণের মতো ধামাচাপা পড়লেও একেবারে বিস্মৃতির অতলে যে তলিয়ে যায়নি·· সে কথাটা বুঝলেম সেদিন 'চা-তক মজলিস'-এর রাজাউজিরমারক রবিবাসরীয় সান্ধ্য আসরে। না না, বিরক্ত হবেন না। ভাবছেন তো, ভুষি আবার একটা বস্তু, তাই নিয়ে এতো নেকেরাপনা, এতো খিটকেল, এতো কেলেঙ্কারি! কিন্তু ভাই, একবার বাস্তবে নেবে এসে ভেবে দেখুন তো—এই ভুষি নিয়েই কি আমরা অষ্টপ্রহর কষ্ট পাচ্ছিনে মনে মনে জনে জনে, কষ্ট দিচ্ছিনে আপনপরকে ঘরেবাইরে? পরমার্থকে নিয়ে আবার কে কবে কেলেঙ্কারিটা করেছে বলুন? কেলেঙ্কারি মাত্রেই ভুষিকেন্দ্রিক, কখনো অধীর আগ্রহে কেন্দ্রাভিগ, কখনো

বিধিই বৈরাগ্যে কেন্দ্রাতিগ। ভুবি নিয়েই আমরা খুশি। ভুবি নিয়েই আমরা ছুবি একে অপরকে। কখনো-বা সেই অপরের নাসিকাগ্র টিপ্ ক'রে ছুড়ি ঘুসি। কখনো বা তাক বুঝে বেবাক এই ভুবি দিয়েই তুবি অফিসের তথা দীন দুনিয়ার তাবৎ মালকড়ির মালিককে। শুধু ভুবিজাত মুনাফার মোহেই যে মুগ্ধ আমরা তাই নয়, এমনকি অবিমিশ্র এই ভুবরূপ ঐশ্বর্যের লালসাই পুষি আমরা অহরহ অন্তরের অন্তস্থলে। আর যদি মতি বসুর সপ্তরথীর ভরসা পাই তাহলে নরক গুলজার ক'রে ব'লেই ফেলি: বিবজর্জর বিংশশতকের আমাদের এই 'নব্যসভ্যতা' পদার্থটাই হ'লো ভুবিভিত্তিক।

আর শুধু বিংশশতকের কথাই-বা বলি কেন? উনিশ শতকের ছবিটাই-বা কী কম ছিলো ভাবুন তো। বিস্মৃতির অতলে বিলুপ্তপ্রায় গুপ্তকবির মুখরোচক মন্তব্যটা একবার মনে পড়িয়ে দিই তাহ'লে। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে স্তুতি করার ছলে তাঁরই রাজত্বকালে নীলকরদের অত্যাচারের পশ্চাৎপটে বাঙালি চরিত্র কী মনোহর রূপেই না ফুটিয়ে তুলেছিলেন 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক বঙ্কিম-দীনবন্ধু অক্ষয় দত্তের কবিগুরু ঈশ্বর গুপ্ত নামে অধুনালুপ্ত এই যুগাগ্রযায়ী বিচিত্র ব্যক্তিটি:

হ'লে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা, ঘটে সর্বনাশ।
কালসাপ কি কোন কালে, দয়াতে ভেকে পালে,
টপাটপ্ অমনি করে গ্রাস॥
বাঙালি তোমার কেনা একথা জানে কেনা?
হয়েছ চিরকেলে দাস।
করি শুভ অভিলাষ॥
তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস॥
যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুষি পেলেই খুশি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না॥

তাহলে সেযুগেও আমরা, পোষাগরু এই বাঙালি জাতটা, ভুষি পেলেই খুশি হতেম! শিং বাঁকাতে তখনকার গরুগুলোও জানতো না! তাই ভুবির

ভয়ে সর্বদাই থাকতো তারা তটস্থ, লেজনাড়িয়ে সর্বদাই ভুয়ো আত্মসম্মানের টকটকে কার্বাঙ্কেলটা সযত্নে চলতো বাঁচিয়ে। আর গোরামুখ দেখলেই খোড়া 'আঙ্কেল আঙ্কেল' বলে বুটতলে লুটিয়ে পড়ে আর্জি জানাতো যেন তাদের ভুঘি-ভর্তি গামলাটা সেই বুট ঝেড়ে সক্রোধে ভ্যাট করে ভেঙে না বসে তারা।

খাগড়া বাজারের অপ্রশস্ত রাজপথে গাঁদি পিপড়ের মতো; থিকথিকে ভিড় ঠেলে এই সেদিন সাইকেল চালিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ সামনে দেখি ব্যাজ-ধারী পতাকাবাহী সারিবদ্ধ নরনারীর চিলকণ্ঠ মিছিল। বলা বাহুল্য আহত হলো এমন দৃশ্যে দীর্ঘকাল অনভ্যস্ত পোড়া চোখদু'টো। 'হা হতোহস্মি' বলে ডুকরে উঠতেই পার্শ্ববর্তী সন্তোনবাবু ঠুকরে দিয়ে, মানে একটু ধমকে দিয়ে, ব'লে উঠলেন, 'চমকে উঠলেন কেন? এরা চাঁদ চায় না, ভুষি চায়। আর বুকে ওগুলো ব্যাজ নয়, চুষিকাঠি।' অতএব ভেলেজলে নয়, ভুষিতে আর চুষিতেই 'মানুষ' আজ সেকালের সেই দুর্ধর্ষ বাঙালি। ফলত আমি আশ্বস্ত হয়েই গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হলেম।

তবু আজও খটকা লেগেই থাকে একটা। ভুষিমালই যদি ইষ্টমন্ত্র হয় রতিশাস্ত্র গুরুদের, তাহ'লে হয়তো কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে সদাসতর্ক মতি বসুদের সপ্তরথীর সাজানো বূ্যহের ঘেরবন্দী হয়ে ওদের ফন্দিফিকির সিকির সিকিও কেরামতি দেখতে সক্ষম হবে না। আলুফাঁক ঝিঙেফাঁক পটলফাঁক বেগুন ফাঁক—কোন ফাঁক-ই আর জাঁক ক'রে জয়ের শাঁখ শোনাতে পারবে না তাদের হাটের এই আপনিমোড়ল গাড়লটাকে। ফলে অ-বন্দি গোবন্দি হবে। শেয়ালের বাপ দেয়াল দেবে। ঘোলা জলে ছিপ ফেলে তপ্তশৃংগ জামদগ্ন্য ঋষি মতি বসু অচিরেই গণসমর্থনের পিঠে চেপে হুস্ করে এম এল এ হবার খোয়াব দেখবে, চাইকি যদি ভাগ্যে নৈবচ সম্ভবতি তবে হয়তো হন্দমুদ্দ পদ্ম-বিভীষণও হবে। বিনিষ্ঠি বাবের দারুণ বোতল বগলদাবা ক'রে সংস্কৃতির সংকর শাখামৃগের মতো অবলীলায় একলম্ফে আশাবিড়ম্বিত অন্নদেবতার স্কন্ধোপরি আরোহণ করে ব্যাদস্ত দশনে তাকেই দংশনের পোজপস্চার মারবে। তাই সেই পরম পরিণামের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মন্দ লাগিয়ে দেওয়া বোধ করি মন্দ হবে না ভাবিকালের সুসাজিষাংসু পুণ্যশ্লোকা স্নেহলতাদের :

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক, বাবা সব হ্যায় ফাঁক
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক, বাবা মিছা জাঁক।
পেয়েছ যে কলেবর   দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর পুড়ে হবে খাক্।

... ... •

চইয়া আশার বশ ভ্রমে চাহে মিছা যশ
বিষয়বিষের রস, নহে পরিপাক।
কেবা পুত্র কেবা বধূ শুধু বিষ নাই মধু
মিছা মায়া পুত্রবধূ শেষ কুম্ভীপাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক॥

[ঈশ্বর গুপ্ত মৃটাটিস্ মৃটান্ডিস্]

হ'লে কী হবে। আমার ধমনীতেও তো সেই একই রক্তধারা প্রবাহিতা। খালি মনে হয়, ঘুসি খেলে বাঁচবো না। বরং আজীবন ভুষি পেলেই খুশি হবো। শিং বাঁকিয়ে কী হবে! কে কখন এসে খুঁটিশুদ্ধ উপড়ে তুলে হয়তো গোয়াল থেকেই দেবে ধাঁ ক'রে হাঁকিয়ে। বোকার মতো হাঁ ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে এই অসহায় আত্মবিতাড়নের দিবাদৃশ্য দর্শন করা ছাড়া তখন আর হয়তো নাস্তি গতিরন্যথা। তার চাইতে বরং হেমন্তকন্যাকে ডেকে বলি, আয় তো মা! তোর সেই প্রাণমাতানো গানখানা গা'তো দেখি একবার:

ভুষিমাল ভুষিমাল, তুমি যে আমার
ভুষিমাল ভুষিমাল, আমিও তোমার॥

———

জনতা / হীরালাল দাশগুপ্ত

আলো আর অন্ধকার বিড়ম্বিত আপাদমস্তক
জনতার শরীরের রোম কূপে কূপে
পর্বে পর্বে চরণে চরণে
ক্ষুধার্ত ক্রুদ্ধ গদ্য কবিতার মতো
মূঢ় বন্ধুরতা
বন্ধ্যাত্ব-বিহ্বল।
মুখে তার ভাস্কর্যের কারুকার্য নেই।
চোখে নেই মর্মরিত নগ্ন ছায়া স্বপ্ন উর্বশীর।
এই মুগ্ধ জনতার মস্তিষ্কের গূঢ় কোষে কোষে
অপকেন্দ্রী মননের বিচিত্র জটিল জাল
মাকড়সা বোনে না!
জনতা অরণ্যে সেই ক্রৌঞ্চ মিথুন!
জনতার কণ্টকিত কর্কশ লোমশ আকাশে
বলাকার শাদা স্বপ্ন বিধূনিত পাখাপথ নেই।
অর্থহীন ধ্বনিতে বাণীতে কিংবা বর্ণব্যঞ্জনায়
তারা কোনো ইন্দ্রিয়ের অতীন্দ্রিয় আত্মরতি আলেখ্য
আঁকে না।
গোয়ালিয়র গণ্ডা-র কথা তারা জানে।
তাদের ভূগোলে নেই উজ্জয়িনী শ্রাবস্তীর নাম!
বহমান বক্তার
স্ফীতকায়
শূন্যগর্ভ
সংখ্যার পণ্য প্রয়োজনে
সংখ্যাতীত শূন্য শুধু
জনতা!
জন নয়। শুধুই জনতা।
বৃক্ষহীন মহারণ্য!
জনহীন মহান জনতা!

কিছু কি গোপন নেই জনতা জীবনে ?
কংকাল আগুন দিনে
চিতাভস্ম রাতে
ভুলেরা কি ভুল কোরে কোনো গূঢ় চক্রান্ত করে না ?
ঘরে ঘরে মনীষী জীবনী,
গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে পৃথিবী কল্পিত কাহিনী
সভ্যতার ধূর্ত ইতিহাস
কে শোনায়, কেবা শোনে, জনতার কথা ?
শুধু ধোঁয়া ?
ধোঁয়া আর অগণিত সংখ্যার ধোঁয়াটে নিশ্বাস ?

সমুদ্রের বুকে চুপি চুপি চোরেবর মতোন
রাত্রি আসে !
অরণ্যের চোখে চুপি চুপি চোরের মতোন
রাত্রি আসে।
ঠাণ্ডা—অন্ধকার মাটিতে মাটিতে বীজ বোনে
চুপি চুপি চোরের মতোন বীজ বোনে
বীজ বোনে সময় মিথুন ! বীজ বোনে !
চলো যাই, রাত্রির শো-তে
সত্যজিৎ রায়-এর সাম্প্রতিক ছবি
জন অরণ্য দেখে আসি।

ডেভিড হেয়ারের ধর্মনিরপেক্ষতা

নারায়ণ চৌধুরী

মহামতি ডেভিড হেয়ার সাহেবের উদার ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেকেই অনেক প্রকার আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর মানসিকতার একটা লক্ষণীয় দিক এখনও যথোচিতরূপে আলোচিত হয়েছে ব'লে মনে হয় না—তাঁর চিন্তার ধর্মনিরপেক্ষতার দিক। তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, অন্ততঃ তাঁর অনুসৃত শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজমের আদর্শ অব্যভিচারীরূপে অনুসরণ করে গেছেন তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। ব্যক্তিজীবনে তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন কি ছিলেন না তা আমরা জানি না। হয়ত তিনি গভীরঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, হয়ত বা ধর্মের মূলতত্ত্বগুলির প্রতি তাঁর অন্তরের গহনে প্রগাঢ় আস্থা ছিল, এমনকি এ কথাও জানা যেতে পারে যে ক্রীশ্চিয়ান ধর্মের সকল মত তাঁর গ্রহণীয় না হলেও যীশু খৃষ্টের ব্যক্তিগত জীবনের শুদ্ধতা ও পবিত্রতায় তিনি কোন সময়েই সংশয় প্রকাশ করেননি এবং তাঁর প্রতি হৃদয়ে নিবিড় শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন বরাবর। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে তিনি তাঁর এই ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকে কখনও তাঁর শিক্ষাপ্রসার চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে দেননি। শিক্ষাকে তিনি আগাগোড়া ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার রাখবার প্রযত্ন করেছেন।

হেয়ার সাহেবের এই বৈশিষ্ট্যটিকে আমি বিশেষ গণনীয় বৈশিষ্ট্য বলে বলে মনে করি আর এই প্রসঙ্গেই আলোচনার জন্য আজ দু'কথা বলতে প্রয়াসী হয়েছি।

আমরা আজকাল সেক্যুলারিজমের কথা খুবই বলে থাকি। শিক্ষানীতিতে এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সর্বৈব অনুসরণ করে চলা উচিত বলে মত প্রকাশ করে থাকি। অবশ্য শিক্ষায় এবং রাষ্ট্রিক কর্মকাণ্ডের বাস্তব রূপদানের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমরা পুরোপুরি মেনে চলছি কিনা সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র প্রশ্ন তবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, সেক্যুলারিজম আজকের দিনের প্রগতিশীল চিন্তার মানদণ্ডে খুবই শ্রদ্ধেয় একটি দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাকে জনজীবনের বিবিধ ক্রিয়াকর্মে অনুসরণ করে চললে সমূহ লাভ।

আমাদের দেশে এই সেক্যুলারিজমের আদর্শেরই একজন অগ্রচারী ভাব নায়ক ছিলেন ডেভিড হেয়ার। তিনি তাঁর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম বলতে যে জিনিস আমরা বুঝি তাকে কোন সময়েই প্রবেশাধিকার দেননি—শিক্ষাকে বরাবর ধর্মের সংস্রব থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছেন।

আর ঠিক এই কারণেই দেখা যায়, হিন্দু কলেজের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান শিক্ষক বিদ্রোহী ভাবুক ডিরোজিয়োর নেতৃত্ব চালিত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর প্রতিভাবান ছাত্রসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে অন্তরের মিল ছিল। আর 'ইয়ং বেঙ্গল'রাও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও গভীরভাবে ভালবাসতেন। এই শ্রদ্ধা ও প্রীতির মূলে ছিল উভয়পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য। হেয়ার সাহেব নিজে খুব লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি জীবনে। স্কটল্যাণ্ডের এক স্বল্পশিক্ষিত যুবক ভাগ্যান্বেষণে এদেশে এসেছিলেন এবং ঘড়ির ব্যবসায়ের সূত্রে স্বীয় ভাগ্যকে ফেরাতে সক্ষম হয়েছিলেন—ঘড়ির ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। সুতরাং কি বাল্য কৈশোর-যৌবনের পরিবেশ কি কর্ম-জীবনের পরিবেশ কোন দিক থেকেই উদার শিক্ষার আলো তাঁর জীবনে প্রবেশ করার বিশেষ ফাঁক ছিল না। অথচ কী আশ্চর্য, এই মানুষটিই কিনা এই যুগের একটি চমৎকার সুস্থ ও সুন্দর নীতিকে নিজ জীবনের মর্মধারার ভিতর রূপায়িত করেছিলেন সার্থকভাবে। একদিকে এদেশবাসী বালক বালিকাদের শিক্ষার প্রসারে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে নিজের উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগসংকোচ হওয়ার অতৃপ্তি ও ক্ষোভ দূর করতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে আধুনিক। প্রগতিশীল চিন্তাদর্শের ছাঁচে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করে ঐকান্তিক যুগচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অগ্রসর ভাবনার পথিকৃৎ রূপে যাঁরা চিহ্নিত ও স্বীকৃত, যেমন রাম-মোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল, 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায় প্রমুখ, তাঁদের সমসারিতে ডেভিড হেয়ারের নামটিও স্থান পাওয়া উচিত। হেয়ার শুধুই শিক্ষাপ্রচারক ছিলেন না, শিক্ষার উদারনীতিরও একজন নিষ্ঠাবান বাহক ছিলেন।

আমরা সকলেই জানি যে, হেয়ার সাহেব রাজা রামমোহন রায়ের বিভিন্ন কর্মপ্রয়াসের একজন প্রধান সহকারী ছিলেন। রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ চেষ্টা ও অন্যান্য সমাজ সংস্কারমূলক কর্মপ্রয়াস, সংবাদপত্র দলনের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ আন্দোলন, স্কুল পরিচালনা ও হিন্দু কলেজ স্থাপনা, মেডিকেল শিক্ষা প্রবর্তনা প্রভৃতি অনেক কিছুর সঙ্গেই হেয়ার ঘনিষ্ঠরূপে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং প্রয়োজনে অর্থসাহায্য করে রাজার কর্মপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু এক রাজার ব্যাপারে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মতৈক্য হয়নি। তিনি স্কুলে ধর্মশিক্ষাদানের বরাবর বিরোধিতা করে এসেছেন। রামমোহন চেয়েছিলেন তাঁর ও হেয়ারের যুক্ত প্রচেষ্টায় যেসব ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে বা হবে, সেগুলিকে বেদান্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা হোক কিন্তু হেয়ার রামমোহনের এই অভিপ্রায় মেনে নিতে পারেননি। বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির ভিতর তিনি শুধু বেদান্তবিদ্যা কেন, কোন ধর্মবিদ্যাকেই প্রবেশ করতে দিতে রাজী ছিলেন না। বরং তাঁর ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। তিনি ইংরাজী শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও, এ দেশবাসীর মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনকেও কোনমতেই খাট করেননি। ইংরাজীর পাশে পাশে মাতৃভাষারও বিধিমতে চর্চা চলুক এই ছিল তাঁর অভিমত এবং এই দুই ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষাকেই তিনি ছাত্রদের মধ্যে প্রচারে যত্নবান হয়েছেন—ধর্মীয় শিক্ষা নয়। বেদান্ত শিক্ষা বা 'গসপেল'-এর শিক্ষা কোন শিক্ষাই তাঁর মনঃপূত ছিল না। ধর্মে খ্রীশ্চিয়ান হয়েও যে তিনি তাঁর শিক্ষার আয়োজনের ভিতর বাইবেলকে স্থান দেননি এটা অসামান্য স্বাধীনচিত্ততার পরিচায়ক। মিশনারী শিক্ষা পদ্ধতির তিনি ছিলেন একজন আপসহীন বৈরী।

এই কারণে দেখা যায় মিশনারী শিক্ষার প্রচারকেরা হেয়ারের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। এঁদের শিরোমণি আলেকজাণ্ডার ডাফ হেয়ারকে মোটেই সুনজরে দেখেননি। কী করেই বা দেখবেন, তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল একটা অছিলা, এদেশীয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের নাম করে তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে খৃষ্টধর্মের কুহকের মধ্যে এনে ফেলাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। ডাফ সাহেব এই মতলবী শিক্ষাপ্রচার হেয়ারের মত একজন আধুনিক ভাবধারার ভাবুক যুক্তিবাদী উদার শিক্ষানেতার অনুমোদন পাবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

হেয়ার যে কীরকম যুক্তিবাদী আর সকল আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতিই কী রকম সমান অপ্রসন্ন ছিলেন তার দু'একটা উদাহরণ দিই।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হেয়ার স্কুলের একজন প্রতিভাবান অগ্রগণ্য ছাত্র পরিগণিত হন। কৃষ্ণমোহন যখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে উদ্যত হন হেয়ার তখন

সেই সংবাদ পেয়ে তাঁর গৃহে যান এবং তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কৃষ্ণমোহনের ধর্মান্তর গ্রহণ চেষ্টাকে তিনি এক কুসংস্কার থেকে অন্য কুসংস্কারে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে তুলনা করেন এবং এই মূঢ় পথ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত হবার পরামর্শ দেন। কৃষ্ণমোহন অবশ্য সে-পরামর্শ গ্রহণ করেননি কিন্তু এর থেকে হেয়ারের মানসিকতার ধাতের অসংশয় পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সকল আনুষ্ঠানিক তথা সাম্প্রদায়িক ধর্মের সারবত্তাতেই সন্দিহান ছিলেন।

লালবিহারী দে ছিলেন ডাফ স্কুলের ছাত্র। কিন্তু ডাফ স্কুল থেকেও হেয়ারের পটলডাঙা স্কুলে (এই স্কুলই পরে হেয়ার স্কুলে পরিণত হয়) ভাল পড়াশুনা হয় খবর পেয়ে লালবিহারী হেয়ার সাহেবের কাছে দরবার করেন তাঁকে তাঁর স্কুলে ভর্তি করে নিতে। কিন্তু হেয়ার রাজী হননি। এই যুক্তিতে রাজী হননি যে লালবিহারী ডাফ স্কুলের 'বাইবেল পড়া ছেলে' এবং 'আধা-খৃষ্টান ছেলে'। এমন ছাত্রকে তাঁর স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দিলে অন্য ছাত্ররাও তার প্রভাবে পড়ে খৃষ্টান ভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব থেকে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের রক্ষা করবার জন্য হেয়ারের এই উদ্বেগ তাঁর চিন্তাবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয় এবং তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী স্বরূপটিকেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। সকলেই অবগত আছেন যে, লালবিহারী দে পরে ডাফের প্ররোচনায় খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেন এবং উত্তরকালে স্থায়ী অধ্যাপনা কর্ম গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত খৃষ্টীয় যাজকবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকেন। এই ঘটনায় হেয়ারের দুরদর্শিতা প্রমাণিত হয়।

হেয়ারের ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের জন্য শুধু আলেকজাণ্ডার ডাফই নয়, তৎকালীন সমগ্র মিশনারী কুল তাঁর উপর বীতরাগ ছিলেন। তাঁকে তাঁরা নিজেদের সমাজপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রায়-একঘরে করে তুলতে চেয়েছিলেন। ভাবখানা এই যে, হেয়ার যেন ক্রীশ্চান সমাজের কেউ নন, তিনি এদেশীয় বালকবালিকাদের শিক্ষাদানের খেয়ালে মেতেছেন সম্পূর্ণ আপন মর্জিতে; তাঁর স্বসম্প্রদায়ের অনুমোদন এর পশ্চাতে নেই। অর্থাৎ কিনা তিনি একজন দলবিচ্যুত ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-প্রচারক, মিশনারীদের মূল ধারার ব্যতিক্রম। এক হিসাবে দেখতে গেলে কথাটা ঠিক কিন্তু দেখা যায় এই ব্যক্তিভাবুক শিক্ষা-প্রচারকটিকেই এদেশের মানুষ পরম শ্রদ্ধায় মনে রেখেছে, মিশনারীদের স্মৃতি তাদের মনের তলায় হারিয়ে গেছে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের আদিপর্বের সংগঠনায় ও বাংলা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠায় কেরী, মার্শম্যান, ফেলিক্স কেরী, ওয়ার্ড প্রমুখ

প্রথম যুগের মিশনারীদের যে-দান তার স্মৃতি নিশ্চয়ই তারা সযত্নে লালন করছে, তবে মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণ চেষ্টার স্মৃতি তাদের মনে বিতৃষ্ণা ভিন্ন আর কোন মনোভাব জাগ্রত করে না, সে কথা নিশ্চিত।

আসল কথা, ডেভিড হেয়ার এই দেশ এবং এই দেশের কালো মানুষগুলিকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। কলকাতা তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশে পরিণত হয়েছিল। তাঁর সাতষট্টি বছর আয়ুমণ্ডিত জীবনের (১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৭৭৫—১ জুন ১৮৪২) শেষ বিয়াল্লিশ বছর তিনি এই শহরেই অতিবাহিত করেন এবং এই শহরের মাটিতেই তিনি দেহ রাখেন। কে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসী কে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসী নয় লোকে সে কথা মনে রাখে না, মানুষ দেখে হৃদয় এবং সেই হৃদয়ের প্রসার। ভালবাসার এই প্রসার সাধিত হয়। এই মানদণ্ডে হেয়ার বঙ্গবাসীর অশাস্ত্র আপনার জন এবং তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মার আত্মীয়দের অন্যতম। দ্বিশত বৎসরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতিকে সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর গুণাবলীর কীর্তন আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

ডেভিড হেয়ার ঃ একটি মূল্যায়নের প্রয়াস

বিজন বিহারী পুরকায়স্থ

১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারি ডেভিড হেয়ারের জন্মদিনে হিন্দু কলেজের ৫৮৫ জন ছাত্র এদেশে শিক্ষাপ্রসারে তাঁর অবদানের প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। সেই সভায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ডেভিড হেয়ারের উদ্দেশে একটি প্রশস্তিপত্র পাঠ করেছিলেন এবং ডেভিড হেয়ার তার উত্তরে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবক্তৃতা করেছিলেন এই ঘটনা এক হিসাবে ঐতিহাসিক তাৎপর্যবহ। কেন না নব্যশিক্ষা হিসাবে প্রকীর্তিত এই আধুনিক শিক্ষার প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা তাঁদের অন্তরের কথাই তার মধ্য দিয়ে বলেছিলেন এবং এই নব্যশিক্ষার প্রধানতম উৎসাহদাতার প্রতি তাঁদের মুগ্ধচিত্তের শ্রদ্ধাঞ্জলিই এতে

অর্পিত হয়েছিল। আর ডেভিড হেয়ারের প্রতি-বক্তৃতায় ফুটে উঠেছিল মিতভাষী হেয়ার সাহেবের একান্ত একটি পরিচয়।

ডেভিড হেয়ারের জন্মের দ্বিশত বর্ষ পূর্তির এই মুহূর্তে ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণের দাবী রাখে। কারণ হেয়ার সাহেব বুঝেছিলেন " the tree of education has already taken root ; the blossoms I see around me , and if it be left to grow up for ten years more, it will acquire such a strength that it will be impossible to eradicate it " প্রশান্ত প্রত্যয়ে স্থির একজন স্বপ্নদ্রষ্টা কর্মীর সন্তোষ এখানে সহজেই প্রতিভাত। কিন্তু এগিয়ে চলার প্রেরণা প্রদানে হেয়ার সুস্পষ্ট : "To maintain and to continue the happy carreer already begun is entirely left to your own exertions Your countrymen expect it from you, for they look upon you as their reformers and instructors." সহজ ভাষায় ছাত্রদের কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রকাশ, আর বিশেষভাবে লক্ষণীয় 'reformer' আর 'instructor' কথা দু'টি। নূতন প্রেরণায়, নবচেতনায় তরুণদের উদ্বোধিত করে তোলার স্থির লক্ষ্যই এখানে অভিব্যক্ত।

এই সংলাপধর্মী মূল্যবান দলিল দু'টি বার বার অনুশীলন না করে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিচর্চা বহুলাংশে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। শিক্ষাপ্রসার আর নব-চেতনার আবাহনে প্রেরণা যোগানোর ক্ষেত্রেই ডেভিড হেয়ার তাঁর নিজের প্রথম পরিচয় রেখে গেছেন। যে জমিতে ভাববাদের ভিত্ গড়ে উঠবে তার অন্যতম স্থপতি ডেভিড হেয়ার —, শিক্ষাভিমানী বিদগ্ধ কোনো ব্যক্তি নন, একজন 'ঘড়িওয়ালা' হলেন আমাদের নব্যশিক্ষার যথার্থ অর্থেই নবযুগের দূত। এই আপাত অবিশ্বাস্য ঘটনায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পরিণামের, আপাত অভাবিত পরিণতিরই ছায়া। আর এই সূত্রে বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস তার সকল তাৎপর্য, সকল ঔজ্জ্বল্য ও সকল সীমাবদ্ধতা নিয়েই অভিব্যক্ত। সমাজবিজ্ঞানী আর ইতিহাসবেত্তা বা বিচারশীল যে মানুষের কাছে এই বিচারণার মূল্য প্রায় মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ। ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মৃতি এবং স্মৃতির মূল্যের যাথার্থ্য নিরুপণে এটা সহজেই প্রাথিত।

ভারতে ইংরাজ শাসন যখন তার সর্বব্যাপ্ত প্রচণ্ডতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সন্ধিলগ্নে, 'জাত ব্যবসায়ীদের বাসভূমি স্কটল্যাণ্ড' থেকে ১৮০০ সালে পঁচিশ

বছরের তরুণ যুবা ডেভিড হেয়ার 'ঘড়ির ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে' এলেন কলকাতায়। ১৮২০ সালের ১লা জানুয়ারি ডেভিড হেয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘড়ির ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তার অন্ততঃ পাঁচ বছর আগে থেকেই হেয়ার শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮১৬ সালের ১৪ই মে সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইস্টের বাসভবনে ইংরাজি শিক্ষার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ডেভিড হেয়ারের একটি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে আধুনিক নবশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু কলেজের' আদিকল্পক ছিলেন স্বয়ং ডেভিড হেয়ার। কার্যতঃ ডেভিড হেয়ারের কলিকাতায় অবস্থানের গোটা সময়ই, অন্ততঃ তার অধিকাংশ সময়টুকু শিক্ষা বিস্তারের কাজে কেটেছে। ১৮৪২ সালের ১লা জুন মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়া পর্যন্ত ঐ সময়ের কলিকাতায় সমগ্র শিক্ষায়োজনে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ডেভিড হেয়ার নানাভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। তারমধ্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সংক্রান্ত ১৮১৬ সালের ১৪ই মে'র সভার কথা এর মাঝেই বলেছি। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী গরানহাটায় ৩০৪ নং চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাক মশায়ের বাড়িতে কুড়িজন ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। ঐ বছরের ৪ঠা জুলাই 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির পরিকল্পনা করা হল। ১৮২৩ সালে পটলডাঙ্গায় ইংরাজী শিক্ষার স্কুল স্থাপিত হল। ১৮২৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি কলেজ স্কোয়ারের উত্তর দিকে হেয়ার কর্তৃক স্বল্পমূল্যে প্রদত্ত জমিতে সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলেন লর্ড আমহার্স্ট। ১৮২৮ সালে প্রধানত হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে ডিরোজিওর সভাপতিত্বে যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয় ডেভিড হেয়ার তার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৩৫ সালের জুন মাসে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনায় ডেভিড হেয়ারের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধারাবাহিক কোনো বিবরণ এটা নয়—কিন্তু এই তর্কাতীত তথ্য থেকে নব্য শিক্ষা, ধর্মীয় উপদলীয় প্রভাবমুক্ত আধুনিক শিক্ষায়োজনের ক্ষেত্রে হেয়ারের অবদান অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তা এক কথায় অতুলনীয়। পূর্বে উল্লিখিত হিন্দু কলেজসংশ্লিষ্ট ছাত্রদের অভিনন্দন পত্রে তাই বলা হয়েছিল: the man who breathed a new life into Hindu Society, who has made a foreign land the land of his adoption . . .

বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিল, অন্যদিকে শাসক ইংরাজ ও মিশনারি ইংরাজেরা এতদ্দেশে শিক্ষা বিস্তারও করেছেন; বিদেশী শাসনের বিদেশী শাসকদের সেইসব স্বাভাবিক লুণ্ঠনে নিপীড়নে ভাঙনে গড়নে পরিকীর্ণ ইতিহাসের সেই দিকটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে নেই। কিন্তু ডেভিড হেয়ার প্রসঙ্গে এখানে ক'টি কথা না বললে ইতিহাসের কাছে অপরাধী হতে হবে। ব্যবসায়ী পরিশেষে বদান্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল হলেও দুর্লভ নয়। কিন্তু ব্যবসায়ী ব্যবসা বিসর্জন দিয়ে এমন এক শিক্ষাপ্রসারে আত্মনিয়োগ করলেন যাতে পাওয়ার ঘরে বছরে বছরে শুধু ঘাটতিই জমে এবং যা যথার্থতঃ ধর্মনিরপেক্ষ— এই অসাধারণ পথে চলার অসামান্য মহত্বের স্বীকৃতি সবচেয়ে বেশি করে যাঁর প্রাপ্য তিনি নিঃসন্দেহে ডেভিড হেয়ার। এ হিসাবে তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৃত অর্থেই ডেভিড হেয়ার ছিলেন 'a time keeper of the then Bengal and India that was yet to be.' ঘড়ির ব্যবসায় ডেভিড হেয়ারের পক্ষে বস্তুতঃই ইতিহাসের এক স্মিত কৌতুক, অথবা আপতন। কেন না ঘড়ির ব্যবসায়ী না হয়ে অন্য কোনো পণ্যের ব্যাপারী হলে হেয়ারের মাহাত্ম্যের কিছুমাত্র হানি হতো না।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসা ব্যপদেশে ভারতে আগমন এবং এতদ্দেশে ব্যবসায়িক সাফল্য বা অসাফল্য লাভের শেষে 'স্বদেশে প্রত্যাবর্তন' এই রেওয়াজ ডেভিড হেয়ার আশ্চর্য সরলতায় ভেঙে দিলেন নিজের জীবনে। তিনি একটা বিদেশকেই তাঁর নির্বাচিত দেশভূমি করে নিলেন—ছাত্রদের অভিনন্দনপত্রের এই কথাটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

তৃতীয়তঃ, পঁচিশ বছর বয়ঃক্রম কালে হেয়ার ঘড়ির ব্যবসা করার জন্য যখন ভারতে এলেন তখন তিনি শিক্ষার বিরাট কোনো ঝোঁক নিয়ে অবশ্যই আসেননি, 'মিশনারি' তিনি ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে যাত্রারম্ভে দাঁড়িয়ে নব্য শিক্ষার, আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজন তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় বাঞ্ছিত বিষয় বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং সন্দেহ মাত্র নেই, যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ (secular) শিক্ষার প্রচলনেই প্রথমাবধি তিনি তৎপর ছিলেন। ছাত্র হিসাবে হিন্দু স্কুলে যোগদানেচ্ছু রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-কে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্য দিয়ে ডেভিড হেয়ারের শিক্ষাদর্শ সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ডাফ সাহেবের স্কুলের ছাত্র লালবিহারী বাইবেল পড়েছেন

কিন্তু ডেভিড হেয়ার চাননি বাইবেল-পড়া শিক্ষার অঙ্গ হোক। তাঁর মতে শিক্ষা, আধুনিক শিক্ষা, হবে ধর্মনিরপেক্ষ। এই ঘটনা সম্পর্কে "বাংলায় নব চেতনার ইতিহাস" নামক তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে বিশেষ বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন ডঃ স্বপন বসু।

আর 'এশিয়াটিক' কলেরায় মৃত্যুবরণ হেয়ারের জীবনের আরেকটি চরম ঘটনা যাতে ইতিহাসের কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ্য না করে উপায় নেই।

এই সব কিছু মিলিয়ে বাংলার নবচেতনার ইতিহাসে ডেভিড হেয়ার প্রথম বিদেশীয় স্বদেশী। ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার নিরিখে ডেভিড হেয়ার প্রথম আধুনিক ব্যক্তিত্ব, নিজের কবরের জন্য ধর্মীয় গোরস্থান থেকে দূরে লোকায়ত ভূমিখণ্ড নির্বাচনে সেই ব্যক্তিত্বেরই চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তি। নিরপেক্ষ বিচারে প্রতিষ্ঠানগত ধর্মব্যবসায়ের বিরোধী ডিরোজিও-র তুলনায় ডেভিড হেয়ারের চিন্তা অনেক বেশি প্রাগ্রসর বলেই গণ্য হয়।

স্বভাবতঃই সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'ইয়ং বেঙ্গলের' ধর্মীয় ভাবনাকে ডেভিড হেয়ার প্রভাবিত করেছিলেন। তাছাড়া হেয়ারের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলের সম্পর্ক ছিল একাত্মতায় ভরা, হৃদয়ে অনুভূত। তারই জন্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নিঃসঙ্কোচে হেয়ারের কাছে তাঁদের ঋণের কথা স্বীকার করতে 'মাতৃস্তন্য লালিত সন্তানের' উপমাটি ব্যবহার করেছিলেন। চিরকাল নেপথ্যে থেকে কাজ করতেই হেয়ার আগ্রহী ছিলেন। সকল প্রচার থেকে দূরে নীরবে কাজ করার জন্যই হেয়ারের প্রাপ্য কৃতিত্বে অন্যরা সহজেই ভাগ বসাতে পারেন। হিন্দুস্কুলের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সেই বিড়ম্বনাই এক শ্রেণীর গবেষকদের বিভ্রান্ত করেছে মনে হয়। কিন্তু নেপথ্যে থেকে হেয়ার প্রেরণা ও সাহায্য না দিলে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ বা রামতনু লাহিড়ীর উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগই জুটতো কিনা সন্দেহ। এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে হেয়ার তাঁর উদারতা ও চরিত্রমাধুর্যে প্রায় কিংবদন্তী।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এই পটভূমি থেকে বিচার করলে ডেভিড হেয়ারের বৈশিষ্ট্য, তাঁর চিন্তা, চেতনা ও অবদানের বিশেষত্ব চোখে না পড়ে পারে না। আর এক হিসাবে দেখতে গেলে এই বিষয়গুলির উপলব্ধির ফলে উনবিংশ শতকের বাংলার 'নবজাগরণ' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সহজ হয়, অতি সরলীকৃত খণ্ডিত চিন্তার কবল থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণে সীমাবদ্ধতাগুলি ক্রমেই যে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'ল তার উৎসের সন্ধান

করতে হয় এই আদিলগ্নের সমাজবাস্তবের মধ্যেই।

এই বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ডেভিড হেয়ারের অবদান সম্পর্কিত ভাবনার গুরুত্ব অনেক। তাঁর জন্মের দ্বিশতাব্দী পূর্তির অনুষ্ঠানের তাৎপর্য এখানেই।

'ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার' হয়ে যে ব্রিটিশ শাসন ভারতের যুগ যুগ বাহিত গ্রাম-সমাজের ভিত্তিকে লণ্ডভণ্ড করে বাংলা তথা ভারতের সমগ্র জীবনকে শিল্প যুগের সভ্যতার সঙ্গে যোগযুক্ত করে দিল তার অন্তর্নিহিত ইতি ও নেতিবাচক শক্তিসমূহের মূল্যায়ন ছাড়া এই যুগসন্ধিকে উপলব্ধির চেষ্টা একদেশদর্শী ও খণ্ডিতই থেকে যাবে। আর সামগ্রিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে উনবিংশ শতকের বাংলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনার বিরাট অবকাশ এখনও রয়ে গেছে একথা সহজেই বলা চলে। ডেভিড হেয়ার তাঁর সমসাময়িক যুগে দাঁড়িয়েও যে আশ্চর্য প্রাগ্রসর আধুনিক মানসিকতার প্রকাশ দেখিয়ে গেছেন তা এক উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। এখানেই হেয়ারের জীবনী ও কর্মসাধনার বিচারণার সবিশেষ মূল্য।

প্রাসঙ্গিকী :

১। প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত ডেভিড হেয়ারের সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ একখানি অপরিহার্য আকর স্বরূপ। 'সম্বোধি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'-র তৃতীয় গ্রন্থ হিসাবে ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে তা বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তথ্যপূর্ণ সুসম্পাদিত এই গ্রন্থ যে কোনো আগ্রহী পাঠকের কাছে অপরিহার্য বলেই গণ্য হবে।

২। "বাংলায় 'নবচেতনার ইতিহাস" ডঃ স্বপন বসু ; (পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯, মূল্য—২০.০০। এই সাম্প্রতিক গ্রন্থে শ্রীবসু ১৮২৬ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলার নবজাগরণের ব্যাপারে তথ্য-নির্ভর, যুক্তিপূর্ণ, নির্মোহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'নবজাগরণের' নানাদিক নিয়ে প্রণিধানযোগ্য আলোচনা করেছেন। আমি ক্ষুদ্র লেখাটির ব্যাপারে অকৃপণ ভাবে তাঁর গ্রন্থের থেকে সাহায্য নিয়েছি। এই বইখানি যে কোনো সত্যনিষ্ঠ বিচারশীল ব্যক্তির কাছেই অত্যন্ত সহায়ক বলে গণ্য হবে—সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

৩। "ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও তার পরিণাম" সম্পর্কিত চিন্তার ব্যাপারে আমি কার্ল মার্কস-এর ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাদির থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। এ বিষয়ে "Articles on India" শীর্ষক R. P. D. সম্পাদিত দুর্লভ সংকলন বা "India's First War of Independence" শীর্ষক কার্ল মার্কস-এর প্রবন্ধ সংগ্রহটি অবশ্যই দ্রষ্টব্য এবং সযত্নে পাঠ্য।

আচার্য রামেন্দ্র সুন্দরের রাজনৈতিক চিন্তা

অধ্যাপক মৃন্ময় পাল

ভারতের সারস্বত সাধনার ইতিহাসে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্কার ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সমন্বয়েই তাঁর ব্যক্তিত্ব পুষ্ট ও স্ফূর্ত হয়েছিল। এই ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ও রূপায়ণের সাক্ষ্য তাঁর জীবন ও মনন। উনিশ ও বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত ভারতীয় মণীষার এক সাধারণ ধর্ম ছিল স্বদেশ চেতনা। তা রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন ভারতীয় প্রেক্ষিতে, স্বদেশ ছিল ধারণার বিষয়, ধ্যানের ক্ষেত্র, প্রেরণার উৎস ও প্রয়োগের কেন্দ্র। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ও বলেছেন 'মূল' স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকিলে, স্বদেশের উন্নতি চেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম। ..... স্বদেশের উন্নতির জন্য এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন শিল্প শিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার, শিল্প সমিতি স্থাপন প্রভৃতি নানা উদ্যম দেখা যাইতেছে।' (উমেশচন্দ্র বটব্যাল)

রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশ-চিন্তনের রূপ ও প্রকৃতিটি সমসাময়িক মণীষীদের দ্বারাও গ্রাহ্য হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'দেশের প্রতি তাঁহার (রামেন্দ্র সুন্দরের) প্রীতির মধ্যেও তাঁহার নিজের বিশিষ্টতা ছিল, তাহা স্কুলপাঠ্য বিলাতী ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত তৎকালীন কনগ্রেস্ জোতাপাখী কর্তৃক উচ্চারিত বাঁধিবুলির দ্বারা পুষ্ট ছিল না। তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভারতের একটি মানসী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মূর্তিটি ভারতেরই সনাতন বাণীর উপকরণে নির্মিত। সেই বাণীর সহিত তাঁহার নিজের মনন সম্মিলিত ছিল। তাঁহার সেই স্বদেশ প্রীতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞানগাম্ভীর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতা

একত্র সংহত হইয়াছিল।' (রামেন্দ্রসুন্দর/বাজপেয়ী) রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতটি বিশ্লেষণ করলে, রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশ চেতনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন তাঁর উপলব্ধির স্বকীয়তা, ঐতিহ্যবাদী অনুস্মৃতির সঙ্গে নিজস্ব চেতনায় সমন্বয় এবং জ্ঞান ও ভাবাত্মক দৃষ্টিকোণ। আচার্য জানকীনাথ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন : 'তাঁহার ভারত, বাল্মীকি বুদ্ধের ভারত যে কালের পঙ্কে লুণ্ঠিত হইল, এই যন্ত্রণাতেই তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতেন। স্বদেশের সেবা তিনি ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার প্রকৃতি, তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা, তাঁহার অবস্থা অনুসারে সেবার প্রণালী নির্দিষ্ট হইল।' (রামেন্দ্র সুন্দর /বাজপেয়ী)

যদিও রামেন্দ্রসুন্দর জীবনের সুউচ্চ ধ্যানগম্ভীর চিন্তনভূমিতে বিচরণ করতে পছন্দ করতেন তবু ঐ স্বদেশপ্রাণতার তাগিদেই তিনি সমসাময়িক জীবনের কোলাহল, চাঞ্চল্য, আবেগ ও উত্তেজনাকে বরণ করেছিলেন। মানুষের স্বভাবের দুটো দিক, একটি প্রেরণার, অপরটি প্রয়োজনের। মণীষীচরিতে দেখা যায় যে যুগের প্রয়োজনে, স্বভাবের এই দুই বিপরীত উপাদান এক সংহত ও সমঞ্জস ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। রামেন্দ্রস্বভাবের নিঃসঙ্গ জ্ঞানচারিতার প্রবণতার সঙ্গে যে কর্মযোগের সমন্বয় ঘটেছিল তা এই সূত্রেই বিশ্লেষ্য। রামেন্দ্র-সুন্দর পরাধীন দেশের পটভূমিতে দেখেছিলেন এক জীবন্ত সমাজ (living society)-কে কারণ রাজনৈতিক অধীনতা সত্ত্বেও ঐ সমাজে জীবনের লক্ষণ ও ধর্ম পরিস্ফুট ছিল। জীবনের কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থা জীবের স্বাতন্ত্র্যকে নষ্ট করবার চেষ্টা করছে, আর জীব কখন সন্ধি, অথবা বিরোধ অথবা সামঞ্জস্যের দ্বারা আপন স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করবার জন্য সংগ্রাম করছে। 'এই অবিরাম চেষ্টাই জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। এই চেষ্টা যাহার যতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে, জীবনসংগ্রামে সেই ততটা জিতিয়াছে।' (বিচিত্র প্রসঙ্গ) ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের নিরিখে সমসাময়িক সমাজজীবন পর্যালোচনা করে রামেন্দ্রসুন্দরের এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছিল যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও প্রতীচী সংস্কৃতির পারিপার্শ্বিক ভারতবর্ষের ঐতিহ্য অনুযায়ী জীবনবাদ ও যুগাকাংক্ষার স্বাতন্ত্র্যকে লুপ্ত করতে অগ্রসর, এবং তা প্রতিহত করে আপন অস্তিত্বের প্রতিরক্ষায় ভারতীয় সমাজ ও সচেষ্ট? অতএব এই জীবন্ত সমাজের জীবনসংগ্রামের মূল ধারাস্রোত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোল না। স্মরণ-মনন ও অনুধ্যানের

শাস্ত্র সমাহিত ক্ষেত্রে অবস্থান করেই যিনি তাঁর অন্তর্বীক্ষ আকাংক্ষার পরিতৃপ্তি পেতে পারতেন, একটি যুগধর্মের প্রয়োজন তাঁকে মানতে হোল বলেই, অতঃপর তিনি রাজনৈতিক চিন্তায় প্রবৃত্ত হলেন। জাতীয় আশা আকাংক্ষার পরিণাম বিধানে এই চিন্তা অনিবার্যও ছিল। এ ব্যাপারে রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথ একগোত্রীয়, সমকালীন রাজনীতিতে এঁরা সংগঠক নন, ভাবুক, পথে আন্দোলন করা নয়, আন্দোলনের পথ দেখানোই এঁদের কাজ। ব্যতিক্রম যে ঘটেনি, তা নয়, যেমন বঙ্গব্যবচ্ছেদের পর্বে, তবে তা মূল সিদ্ধান্তকেই প্রমাণ করে।

সমসাময়িক কাল ও অব্যবহিতপূর্ব অতীতের কিছু ঘটনা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, কেননা ঘটনা সমন্বিত কালখণ্ডই যে কোন চিন্তাস্থাপত্যের একটি প্রধান উপাদান। রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মের ঠিক সাত বছর আগে ঘটেছিল সিপাহী বিদ্রোহ, 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যাকে বলেছিলেন 'মহাবিপ্লব'। ১৮৫৯-৬০তে বাঙলাদেশে নীল বিদ্রোহ, আসামে কৃষক বিদ্রোহ পাঞ্জাবে কুকা বিদ্রোহের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এইসব ঘটনায় ভারতবাসী সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের মূল্য ক্রমশই বুঝতে পারছিলেন। শুধু অসংগঠিত বিদ্রোহ নয়, অবস্থার পরিবর্তনের জন্য মননকে সচেতনভাবে প্রয়োগের জন্যও ভারতীয় মণীষা সচেষ্ট হয়ে ছিলেন। ১৮৬০-এ দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রকাশ, হিন্দু প্যাট্রিয়টের নির্ভীক সাংবাদিকতা, ১৮৬১ তে মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' প্রতিষ্ঠা, ১৮৬৭ তে নবগোপাল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় কলকাতায় 'হিন্দু মেলা'-র প্রতিষ্ঠা, ১৮৭৫-এ রাজনৈতিক ঐক্যের সন্ধানে শিশির কুমার ঘোষের দ্বারা 'ইণ্ডিয়া লীগ' স্থাপনা, ১৮৭৬-এ সুরেন্দ্রনাথ শিবনাথ ইত্যাদির প্রচেষ্টায় 'ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশ'-এর জন্ম, ১৮৭২এ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আবির্ভাব, ভূদেব-বঙ্কিম প্রমুখের স্বদেশচিন্তার প্রকাশ, এবং সর্বশেষ ১৮৮৫তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা মূলত ভারতবাসীর তৎকালীন বৈপ্লবিক আশা-আকাংক্ষার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় রামেন্দ্রসুন্দরের বয়স একুশ বছর ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের উন্মেষযুগ। এই পর্বের কয়েকটি প্রধান ঘটনা, ১৮৯৯-এ ভারত বিদ্বেষী লর্ড কার্জনের ভারতের শাসনভার গ্রহণ, ১৯০১ এ ইউনিভার্সিটি কমিশন এবং ইউনিভার্সিটি বিল প্রণয়ন, ১৯০৩ এ দিল্লীর দরবার, ১৯০৩-এর

৩রা ডিসেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে বঙ্গভঙ্গের সরকারী প্রস্তাব প্রকাশ, ১৯০৫এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা, ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের পরিকল্পনায় যথাক্রমে রাখীবন্ধন অরন্ধন ও বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথানুষ্ঠান, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বয়কটের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, ১৯০৬-এ মুশলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন ইত্যাদি। 'A case for India' গ্রন্থে উইল ডুরান্ট ঠিকই লিখেছেন 'It was in 1905, then, that the Indian Revolution began!' এই পর্বে আরও কয়েকটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ বাঞ্ছনীয়, যেমন ১৯১৪-তে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ড, রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ, এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯১৭ তে চম্পারণ-সত্যাগ্রহ। ১৮৫৭ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের ঘটনাবহুল পটভূমিতে রামেন্দ্রসুন্দরের রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ বিচার্য, কেননা ১৮৬৪তে তাঁর জন্ম এবং ১৯১৯-এ মৃত্যু।

ভারতবর্ষের জাতীয় দুর্দশা ও সর্ববিধ অব্যবস্থার জন্য যে দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতাই প্রধানত দায়ী, এই বিশ্বাসে রামেন্দ্রসুন্দর আস্থাবান ছিলেন। ফলে ভারতবর্ষের পরাধীনতা কেন এবং অন্যান্য জাতির তুলনায় ভারতীয় জীবনতন্ত্রের প্রকৃতি পার্থক্য কোথায়, এই প্রশ্নগুলির মীমাংসায় তিনি তৎপর হয়েছিলেন। মীমাংসার পথে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক চেতনাপুষ্ট। বিশেষ ইতিহাস ও রাজনীতির বহিশ্চারিতার সঙ্গে দর্শনের অন্তশ্চারিতার সংযোগ সিদ্ধ হয়েছিল বলে এ-ব্যাপারে তাঁর মীমাংসায় উপায় ও পরিণাম স্বচ্ছ ও গভীর। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরাধীনতা যে ইংরেজ আমলের বহু পূর্ব থেকেই অব্যাহত ছিল, তা ধরে নিয়েই তিনি পরাধীনতার প্রসঙ্গটির বিচার করেছেন। জাতীয় চরিত্রের ভয়ানক অধোগতি ছাড়া যে পরাধীনতা ঘটে না, তা দুঃখের সঙ্গেই তিনি স্বীকার করেছেন। তবে পরাধীনতার কারণ হিসেবে দেশী বিদেশী পণ্ডিতদের প্রচলিত মতের সঙ্গে তিনি একমত হননি। ব্রাহ্মণই প্রাচীন ভারতের যত দুর্দশার মূল, এই মতকে খণ্ডন করে তিনি দেখালেন ভারতীয় স্বভাব ও জীবন স্বাতন্ত্র্যই পরাধীনতার মূলে। এই স্বাতন্ত্র্যের তিনটি প্রধান লক্ষণ হোল :

ক ভারতীয় প্রজার রাজনৈতিক চেতনার অভাব। ভারতবাসীর কাছে রাজনৈতিক বিপ্লব কতকটা নৈসর্গিক উৎপাতের মতো সম্পূর্ণ দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা। দৈব উৎপাত বা রাজনৈতিক পরিবর্তন ভারতীয় মানসে যেন এক সিদ্ধ ব্যাপার।

মানুষের পক্ষে তার প্রতিবিধান সম্পূর্ণ অসম্ভব। 'যাহাকে আধুনিক ভাষায় রাজনৈতিক জীবন বলে, স্বদেশভক্তি, জাতীয় ভাব প্রভৃতি যাহার লক্ষণ, ভারত-বাসীর সেই জীবনটা একেবারে নাই।' (পরাধীনতা)

খ ভারতীয় দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা। সম্ভবত অন্তরঙ্গ জীবনচর্চার সূত্রে ভারতবাসী চিরদিনই বহির্জীবন সম্বন্ধে অনাগ্রহী। নানান খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ভারতবাসী আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমিকে রাজনৈতিক অর্থে স্বদেশ বলে প্রাচীন কালে গ্রহণ করতে পারেনি। 'আমাদের স্বজাতি, স্বধর্ম, আত্মীয়, অন্তরঙ্গ সকলেই এই পরিধির মধ্যে বাস করে। কিন্তু তাই বলিয়া বিধর্মী আসিয়া পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে বাঙালির মাথাব্যথার প্রয়োজন কি? অথবা বাঙালি বিধর্মীর পদানত হইল, তাহাতে মহারাষ্ট্রের কি আসে যায়?' (পরাধীনতা) ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি মানুষের অধিকাংশই শুধু সেকালে কেন, রামেন্দ্রসুন্দরের কালেও জানত না যে তারা ভারতবাসী। অবশ্য রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছিলেন ভারতীয় চরিত্রে এই অভাব চারত্রগত নয়, জ্ঞানগত।

গ রাষ্ট্রশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে অনৈক্য। অতীত ভারতে রাজা ও প্রজার সম্পর্কটি ছিল সাপেক্ষ নয়, নিরপেক্ষ। বহির্শত্রুর আক্রমণের সময় দেশীয় রাজশক্তির পিছনে প্রজাশক্তির ব্যাপক সমর্থনের দৃষ্টান্ত অন্যদেশের ইতিহাসে থাকলেও, ভারতীয় ইতিহাসে নেই 'আমাদের দেশের ইতিহাস অন্যরূপ। এখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় প্রজা নির্বিকারচিত্ত'

ঘ পরনির্ভরশীলতা ও মতদ্বন্দ্ব। এই লক্ষণটি প্রাচীন নয়, সমকালীন ভারতবর্ষের। তাঁর সময়ের ভারতীয় জীবন বিশ্লেষণ করে, রামেন্দ্রসুন্দরের মনে হয়েছিল 'আমাদের অবস্থা কতকটা হট্‌হাউসের চারার মতো।' (সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার)। ভারতীয় চরিত্রের যে উপসর্গটি তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল, তা হোল, শক্তি, অনুরাগ, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অভাবে সব কাজেই স্বজাতির বিফলতা এবং ফলত অন্তর্দ্বন্দ্ব। 'আমাদের অধ্যাপক গোখলে মহাশয় বিধিবিড়ম্বিত হইয়া রাজার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমাভিক্ষা করিলেন, আমরা তাঁহাকেও কাপুরুষতার জন্য ধিক্কার দিলাম, আমরা প্রত্যেকেই এক-একটা বালগঙ্গাধর তিলক।' (সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার)

ভারতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের এই মূল্যায়নে রামেন্দ্রসুন্দর ইতিহাস ও অভিজ্ঞতানির্ভর, এবং হয়ত অভিনবও নন। কিন্তু অভিনবত্ব সেখানেই, যখন

তিনি তাঁর দার্শনিকবৃত্তির প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধান্ত করলেন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জীবন-তন্ত্রের তুলনাক্রমে যে, ইউরোপের প্রজা চিরকাল পরাধীন এবং ভারতের প্রজা স্বাধীন। তাঁর যুক্তিটি ছিল: 'পরাধীন ও স্বাধীন শব্দ দুইটা একটু বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি। আমি হিন্দুর রাজ্যে বা মুসলমানের রাজ্যে, কি খ্রীষ্টানের রাজ্যে বাস করি, তাহা দেখিয়া আমার স্বাধীনতার পরিমাপ হইবে না। আমার নিত্য জীবনের কতখানি রাজার অধীন ও কতখানি আমার নিজের অধীন, জীবনের কতগুলো কাজ রাজার হুকুমে সম্পাদন করিতে হয়, আর কতগুলো কাজেই বা আমার ইচ্ছামত সম্পাদন করিতে পারি, তাহা দেখিয়াই আমার স্বাধীনতার মাত্রা স্থির করিতে হইবে। আমি বলিতে চাহি যে, এই হিসাবে সেকালের ভারতবাসী একালের ইউরোপীদের অপেক্ষাও অধিকতর স্বাতন্ত্র্য সম্ভোগ করিয়াছে।' (পরাধীনতা)

প্রাচীন ভারতবাসী সম্বন্ধে একথা বলা সম্ভব হলেও সমকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত পোষণ করা রামেন্দ্রসুন্দরের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ ভারতীয় জীবনতন্ত্রের যুগাগত স্বাধীনতা সম্ভোগে ইংরেজরা হস্তক্ষেপ করে ছিলেন এবং ভারতীয় আশা আকাংক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন মানসিক ঐক্য ছিল না। সুতরাং ভারতীয় সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বরক্ষার জন্য নতুন রাজ-নৈতিক পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এবং এজন্যই অন্যান্য ভারতীয় নেতার মতোই রামেন্দ্রসুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলেন সম্ভবত এরকম: 'What light is to the eyes—what air is to the lungs—what love is to the heart, liberty is to the soul of man.' (Progress/Ingersoll)। কিন্তু মনীষীর স্বপ্ন সবসময় যুক্তিনিষ্ঠ, অবস্থানের ভূমিতে লগ্ন থেকেই তা ভবিষ্যৎ-সম্ভব। তাই যুগকে বুঝেই রামেন্দ্রসুন্দর যুগধর্মকে চিহ্নিত করলেন।

ধর্ম তথা যুগধর্মের প্রত্যয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমের বিশ্বাসকেই বিশদ করে-ছিলেন। 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'। ধর্ম মানবজীবনকে রক্ষা করে। অতএব ধর্ম ব্যক্তি, বংশ, সমাজ ও দেশজীবনকেও রক্ষা করে। বঙ্কিম উপলব্ধ ধর্মের এই অর্থটিকে রামেন্দ্রসুন্দর গ্রহণ করেছিলেন। ধর্ম মানে 'রিলিজন' নয়। যা ধরে রাখে, তাই ধর্ম। ধর্মের বিধৃতিশক্তি ঐতিহ্য-অনুস্মৃতি ও যুগসংস্কারের উপাদাননির্ভর। তাই বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে দেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের যুগধর্ম ও রাষ্ট্রধর্ম-বিধায়ক মূর্তিকে। রামেন্দ্রসুন্দরও খুঁজেছিলেন নতুন যুগধর্মকে, যা

জাতীয় আশা-আকাংক্ষার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে, জাতিকে ধরে রাখবে, জাতির পুষ্টি ও স্ফূর্তির কারণ হবে। তিনি বুঝেছিলেন স্বাধীনতার আকাংক্ষা অঙ্কুরিত হলে তা ক্রমশই মহীরুহের রূপ ধরবে। তাই তিনি বললেন রাষ্ট্র ও নেশনই যেহেতু বিশ শতকের যুগধর্ম, অতএব তা ভারতবর্ষেরও যুগধর্ম। সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ছাড়া যেহেতু রাষ্ট্র ও নেশন গঠিত হ'তে পারে না, তাই বোঝা গেল রামেন্দ্রসুন্দর চেয়েছিলেন প্রয়োজনীয় সব উপাদানগুলির পূর্ণতায় ভারত-ভূমিতে রাষ্ট্র ও নেশনের শরীর অভিব্যক্ত হোক।

রাষ্ট্র ও নেশন সম্বন্ধে তাঁর এবং রবীন্দ্রনাথের ধারণা বিচার্য, কারণ উভয়েই এবিষয়ে বঙ্গদর্শনের পাতায় আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধে ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রেনাঁর অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। রেনাঁর অভিমতকে সূক্তিবাক্য হিসাবে গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত 'নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানসপদার্থ।' (আত্মশক্তি ও সমূহ)। রামেন্দ্রসুন্দর গ্রহণ করেছেন শুধু রেনাঁ নয়, অধ্যাপক সিলির একটি অভিমত: 'ভারতবর্ষে নেশন নাই, কিন্তু এমন বীজ রহিত আছে, যাহা হইতে কালে নেশন অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে।' (রাষ্ট্র ও নেশন) ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন খণ্ড রাজ্যগুলি এক রাজনৈতিক অধিকারভুক্ত হয়েছিল। ভারতীয় মনে যে রাজনৈতিক একত্বের ধারণা এ-যাবৎকাল অনুপস্থিত ছিল, তাও ক্রমশঃ যে অপসৃত হয়ে রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ জাতিত্বের রূপ নেবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল, তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু নেশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির পারস্পরিক বন্ধনের দৃঢ়তা, তা ছিল তখনকার ভারতবর্ষে অনুপস্থিত। রামেন্দ্রসুন্দর 'রাষ্ট্র ও নেশন' প্রবন্ধে এই ইঙ্গিত রাখলেন, ভারতবর্ষে নেশনের পূর্ণাবয়ব মূর্তি অবশ্যই সম্ভব হবে।

বিদেশী রাজশক্তি সম্বন্ধে কোন মুগ্ধ প্রত্যাশা তাঁর ছিল না। ফলে ১৩১৪ শ্রাবণ মাসে, 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাধি ও প্রতিকার' নামক প্রবন্ধটির সঙ্গে তিনি পুরোপুরি একমত হতে পারেননি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় উত্তেজনার ব্যাপারটিকে ঠিক অনুমোদন করতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল উত্তেজনা আস্ফালনের পথ ছেড়ে স্বদেশবাসীর গঠন-মূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করা উচিত। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেই লিখেছিলেন: 'উত্তেজনার বশে আমরা দুই বৎসর ধরিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লইব না, ইংরেজের শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিব বলিয়া লাফালাফি

করিয়া আসিতেছি ; এবং ইংরেজ রাজা যখন সেই লাফালাফিতে ধৈর্যভ্রষ্ট হইয়া লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক আস্ফালনের নিষ্ফলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন— ও পথে চলিলে হইবে না মাতামাতি লাফালাফির কর্ম নহে, নীরবে ধীরভাবে কাজ করিতে হইবে।' (ব্যাধি ও প্রতিকার) এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত স্বচ্ছ ও বৈপ্লবিক। প্রথমত তিনি বললেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আবেগ-উত্তেজনা নিরর্থক নয়, কেননা এর মাধ্যমে দেশের নেশন হবার আকাংক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত 'কর্মে প্রেরক জ্ঞানও নহে, বুদ্ধিও নহে, কর্মে প্রেরণা করে ভাব।' স্বদেশী আন্দোলন ভাব উদ্বোধনের উপায়। তৃতীয়ত, কর্ম শুধু ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, অবস্থাসাপেক্ষও বটে। গঠনমূলক কাজের জন্য প্রয়োজন কাজ করার স্বাধীনতা। দেশের রাজনৈতিক চরিত্র তার অনুকূল ছিল না। তাই তিনি বললেন, যাকে স্বায়ত্তশাসন বলা হয়, আসলে তা ইংরেজ রাজার আরও শাসন। সর্বতোভাবে পরতন্ত্র একটি জাতি কখনও স্ব-তন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে না। আশুতোষ চৌধুরী নির্দেশিত রাজনীতি চর্চার পথ পরিহার করে, স্বদেশের হিতকর্ম সাধনের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন করলেন 'যতদিন ইংরেজের বাণিজ্য নীতির পশ্চাতে ইংরেজের বেয়নেট থাকিবে, ততদিন অনেষ্ট স্বদেশীর মাথা তুলিবার ক্ষমতা কতটুকু?' (ব্যাধি ও প্রতিকার)

স্বদেশচিন্তার উন্মেষ ঘটানোর জন্য গতিশীল নেতৃত্ব, গণসংযোগ ও কর্মযোগ যে অপরিহার্য, তা রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন। তিনি মনে করতেন, কর্মযোগের মাধ্যমেই ভারতবাসীর মনে স্বদেশ নামক কাল্পনিক বস্তুটি মূর্তিরূপ ধারণ করবে। কর্ম কি ধরনের হবে, তা অবশ্য নির্ভর করবে কর্মীর সাধ্য ও প্রবণতার উপর। যেমন তিনি নিজে সাহিত্য কর্মকেই দেশ উপলব্ধির উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কর্মের জন্য আরও প্রয়োজন শক্তিসঞ্চয়। দেশীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কথাটিকে গ্রহণীয় বলে মনে করেছিলেন। ভূদেব বলেছিলেন, দেশজননীর পূজায় সাফল্যের জন্য প্রয়োজন কূর্মনীতি অবলম্বন। অর্থাৎ যতদিন ভারতীয়েরা দুর্বল, ততদিন কচ্ছপের খোলার মতো পিঠ শক্ত করে, সেই খোলার আড়ালে ভারতবাসীকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

রাজনৈতিক-অর্থে ভারতীয় জাতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল উদার ও

সংস্কারমুক্ত। বঙ্কিমের স্বদেশ প্রত্যয়ের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে স্বাদেশিকতার প্রাণরস আকণ্ঠ পান করেও তিনি ছিলেন বঙ্কিম অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। বঙ্কিম চেয়েছিলেন হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। রামেন্দ্রসুন্দর চেয়েছিলেন ধর্ম-ভাষা-গোষ্ঠী নিরপেক্ষ এক অখণ্ড ভারতীয় জাতি ও জাতীয়তা। ঐতিহাসিক সূত্রের প্রয়োগ করে তিনি দেখেছিলেন, মুসলমান এদেশের রাজসিংহাসনে দীর্ঘকাল ধরে আসীন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বা অত্যাচারী কিন্তু মোটের উপর তাঁরা হিন্দুর সমাজ-স্কন্ধকে তেমন বিনষ্ট করেননি। ক্রমশ মুসলমানের অ ভারতীয় উপাদান বিনষ্ট হয়েছে। ভারতভূমিকে তাঁরা জননী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রয়োজন কেবল রাজনৈতিক ঐক্য ও সখ্যের, এবং তা সম্ভব কারণ, 'ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান উভয়েই পরকে যেমন আপন করিতে জানে, তেমন পৃথিবীর আর কোনও জাতি জানে না।' (ব্যাধি ও প্রতিকার)

সবশেষ, রাজনৈতিক উপায় সম্বন্ধে রামেন্দ্র চর্চা। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদী ধারাকে রামেন্দ্রসুন্দর সমর্থন করেননি। 'স্বদেশী আন্দোলন যখন গুপ্ত নরহত্যার শোণিতে কলুষিত হইয়া গেছে, তখন তিনি বড়ই আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন: এই পাপে আমাদের এই আন্দোলন পণ্ড হইবে, গবর্ণমেন্ট কঠোর হস্তে ইহার মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইবেন।' (রামেন্দ্রসুন্দর/বাজপেয়ী) বঙ্গ বিভাগের সময় রামেন্দ্রসুন্দর যেভাবে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ রাখীবন্ধন, অরন্ধন ও বঙ্গলক্ষ্মীব্রত উদ্‌যাপন ইত্যাদির মাধ্যমে, এবং বঙ্গ ব্যবচ্ছেদরোধ করার জন্য বয়কট ও অসহযোগী পন্থাকে যেভাবে তিনি সমর্থন করেছিলেন, তাতে এই ধারনাই হয় যে, গান্ধী প্রবর্তিত ভারতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত, সংযত আত্মসাধনার রাজনৈতিক পথটাই তাঁর চিন্তার সগোত্রীয়, যদিও অবশ্য গান্ধীর নেতৃত্বের পূর্ণায়ত প্রকাশের পূর্বেই রামেন্দ্রসুন্দরের তিরোধান।

[ছৌনাচ এক ধরনের মুখোশ নৃত্য। Merchant of Venice এ যে MASQUE DANCE-এর উল্লেখ দেখা যায় তা প্রকৃতিতে ও মেজাজে ছৌ-নাচ থেকে ভিন্ন। তবে Milton-এর COMUS বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে ও মেজাজের high seriousness-এর জন্যে ছৌ-নাচের সঙ্গে তুলিত হবার যোগ্য। বহু যুগ ধরে সীমান্ত বাংলায়, বিশেষত পুরুলিয়ায় ও উড়িষ্যার কোনো কোনো অঞ্চলে, প্রধানত আদিবাসীদের মধ্যে এই অনাড়ম্বর নৃত্যকলার অনুশীলন ও অনুষ্ঠান চ'লে আসছে। 'ছৌ' শব্দটা 'ছাউনি' (অর্থাৎ সৈন্যশিবির) থেকে এসেছে ব'লে মনে করা হয়। 'ছায়া' শব্দ থেকে এসেছে মনে করাটা নেহাৎ ই কষ্টকল্পনা। ছৌ-নাচ তাই সৈন্যশিবিরে সৈন্যদের দ্বারা অনুশীলিত নৃত্য। প্রাচীনকালে রাজাদের যুদ্ধযাত্রার পূর্বে সৈন্যদের উদ্দীপিত করবার উদ্দেশ্যে শিবিরে শিবিরে এই বীররসাত্মক নৃত্যের ব্যবস্থা করা হতো। কালক্রমে শিবিরের কাঁটাতার ছিঁড়ে এ নাচ জনপদের ধুলোয় নেমে এসে জনপদবাসীদের জীবনধারার সঙ্গে মিশে গেলো। যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টির পরিবর্তে এখন থেকে এর লক্ষ্য হলো সারাদিনের পরিশ্রমে অবসন্ন কৃষিজীবী সাধারণ মানুষকে সন্ধ্যা-বেলায় আবার একটু জাগিয়ে তোলা, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা, বিশুদ্ধ আনন্দ দেওয়া। গ্রামীন এই নাচের উপকরণ সামান্যই ছিলো এতোদিন। স্থানীয় লতাপাতা আর মুখোশ। সম্প্রতি সভ্যতার অনিবার্য আলোকস্পর্শে পোশাকে-আশাকে এবং মুখোশের কারুকাজে বেশ একটু জৌলুশ দেখা দিয়েছে। এর বাজনা খুব সামান্য হলেও রণোন্মাদনা সৃষ্টিতে এর অবদান অসামান্য। ধামসা, দুটো ঢোল আর সানাই, আর থেকে থেকে সমবেত কণ্ঠের 'কুলকুলি'। রূপায়নের বিষয়বস্তু রামায়ন মহাভারত আর বিভিন্ন পুরাণের খণ্ড খণ্ড উপাখ্যান। আজও এতে শুধু পুরুষেরাই অংশ গ্রহণ করে থাকে। মেয়েদের ভূমিকাও চালায় পুরুষেরাই। অবশ্য শহরের মেয়েরা আজ যখন ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু খেলছে তখন তাদের সংক্রামক প্রভাবে কে বলতে পারে অদূর ভবিষ্যতে একদিন আদিবাসী কৃষক বধূরাও এই বীর-রসাত্মক তাণ্ডব নৃত্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে একে আরও বর্ণাঢ্য ক'রে তুলবে কি না? ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সস্নেহ শুশ্রূষায় নববলে বলীয়ান এই নাচের একটি দল কিছুদিন আগে বিজয়ীর মর্যাদায় লণ্ডন আর আমেরিকা ঘুরে এসেছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সে মর্যাদার আভায় আদৌ উদ্ভাসিত হয় না ওদের দৈন্যদীর্ণ ম্লান পারিবারিক জীবন।

সম্প্রতি কান্দি মহকুমা শহরে শ্রীউদয় ভাদুড়ীর উদ্যোগে ও শ্রীমান পূর্ণেন্দু সিংহের প্রশংসনীয় তৎপরতায় আয়োজিত এবং অধ্যাপক সনৎ মিত্রের তত্ত্বাবধানে ও শ্রীকলেবর কুমারের প্রশিক্ষণায় পুরুলিয়া থেকে আগত একটি দলের ছৌ-নাচের দৃপ্ত অনুষ্ঠান দেখে এসে 'চেতনিক'-এ এ বিষয়ে কিছু লেখার কথা ভাবছিলেম। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে মানিকবাবুর কাছ থেকে প্রবন্ধটি এসে পৌঁছুলো এবং তাঁরই ইচ্ছাক্রমে এই ভূমিকাটুকু লিখে দিলেম। তবে এই প্রসংগে একটা কথা বলে রাখি। সেদিন কান্দির অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তৃতায় অধ্যাপক সনৎ 'মত্রকে বলতে শুনলেম ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ছৌ-নাচের আবিষ্কর্তা। কথাটা ঠিক শুনেছি কিনা তা আমার পার্শ্ববর্তী দুয়েকজন বিশিষ্ট দর্শককে দিয়ে যাচাই করে নিয়েছিলাম। আমার বক্তব্য, ছৌ-নাচের কথা আমি প্রথম জানতে পারি সম্ভবত ১৩৪৫-৪৬ এর 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মুমূর্ষু পৃথিবী' নামের উপন্যাসে।

-- সম্পাদক চেতনিক]

বাংলার ছৌ-শিল্পীদের আর্থিক জীবন

মানিক সরকার

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমানায় পুরুলিয়া জেলা। বাঘমুণ্ডি এ জেলার অন্যতম থানা। এ থানার একটি গ্রাম মাঠা। মাঠা গ্রামের পূবে অযোধ্যা পাহাড়, পশ্চিমে উঁচু-নীচু কৃষি ক্ষেত, উত্তর দক্ষিণে ছোট ছোট গ্রাম, তাতে জনবসতি কম। বাঘমুণ্ডি, মাঠা ও অযোধ্যা এ তিনটে নামেই বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাচীন ধারার চিহ্নাংশ রয়েছে। বর্তমানে কেউই আর স্বতন্ত্র নয়, তিনে মিলে যেন এক।

এটা বনাঞ্চল আবার কৃষি অঞ্চলও বটে সভ্যতায় বনচারী এবং কৃষিজীবী দুটি সুস্পষ্ট পর্ব। বহু ক্ষেত্রে এ দুটি পর্বের জীবনচারণ পাশাপাশি বয়ে এসেছে, অন্ততঃ প্রাচ্যের দেশগুলিতে এটা আছে। মাঠার একদিকে বন, অপরদিকে কৃষি ক্ষেত মিলেমিশে আছে। যে মানুষ বনে বনে কাঠ কাটে, পাতা কুড়োয়, বনের ফলমূল খায়, তারাই আবার জমিতে লাঙল চালায়, বীজ ছড়ায় ধান

কাটে। এখন আবার এরাই পাকা সড়ক ধরে পুরুলিয়া জেলা শহরে আসে। সহাবস্থানের, প্রাচীন ও অর্বাচীনের মিলন-বিরোধের এ এক সুন্দর নিদর্শন। কুঁড়ে ঘরে বাস, জলভাতে উদর ভর্তি, অসুখ বিসুখে তুকতাক জলপড়া, অনাবৃত শীর্ণকায় দেহ নিয়ে তাদের কেউ কেউ সিনেমাও দেখে। একদিকে প্রাচীন জীবনের রেশ অপরদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান—সিনেমা, উভয়ই এখানে অবস্থান করছে।

মঠোর একটা বাংলো আছে। তারকাঁটা ঘেরা বাংলোর মধ্যে ক'বছর ধরে ছৌ-নাচের উৎসব হয়ে আসছে। লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে, সঙ্গীত-নাটক-একাডেমির পৃষ্ঠপোষকতায় এ উৎসব হয়। এটা একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পুরুলিয়ার সংযুক্তিকরণের এ একটি অন্যতম আশীর্বাদ। ছৌ নাচ বিশ্বসভাসরায় উপস্থিত হয়েছে। ছৌ-নাচ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সম্পদ, বাংলার সম্পদ, ভারতের সম্পদ, বিশ্বসম্পদ। এ সম্পদের পুনরুদ্ধারে স্বাধীনতা অর্জনের জয়গান গাইতে হয়, লোক সংস্কৃতির চর্চাকে অভিনন্দিত করতে হয়, ডঃ ভট্টাচার্যের প্রতি বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়।

আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে অনেক সম্পদ এখনও অজ্ঞাত রয়েছে, বিকৃত হয়েছে নয়তো অবহেলার মধ্যে পড়ে থেকে পলে পলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে অবলুপ্ত হয়েছে অথবা অবলুপ্তির পথে চলছে। এগুলি রক্ষা করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন, গুরুসদয় দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সাহিত্য বিশারদ করিম সাহেব প্রমুখ গুণী ব্যক্তিরা একবার দৃষ্টি দিয়েছিলেন, বহু কিছু উদ্ধার হয়েছিল। তারপর একটা ভাঁটার টান এসেছিল। স্বাধীনতার পর ভাটার টান নেই ঠিকই, কিন্তু জোয়ারও নেই। তবে একেবারে যে কিছু হচ্ছে না তা নয়। হচ্ছে, তা আশানুরূপ নয়। এই তো ছৌয়ের পর নাচনী নাচ, ঝুমুর গান, নাটুয়া নাচ ইত্যাদি নিয়ে ব্যক্তিগত উৎসাহে বেশ কিছু কাজ চলছে। যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের অনেকেই স্বীকৃতি পাচ্ছেন না, সহায়তা পাচ্ছেন না, বিঘ্নটা ঘটছে এখানেই।

গ্রাম বাংলায় বেশ কিছু কর্মী নিঃস্বার্থ ভাবেই কাজ করছেন, কিন্তু তাঁদের অনেকের শিক্ষাগত-শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে, তাঁদের কাছে কাজের-পরিপ্রেক্ষিত অনেক সময় স্পষ্ট থাকে না, আবার কেউ কেউ কিছু কাজ করেই অর্থের মোহে দৌড়ে মরছেন, কেউবা নামের মোহে হন্যে হয়ে উঠছেন,

'মৌলিকতার' মোহ কয়েকজনকে পেয়ে বসেছে। কিছু করলেই তাঁরা 'মৌলিকতার' দাবি করে বসেন, তার জন্যে আবার 'মাদুলি' ধারণ অর্থাৎ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে বের হন।

যাক্ ও সব কথা। ও তো ক্ষোভের প্রকাশ, পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ চৈত্র-সংক্রান্তির পরে আরম্ভ হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির সঙ্গে এর যেন কোথায় একটা যোগসূত্র আছে। ছৌ নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা হচ্ছে, দেশের আলোচকদের মধ্যে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, স্বর্গত বিভূতি দাসগুপ্ত, ডঃ সুধীরকুমার করণ, এই প্রবন্ধকার, ডঃ সুভাষ বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক সনৎ মিত্র, শ্রীঅজিত মিত্র প্রমুখ রয়েছেন। এ ছাড়াও ডঃ ভট্টাচার্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ছৌ শিল্পীদের আর্থিক সামাজিক জীবন নিয়ে কোন মূল্যবান তথ্যনির্ভর আলোচনা এ প্রবন্ধকারের চোখে পড়েনি। অথচ এটার প্রয়োজন আছে, বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর্থিক বনিয়াদের উপরেই চলমান সমাজটি দাঁড়িয়ে আছে। বনিয়াদ সৌধকে ধরে রাখে। আমরা সৌধ দেখি, বনিয়াদ লক্ষ্য করি না, এই দেখা অর্ধ দেখা, পুরো নয়।

ছৌ-নাচের শিল্পীদের আর্থিক জীবনের পরিচয়টা জানা এবং জানান প্রয়োজন। নাচের উন্নতির জন্য তাঁদের আর্থিক জীবনের উন্নতি অপরিহার্য। কাজটি বিরাট এবং একটি সামগ্রিক ও পরিকল্পিত কাজের এটি একটি অংশ, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অংশ। এই বিশাল কাজ একজনের পক্ষে সম্ভব নয় তবু ব্যক্তিগত উৎসাহে ১৯৭০ সালে একটা নমুনা সমীক্ষার আংশিক কাজ করতে চেষ্টা করেছিলাম, তাতে একটা চিত্র পেয়েছিলাম, যদিও আংশিক; কিন্তু বেশ ভয়াবহ।

সমীক্ষার মধ্যে পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি অঞ্চলের ১৫টি দল ছিল খ্যাত-অখ্যাত ১৫ জন 'ওস্তাদ', ১২৩ জন নৃত্য শিল্পী, ৭৯ জন বাদ্যযন্ত্রী।

দেখতে পেয়েছিলাম, শিল্পীদের অধিকাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন, অনেকে সময় সময় অনাহারে থাকেন, অর্ধাহারে তো আছেই। প্রায় সকলেরই খাদ্যাভাবে অপুষ্টি, ভগ্ন স্বাস্থ্য। বাসস্থান বলতে এঁরা অনেকেই কুঁড়ে ঘরে বাস করেন, নাচের শিক্ষাকেন্দ্র এঁরা বাড়ির উঠানকেই করে থাকেন।

কেউ কেউ চাষবাস, কেউ ছোট ব্যবসা, কেউ জনমজুরী, কেউ পরের বাড়িতে পেটে-ভাতে কাজ করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন পুরো

বেকার, তাঁদের কোন আয় নেই।

তাঁদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত মান অতি সামান্য। ২/১ জন বাদে সকলেরই ভগ্ন স্বাস্থ্য। পরনের বেশভূষাও সামান্য। অনেকেই জামার পরিবর্তে গেঞ্জি পরেন, কেউ বা তা-ও পান না। ভাল জামাকাপড় কারও পরনে দেখিনি। বিগত সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক এবং বর্তমান কালের ধনতান্ত্রিক শোষণের যেন এঁরা এক একটি জীবন্ত নিদর্শন।

তবু এঁরা ভাল নাচতে চান। এ এক অভূতপূর্ব নেশা। এত দারিদ্র্যের মধ্যেও এ নাচকে ওঁরা ত্যাগ করেননি। অর্ধাহারে, অনাহারে থেকেও নাচের আসরে আসেন, মৃত্যুর ন্যায় শোকাবহ অনটনের মধ্যেও দল গড়েন, বায়না করেন, আসরে নাচেন। অর্থাৎ ছৌনাচ এঁদের জীবন-সঙ্গী। সঙ্গী-বিচ্ছেদ ওঁরা পছন্দ করেন না।

এ থেকে কি আমরা কোন শিক্ষা নিতে পারি না? দারিদ্র্যকে মাথা পেতে মেনে নেওয়া অপরাধ, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সার্থকতা আছে। কিন্তু দারিদ্র্যের দোহাই দিয়ে সাধনাকে পরিত্যাগ করা চলে না। দারিদ্র্য বড় বিঘ্ন। কিন্তু সেই বিঘ্নের চেয়ে সাধনা আরও বড়। তাই সাধনা, বিশেষ করে সাহিত্য সংস্কৃতির কাজে যাঁরা অর্থের পেছনে ছোটেন, তাঁদের সাধনা ছোট সাধনা। এই ছোট সাধনা আজকাল শহরের অনেক 'বড়রাই' করে থাকেন। এটা ভাল নয়। নবীনরা এতে প্রলুব্ধ হচ্ছেন। কলুষিত হচ্ছেন।

ছৌ-সমীক্ষায় যে চিত্র পাওয়া গেছে তা আংশিক, কিন্তু বড়ই মর্মান্তিক। গ্রাম বাংলার দ্রুত আর্থিক পুনর্গঠন অর্থাৎ কৃষিব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে সামগ্রিক অর্থনীতি, বিশেষ করে কৃষি-অর্থনীতির গণতান্ত্রিক এবং সার্বিক পুনর্জাগরণ না হলে ছৌ-নাচের অগ্রগতির ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল বলেই সমাজ বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

বাংলার ছৌ তাণ্ডবী নাচ। এ নাচে শুভ শক্তির প্রয়োজন, তেজের প্রয়োজন। সেই শক্তির শুভ আগমন হোক। *

* দ্রষ্টব্য :—''পশ্চিমবঙ্গ' ১৩ এপ্রিল, ১৯৭১, ১২ই মে, ১৯৭২, 'দর্শক' ৩০ এপ্রিল, ১৯৭৪, এবং 'সাম্মীক'-শিল্প দর্পণ সংখ্যা ১৩৮২।

[জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামায়ণ—পুরাণে ও বিজ্ঞানে' শীর্ষক কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধগুলি যখন কয়েক মাস আগে সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কান্দী বান্ধব' সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিলো তখন সেগুলি পাঠকসমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। বেশ কিছু স্বনামখ্যাত সুধী ব্যক্তি ও তাঁদের সমপরিমাণ কৌতূহলোদ্দীপক মতামত পাঠান। কেউ বলেন অপদার্থ, কেউ বা বলেন অভিনব। পত্রগুলি ভবিষ্যতে চেতনিক-এ পত্রস্থ করার ইচ্ছে রইলো। আপাতত একটি মাত্র চিঠি তুলে দিচ্ছি। পত্রলেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বিশ্রুতকীর্তি গবেষক লেখক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল অধ্যাপক শুচিব্রত সেনের মাধ্যমে এই সিরিজের কয়েকটি প্রবন্ধ পড়ে এই পত্রটি পাঠান। তবে তার আগে সম্পাদক হিসেবে আমার মন্তব্যটা এখানেই বলে রাখি : আমি পণ্ডিত ব্যক্তি নই। কাজেই এগুলি অপদার্থ বলে এক কথায় উড়িয়ে দেবার স্পর্ধা আমার নেই। সাধারণ পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছে এদের মধ্যে অবশ্যই ভেবে দেখার মতো কিছু পদার্থ আছে। এবং আমরাই আগ্রহে জিতেন্দ্রনাথ, যিনি এ যাবৎ একটি অনুপেক্ষণীয় পাঠকপরিমণ্ডলের কাছে একজন গুণী ছোট গল্প লেখক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন, এই প্রবন্ধগুলির একটি সংক্ষিপ্ত মর্মকথা লিখেদিয়েছেন 'মা নিষাদ' নামে চেতনিকের পাঠকবর্গের জন্যে। সুধীপাঠকবৃন্দের অভিমত পেলে তিনি খুশি হবেন। প্রবন্ধগুলি শিগগির গ্রন্থাকারে বাজারে বের হবে। আগ্রহী পাঠকেরা লেখকের সংগে যোগাযোগ করতে পারেন।—সম্পাদক/চেতনিক

শান্তিনিকেতন

৮. ১১. ৭৭

মাঙ্গবরেষু,

শ্রীযুক্তশুচিব্রতবাবুর হাতে গত ২২ | ৯ তারিখে আপনার 'বিজ্ঞানময় শারদ দুর্গা প্রতিমা', 'রামায়ণ—পুরাণে ও বিজ্ঞানে' প্রবন্ধগুলি পেয়ে, অভি-নিবেশ সহকারে প'ড়ে, আপনাকে আমার বিশদ মতামত আপনার নতুন-পাড়া, কান্দীর ঠিকানায় গত ২৪ | ৯ তারিখে পাঠিয়ে দিয়েছি। কপি রেখেছিলেম। আপাতত হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছি না।

আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ও তাৎপর্যব্যাখ্যা অভিনব ও যথার্থ। আপনার রচনা পড়তে পড়তে দানিকেনের কথা মনে পড়ে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে আপনি নতুন বস্তু দান করছেন।

আগামী ফেব্রুয়ারির দিকে আমাদের আলোচনায় বসলে ভাল হয়। বর্তমানে বিস্তর ঝামেলায় আছি।

কুশল সংবাদ সমেত পত্রযোগ রাখলে আনন্দিত হবো। ইতি

ভবদীয়

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় করকমলে]

মা নিষাদ

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকির মুখনিঃসৃত প্রথম শ্লোক :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

ক্রৌঞ্চদৃশ্য অবলোকনের আগে এবং প্রথম শ্লোক উদ্‌গীত হওয়ার পরে বাল্মীকির জীবনে আরও দু'টি ঘটনা ঘটেছে, যা তাঁকে রামায়ণ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

এই ভূমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ নর কে ?—একথা জানবার কৌতূহল জেগেছিল বাল্মীকির মনে।

মহর্ষি নারদকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি রামকাহিনী ব্যক্ত করলেন।

নারদ বিদায় নিলে বাল্মীকি স্নানের অভিলাষে 'গঙ্গার অদূরবর্তিনী তমসা নদীতীরে উপস্থিত' হয়ে সুবিস্তীর্ণ বনের চারদিকে ভ্রমণ করতে করতে "বিচরণশীল, আধিব্যাধিশূন্য, মনোহর শব্দায়মান ক্রৌঞ্চমিথুন" দেখতে পেলেন।

হেনকালে এক নিষাদ সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে পুং-ক্রৌঞ্চকে নিহত করল।

'তখন ক্রৌঞ্চী প্রমত্তভাবে সুরতাসক্ত, বিস্তৃতপক্ষ নিত্যসহচর তাম্রশীর্ষ দ্বিজবর পতির বিয়োগ কাতরা হইয়া এবং তাহাকে নিহিত শোণিতাক্ত ও ভূমিতলে পুনঃ পুনঃ বিলুণ্ঠিত দেখিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল।'

এই দৃশ্য দেখে বাল্মীকির হৃদয়ে করুণার আবির্ভাব হ'ল। পরে তিনি দয়াপ্রযুক্ত এই কর্মকে পাপকর্ম নিশ্চয় করিয়া ব্যাধকে বললেন, 'মা নিষাদ' অর্থাৎ রে নিষাদ! যেহেতু তুই, এই ক্রৌঞ্চমিথুন মধ্যে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস্ অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠালাভ করিবি না।"

এই কথা বলার পরমুহূর্তে বাল্মীকির মনে হল,—'আমি এই শকুনের শোকে ক্রুদ্ধ হইয়া ইহা কি বলিলাম।'

অতঃপর শিষ্যকে বললেন,—"এই চতুষ্পাদবদ্ধ, প্রতি পাদে সমানাক্ষর ও বীনালয়-সমন্বিত বাক্য, শোক সময়ে আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব ইহা শ্লোকই হউক, অন্যথা না হউক।"

স্নানান্তে আশ্রমে ফিরে যাওয়ার পর সেখানে ব্রহ্মা উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মার সম্মুখে হৃদয়াবেগে বাল্মীকি সেই শ্লোক গান করলে তিনি বললেন,— "তোমার এই চতুষ্পাদবদ্ধ বাক্য শ্লোকই হউক, ইহাতে বিচারণা করিও না...। এরূপ বাক্যেই তুমি ধর্মাত্মা ধীশক্তি-সম্পন্ন লোকাভিরাম রামের সমস্ত বিবরণ বর্ণনা কর।" অনন্তর বাল্মীকি বিবেচনা করলেন যে সমুদয় রামায়ণ-কাব্য এরূপ করুণ রসপূর্ণ শ্লোকে রচনা করবেন।

বাল্মীকির রামায়ণ রচনার এই পটভূমিকা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এবং পাশাপাশি কিছু প্রশ্ন জাগে। যেমন,

প্রাচীন কাব্য-রীতি অনুসারে প্রথমে মঙ্গলাচরণ অবশ্যকর্তব্য। তবে কি প্রথম শ্লোকটি মঙ্গলাচরণ?

রাম-কাব্য রচনা করতে গিয়ে ক্রৌঞ্চমিথুন ঘটনার অবতারণা করার প্রয়োজন কি? সমগ্র কাব্যের করুণ রসের প্রাধান্য সুস্পষ্ট করে তুলবার জন্য?

বীণা-লয় সমন্বিত বাক্য—এই বক্তব্য কি সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রতি নির্দেশ করছে?

রাম-কাহিনীর প্রথম বক্তা নারদ, সম্মতিদাতা ব্রহ্মা, রচনাকর্তা বাল্মীকি

আর প্রয়োগকর্তা লবকুশ। এতজনের সমাবেশ ঘটানোর কারণ কি?

'মা নিষাদ' শ্লোকটির অর্থভেদ করলে পূর্বোক্ত তর্জমা ছাড়া ভিন্ন বক্তব্য আছে।

মা—লক্ষ্মী নিষাদ, নিষদ, নিষদ=নিষাদস্বরঃ। অতএব নিষাদ—নিষদ অর্থ স্বামী।

ক্রৌঞ্চ অর্থ রাক্ষস বিশেষ।

সুতরাং শ্লোকটির অর্থ: লক্ষ্মীপতি! রাক্ষস-দম্পতির কামমোহিত পুরুষজনকে বধ করে তুমি সনাতন প্রতিষ্ঠা লাভ করো।

এই অর্থ অনুসারে শ্লোকটিকে রাম-কাব্যের মঙ্গলাচরণ হিসাবে মেনে নেওয়া যায়। লক্ষ্মীপতি রাম এবং রাক্ষস-দম্পতির পুরুষজন রাবণ; কামমোহিত সীতার প্রতি। অর্থবোধ সহজ।

কিন্তু নিগূঢ় অর্থও আছে। এই অর্থভেদের আগে বাল্মীকি প্রমুখ নামগুলির অর্থ জানা দরকার। কে এই বাল্মীকি?

কৃত্তিবাস এবং আধ্যাত্ম-রামায়ণে স্পষ্ট বলা আছে তিনি চ্যবন-পুত্র; প্রথম জীবনে রত্নাকর দস্যু ব'লে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তপস্যা করে ঋষি বাল্মীকি হয়েছেন।

বাল্মীকিরামায়ণ-এ তাঁকে প্রচেতস-নন্দন বলা হয়েছে।

চ্যবন ভৃগু-সুত; আর ভৃগু ব্রহ্মার মানসপুত্র। ভৃগু অর্থ পর্বতের সানুদেশ।

যা কিছু সহজাত তাকেই ব্রহ্মা বলা হয়। পর্বত পৃথিবীসৃষ্টিকালে প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ভূত। অতএব পর্বতকে বলা হয়েছে ব্রহ্মা এবং তার সানুদেশ মানসপুত্র ভৃগু।

চ্যবন অর্থ ক্ষরণ।

পর্বতের ঢালুদেশ হতে যে জলস্রোত নেমে আসে তাকে বলা হয়েছে ভৃগুপুত্র চ্যবন। পর্বত ও তার সানুদেশ চেতনাহীন; কিন্তু গতিশীল জলধারাকে মনে হয় চেতনাসম্পন্ন। সুতরাং একে বলা হয়েছে প্রচেতস—উৎকৃষ্ট চেতনা যার।

প্রচেতস বা চ্যবন অর্থাৎ জলস্রোত বহন করে আনে পলিমাটি, বালি ইত্যাদি। এই বাহিত পলিমাটি সাগরসঙ্গমে নদীমুখে বদ্বীপ বা ভূখণ্ড সৃষ্টি করে।

সমুদ্রর এক নাম রত্নাকর; সাগরের জোয়ারভাটাকে বলা হয়েছে দস্যুতা।

একদা যা সমুদ্র সামিল, পরবর্তীকালে পলিমাটি জমে তাই ভূখণ্ডে রূপান্তরিত হয়। বাল্মীকি শব্দটি বল্মীক (উইঢিবি) শব্দজাত। আবাদযোগ্য পাললিক মৃত্তিকাগঠিত ভূখণ্ডকে বাল্মীকি বলা হয়েছে।

এই জাতীয় ভূ খণ্ড চলিতভাবে ক্ষেত্র' বলে পরিচিত।

ভরত অর্থ ক্ষেত্র; অতএব ভরত ও বাল্মীকি সমার্থক।

এই ভূ-খণ্ড মূলতঃ মানবজাতির অগ্রগতির ধারক; যেহেতু কৃষিকাজের শুরু এখানে। অতএব মনে করা যেতে পারে যে এই ভূ-খণ্ডের (বাল্মীকির) মানব সভ্যতার কর্ণধার হিসেবে গর্ববোধ ছিল এবং নারদের কাছে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে শুনতে চেয়েছিল।

নারদ নার (জল)—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। যিনি জল দান করেন।

অথবা, না (সৃষ্টিকর্তা)+র (সংহারকর্তা)+দ (পালন কর্তা)= নারদ।

উভয় ক্ষেত্রেই ভাবার্থে অন্তরীক্ষ।

শ্রেষ্ঠ নর কে— একথার প্রশ্নকর্তা ভূ-খণ্ড (বাল্মীকি)

উত্তরদাতা অন্তরীক্ষ (নারদ)

নর শব্দ দ্বারা স্পন্দনময় সকল কিছুই ব্যক্ত করা যায়।

এই প্রশ্নর উত্তরে রাম-এর প্রস্তাবনা।

নারদ কাকে নির্দেশ করল রাম শব্দে?

ভূখণ্ড বন্ধ্যা, প্রজনন-শক্তিহীন; যদি বৃষ্টিপাত না হয়।

অতএব মূল শক্তি নিহিত রয়েছে বৃষ্টিপাত তথা মেঘের মধ্যে।

কিন্তু এই মেঘ সচলতা লাভ করে বায়ুদ্বারা। এবং শ্রেষ্ঠত্ব মনোহরত্ব লাভ করে বর্ষাকালে। প্রচণ্ড দাবদাহের পর বর্ষা আনে ধরিত্রীর বুকে সজীব শ্যামলতা; পৃথিবীর শাশ্বত মাতৃত্ব ফুটিয়ে তুলে রূপ নেয় জীবধাত্রীর।

যে বায়ু বর্ষাঋতুর সূচনা করে তাকে বর্তমান কালে বলা হয় মৌসুমী বায়ু।

আবহমান কাল হতে এই মৌসুমী বায়ুর আসা যাওয়ার উপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাত তথা কৃষিকাজ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

অবশ্য এই বয়েপ্রভাব সমগ্র পূর্বভারতীয় অঞ্চল এবং তিব্বত ও চীনের আবহাওয়ার উপর আধিপত্য করে আংশিকভাবে।

বর্তমানের মৌসুমী বায়ুকে মহর্ষি নারদ একদা রাম বলে সম্বোধন করেছেন। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা নারদের এই বক্তব্যকে সমর্থন করার পর বাল্মীকি তখন রামের অয়ন অর্থাৎ চক্র বা আসা-যাওয়ার গতি প্রকৃতি বিশদভাবে গীতি কাব্যে রচনা করেন।

ক্রৌঞ্চ অর্থে এক জাতীয় বক ধরলে সমগ্র রাম কাহিনীর সঙ্গে প্রথম শ্লোকটির কোন সম্পর্ক থাকে না। একমাত্র করুণ রসের নির্দেশনা ছাড়া।

কিন্তু শ্লোকটিকে মঙ্গলাচরণ ধরলে ক্রৌঞ্চমিথুনের ভাবার্থ হয় দ্যাবাপৃথ্বী - দৌ বা অন্তরীক্ষ পিতা বা পুরুষ এবং পৃথিবী মাতা বা স্ত্রী।

শ্লোকটিতে ক্রৌঞ্চমিথুনের কয়েকটি বিশেষণ আছে;—বিচরণশীল আধিব্যাধি বিশেষণ; প্রমত্তভাবে সুরতাসক্ত, বিস্তৃতপক্ষ নিত্যসহচর তাম্রশীর্ষ দ্বিজবর।

বর্ষার পূর্বে প্রখর গ্রীষ্মের প্রাকৃতিক পরিবেশ এই বিশেষণগুলিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটি জ্বলন্ত তাম্রপিণ্ডের মত প্রচণ্ডভাবে তার তেজঃপুঞ্জ ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এজন্য বলা হয়েছে প্রমত্তভাবে সুরতাসক্ত।

হেনকালে কালোমেঘ সূর্যকে আড়াল করে বর্ষা আগমনের ইংগিত দিল।

মেঘকে রূপকার্থে নিষাদ বলা হয়েছে এবং সূর্য আড়াল হওয়া মানে নিষাদ কর্তৃক পুং ক্রৌঞ্চ নিহত হওয়া।

নিষাদ এবং ক্রৌঞ্চ মিথুন শব্দ দুটি কাল নির্দেশক।

ক্রৌঞ্চমিথুন হয় বর্তমানের ইংরাজি অব্দের মে-জুন মাসে।

নিষাদ অর্থ সপ্তসুরের শেষ সুর, হস্তী বৃংহিত।

মিথুনকালে পশুপাখীর ডাক স্পষ্টতর হয়।

হস্তীর মিথুনকাল গ্রীষ্ম ঋতু ও বর্ষা সমাগম। সুতরাং ক্রৌঞ্চ ও হস্তীর মিথুনকালে সূর্য যখন দক্ষিণায়নাদি বিন্দুর কাছাকাছি;

অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ পর্যায় এবং বর্ষাঋতুর শুভারম্ভ।

প্রচণ্ড সূর্যতাপ জীবাণুনাশক, এজন্য বলা হয়েছে আধিব্যাধি শূন্য।

সূর্যরশ্মি তরঙ্গ বিশেষ এবং বিজ্ঞান মতে তরঙ্গ মাত্রই শব্দ সমন্বিত। প্রমাণিত সত্য যে মহাশূন্য মনোহর শব্দায়মান।

ক্রৌঞ্চ অর্থ রাক্ষস বিশেষ।

রক্ষ্ (রক্ষা করা) ধাতু নিষ্পন্ন রাক্ষস শব্দের অর্থ 'যাহা হইতে (ধনাদি) রক্ষিত হয়,।

দ্যাবা পৃথ্বী প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি করে মেঘ আকর্ষণ করে। ফলে, স্থলভাগে বর্ষণ হয়, ফসল উৎপন্ন হয় যা প্রাণীজগতকে রক্ষা করে। অতএব গ্রীষ্মকালীন দ্যাবাপৃথ্বীকে ক্রৌঞ্চমিথুন বলে উল্লেখ করে আগামী দিনের ফসল উৎপাদন কারণে মেঘকে আহ্বান জানানো খুবই সহজ।

সুতরাং ক্রৌঞ্চ-মিথুন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে সমগ্র কাব্যে করুণ রসের প্রাধান্য সুস্পষ্ট করে তুলবার জন্য নয়।

বরং রামায়ণের মূল বিষয়বস্তু, মেঘসমাগমে ফসলপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা অর্থাৎ কৃষিবিজ্ঞানবক্তব্যের ইংগিত রাখা হয়েছে প্রথম শ্লোকে।

স্নানের অভিলাষে গঙ্গার অদূরবর্তিনী তমসা নদীতীর'—এই বাক্যে তমসা শব্দে নদী নয় বরং ভূ খণ্ডের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। নদী মাত্রকেই গঙ্গা শব্দে সম্বোধন করা যায়, যদিও গঙ্গোত্রীমুখনিঃসৃত জলধারাকে পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী বলে বর্তমানে ধারণা বদ্ধমূল আছে।

সরস্বতী নামে বিশেষ এক বা একাধিক নদী থাকলেও যে কোন জলধারাকে পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী বলে বর্তমানে ধারণা বদ্ধমূল আছে।

সরস্বতী নামে বিশেষ এক বা একাধিক নদী থাকলেও যে কোন জলস্রোতকে সৃ (গমন করা) ধাতু নিষ্পন্ন সরস্বতী শব্দে চিহ্নিত করা যায়।

তমসা তমঃ শব্দজাত। তমঃ অর্থে পঙ্কভূত।

অতএব তমসা ভাবার্থে পঙ্কভূত দেহ সম্পন্না ভূ খণ্ড।

নদী মুখে পলিমাটি জমে যে ভূ-খণ্ডের সৃষ্টি হয় তা'কে তমসা বলে অভিহিত করা হয়েছে। রামায়ণে ভৃগুর আশ্রমে হিমালয়ে এবং চ্যবনের আশ্রম যমুনা তীরে উল্লেখ আছে (উত্তর কাণ্ড/৭৯: ১৫)।

কিন্তু বাল্মীকি আশ্রম তমসাতীরে, এই তমসার অবস্থান সুনির্দিষ্ট নয়।

বনবাসকালে রাম গঙ্গা অতিক্রম করে অনেক পথ পরিক্রমণের পর বাল্মীকি আশ্রমে পৌঁছায়। অথচ লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হয়ে সীতাকে বাল্মীকি আশ্রমে নির্বাসনে রেখে আসে।

এই ধরণের অসঙ্গতি বিশ্লেষণ করে মনে হয় তমসা শব্দে কোন নদী ইংগিত না করে যে কোন নদী মুখের ব-দ্বীপ বুঝানো হয়েছে।

রামায়ণের প্রথম শ্লোকে বর্ষার মেঘকে আহ্বান জানিয়ে কৃষি বিজ্ঞান বক্তব্যের অবতারণা করা হয়েছে, তার বহু নজির মহাকাব্যে ছড়িয়ে আছে।

বলা হয়েছে রামায়ণের প্রয়োগ কর্তা লবকুশ।

কুশ অর্থ জল, যোক্ত্র। লব অর্থ অঙ্কুর। কুশ বড় বা প্রথম; লব ছোট বা দ্বিতীয়। বীজ হতে প্রথম আবির্ভূত অঙ্কুরাংশ পরবর্তীকালের শিকড় যার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা Radicle।

দ্বিতীয় অংশের নাম ভ্রূণ মুকুল (Plumule), যেটি কাণ্ডে রূপান্তরিত হয়।

বার্ষাসমাগমে বীজের অঙ্কুরোদ্গমে মেঘের সমাবেশের পরিপূর্ণতা ঘটে।

সুতরাং লবকুশ কৃষিবিজ্ঞানের প্রতি ইংগিত করছে।

রাম সীতাকে নির্বাসনে পাঠালো অন্য কারও কাছে নয়, বাল্মীকির আশ্রমে। এবং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কুলগুরু বশিষ্ট বা মাতা কৌশল্যার সঙ্গে পরামর্শ না করেই।

এই ঘটনায় সীতার পরিচয় দাঁড়ায় বাল্মীকির আশ্রিতা বা পালিতা।

কৃষিকাজ করা হয় পাললিক মৃত্তিকা গঠিত ভূ-খণ্ডে এবং হলকর্ষণ দরুণ ভূমিতে হলরেখা ফুটে ওঠে।

অতএব সহজেই বলা যায় বাল্মীকি আশ্রিতা সীতা (হলরেখা)।

লক্ষ্মণ রেখে এসেছিল সীতাকে বাল্মীকি আশ্রমে। সীতা তখন গর্ভবতী (উত্তরকাণ্ড/৫৮: ৮)।

গ্রীষ্মকালের শেষভাগে হলকর্ষিত জমিতে বীজ বপন করা হয়। এই তথ্য গর্ভবতী সীতা শব্দে প্রকাশিত।

লক্ষ্মণ=লক্ষণ=চিহ্ন। মেঘের আত্মপ্রকাশ বর্ষণে; এজন্য নামকরণ রামানুজ লক্ষ্মণ। পূর্বোদয়ে বর্ষা শুরুর আগেই বৃষ্টিপাতের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, বিশেষ করে বীজ বপনকালে।

এই কারণেই আদিকবি লক্ষণের সঙ্গে গর্ভবতী সীতাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন।

ঠিক এমনই লক্ষণীয় যে শ্রাবণ মাসে শত্রুঘ্নর উপস্থিতিতে লবকুশের জন্ম। সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হলে বর্ষা ঋতু ধরা হয়। রামায়ণে বর্ষাঋতুর প্রথম মাস শ্রাবণ। শত্রুঘ্ন অর্থে কীটঘ্ন শক্তি বিশিষ্ট সূর্যতাপ। ধান চাষের

অঙ্কুরোদগম সময়টি স্মরণ করলে বক্তব্য সহজ হবে।

উদাহরণ না বাড়িয়ে এই দাবি রাখা যায় যে রামায়ণে রূপকধর্মী উপাখ্যান দ্বারা প্রাচীন ভারতের ঋষিদের অধিগত কৃষিবিজ্ঞান তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

অবশ্যই এই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে বর্তমানের প্রচলিত রামায়ণ শুধু মাত্র এই তথ্য বহন করে না ; এর সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা, ধর্ম-তত্ত্ব এবং সমাজবিধি। ফলে মহাকাব্যটি হয়েছে ক্ষেত্র বিশেষে দুর্বোধ্য, তর্কসাপেক্ষ। যেমন প্রথম শ্লোকটিকে কেন্দ্র করে আরেকটি তথ্যের ইংগিত পাওয়া যায় সংগীত শাস্ত্রের ইতিহাসে সঙ্গীতবিদ হিসাবে কালানুসারে ব্রহ্মা, নারদ এবং ভরতের নাম রয়েছে।

বৈদিকসামগান প্রচলনের কালে ব্রহ্মা এবং গান্ধাররীতি ও বীণার উদ্ভাবক নারদের পরবর্তীকালে ভরত সঙ্গীতশাস্ত্রকে আরও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলেন।

'চতুষ্পাদবদ্ধ, প্রতিপাদে সমানাক্ষর' মূলতঃ অনুষ্টুপ ছন্দ।

সঙ্গীত জগতে বৈদিক ও গান্ধার রীতির সংমিশ্রণে পরবর্তীকালের রাগ ও রাগিনী। 'বীণালয়-সমন্বিত বাক্য' শব্দ গান্ধাররীতির নির্দেশক।

সঙ্গীত বিশারদ ভরত প্রাচীন কৃষিবিজ্ঞানকে অবলম্বন করে বাল্মীকি (=ভরত) ছদ্ম নামে রামায়ণ রচনা ক'রে ব্রহ্মা ও নারদ প্রবর্তিত রীতির সমন্বয় ঘটিয়ে একটি নতুন সঙ্গীত রীতিতে রামায়ণ গীতিকাব্য রচনা করেন। এই কারণে নারদের প্রস্তাবনা এবং ব্রহ্মার সমর্থন।

ভরতরচিত গীতিকাব্যের প্রয়োগকর্তা চারণগণ। বলা যায় নবরীতির গীতিকাব্য মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে নাট্যকার ও পরিচালক হলেন অভিনেতাগণ হতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

রামায়ণের প্রথম শ্লোকটির মধ্যে সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রতি যথেষ্ট ইংগীত রয়েছে।

প্রথমতঃ শ্লোকটির মেঘ ও মল্লার রাগের ধ্যানের সঙ্গে মিল রয়েছে। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই মেঘ বন্দনা করা হয়েছে।

শ্লোকটির ছন্দ সুরারোপ করার উপযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ শ্লোকটির মধ্যে শৃঙ্গার, রৌদ্র এবং করুণ রসের সমাবেশ ঘটনো হয়েছে। এই তিনটি রসের সঙ্গে ভাব ইত্যাদির সম্পর্ক দাঁড়ায় :

রস	ভাব	বর্ণ	স্বর
শৃঙ্গার	রতি	কৃষ্ণা বা শ্যাম	মধ্যম—চতুর্থ পঞ্চম—পঞ্চম
করুণ	শোক	কপোত বা বিচিত্র	গান্ধার—তৃতীয় নিষাদ—সপ্তম
রৌদ্র	ক্রোধ	রক্ত	ষড়জ—প্রথম ঋষভ—দ্বিতীয়
বীভৎস	জুগুপ্সা	নীল বা পীত	ধৈবত—ষষ্ঠ

অর্থাৎ মেঘ বা মল্লার রাগে সপ্তস্বরের যে কয়টি স্বরের প্রধান্য শ্লোকটিতে সেই স্বরপ্রকাশক ভাবগুলি বর্তমান। অথবা এমন কি প্রথম শব্দ মা নিষাদ মা নি ষা দ (ধা) মনে হয় যেন চারটি স্বরকে প্রস্ফুট করছে।

রামায়ণ পালাগান হিসাবে আবহমান স্বীকৃত। অতএব সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে বিশ্লেষণ করলে নতুন আলোক প্রাপ্তির সম্ভবনা প্রত্যাশা করা যায়।

যাইহোক, মুল বক্তব্য হোল রামায়ণের রচনাকর্তা কৃষিবিষয়ক তথ্য অবলম্বন করে বর্ষার প্রথম মেঘকে সম্ভাষণ জানিয়ে সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে একটি গীতিকাব্য রচনা করেন।

এই গীতিকাব্য বৈচিত্র্য তৎকালীন সমাজে ছিল সম্পূর্ণ নূতন।

সে কারণে দেখা যায় লবকুশ প্রথমে রামগান করেন ঋষিসমাবেশে (অর্থাৎ পণ্ডিতসমাজে), পরে অযোধ্যার রাজপথে (অর্থাৎ জনসমক্ষে), শেষে রামের রাজসভায় (অর্থাৎ রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ)

প্রাচীন ভারতে সকল কিছুর স্বীকৃতি যে পদ্ধতিতে দেওয়া হত, রামায়ণের ক্ষেত্রে সেই একই পথ অনুসরণ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় মেঘ-বন্দনা সূচক প্রথম শ্লোকে যে বক্তব্যের প্রস্তাবনা, পরবর্তীভাগে বিশেষ করে ইক্ষ্বাকু, কুশ, এবং জনক বংশে তারই পূর্ণাঙ্গ বিস্তার। বর্তমান প্রচলিত রামায়ণ হতে কৃষি-বিষয়ক অংশগুলো উদ্ধার করতে বসলেই দেখা যাবে প্রতি অধ্যায়ের শ্লোকের মর্মে মর্মে পিতৃরাজ্য হতে নির্বাসিত এক রাজকুমারের ইতিবৃত্ত জড়িয়ে রয়েছে।

আপাততঃ এই প্রাচীন ইতিহাসকে পাশে সরিয়ে রাখলে রামায়ণে কৃষিবিজ্ঞান তত্ত্বগুলি সুন্দর ফুটে ওঠে।

অন্য হাটে পাওয়া

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

কলকাতার প্রতিবেশী। গায়ে হেলান দিয়ে বসবাস অথচ কেউ কারও আত্মীয় নয় · অনাত্মীয়ও নয়। আশুবাবুকে রোজই দেখি—তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর সদাসর্বদা কানে এসে আছড়ে পড়ে, কিন্তু মৌখিক একটা আলাপ করার মতো কোন ঘটনাই ঘটে ওঠে নি।

সেদিন হঠাৎ সরাসরি আমার বসার ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন ভদ্রলোক। আমাকে ভদ্রতা করার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে আশুবাবু আসন গ্রহণ করে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। কারণটা অবাঞ্ছনীয় কিছু নয়। তিনি তাঁর গ্যারেজ ঘরটায় মুদি দোকান খুলছেন। পাড়া প্রতিবাসীদের সমর্থন ও সহানুভূতি প্রার্থনা করতেই তাঁর আগমন। হঠাৎ মুদি দোকান কেন খুলছেন, তার কারণ জানালেন। মেয়ের বিয়ের সওদা করার সময় তিনি আবিষ্কার করেছেন নিত্য দরকারি এই ·চাল, ডাল, তেল-নুন ইত্যাদিতে আমাদের মতো সাধারণ লোক কী আন্দাজ ঠকে আসছে। দোকানদার জাতটাই নাকি জোচ্চোর। যাতে তিনি নিজে এবং পাড়ার দশঘর সস্তায় ভালো জিনিস পেতে পারেন তার এই ব্যবস্থা। দোকান চলে ভালো, না চললেও জিনিস তো তাঁর আর ফেলা যাচ্ছে না।

গ্যারেজ ঘরটায় কী একটা কাণ্ডকারখানা চলছে ক'দিন ধরেই যাওয়া আসার পথে সেটা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ওটা যে মুদিখানা দোকানের জন্ম-পর্বের সূচনা হচ্ছে সেটা বোঝা গেলো এইমাত্র। .

বললাম, 'আমি যে ভেবেছিলাম, ওটা বোধহয় একটা ক্যাবিনেট ফার্মের সূচনা হচ্ছে।'

হেসে তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন, আশুবাবু, 'মুদিখানা বলে কি ভাবছেন, বেটাদের মতো স্রাষ্টি কিছু করবো ? এ হবে একেবারে মডার্ণর সিস্টেমে—· অত্যন্ত আধুনিক কায়দায়। বাংলাদেশে এমনটি নিশ্চই আজও কোথাও এমনটি দেখেননি মশায়। আসুন না, দেখুন এসে কেমন সব ব্যবস্থা করেছি!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। 'আসুন, চলুন, দেখে শুনে বুঝে

নিন। দেখে কিন্তু আমার কাজের তারিফ না করে পারবেন না। তা আমি বলে রাখছি!'

কাজ রেখে বাধ্য হয়ে ভদ্রলোকের সংগে তাঁর আদর্শ মুদিখানার দোকান দেখতে বেরিয়ে আসতে হলো।

প্রৌঢ় হাসিখুসি ভরা ভদ্রলোক। দেখলেই মনে হয় বেশ শান্তিতে আছেন তিনি। দোকানে ঢুকেই সগৌরবে সকল আসবাবগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, দেখুন তো মুদিখানা বলে মনে হয় কি? মাটিতে শোয়ানো প্রকাণ্ড শো-কেশটা দেখিয়ে বললেন, 'চিনি ময়দা, ডাল, মশলা সব ঝাড়-পোঁচ করে ঢেলে দেবো এর খোপে খোপে কাঁচের জায়গায় থাকবে তেল, কলের মুখ খুললেই ব্যাস্। নিট্ ওজন চলে আসবে বোতলে মিটারের দাগে। দেখবেন, মেয়েরা পর্যন্ত সখ করে ম্যার্কেটিং করতে আসবে এখানে। বাজারে ঘুরে শাড়ি ব্লাউজ ব্রেসিয়ার কেনে আর তাদের ভাঁড়ারের জিনিষ কিনবে না? এই দেখুন, একটা বিলিতি কাঁটা কিনেছি। জিজ্ঞেস করলে তখনই প্রশ্ন করবো, মটর ডাল? কম্পাউণ্ড বলুন? খুব একটা ষ্টাইল মেনটেন করা যাবে, কি বলেন? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকান ভদ্রলোক। তারপর হো হো করে প্রাণভরে হেসে ওঠেন তিনি।

বুঝলাম, আশুবাবুর ব্যবসা করার প্রতিষ্ঠান এটা নয়, এটা তাঁর সৌখিন একটা খেয়াল! একটা কিছু বলা দরকার। বললাম, 'ভারি সুন্দর করেছেন কিন্তু দোকানটা। এটা একটা আদর্শ ভাণ্ডারই বলা চলবে।'

'আরে মশায়, সুন্দর কথাটা তো দু'নম্বরে। প্রথম ব্যাপারটা তো ধরলেনই না। এটা করতে খরচের হিসাবটা দেখেছেন? সেটাই তো ক্রেডিট মশাই। 'টক্‌টক্' করে শেল্‌ফটার গায়ে টোকা মারলেন। তারপর বললেন চোখ কপালে তুলে, 'বুঝলেন, এই যে দেখছেন জিনিষটা, এটা খাঁটি বিলিতি সাহেব বাড়ির মশায়। পয়লা নম্বরের 'টিক'—বলতে পারেন এর দামটা? না, তবে শুনুন, 'টু-থারটির' কম তো নয় কিন্তু আমার পড়েছে কোরিং শুদ্ধ মাত্র 'ফিফটি-টু' ওন্‌লি। সমস্ত কলকাতা চষে আসুন, এ দামে জোটাতে পারবেন কি? ইম্‌পসিবল্! 'ড্যাম্ চিপে হয়ে গেলো এতোগুলো ফার্ণিচার, তাইতো এই 'আদর্শ—ভাণ্ডার', আমার স্বপ্ন সার্থক রূপনিতে পারছে!' তিনি তক্তাপোষের ওপর স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বসে পড়ে আরও বলতে থাকলেন, জিনিস কেনাটা মস্ত একটা আর্ট মশায়। ওটা

সবারের ক্ষমতায় কুলোয় না।

আমি মুক্তির প্রচেষ্টায় বাইরে বেরিয়ে আসতেই আশুবাবুও তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। 'চললেন কোথায় মশায়? হ্যাঁ চলে আসুন আমার ঘরে। আরে পাশের বাড়ির প্রতিবাসী আপনি তো আমার ঘরের লোক মশায়।' এই বলে সজোরে আমার ডান হাতটা চেপে ধরে টানতে টানতে একেবারে উপর তলায় তাঁর শোবার ঘরের বিছানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন।

খুব মনখোলা খেয়ালি মানুষ এই আশুবাবু। সব সময়ই যেন হাজারখানেক লোকের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি সাজানো গোটা দশেক বড় বড় স্টিলের ট্রাংক। পটাপট টেনে টেনে ডালাগুলো খুলে দিলেন। বললেন, 'বছর তিনেক আগে গিয়েছিলাম, কাশ্মীরে। এ সব গরমের কাপড় ওখান থেকে না নিয়ে পারলাম না, এ সব কাপড়ের দাম শুনলে আপনি মশায় বিশ্বাস রাখতে কেঁউমেউ করবেন। অল্প মজুরিতে একটা দরজি ধরে ত্রিশটা কমপ্লিট স্যুট আর একুশটা ওভার কোট করেও আটখানা গোটা থান একদম পুরো মাপে পড়ে আছে। এছাড়া ঐ যে দুটো লেদার কেস দেখছেন, ওর ভেতর শুধু কাশ্মীরী শাল আর আলোয়ান টান টান ঠাসান রয়েছে। বলতে পারেন এগুলো মোট কত্তো দামে কিনেছিলাম? মাত্র আড়াই হাজার টাকায়। বিশ্বাস করবেন, মশায়?'

আমি প্রসংগ পরিবর্ত্তনের আশায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'কৈ এতদিন আছি, কখনো তো আপনাকে 'স্যুট' পরতে দেখিনি?'

'পরিনা, হয়তো পরবোও না। যা কিনি সবই কি আমি বা আপনি নিজেই খাচ্ছি?' অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে আশুবাবু আবার বকতে শুরু করেন, 'আমার ওয়াইফ ও বলেন, আমি 'স্যুট' পরিনা কেন? আরে মশাই, প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে তো আমাদের সকলকে বাট ভাগ জিনিষই বাদ দিতে হবে। এমন জলের দরে জিনিশগুলো পাচ্ছি, হাতছাড়া হয়ে যাবে? মাথা খুঁড়লেও পারবো আর ওদামে ঐ সব জিনিষগুলো জোটাতে? বাবসার বাইরে প্রয়োজন কি সখ ছাড়াও এত সামান্য দরে ওগুলো কি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে?

সামান্য পরিচয়ের মধ্যেই আমি বুঝেছিলাম, এ লোকটিকে বোঝানো বা উপদেশ দেওয়ার চেয়ে 'সায়' দেওয়াটাই বেশি নিরাপদ। এ ছাড়া আমার উপদেশ উনি 'বশ' মানবেন এমন ধারণা করা নিতান্ত অর্বাচীনতা ছাড়া আর

কিছুই নয়। একে একে অনেকগুলি জিনিশ দেখে এবং মালিকের আর্টের তারিফ করে এদিনের মতো পরিচয় পর্ব শেষ করে নিজের আস্তানায় ফিরে আসতে আমার পুরো চারটি ঘণ্টা অতিবাহিত হলো।

পুরাতন দোকানের পাট তুলে দিয়ে আশুবাবুর দোকানের মালিক গ্রাহক হলাম। ভালো জিনিস সস্তা দরে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিটা তিনিও যথাসম্ভব রাখতে লাগলেন। অনেকের অপেক্ষা অনেক ফিকির ফান্দিতে উনি আমাদের জন্য মাল সংগ্রহ করেন। দেখা হলে তারই সমর্থন গ্রাহক-দের মুখ থেকে আদায় করে আনন্দ পান।

এমনি করেই কাটছিলো নিশ্চিন্ত আরামে। অকাস্মৎ এক রাতে আমার বারান্দায় আমারই নাম ধরে ডাকতে শুনে তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম। চিৎ-কার করে আমাকে আকর্ষণ করলেন, 'নেমে আসুন মশায়, দেখে যান, কি কাণ্ড করেছি — ।'

আশুবাবুর পিছনে একটা ভারি বিরাট বস্তু মাথায় নিয়ে ছয় সাতজন কুলি। নেমে আসতেই গলা একটু খাটো করে বললেন, 'জার্মান পিয়ানো টিপটপ কণ্ডিশন। নিউ প্রাইজ, সাড়ে তিন হাজার টাকা দাম মাত্র দু'শ পঁচাত্তর টাকায় খরিদ করলাম।' খুসির প্রাবল্যে কাঁধে হাত চাপিয়ে টেনে নিয়ে চললেন। তারপর বাইরের ঘরের একপাশে ঐ বিরাট পিয়ানো বস্তুটা ধরাধরি করে বসালেন। আমাকেও বসতে হলো। তিনি নিজে এসেছেন রিক্সাতে। রিক্সাওয়ালার সংগে বিতণ্ডা লাগালেন মাত্র এক আনা হেরফের নিয়ে। অবশেষে 'নেহি' দেগা বলে ধপ করে আমারই পাশে বসে পড়লেন। রিক্সাওয়ালা ওদের দেশওয়ালী ভাষায় গজরাতে গজরাতে বিদায় হলো কিন্তু আশু বাবু ঐ এক আনা পয়সা যে সঠিক ভাড়ার চেয়ে কম দিতে পেরেছেন তারই জয়ের আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠলেন। 'আমার সংগে চালাকি? মিথ্যে বলে এক আনা পয়সা আমার কাছ থেকে আদায় করার মতলব? কত ডজন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী আমার হাতে বলে কিনা কাহিল, আর —'

অকস্মাৎ এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ আমাকেই জিজ্ঞাসা করে বসেন, ও মশায়, আমার ছাতাটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা তো রিকসার চেড়াতে বাঁধা ছিলো?

ছাতা নেই, বুঝতে পারলাম ওটা রিক্সাওয়ালার এক আনা পয়সা পুষিয়ে দেওয়ার জন্যই রিক্সায় চড়ে চলেগেছে।

'চুরি করলে আর কি করা যায় বলুন? সংগে খাওয়া করলে অবশ্য আদায় আমি করতে পারি, এটা ঠিকই, তবে কিনা আর একটা ঝক্কি! যাক্‌ —যাক্‌গে।' আশুবাবু শান্ত হলেন। এই মাত্র হাজার দুই টাকা লাভ করে ফিরছেন—ছাতার ব্যাথাটা ভুলতে বেশি বেগ পেতে হ'লোনা তাই। পিয়ানোটার ঢাকা খুলে ওটাতে বেসুরো টোকা দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন তিনি যন্ত্রটা কি পরিমাণে সুরেলা। তারপর তাঁর কাজের হাজরো তারি'ফ আদায় করে আমাকে ছাড়লেন যখন, তখন রাত সাড়ে এগারোটা।

এর কিছুদিন পরে পুরানো একটা মোটরগাড়ি আশুবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে দেখলাম। এ ধরনের গাড়ি যার হর্ন ছাড়াও সব অংগ প্রত্যংগই আওয়াজ করে নিশ্চয়ই এমন একটা মূল্যে পেয়েছেন যে না কিনে থাকতে পারেন নি তিনি। আশপাশে দোকান থাকায় চট মুড়ি দিয়েই দাঁড়িয়ে থাকতে হলো ওটাকে ফুটপথের একধারে। মালিকের নতুন হাতের খুব খানিকটা সেবা যত্ন নিয়ে একদিন ওটা কোথায় সরে পড়লো আর তার পাত্তা পাওয়া গেল না পুনরায়।

আরও কিছুদিন পরে আমার বাড়ির ভিতর থেকে ঘোরতর আপত্তি এলো যে আশুবাবুর দোকান থেকে আর মালমাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। ময়দা দেন তো ঘি পাওয়া যায় না; চিনি পাওয়া যায় তো তেল্ পাওয়া যায় না ইত্যাদি।

আশুবাবুকে জানাতে গিয়ে জেনে এলাম। সস্তায় গব্যঘৃত আমদানির জন্য লোক পাঠানো হয়েছে সুন্দরবনের পল্লী অঞ্চলে। গমের আটা আর ভয়সা ঘিয়ের জন্যে বিহারে ক্রেতা সমবায়ের সংগে যোগাযোগ চলছে। চিনির জন্য জাভা কি সুমাত্রা দেশ থেকে আমদানির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অতএব কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরতে হবে।

কিন্তু ধৈর্য বেশিদিন ধরে রাখতে গেলে রান্না ঘরের পাট ওঠাতে হবে। সুতরাং অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করলাম।

আমার জব্বলপুর থেকে হঠাৎ ডাক আসায় কিছুদিনের জন্য কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হলো। মাত্র মাসেক কালের মধ্যেই ফিরে এসে দেখলাম মুদিখানার নোংরা সাফ হয়ে গেছে। সেখানে পুরাতন আসবাব পত্রের আড়ৎ-খানা হয়েছে। বিরাটাকার সেই পুরাতন পিয়ানোটাও এককোণে ঠুঁটো করে দাঁড়িয়ে আছে শ্বাসরোধ করে। তার গায়ে মোটা পিচবোর্ডে—আলতায়

তুলি দিয়ে দাম লেখা হয়েছে, 'মাত্র দেড়শ টাকা।'

আশুবাবু সেই পুরাতন মেজাজেই কাকে ধমক দিচ্ছেন. 'যান যান মশায়, এর মর্ম বোঝেন না তাই বাজে কথা বলে 'বেশি দাম, বেশি দাম' করছেন।'

' কাকে বলছেন, আশুবাবু?' জিজ্ঞাসা করলাম অতি নম্র কণ্ঠে গ্যারেজটার রোয়াকে উঠে।

' – আরে মশায়, ঐ যে; ঐ পাশের বাড়ির লোকটা। নেহাৎ আনাড়ি। এ সব জিনিষের কদর ও কি বুঝবে বলুন তো? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন সেই পুরাতন মেজাজে। দেখলাম, সেই মেজাজের ঝাঁজ যদিও বেড়েছে, কিন্তু আশুবাবুর কোথায় যেন 'চরম যন্ত্রনার দাগ, অভাবের প্রকটতা, অতি তীক্ষ্ণভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে। ভাবলাম, অবস্থা লোকটার ভালই ছিলো একদিন, কিন্তু খেয়ালের ঝোঁকে যা করে বেড়িয়েছেন তাতে এটাই স্বাভাবিক!

খানিকটা সহানুভূতি, কিছুটা শখ আর সম্মার আকর্ষণে কাছে এসে বললাম, 'আশুবাবু সত্যিই কি পিয়ানোটা দেড়শ' টাকায় বিক্রি করে আজ আপনি ঠকতে চান? কেননা আমি তো জানি এটা আপনি কি দামে কিনেছিলেন! কিন্তু আমার মনে হয়, যদি আপনি আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে পারেন, তাহলে ভালো দাম দেওয়ার লোক আপনি পেতে পারেন।'

আমার কথায় আশুবাবুর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, 'না মশাই, এর কদর আপনার মতো ক'টা লোকই বা বোঝেন?' বললাম, 'তাহ'লে ওটা আমার ঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, আমি পুরো দু'শো টাকাই আপনার লোকের হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই।' এই বলে পিয়ানোর আগ্রহে নয়, আশুবাবুর অবস্থা কে'বের দীনাবস্থার কথা ভাবতে ভাবতেই নিজের ডেরায় এসে উঠলাম।

মনে হলো আশুবাবু অবস্থা বিপাকে আমার এই প্রস্তাবে হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। অধীর আনন্দে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই তিনি দু'টো মুটের মাথায় যন্ত্রটা তুলে মিনিট দশের মধ্যেই আমার দরজায় এসে হাঁক-ডাক শুরু ক'রে দিলেন।

আমি তখনো জব্বলপুরের ঘটনাগুলো সবটা স্ত্রীর কাছে বলে শেষ করতে পারিনি। দরজায় আশুবাবুর চিৎকারে আর বৃষ্টির ঝাপটায় যথাশীঘ্র কাছে এসে দাঁড়ালাম। আশুবাবুর হা'তে টাকা দুশো গুণে দিতেই তিনি চমকে

উঠলেন। সর্বাংগ ভেজা আধবুড়ো এই ভদ্রলোক অবাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাশে কণ্ঠে বলে ফেললেন, 'সত্যি দু'শো টাকাই দিচ্ছেন? হে হে, কিন্তু আমার লেবেল এর চেয়ে পঞ্চাশ কম নিতে বলছে যে মশাই?'

—'তা বলুক। ওটার কম দিলে আপনার পকেট থেকে ক্ষতি হবে যে।' এই বলে আরও কুড়িটি টাকা আনতে স্ত্রীকে ইংগিত করলাম।

আশুবাবু টাকাটা গুণে নিয়ে ফতুয়ার পকেটে রাখলেন। তারপর পকেট থেকে আট আনা পয়সা বের করে কুলিদের হাতে দিয়ে ওদের বিদায় করলেন। একটু থেমে আমাকে সাহায্য করতে নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজেই যন্ত্রটাকে টানতে লাগলেন আমার ঘরের মধ্যে সেট করে দেওয়ার জন্য। বললেন, 'ধরুন, ধরুন তো একটু. বৌ ঠাকরুণের পছন্দ মতো জায়গায় এটাকে মানান সই করে পারমানেণ্টলি বসিয়ে দিই। হোয়াট এ প্রাইজ? দশজনকে দেখিয়ে গৌরববোধ করতে পারবেন মশাই!'

আমি তাঁকে বাধা দিলাম। বললাম, 'আপনি বৃদ্ধ মানুষ, আপনি আর টানাটানি করতে যাবেন না। আমরা আগে জায়গা ঠিক করি, পরে ওটা আমরা সেট করে নিতে পারবো।' চাকর ডেকে পিয়ানোটাকে একটু ধুলো সরিয়ে হাল্কা করে নেওয়ার আশাও পোষণ করছিল্'ম মনে মনে।

বৃষ্টি বেশ কমে এসেছে। এইবার আশুবাবু বাড়ি ফেরার জন্য নামতে উদ্যত হলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর হাতের মধ্যে দু'খানা দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে বিনয়-নম্র কণ্ঠে বললাম, 'এমনই দিনে এই যন্ত্রটা আনতে গিয়ে আপনার আরও যে লোকসানটা হয়েছিলো সেটা আমি ভুলিনি আশুবাবু! এই টাকাটায় একটা ছাতা কিনে নেবেন, তা না হলে আমি খুব দুঃখ পাব কিন্তু।'

বৃষ্টিভেজা চোখ দুটো তুলে কি যেন বলতে চাইলেন তিনি। কিন্তু আমি তাঁকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'এত ভাল জিনিসগুলি এতো কমদামে ছেড়ে দিচ্ছেন কেন, বললেন না তো আশুবাবু?'

চমকে ফিরে তাকিয়ে সেই পুরনো মেজাজে হাজার লোকের সংগে কথা বলার ভংগিতে উনি বললেন, 'আরে মশায় গ্রামে একশ' টাকা করে দামি জমি বিক্রি হচ্ছে। এবারে একটা বড়সড় ফার্মিং খুলবো মতলব করেছি।' হো হো করে হাসতে হাসতে দ্রুত-গতিতে এগিয়ে গেলেন।

আমি ও আমার স্ত্রী না হেসে থাকতে পারলাম না।

লোকটা বোধহয়

দিব্যেশচন্দ্র লাহিড়ী

আবার সেই লোকটা !

চোখাচোখি হওয়া মাত্রই যেন একটা ক্রোধ মিশ্রিত ঘৃণা শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল সুহাসের। সে বিরক্ত হল। আর ভাবল—লোকটা কে? লোকটা কে? ওকি সত্যি সত্যিই ভিখারি না পাগল? ভবঘুরে না স্পাই? কি জানি। আজকাল কত শত লোকই তো কতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে তার খোঁজ রাখে। আর রাখারই বা দরকার কি? তুমি তোমার মত থাক —আমি আমার মত। রিঙ্কু রিঙ্কুর মত। না, রিঙ্কু আমার মত। ঠিক হল না। আমি রিঙ্কুর মত। কিংবা আমরা দু'জনেই দু'জনার মত। জীবনটাকে কাটাতে হবে শরতের ঝকঝকে নীল আকাশে একখণ্ড উজ্জ্বল মেঘের মত। শিউলির সুগন্ধের মত। কিংবা গর্বিত রাজহংসের মত।

অতএব সুহাস এগিয়ে চলল। সে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করল না লোকটাকে। লোকটা এখনও ওপাশের লাইট পোস্টটার গায়ে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে। বোধহয় আকাশ দেখছে কিংবা লাইটপোস্টের মাথায় তারের জটা জালে কাকের বাসা। চেহারাটও ঠিক অমান। কাকের বাসার মতই ছন্নছাড়া এলোমেলো। পরনে তেল চিটচিটে পট্টিমারা ফুলপ্যান্ট, গায়ে ঘাড়াফটা বোতামহীন একটা শার্ট। এক সময়ে হয়ত তার রং নীল ছিল। মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। চোখের কোণে কালি। দৃষ্টি কেমন উদভ্রান্ত। সব মিলিয়ে একটা বিধ্বস্ত ব্যক্তির প্রতিমূর্তি।—কিন্তু লোকটা কে? ভিখিরি না পাগল? ভদ্র ঘরের সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু কে লোকটা? কে জানে।—তবুও সুহাস এক-বার মুখ ঘুরিয়ে দেখল। সে তখনও একইভাবে দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি সেই কাকের বাসার দিকেই। তাহলে নির্ঘাৎ লোকটার মাথা খারাপ কিংবা। কিন্তু সেদিন তো সামনে এসে হাত পেতেই দাঁড়িয়েছিল অদ্ভুতভাবে।—

—একটা প্রশ্নের জবাব দিন।

—কি দেব?—রিঙ্কুর ভাবনা নষ্ট করায় সুহাস বিরক্ত হয়েছিল।

—এক্ষুনি জবাব দিন।

—কোথায় দেব ? হাতের ওপরে ?—সুহাস ক্রুদ্ধ। —ভিখারির আবার এত ভণিতা কেন! সোজাসুজি বললেই হয় - ভিক্ষে দিন। এদের ভিক্ষে দেওয়াও পাপ। শক্ত সামর্থ চেহারা অথচ খাটাবে না। পরিশ্রম করবে না। এদের উৎপাতেই দেশটা গোল্লায় গেল। ভুরু কুঁচকিয়ে চোখের দিকে তাকাতেই লোকটা বলেছিল,—একটু ভেবে উত্তর দিন। কেননা প্রশ্নটা পৃথিবীতে এই প্রথম।

এ-তো আচ্ছা মুশকলি। তবুও রাগ চেপে সুহাস বলেছিল; চটপট বলুন।

পরম পিতা যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র সমাধি যদি সত্যি সত্যিই ভারতে হয় তাহলে জাতির জনক গান্ধীজীর সমাধি কেন রাজঘাটে হবে ?

—তার মানে ?

—তার মানে খুব সোজা—যীশুর কবর যদি কাশ্মীর উপত্যকার হয়ে থাকে তাহলে গান্ধীজীর স্মৃতি-বেদী কেন বর্মায় কিংবা বোর্ণিওর হবে না ?

—সত্যিই তো—'হাসি চেপে সুহাস বলেছিল,—আপনি বরং এ বিষয়ে রিসার্চ করুন।

—যোগ সাধনা করলে খাবার কম লাগে। আমাদের দেশের মুনি ঋষি যোগীরা প্রায় সকলেই বায়ুভুক ছিলেন। তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করলে পৃথিবীর কোথাও কোনদিন ফুড প্রবলেম হবে না। আনন্দের কথা —আমরা আবার

—আপনি এর ওপরেও

—হুঁ—থীসিস! দিল্লী ইউনিভারসিটিতে দেব ঠিক করেছিস।

- খুব ভাল, ডবল ডক্টরেট পেয়ে যাবেন।—সুহাস আর দাঁড়ায়নি। পাগল ভেবে মনে মনে হেসেছিলো আবার অনুকম্পাও অনুভব করেছিল।—বেচারা। ভদ্র ঘরের শিক্ষিত ছেলে বলেই মনে হয়। কিন্তু পাগল হল কেন ? সত্যি সত্যিই পাগল তো ? না অন্য কোন কারণে পাগল সেজেছে ? আজকাল কোন কিছুতেই বিশ্বাস নেই। একটু জেরা করলেই হয়ত দেখা যেত লোকটা পাগল নয়—সেয়ানা ঘুঘু। ক্রিমিনাল। জেলপালানো আসামী। কিংবা স্পাই। আর যদি লোকটা প্রকৃতই পাগল হয় তবে কেন হয়েছে ? সুহাস একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগল সে কথা।

এই ইণ্ডিয়া কিংস না ধরালে ভাবনাগুলো ঠিক যুৎসই হয় না। লম্বা দু'টো টান মেরে তার মনে হল ঐ পাগলটার কথা সে ভাবছে কেন!—সত্যিই তো! পথে-ঘাটে পাগলের তো ছড়াছড়ি। তাহলে এত থাকতে ওর কথা কেন? কি জানি? লোকটা পাগল হল কেন?

দুর ছাই। স্কুটারটা ঠিক থাকলে ওটা নিয়ে বের হলে এসব ছাই পাপ কিছুই ভাবতে হত না। দিব্যি হুস করে রিঙ্কুর কাছে পৌঁছন যেত। আর রিঙ্কু হয়ত দুষ্টু হেসে কপট গাম্ভীর্যে বলত,—কি ব্যাপার, অসময়ে যে?

—তোমার কাছে আসব তার আবার সময় অসময় কি?

—বা রে আমার বুঝি পড়াশোনা নেই, বাড়িতে বুঝি অন্য কেউ নেই!

—থাকলেই বা। এই জান আজ আসবার সময় একটা অদ্ভুত পাগল দেখলাম। শিক্ষিত ভদ্র চেহারা—

—আমিও দেখেছি।

—কাকে?

—একটা পাগলকে। শিক্ষিত স্মার্ট অবুঝ ও অভিমানী। যখন তখন একটা মেয়ের বাড়িতে হানা দেয়—

—শুধু হানা দিয়েই কিন্তু ক্ষান্ত হয় না। সুযোগ পেলেই মেয়েটিকে আবার বলপূর্বক কাছে টেনে পটাপট তার ঠোঁটে গালে বুকে –

—সেয়ানা পাগল তো, তাই—

—তাই ইচ্ছেটাও বল্গাহীন, বুনো ঘোড়ার মতই সাহসী আর বেপরোয়া, সুতরাং

—স্ট্যাচু।

সেই লোকটাও কি এখন স্ট্যাচুর মতই দাঁড়িয়ে আছে লাইটপোস্টার নিচে? প্রশ্নটা যেন হঠাৎই মনে পড়ল সুহাসের। এবং ইচ্ছে হল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। কিন্তু না—কি হবে পাগলকে দেখে যদি আবার চোখা-চোখি হয়ে যায় আর তখন যদি কাছে এসে শুধোয়—পরম পিতা যীশুখৃষ্টের কবর যদি ভারতে হয় তাহলে জাতির জনকের—কিংবা যদি শুধোয় সবাই বায়ুভুক হলে ইণ্ডিয়া কোন দেশে ফুড এক্সপোর্ট করবে বলুন তো? —তাহলে? বেচারা। মাথা ঠিক থাকলে কি কেউ কখনও এ ধরণের প্রশ্ন করে? কিন্তু লোকটা কে? আর কেনই বা এরকম হল? হয়ত কোন গভীর শোক টোক পেয়েছে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় বউ কিংবা ছেলে

মারা গেছে। অথবা দলবাজি করতে গিয়ে চাকরি খুইয়েছে। কিংবা হয়ত দেনার দায়ে ক্ষেপা লেগেছে। হুঁ-উঁ তাও হতে পারে। আবার ব্যর্থ প্রেমের পরিণতিও হতে পারে। কিন্তু তা হবে কি করে? ভালবাসা যদি সাচ্চাই হয় তাহলে তা ব্যর্থ হবে কেন? তাই কি কখনও হয়। এখন চেষ্টা করলেও বিষ্ণু কি—এই যাহ্ বোধ হয় দেরিই হয়ে গেল। বিষ্ণু কি ভাবছে কে জানে।

সিগারেটে শেষ টান মেরে সুহাস দ্রুত হাঁটতে লাগল। কেননা বিষ্ণু বোধ এতক্ষণে সেজেগুজে বসেই আছে। তার দেরি দেখে মনে মনে চটছে, আর ভাবছে আচ্ছা ইরেসপন্সিবল্ লোক। আর কিছু না হোক অন্ততঃ অন্যের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় পাঙ্‌চুয়াল হওয়া উচিত। একশবার হওয়া উচিত, সে কথা আমিও মানি। কিন্তু কি করব বল! ঐ লোকটাকে আবার দেখেই তো কি সব যেন ভাবছিলাম। যদিও এসব আজে-বাজে বিষয়ে আমার মোটেই ভাবা উচিত নয়। তবুও ভাবছিলাম। কেননা ধরবার চেষ্টা করছিলাম তোমার থিওরিতে লোকটা কোন শ্রেণীতে পরে। শ্রমিকও নয় কৃষকও নয়। যেহেতু চেহারাটা ভদ্র অতএব নির্ঘাৎ কেরাণীকুলেরই কোন কলঙ্ক। এরা পরিশ্রমে ভীত, পরচর্চায় মুখর, ঘুষ খেতে ওস্তাদ। এই ক্লাসটাকে এবালিশ না করতে পারলে

বিষ্ণু ছটফটিয়ে উঠল,—তোমার সময় হল? আমি তো ভাবলাম

—খুবই দুঃখিত। অকারণেই দেরী হয়ে গেল তার ওপরে আবার বাহনটি নেই।

—যাক নিশ্চিন্ত। আমাদের কার দু'টিও নাইরে। তাহলে আজ ঐ টি হাঁটি পা-পা।—ছোট্ট করে এক টুকরো হাসল বিষ্ণু।

—তোমার সঙ্গে হাঁটতে তো আমার আপত্তি নেই বরং পৃথিবীর দীর্ঘতম পথটিও—কথা শেষ না করেই বিষ্ণুর দিকে তাকাল সুহাস।

বিষ্ণু চোখ বড় বড় করে চাইল। নতুন কিছু বল।

—মানে হাঁটতে ভালই লাগে কিন্তু যদি আবার সেই লোকটা—

—কোন লোকটা? বিষ্ণু জিজ্ঞেস করল?

রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুহাস বলল সেই লোকটার কথা।—লোকটা সম্ভবতঃ পাগল। হয়ত চাকরি নেই। এদিকে ভদ্রলোকের ছেলে, সরাসরি ভিক্ষেও চাইতে পারেনা। হয়ত খেতে না পেয়েই পাগল হয়েছে।

—আই বেগ টু ডিফার। তুমি আমার থিসিসের সাবজেক্টকে ডিসঅনার করছ। জান আজ দুপুরেই ডক্টর বিশ্বাস আমার পেপারের কত প্রশংসা করেছেন। অ্যাকচুয়ালি আফটার ইণ্ডিপেন্স উই হ্যাভ প্রোগ্রেসট্ মাচ। রেপেস্ট্ ইন আওয়ার ইকনমি। তুমি বলবে দেশে ভিক্ষুক আছে। আমি বলব ওরা স্বভাবভিক্ষুক।

—তাহলে চারিদিকে এত ক্রাইসিস কেন? আর ন্যাশনাল ইনকামের বেলাতেই বা

—ক্রাইসিস! ইটস সেন্টপার্সেন্ট আর্টিফিশিয়াল। তুমি দেখ। আজ কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত প্রত্যেকের হাতেই পয়সা আছে। যে মাঠে আগে একটার বেশি ফসল হত না এখন সেখানে তিনটি চারটি হেসে খেলে হয়ে যায়। চীন দেশে একটা লেবার ডেইলি কত আর্ন করে জান -দশ আনা থেকে পাঁচ সিকে। আর এখানে—চার টাকা থেকে আট টাকা।

আজকের মধ্যবিত্ত মানেই স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত। এই ক্লাশ লাক্সারির পেছনে প্রতিমাসে কত খরচ করে জান? •

সুহাস ইণ্ডিয়াকিংস ধরাল। একটা দীর্ঘ টান মেরে বলল,—জিনিশ-পত্রের দাম বেড়েছে স্বীকার কর তো?

—জাষ্টিফায়েড। ইনকাম বেড়েছে—খরচও বেড়েছে। থিওরিটা হচ্ছে ডাবল ইনকাম, ডাবল এক্সপেণ্ডিচার, ডাবল সেভিংস। তুমি পাঁচটাকা রোজগার করে চারটাকা খরচ করলে একটাকা জমে আর দশটাকা রোজগার করে আট টাকা খরচ করলে কত জমে?

—ওসব থিওরির কথা বাদ দাও।

—কেন বাদ দেব? ইটস্ সায়েন্স—সুতরাং তুমি যদি এখন গায়ের জোরে বল কেউ না খেয়ে থাকছে, কেউ অভাবে মরছে আই'ল নট বিলীভ।

—বিশ্বাস তো আমারও হয় না। কিন্তু প্রায়ই খবরের কাগজে

—কাগজ চালাতে গেলে ওসব লিখতেই হয়। তুমি যে কোন অতি সাধারণ লোককে একটু ভাল করে লক্ষ্য কর'দেখবে ঘড়ি পেন টেরিলিন টেরিকট ট্রানজিস্টার আছে। খেতে না পেলে এসব আসবে কোথা থেকে?
—ভ্যাবাক-আমাদের আছে ঠিকই কিন্তু আগের মত নয়, না খেয়ে মরবার স্টেজে এখন আর কেউই নেই।

—ইগ্জ্যাক্টলি। যে কোন লোকই কার কিনছে। লাখ টাকা দিয়ে

বাড়ি বানাচ্ছে, কথায় কথায় ইউরোপ ছুটছে।

রিঙ্কু কথার মোড় ঘোরাল।—আমাদের কি দেরি হয়ে গেল! আমি অনেকক্ষণ থেকেই তৈরি হয়েছিলাম

—এমন কিছুই নয়। তবে মিঃ ভট্টাচার্য ভুরু কোঁচকাতে পারেন। এই শুনেছ তো মিঃ চৌধুরী নাগপুরে একটা প্লান্ট খুলছেন!

—অজয় লিবিয়া যাচ্ছে সামনের দশ তারিখে।

—তোমার তো এক কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাই না?

—এক কালের কেন—একালেও। —রিঙ্কু হাসল। —আর অঞ্জনের কথা মনে আছে তো? ওর চিঠি কালই পেয়েছি। বালগেরিয়াতেই সেট্‌লড।

—আর আমরা কবে সেট্‌লড হব?

—যে দিন খুশি। —এবার পুজোয় মানালী যাবে? সর্বাণী বাধা অহরদারা প্রোগ্রাম করছে।

গল্পে গল্পে আলো-আঁধারি পথ হেঁটে ওরা যখন উৎসব বাড়িতে পৌঁছল তখন রাত প্রায় আটটা। ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার আগে সুহাস ফিস্ ফিস্ করে রিঙ্কুকে বলল,—মেতে যেও না যেন। ফেরার সময়েও কিন্তু হেঁটেই যাব।

—তুমি রেসকিউ কর। মিসেস পালের এমন্যাসির গল্প শুরু হলে

—একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়ব না হয়। তোমাকে আটকাবার চেষ্টা করলে যা'হোক কিছু একটা বলে দিও।

—তুমি নিজে আবার—। রিঙ্কু আড় চোখে সুহাসের দিকে তাকাল।

—সুহাস হাসল। আমি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে পারি।

—হাই—রিঙ্কু। দা বিউটি ইজ ব্লেজিং

—ডোন্ট লাই।

—স্মাট নেভার।

—সুশীতবাবু আপনাদের নিউ এষ্টাব্লিশমেণ্টের রেসপন্স কেমন?

—ওয়েল, বিয়ণ্ড এক্সপেক্টেশন্।

—কোল্ড ড্রিংকস, স্যার।

—নো থ্যাঙ্ক্‌স।

—প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনে আমিই প্রস্তাব এনেছিলুম যে, গভর্মেণ্টের উচিত প্রতিটি প্রোগ্রেসিভ রাইটারকে অন্ততঃ তিন সপ্তাহের জন্যে হলেও···

—বে অব বেঙ্গল ডিপ্রেশনের ফলে সর্ষের প্রোডাকশন হ্যাম্পার্ড হবে কিনা

বলুন তো?

—আরে সুহাস যে, তোমাদের উৎসব কবে হচ্ছে?

—বন্যার্তদের জন্যে চ্যারিটি শো ?শুক্রবার শুক্রবার। কোন ফিল্ম হিরো-ইনকে দিয়ে…

- ওয়েলথ ট্যাক্স তো দিয়েই যাচ্ছি, দিয়েই যাচ্ছি কিন্তু…

কথা আর শেষ হয় না। চারদিকে শুধু ঝকঝকে নারী পুরুষ—আর ঝক্‌ঝকে কথা। কি ভাবে যে সময় কাটতে থাকে কেউ টের পায় না। সুহাস খুঁজতে থাকে রিঙ্কুকে। রিঙ্কু চোখ টিপে ইসারা করে সুহাসকে। এবং এক সময় ওরা দু'জনেই বেরিয়ে পড়ে।

সুহাস হাঁটতে হাঁটতে বলে, বেশ রাত হয়েছে কিন্তু।

— একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। ফ্রায়েড রাইস কত নষ্ট করেছি; জান? —রিঙ্কু ঢেকুর তোলে।

সুহাস ইণ্ডিয়া কিংস ধরিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে রিঙ্কুর হাত ধরে বলে, সারা রাত ধরে এভাবে হাঁটলে কেমন হয় বল তো?

ভালই হয়। তবে থানায় যাওয়ার প'সিবিলিটি খুব।

—তুমি বড্ড বেরসিক।

—আমার গা খুব গুলোচ্ছে। কেমন অস্বস্তি লাগছে।

—সে কি? - সুহাস ব্যস্ত হল।—বাড়ি গিয়ে না হয় দু'টো জেলুশিল খেয়ে নিও।

নির্জন রাস্তায় ওরা দু'জনে দ্রুত হাঁটতে লাগল এই রাতের অন্ধকারে গা ঘেষাঘেষি করে হাঁটতে খারাপ লাগে না সুহাসের। মনে হয় রাস্তাটা আরো বেশি অন্ধকার হলে যেন ভাল হ'ত। সুহাস আস্তে ডাকে,—রিঙ্কু

রিঙ্কু কোন উত্তর দেয় না।

একটু পরেই গান্ধী মোড়ের আলো দেখা দেয়। সুহাস রিঙ্কুর হাত ছেড়ে দিয়ে বলে,—ওখানে নিশ্চয়ই কোন গাড়ি পাওয়া যাবে।

রিঙ্কু কিছু না বলে আরো জোরে হাঁটতে থাকে। –

আর গান্ধী মোড়টা পার হতে গিয়ে রাস্তার মাঝে হঠাৎই উবু হয়ে বসে হড়হড়িয়ে বমি করে ফেলে।

সুহাস দুহাতে শক্ত করে রিঙ্কুর কাঁধ চেপে ধরে একটু জল পেলে ভাল হত। কিন্তু কোথায় জল? মিনিট .দুয়েক ঐভাবেই কেটে যায়। পকেট

থেকে রুমাল বের করে রিন্টুকে দেয়। রিন্টু চোখ-মুখ মুছে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়।

আর তক্ষণি রাস্তা ফুঁড়ে কে যেন সামনে এসে বিরাট শব্দে হেসে ওঠে।

রিন্টু ভয় পেয়ে সুহাসকে জড়িয়ে ধরে।

সুহাস বিস্ফারিত বিস্ময়ে দেখে বিকেলের সেই লোকটা কাকের বাসার মত বিধ্বস্ত সেই লোকটা তখন মহানন্দে পরম তৃপ্তিতে রাস্তায় ওগলান ফ্রায়েড রাইস চেটেপুটে খাচ্ছে।

রিন্টুর সারা শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

সুহাসের কপালে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রাস্তা সাফ করে হাত চাটতে চাটতে লোকটা উঠে দাঁড়াল। এবং উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল।

সুহাসের খটকা লাগল—একি সেই লোকটা, না অন্য কেউ? এ লোকটার মুখটা যেন কেমন। সেই লোকটা তো—লোকটা কে দেখবার জন্যে সামনে তাকাতেই সুহাস ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

দূরে গিয়েও লোকটা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এবং বিরাট বিরাট পা ফেলে এই দিকেই এগিয়ে আসছে। সারা রাস্তা জুড়ে তার ছায়া। ক্রমেই বড় হচ্ছে। ক্রমেই বড় হচ্ছে। একটা ভয়ঙ্কর পরিচিত মুখ স্থির দৃষ্টিতে দাঁতে দাঁত ঘষে এগিয়ে আসছে। এখন আর তাকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না। সেই লোকটা। লোকটা বোধ হয়··

সুহাস রিন্টুর হাত ধরে ছুটতে আরম্ভ করল।

———

বন্যার জল যখন দেশ ভাসায়

অনুবাদক :
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বর ! তুমি বিশাল এবং পরম শক্তিমান
কেন তবে আজ আড়াল ক'রেছ যা কিছু তোমার সত্য ও সুন্দর ?
তুমি উর্ধ্বের মহাকাশ থেকে পাঠালে মৃত্যু আর মহামারী, তিন ভুবনের
দারুন অসম্মান !
তুমি স্বর্গের শোভাময়, মহাদেব ! নও, পাষাণপুরীর বিষধর !
রাজত্ব করো পৃথিবীর ; নেই সামান্য উদ্বেগ ? নেই কোনো পরিকল্পনাই ?
পাপী যারা তারা মার খায়, মার খাওয়াই উচিত ; কিন্তু
পাপের ছায়াও মাড়ায়নি যারা, শকুন শেয়াল তাদেরও মাংস খায় ।
এ কী বিচিত্র স্বভাব তোমার, দেবতা ! এই কী তোমার রাজত্ব, তার শান্তি ?

এই মহাদেশ শাসন করেন যিনি তিনি না তোমার প্রতিনিধি, ঈশ্বর ?
কীজন্য তিনি বিবেকের কোনো কথায় দেন না কান ? কোনো লক্ষ্যই স্থির
নেই তাঁর ; অন্ধের মত ঘোরেন এ দিকে, ওদিকে ?
যারাই শাসন করে দেশ তারা কবে যে শিখবে সহবৎ—
সামান্য সংযম ভালোমন্দের বিচার !
মানুষের কোন ভয় না থাকুক তাদের, ভয় নেই স্বর্গকে ? *

প্রাচীন চীনা কবিতার (খৃঃ পূঃ ৬ শতাব্দী) অনুবাদ ।
সূত্র : 'The Penguin Book of CHINESE VERSE'

পোস্তা গোলে / সুধীরকুমার করণ

সে এখন বন্দী সেলে
কঠিন কংক্রিটে ,
কখন হুকুমনামা
পেয়াদারা পড়ে যাবে
নির্ভেজাল মুখে,

তারই জন্যে দিন গোনা শুধু —
কখন নির্দয় ফাঁসি
কণ্ঠরোধ করে দেবে তার।
এখন ভয়ের সঙ্গে
দিনরাত ওঠাবসা ;
ভয়ে ভয়ে —
সে এখন ফেলে দেওয়া
অসহায় বিড়ালের ছানা।
সারারাত আস্তাকুড়ে ভয়ের নিশানা।

বাইরে অনর্গল বৃষ্টি।
সে এখন বন্দী সেলে
কঠিন কংক্রিটে ,
চৌকাঠ ডিঙিয়ে যাবে সাধ্য নেই তার।
মাঝে মাঝে চমকে উঠে দেখে,
পোড়া শোল আস্ত হয়ে
তরতর সাঁতার দিচ্ছে উঠোনের জলে।

কোথায় আপেল / শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

গালফোলা সাহিত্যসভায় লাল টুকটুকে গালে
আপেলকাটার মখমল আরাম
যদি পাওয়া যায়
সে কথা ভেবেই আমি পিছনের সীটে গদীয়ান
সত্যি, গদী ছিল
সুন্দর কবিতা পড়ে বাহবা কুড়িয়ে
অনেকে না শুনে
কেতাদুরস্ত আশপাশ

টাক্লিচড়া, নাসিংহোমে প্রসববেদনা নাকি কমে যায়
ফ্রিজে চন্দ্রলোকের আহার্য প্রস্তুত হতে থাকে
এইসব গা ঘিনঘিন কথার এক ফাঁকে
জানলা দিয়ে থুথু ফেলি
মুখ ফিরিয়ে আপেল খুঁজতে গিয়ে
মুখ ফিরিয়ে আপেলবাগানে
কয়েকটি ইঁদুর মাত্র পায়চারি করে।

এক প্রাচীন মন্দিরের সামনে

(শ্রীযুক্ত খোরানাকে নিবেদিত)

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

এক প্রাচীন মন্দিরের সামনে
কেউ তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

টেরাকোটার কাজ দেখছো তুমি
দেখছো অন্ধকার
সারি সারি ভাঙা মূর্তি
এছাড়া কিছু শ্যাওলা
গাছ-গাছড়ার তুচ্ছ জীবনবৃত্তান্ত—
এও ছিল।
আর আসল পুঁথি যা
সে তো সেই মন্দিরের ভেতরে
একেবারে গর্ভগৃহে
যেখানে সেই বুড়ো কুম্ভকার
একদিন গড়ে তুলবেন
ঈশ্বরের মুখ।

পুরোহিত এসব কথাই বলতেন
বলতেন কিভাবে সেই আশ্চর্য মুখ
আবার এক মন্দিরের ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে॥

রক্তের জোয়ারে আসে বুকের নাব্যতা

ব্রজগোপাল রায়

এখনো প্রচুর রক্ত মেখে আছি অশ্বথের ।
বিষণ্ণ বাতাসের শেষ মুছে গেলে
প্রচণ্ড উত্তাপ মেখে
ঝ'রে পড়বো অলৌকিক আকাশ থেকে
নতুন সূর্য হ'য়ে !
হৃদয়ের এই বিশ্বাস একরাশ মৌশুমীর মতো
ধুয়ে দেবে ক্লেদাক্ত তীর—
ভবিষ্যৎ-বৃক্ষের আমন্ত্রণ হবে লোকালয় ঘিরে ।
প্রিয় মানুষের স্বচ্ছ নিঃশ্বাসে ভেসে যাবে—হৃদয়
দেশান্তরের গভীর ইচ্ছার মধ্যে স্বপ্ন বুনে বুনে ,
প্রতিবেশীর নিকানো উঠোনে
দাঁড়াবো সহোদর জীবন উৎসবে ,
রক্তঝরা হৃৎপিণ্ডগুলি বিছানো শ্যামল মৃত্তিকায়
রাত্রিহীন প্রভাতের প্রসন্ন কিরণের সোনালি ছায়ায়
খুঁজে পাবে ভাষা , আমাদের উৎসুক বুকে, চোখে মুখে
প্রিয় মানুষের হৃদয়ের সৌরভ টলটল করবে সুখে
মানুষের এ-পৃথিবী মানুষেরই হবে !
কিশলয় চিবুকে চিবুক রেখে অঘ্রাণের ক্ষেতের শিশির
ঝরাবে পালক ..
সময়ের নৌকা জোয়ারে জোয়ারে ভেসে যাবে
সমুদ্রের কাছাকাছি অথবা গভীর সমুদ্রে
যেখানে নদনদী ফিরে পায় বুকেরা নাব্যতা ॥

[আকস্মিক মৃত্যুর অল্প ক'দিন আগে পূর্ণেন্দু সিংহের আহ্বানে রাজেশ্বরী দত্ত এসেছিলেন পাঁচথুপি, বাংলার মাঠ ঘাট থেকে চকিত শিল্পীদের তুলে নিয়ে এসে তাজা অকৃত্রিম বাউলগান শোনানো হবে তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে। সঙ্গে ধ'রে এনেছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারী ও দিগ্‌দর্শী শান্তিদেব ঘোষকে । সেই প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্যে আমাকেও

আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। টেইপরেকর্ডার হাতে অনুক্ষণ তৎপর সেই তৃপ্ত দৃপ্ত মুখ দেখে সেদিন ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না আর মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ পর এই পাঞ্জাব নন্দিনী বংগবধু, সিন্ধুগংগার সংস্কৃতিসংগমে উদ্ভূতা কমলে কামিনী, রবীন্দ্রসংগীত ধারাকে যিনি ভারতে ও বহির্ভারতে কণ্ঠ ও মনীষার কমণ্ডলুহাতে প্রবাহিত করে দিয়েছেন, তাঁর ওই বলিষ্ঠ দেহের অভ্যন্তরের প্রচণ্ড কর্মক্ষম যন্ত্রটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাবে! নিচের কবিতাটির মধ্যে দিয়ে 'চেতনিক' এই রবীন্দ্রপ্রসাদধন্য গবেষক শিল্পীর স্মৃতি তর্পণ করছে।

সম্পাদক/চেতনিক]

রাজেশ্বরী দত্ত / পুলকেন্দু সিংহ

(১৯২০-১৯৭৬)

বুকভরা সুরের পিপাসা নিয়ে বিপাসা মিশেছে এসে
শ্যামলী এবঙ্গভূমে কবিতার গাঙের সঙ্গমে
বধুরূপে, প্রস্ফুটিত পুষ্পরূপা, বহুদূর নক্ষত্রের বিচ্ছুরিত
আলোর প্রতিমা সুধীন্দ্রসঙ্গিনী!
প্রণম্য আচার্যরূপে শান্তিদেব, শৈলজার সস্নেহ লালনে
রমনীয় স্নিগ্ধ শান্তিনিকেতনে সুরধ্বনি সুরধুনী হল—
আশ্চর্য অমেয় কণ্ঠে প্রাণ পেল রবীন্দ্রভাবনা নতুন আবেগে
তাই টেনিসির তীরপ্রান্তে, রাইনের স্রোতে পরমা প্যারীর বুকে
ইফেল টাওয়ারে বাংলার গাঁয়ে গঞ্জে
গুঞ্জরিত ধ্বনি সুধাকণ্ঠে প্রবাহিতা বাণী
প্রাণপ্রদায়িনী।
সেই বাণী গাঁথা আছে ভালবাসা দিয়ে—
সবার হৃদয়ে পঞ্চস্তূপে ময়ূরাক্ষী কোলে
গেরুয়া মাটির বুকে বাউলের গোপীযন্ত্রে
মধুর মৃদঙ্গ বোলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে।
নন্দকিশোরের কণ্ঠে মনোহারী সুরে ভাগীরথী তীরে।
তাই মর্তসীমা তুচ্ছ ক'রে
আজকের অকস্মাৎ এই চলে যাওয়া
সেই গান, সেই সুর, সেই স্মৃতি নিত্যকার চিত্ত ভ'রে পাওয়া।
সুরলোকা, তুমি হলে সুরের ঈশ্বরী
রাজ-রাজেশ্বরী।

সাতে-পাঁচে/ভাস্কর শর্মা

—কি যে সব ছাইভস্ম লিখছ। তুমি ভাস্কর শর্মা, না অগ্নিশর্মা? —সম্পাদক মশায়ের অগ্ন্যুদগীরণ আমার প্রতি।

— আজ্ঞে, কি যে বলেন! আপনার এ অগ্নিমূর্তি কেন? আমি শর্মা টর্মা নই, শুধু একটু লবণ হতে চাই।

—লবণ? সে কি! কেন?

আজ্ঞে,—মানে, লবণ, ভাস্কর-লবণ আর কি। তাহলে অন্ততঃ আপনার সম্পাদকীয়টুক ত' হজম করার চেষ্টা করতে পারি!

* * *

"মুর্শিদাবাদে মাটির নীচে ট্যাবলেটের খনি," খবরে প্রকাশ।

হায় মুর্শিদাবাদ! সোনা নয়, পেট্রোল নয়,—এমন কি কয়লাও নয়? শেষ অবধি শুধু ট্যাবলেট! তাও যদি ম্যানাড্রেক্স হতো!

দেখো, গোঁজো; খোঁড়ো, আরো খোঁড়ো। অবশ্য অন্য মাল না পেলেও ফারাক্কা ত' তোমার বাপিটাকের ট্যাবলেট হয়েই রইল। দুঃখ কিসের?

* * *

পরীক্ষা কেন্দ্রে বিয়েবাড়ির চেয়ার-টেবিল উল্টে-পাল্টে বিপত্তি, পরীক্ষার্থী বিপর্যস্ত, বিগত এক পরীক্ষার খবরে জানা গেল।

তা, আগে-ভাগে পাতায় পাতায় রসগোল্লাটা পরিবেশন ক'রে দিলেই ত' ল্যাঠা চুকে যেত!

* * * *

মাছের আড়তদারদের ওপর লেভি লাগু হবে, আরেক সুখবর।

উত্তরবঙ্গের বড়ো রুই আর দক্ষিণবঙ্গের ভেটকি মাছ,—আহা! মধ্যবঙ্গে আমার পেটে-পিঠে গড়াগড়ি খেতে ইচ্ছে করছে।

* * *

বহরমপুরে রিক্সাভাড়া নির্ধারণের সব প্রয়াস ব্যর্থ হচ্ছে নৈরাজ্য অব্যাহত। ভাড়ার সংশোধিত তালিকার বোর্ড পথপ্রান্ত থেকে রিক্সাচালকেরাই নাকি তুলে ফেলে দিয়েছেন।

মা ভৈঃ! অনানুষ্ঠানিক শুনলাম, রাষ্ট্রীয় পরিবহন নাকি বহরমপুরে রিক্সা চলাচল জাতীয়করণের সুপারিশ করবেন!

তাই বুঝি রিক্সাতে এত পরিবর্তন দেখি।

* * *

"হাম দো, হামারা দো—আমরা দু'জন, আমাদের দুইজন" ইহা ছাড়া নাকি গত্যন্তর নাই খাইবার-পরিবার সমস্যা সমাধানের।

হয় পরিবার পরিকল্পনা, না হয় থাইবাবু হরিমটর ? কিন্তু আরও একটা বিধান ত' ছিল। হয় অজয় মুখুজ্জে কিম্বা প্রফুল্ল সেন ?

* * *

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন থেকে নাকি বছরের পরীক্ষা বছরেই হবে, এমন কি বছরে দুটো করেও হতে পারে—একটি শুভেচ্ছুক ঘোষণা।

সে কি! এ যে নাশকতা! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে এইভাবে ধূলিস্যাৎ করার মতলবের তীব্র প্রতিরোধ হওয়া দরকার,—বললেন এক বন্ধুপত্নী, যিনি গত পাঁচ বছর ধরেই এম এ পরীক্ষার্থিনী, পাশও করেন না, ফেলও না।

* * *

'বিগত দশটা বছর হচ্ছে প্রগতির দশক, সর্বস্তরের, সর্বক্ষেত্রে।'

—বুঝলাম। আগের দুইটি দশক শুধুই কৃচ্ছ্রসাধন নামক অগতির একক ছিলাম। এখন শতকটার মতিগতি কি,—কে জানে!

* * *

রেজিস্ট্রি বিবাহ সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হবে—লোকসভায় চিন্তা-ভাবনা।

সত্যিই চিন্তার কথা। একে কন্যাদায়, তার ওপর আবার যদি বাপ-মায়ের বিয়ে দিতে হয় তাহলেই ত' গেছি!

* * *

দরিদ্রশ্রেণীর সুবিধার্থে সুন্দরবন অঞ্চলে ভাসমান ব্যাঙ্ক সংবাদ পত্রে শিরোনাম (হেড লাইন)।

ধনিক শ্রেণীর ডুবন্ত ব্যাঙ্ক আমরা অনেক দেখেছি। এখন ঘাটে ঘাটে হাটের দিনে ব্যাঙ্ক ভাসছে,—'রূপসী বাংলা!' হ্যালে পানির অভাব হবে না নিশ্চয়ই, কি বলেন সেন শর্মা মশাই ?

* * *

কিংসটনে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ ও শেষ টেস্টে ওঁদের বোলাররা গড়ে প্রতি ওভারে চারটি করে বাউন্সার দিয়েছেন। ফলে খবরে প্রকাশ—জনা চারেক ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যান রীতিমত জখম।

খেলাটা কি সত্যিই ক্রিকেট ছিল ?

হঠাৎ তোমার সামনে/অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হঠাৎ তোমার সামনে
অনন্ত কালের জন্যে গড় হয়েছি
ঘাড় সোজা করার স্পৃহা আর বুঝি কোনোদিন
দেবে নাকো ঘাই
ভেড়িয়া রুইয়ের মতো
জড়তায় পচা পানা ছিন্ন ভিন্ন ক'রে

এসো
দেখো
পিঠ পেতে দিয়েছি
লাগাও চাবুক
হে আমার বাম হস্তে
পূজিতা ঈশ্বরী

তথাপি এ-হৃৎপিণ্ড
পাবে না নখরে খুঁজে আরো বহু রাত
এখনো লুকিয়ে রাখি
আঘাতে বিকৃত তবু
ইস্পাতের মতো জেদী বুকের খাঁচায়
গোলাপের ঘ্রাণে মুগ্ধ কবোষ্ণ হৃদয়টাকে
নিরালায় নক্ষত্রের অনন্ত ক্ষুধায়।

আপনার এক কোটা রক্ত একটি

অমূল্য জীবন

এতে যে ভয়ের কিছু নেই তা দেখিয়েছেন

আপনাদের জেলার স্বাস্থ্য কর্মীরা

কালেকটরেটের কর্মীরা।

গ্রামে-গঞ্জে এই রক্ত দান আন্দোলন ছড়িয়ে দিন।

এগিয়ে আসুন আপনিও

বলেছেন জনাব আবদুস সাত্তার, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী।

আমরাও তাই এগিয়ে এসেছি এই আন্দোলনে। শারীরিক ক্ষতি

যে হয় না তা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন জেলার

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নিজে এবং অনেক

ডাক্তার নার্স আর স্বাস্থ্য কর্মীরা

তাঁদের রক্ত দিয়ে।

রক্ত দিয়েছেন জেলা সমাহর্তা নিজে এবং তাঁর নেতৃত্বে

কালেকটরেটের অনেক অফিসার ও কর্মীরা। আমি তাই জনগণকে

বিভিন্ন ক্লাবকে অনুরোধ করি—আসুন রক্ত দিন।

আপনার রক্ত একটি জীবন বাঁচাতে পারে।

অন্তত: ৩০/৪০ জন রক্তদাতার তালিকা প্রস্তুত করে আমাকে

সরাসরি লিখুন।

মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কথার সুর মিলিয়ে

আমিও বলছি—

'রক্ত দিন। আমি আপনাদের জীবন দেব।'

স্বাক্ষর—ডাঃ এস, এন সিংহ

চিফ মেডিক্যাল অফিসার, মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলা চিকিৎসা স্বাস্থ্য ও

পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর

১৬-৬-৭৬

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জন সংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত]

ফর্ম—৪

অষ্টম আইন অনুসারে 'চেতনিক' সম্পর্কে ঘোষণা

প্রকাশন স্থান : পোঃ ও জেলা মুর্শিদাবাদ

প্রকাশন সাময়িকতা : ত্রৈমাসিক

মুদ্রাকর প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর
নাম জাতীয়তা ঠিকানা : অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয়
পোঃ ও জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

আমি অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংগে ঘোষণা করছি যে উল্লিখিত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতো সত্য।

স্বাঃ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক, চেতনিক

১৯৭৬ পোঃ ও জেলা মুর্শিদাবাদ

Regd. No. RN 24668/73

CHETANIK (Progressive Lit. Qly) Year 3 No. 4
Edited & Published by ATUL CHANDRA BANERJEE from P.O. & Dist. MURSHIDABAD, WEST BENGAL & Printed by him from Cygnus Printing Co-operative Society Ltd, Berhampore, West Bengal.

'চেতনিক' সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য :

'দেশ'......'খ্যাত অখ্যাত সকলের লেখায় 'চেতনিক' সাহিত্যে নিজস্ব কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে পেরেছে। খাঁটি সাহিত্যপ্রীতি না থাকলে এমন হয় না।' **'যুগান্তর'** : 'চেতনিক' একটি সত্যিকারের মননশীল পত্রিকা...' **'সত্যযুগ'** : '......এই পত্রিকায় যে-সব রচনা স্থান পেয়েছে তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।' **দেশিকোত্তম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়** (শান্তিনিকেতন) : '..... একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই পাতাগুলি উল্টোতে সুরু করি। কিন্তু দু'খণ্ডের সব প্রবন্ধগুলি পড়লাম। দেখলাম মফস্বল থেকেও ভাবাবার মতো পত্রিকা বের হতে পারে...।' **অন্নদাশংকর রায়** : 'চেতনিক বেশ উচ্চাঙ্গের পত্রিকাই হচ্ছে। কলকাতায়ও এর মতো পত্রিকা খুব বেশি নেই। আপনার সম্পাদকীয় রচনাগুলি ভালোই লেগেছে। নির্ভয়ে ও অকপটে নিজের বক্তব্য বলে যান। মা ফলেষু কদাচন।... ...' **নারায়ণ চৌধুরী** : 'আপনার ('চেনা গোলাপ' নিবন্ধের) তানসম্রাট মাস্তু সাহেবের ওপর লেখাটি চমৎকার হয়েছে। গতদিনের পৃথিবীর এক ঝলক মিষ্টি বাতাস যেন এসে গায়ে লাগলো। গজল ও গীতগুলির পাশে পাশে বাংলা অনুবাদ দিয়ে খুব ভাল করেছেন। আপনার ওস্তাদ কাদের বক্সের সম্পর্কিত প্রবন্ধটি পড়ার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে রইলাম।' (অনিচ্ছার সংগে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি এবারকার মতো প্রেস থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হ'লো।—সঃ) **হীরালাল দাশগুপ্ত** : 'বদরিদাস বাধ মারেনি' এবং 'চেনা গোলাপ' দ্বিতীয় কিস্তি প'ড়ে অনাবিল নিবিড় আনন্দ লাভ করলেম। বিস্মিত হয়ে ভাবলেম একই লেখকের পক্ষে একই সময় এরকম দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করা কী অসাধারণ শক্তিরই না পরিচায়ক। বাস্তবিকই প্রতিভা অসাধ্য সাধন করতে পারে।' **বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** : 'আপনাকে আগেও বলেছি ১৯৭৪-এর শারদীয় সংখ্যা থেকে 'চেতনিক' অনেক উঁচুতে উঠে গেছে।' **কল্পতরু সেনগুপ্ত** : '......সম্পাদকীয় এবং 'চেনা গোলাপ' প'ড়ে আপনার প্রতি শ্রদ্ধায় আমি অভিভূত হয়েছি। আপনি 'চেনা গোলাপ' লিখে সংগীত জগতের উপকার করলেন। এর সংগে আরো সংগীত স্মৃতিকথা যুক্ত করে 'চেনা গোলাপ'কে একটি বই হিসাবে বের করা প্রয়োজন।' **বার্ণিক রায়** : 'চেতনিক' সম্প্রতি কলকাতার যে কোন পত্রিকার মানকে হার মানাতে পারে .....।' **বোম্মানা বিশ্বনাথম** : এমন সুন্দর ছিমছাম পত্রিকা মুর্শিদাবাদে বসে করা যায়! 'চেতনিক' না দেখলে না পড়লে বিশ্বাস হতো না।' **বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়** : (চেনা গোলাপ সম্পর্কে) শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সান্যালের 'স্মৃতির অতলে'-র পর এমন মাইফিলি মেজাজ বিশেষ মনে পড়ে না।......'